সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতির সদরে-অন্দরে

The Secretes of Imperialism

এস.এম. নজরুল ইসলাম

সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতির সদরে-অন্দরে

এসএম নজরুল ইসলাম

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতির সদরে-অন্দরে

এসএম নজরুল ইসলাম

www.pathagar.com

সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতির সদরে-অন্দরে
এসএম নজরুল ইসলাম

স্বত্ব
লেখক

প্রথম প্রকাশ
আগষ্ট ২০১৪

প্রকাশক
ইতিহাস-অন্বেষা প্রকাশনা

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
লেখক

অক্ষরবিন্যাস
বন্ধু কম্পিউটার্স

মুদ্রণে
পিজন প্রিন্টিং প্রেস (হোটেল আল হেলাল ভবন), ১৮৬ ইনার সার্কুলার রোড, আরামবাগ, ঢাকা-১০০০

মূল্য
৩৪০.০০ টাকা

U.S
10.00 $

www.pathagar.com

উৎসর্গ

১৭৫৭ সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত
যাঁরা দেশ-জাতির স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব
রক্ষায় নিজেদের জীবন-সম্পদ ও মেধা
দিয়ে জাতিকে পথ দেখিয়েছেন—
সেই মহান দেশপ্রেমিকদের স্মরণে—

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মুখবন্ধ

লেখক, গবেষক, কলামিস্ট ও সম্পাদক এস এম নজরুল ইসলামের গ্রন্থ 'সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতির সদরে অন্দরে' মোট ২০টি প্রবন্ধের সমষ্টি। একটি মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ও কলামিস্ট হওয়ার কারণে তাঁর লেখাসমূহ আবর্তিত হয়েছে বিভিন্ন বিষয়কে ঘিরে। লেখাগুলোর দিকে একটি সামগ্রিক দৃষ্টি আরোপ করলে এটা বলা যায় যে, তার এই গ্রন্থের বিষয় আবর্তিত হয়েছে সমকালীন বাংলাদেশ ও বিশ্বের বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহকে কেন্দ্র করে। বিগত কয়েক বছর ধরে তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সম্পাদনা করে চলেছেন 'মাসিক ইতিহাস-অন্বেষা'। এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, গ্রন্থে সন্নিবেশিত প্রবন্ধসমূহ ইতোপূর্বে উপরোক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

'সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতির সদরে অন্দরে' গ্রন্থে সন্নিবেশিত প্রথম প্রবন্ধের শিরোনাম হলো- 'ইহুদি চক্রান্তের ঘূর্ণিপাকে বাংলাদেশ ও বহির্বিশ্ব' এই প্রবন্ধে লেখক সারা পৃথিবীব্যাপী বিশেষতঃ মুসলিম বিশ্বের বিরুদ্ধে ইহুদিদের ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত, এই ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত বাস্তবায়নের কায়দা কৌশল, অর্থের যোগান প্রভৃতি বিষয়াবলী উপস্থাপন করেছেন। এই অনুষঙ্গে বাংলাদেশের চলমান রাজনীতিতে ইহুদিদের ষড়যন্ত্রের এবং এর ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ করেছেন। 'জঙ্গী-প্রজনন কেন্দ্রের গডফাদারগণ' প্রসঙ্গে লেখক জঙ্গী মতবাদ তৈরি, জঙ্গী দল তৈরি এবং জঙ্গী তৎপরতার পুরো বিষয়টিকে সাম্রাজ্যবাদীদের একটি অপকৌশল হিসেবে অভিহিত করেছেন। তিনি তুলে ধরেছেন যে জঙ্গী-তৎপরতা বহাল রাখতে সক্ষম হলে সাম্রাজ্যবাদীদের বিচরণ, শোষণ এবং লুণ্ঠনের পথ সুগম হয়। লেখক এটা স্পষতঃই বলতে চেয়েছেন যে, তৃতীয় বিশ্বের জঙ্গী তৎপরতার পুরো প্রক্রিয়া ও কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তির স্বার্থে এবং তাদের অর্থে।

গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে স্থান পেয়েছে পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-এশিয়া নীতি। ওবামার এই পররাষ্ট্রনীতি গোটা দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে পরিচালিত এটা বলার অপেক্ষা রাখে না। বর্ণ, গোষ্ঠী, জাতি আর ধর্মে বিভক্ত ভারতের অভ্যন্তরীণ অবস্থা খুবই করুণ। জনসংখ্যার ৭০%-এর উপরে মানুষ দরিদ্র সীমার নিচে বসবাস করে। মোট জনসংখ্যার একটা ছোট অংশ উচ্চ মধ্যবিত্ত। এরাই ভারতের শাসক। ওবামা তাদের উপরই ভর করে চলেছেন। গোটা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে চলছে সশস্ত্র লড়াই। এই বাস্তব পরিস্থিতিকে

www.pathagar.com

অতিক্রম করে ভারতের পক্ষে মার্কিন এজেন্ডা বাস্তবায়নে শামীল হওয়া আত্মঘাতী পদক্ষেপ। অন্যদিকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ পাকিস্তান, বাংলাদেশকে অকেজো বা ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত করার চেষ্টায় রত। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের এটা অনুধাবন করা প্রয়োজন যে, পাকিস্তান আর বাংলাদেশ মুসলিম দেশ। যে কোনো মুসলিম দেশের সমাজজীবন পরিচালিত হয় ইসলামী দর্শনের ভিত্তিতে। উপরন্তু দুটি দেশের জনগণের সাথে চীনের রয়েছে গভীর আস্থাপূর্ণ সম্পর্ক। এমনকি নেপাল ও শ্রীলঙ্কার সাথে চীনের সম্পর্ক উত্তরোত্তর বৃদ্ধির পথে। প্রতিবেশী মিয়ানমার চীনের একটি প্রভাবিত অঞ্চল। সামরিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতায় চীন বিশ্ব পরিমণ্ডলে মার্কিন শক্তিকে মোকাবেলায় সক্ষম। তাই এটা বলা যায় যে, দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলকে ঘিরে মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির গন্তব্য ব্যর্থ হতে বাধ্য।

পশ্চিমা বিশ্বের তথাকথিত আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ মুসলিম বিশ্বের জনগণের কাছে কখনোই গৃহীত হয়নি। ইসলামের মতো অসাধারণ ধর্ম ও দর্শনে ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পূর্ণ অর্থহীন। বিশ শতকের বিভিন্ন পর্বে হিন্দু মুসলিম দেশ পশ্চিমাদের পাল্লায় পড়ে ধর্মনিরপেক্ষতাকে গ্রহণ করলেও সময়ের বিবর্তনে এটা অসার ও অকার্যকর প্রমাণিত হয়েছে। লেখক মুসলমান সমাজকে এই আত্মঘাতী মতবাদ থেকে দূরে থাকার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন। গ্রন্থের ৫ম ও ষষ্ঠ সংখ্যক প্রবন্ধ দুটি হলো মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলে ইসরাইলের আগ্রাসন। ইসরাইল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ মদদে এই আগ্রাসন পরিচালনা করে আসছে বছরের পর বছর। প্যালেস্টাইনের জনসাধারণ ইসরাইলী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধে লিপ্ত। ইসরাইলের জায়নবাদী শক্তি নিজেদের অপরাজিত মনে করতো। ২০০৬ সালে সশস্ত্র প্যালেস্টাইনী সংগঠন 'হামাস'-এর বীর যোদ্ধারা ইসরাইলী বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে দেয়। ধুলিসাৎ হয়ে যায় জায়নবাদীদের অপরাজেয়র মিথ। হামাস এখন ইসরাইলের প্রত্যক্ষ ভীতিতে পরিণত হয়েছে। সত্যিকার ইসলামী ধারায় জেগে উঠা ও আগুয়ান হামাসকে থামিয়ে রাখার শক্তি যে ইসরাইলের নেই এটা অনুধাবন করে খোদ ইসরাইলের রক্ষাকারী অভিভাবক মার্কিনীরাও গভীরভাবে উদ্বিগ্ন।

'ইন্দিরা মায়ের স্মরণে' প্রবন্ধে লেখক বাংলাদেশে ইসলামী সশস্ত্র গ্রুপগুলোকে ভারতের সমর্থন ও আর্থিক অনুদানের কথা বলতে চেয়েছেন। ভারত এই ধর্মীয় উগ্রবাদী সংগঠনগুলোকে দিয়ে বাংলাদেশে একটা অস্থিতিশীল পরিবেশ বজায় রাখতে চায়। বাংলাদেশে ভারতের এই আগ্রাসন শুরু হয়েছিল ইন্দিরা গান্ধীর আমলে। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ প্রচণ্ড ধর্মভীরু এবং আগ্রাসনবিরোধী। ভারতের যে কোনো আগ্রাসনকে মোকাবেলায় বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণ প্রস্তুত। এই ক্ষেত্রে তাদের দর্শন ও আদর্শ হলো ইসলাম ধর্ম। সাম্প্রতিক বাংলাদেশের সমাজ ও রাজনীতিতে সবচেয়ে আলোচিত বিষয় 'মাইনাস টু ফর্মুলা'।

www.pathagar.com

লেখক এই বিষয়ে এক প্রাজ্ঞ ও প্রাণবন্ত বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। এই মাইনাস টু ফর্মুলার নামে সেনাপ্রধান মইন ইউ আহমদের বিশ্বাসঘাতকতায় বাংলাদেশের রাজনীতিতে এক চরম বিপর্যয় নেমে আসে। বাংলাদেশ ভারতের প্রত্যক্ষ আগ্রাসনের কবলে পতিত হয়। আজকের বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিতিশীল পরিস্থিতির জন্য বিশ্বাসঘাতক মইন ইউ আহমদের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ সম্পূর্ণভাবে দায়ী। এখনো বাংলাদেশ যে অনিশ্চিত গন্তব্যের পথে চলেছে তাও মইন ইউ আহমদের পরিকল্পনার অবদান। এক কথায় আজ বাংলাদেশের অস্তিত্ব হুমকির মুখে। এই বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে দেশের মানুষের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব রক্ষায় এগিয়ে আসার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন লেখক। এই ক্ষেত্রে তিনি দেশপ্রেমিকদের করণীয় সম্পর্কে এক বাস্তব দিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন।

সমকালীন বিশ্বে একটি জ্বলন্ত সমস্যা হলো কাশ্মীর সমস্যা। কাশ্মীরের জনগণের ভারতীয় আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে সুদীর্ঘ লড়াই সংগ্রামের ইতিহাস লেখক তুলে ধরেছেন 'অশান্ত কাশ্মীর' প্রবন্ধে। একই সঙ্গে মুসলিম দেশ সুদান ও বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অপপ্রয়াস, অপকৌশল তুলে ধরেছেন একটি প্রবন্ধে। এই দুই অঞ্চলে সাম্রজ্যবাদী শক্তি খ্রিস্টান মিশনারীদের বিপুল পরিমাণ অর্থ দিয়ে সাধারণ নিরীহ মানুষকে খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত করার জন্য আপ্রাণ প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। তবে এটাও সত্য যে মুসলিম প্রধান এই দুই অঞ্চলে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পূর্ণ সফল হওয়া সম্ভব নয়।

ভারতকে করিডোর প্রদান যে কোনো বিচারে বাংলাদেশের জন্য আত্মঘাতী। স্বাধীনতা পরবর্তী বিগত চল্লিশ বছরে কোনো সরকার ভারতকে করিডোর প্রদান করেনি। ভারতকে করিডোর প্রদান করলে একদিকে বাংলাদেশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা, অন্যদিকে বাংলাদেশ আর্থিকভাবে কোনো লাভবান হবে না। ভারতকে করিডোর প্রদান বাংলাদেশের জন্য এক আত্মঘাতী পদক্ষেপ এবং এ পদক্ষেপকে যে কোনো মূল্যে ঠেকানোর জন্য লেখক দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। গ্রন্থের শেষ প্রবন্ধে লেখক সমগ্র বিশ্ব পরিস্থিতি আলোচনা, পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করে বলতে চেয়েছেন এশিয়াকে বিশ্ব নেতৃত্ব গ্রহণ করতে হবে। পৃথিবীর সভ্যতার উদ্ভব ও বিকাশ এশিয়াতে, সকল ধর্মের উৎপত্তি এশিয়াতে। দুই বিশ্বযুদ্ধের কঠোর অভিঘাত এশিয়াকেই মোকাবেলা করতে হয়েছে। এখনো মানবিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রে এশিয়া অনেক এগিয়ে। পৃথিবীর প্রাকৃতিক সম্পদের বিশাল ভাণ্ডার এশিয়াতে। সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসন ও বিচরণভূমি এশিয়া। সামগ্রিক বিষয়াবলী মূল্যায়নে নিয়ে লেখক এশিয়াকে বিশ্ব নেতৃত্ব গ্রহণে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন।

গবেষক, লেখক ও সম্পাদক এস এম নজরুল ইসলাম সমকালীন ঘটনা প্রবাহ, ইতিহাস, সাহিত্য ও সংস্কৃতির একজন একনিষ্ঠ পাঠক। একজন পত্রিকা

www.pathagar.com

সম্পাদক হিসেবে তিনি সমকালীন বাংলাদেশ ও বিশ্বের ঘটনাবলীর একজন বিরাট পর্যবেক্ষণকারী। তাঁর চিন্তা আবর্তিত হয়েছে বাংলাদেশ ও মুসলিম বিশ্বের সমস্যাবলীকে ঘিরে। গ্রন্থে উল্লিখিত বিষয়াবলীকে তিনি বিচার, বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করেছেন বিশ্ব রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলে দাঁড়িয়ে। ফলে এই গ্রন্থটি হয়ে উঠেছে সমকালীন দুনিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থার এক চিত্র। আবার একই সঙ্গে সমকালীন দুনিয়ার ঘটনাপ্রবাহের এক আলেখ্যচিত্র। গ্রন্থে উল্লিখিত ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে লেখকের গভীর পর্যবেক্ষণ, মূল্যায়ন, তুলনামূলক পর্যালোচনা, বিশ্লেষণ গ্রন্থটিকে একটি একাডেমিক মাত্রা দান করেছে।

এই গ্রন্থটি নেহায়েৎ পপুলার বা জনপ্রিয় গ্রন্থ নয়। এই গ্রন্থের ধরন হলো গবেষণা ও বিশ্লেষণধর্মী। গ্রন্থটি সমকালীন বাংলাদেশ ও বিশ্ব রাজনীতির একটি গভীর পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ এবং প্রতিবেদন। গ্রন্থটি পাঠে সহজেই অনুমান করা যায় আগামী দিনের দক্ষিণ এশিয়া, মুসলিম বিশ্ব ও বিশ্ব পরিস্থিতি একটি বাঁক নিতে চলেছে। ইতিহাসের এই বাঁকে দাঁড়িয়ে আমাদেরকে আমাদের ভাগ্য নির্ধারণের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। গ্রন্থটি সুধী পাঠক, লেখক, গবেষক, রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক ঘটনাপ্রবাহের পর্যবেক্ষক প্রভৃতি সকল মহলে সমাদৃত হবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

(ড. এসএম লুৎফর রহমান)
সাবেক চেয়ারম্যান
বাংলা বিভাগ, ঢা.বি।

www.pathagar.com

ভূমিকা

আমার প্রকাশনায় ও সম্পাদনায় বিগত ১০ বছর যাবত প্রকাশিত মাসিক ইতিহাস অন্বেষা নামক পত্রিকাটি ইতোমধ্যে দেশের সুধী মহলে প্রশংসিত হয়েছে। চিন্তাশীল মানুষের পথনির্দেশক হিসাবেই পত্রিকাটি স্বীয় দায়িত্ব পালন করছে। ইতোপূর্বে আমার লিখিত ও প্রকাশিত ২টি বই যথাক্রমে 'সমকালীন সংলাপ' ও 'জাতির উথান-পতন সূত্র' পাঠক মহলে সমাদৃত হয়েছে। অতীতের সাথে বর্তমানের সমন্বয়ের মাধ্যমে সুন্দর আগামী নির্মাণের লক্ষ্যে কাজ করা আমার লক্ষ্য। এ লক্ষ্যেই আমি চিন্তা গবেষণাকে প্রবন্ধের রূপ দিই। আমার প্রতিটি প্রবন্ধে একজন চিন্তাশীল ব্যক্তি অতীত-বর্তমান ও ভবিষ্যতকে অবলোকন করতে সক্ষম হবেন এবং কর্তব্যকর্ম নির্ধারণ করতে পারবেন।

বর্তমান 'সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতির সদরে-অন্দরে' নামক বইতে মোট ২০টি প্রবন্ধ রয়েছে। এসব প্রবন্ধে প্রত্যেক পাঠক, ছাত্র, শিক্ষক ও গবেষক যুগ-জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজে পাবেন। অতীত এবং বর্তমানের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ, তাদের গোপন চক্রান্ত ও প্রকাশ্য কার্যক্রমের ফিরিস্তি প্রত্যক্ষ করবেন। এ প্রত্যক্ষ করার মাধ্যমে একজন সাধারণ পাঠক, বুদ্ধিজীবি, গবেষক, ছাত্র-শিক্ষক, রাজনীতিবিদ, সমাজবিদ ও ধর্মীয় নেতা নিজ জাতি, ধর্ম ও দেশকে, সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত থেকে রক্ষার উপায় খুঁজে পাবেন এবং নিজেকে, নিজের সামাজকে, দেশকে, ধর্মকে, জাতিকে ও রাষ্ট্রকে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথ রচনা করতে সক্ষম হবেন।

বইয়ের শুরুতে বিষয়সূচি দেয়া হয়েছে। এ জন্য আমি বইয়ের উপর কোনো আলোচনা উপস্থাপন করা থেকে বিরত রইলাম। বইয়ের প্রবন্ধসমূহ ইতোমধ্যে আরবী ও ইংরেজি ভাষায় অনূদিত হয়ে ছাপাখানা পর্যন্ত পৌছেছে। এর মাধ্যেমে ইংরেজি ও আরবী ভাষী জনগণ ও যুগ-জিজ্ঞাসার জবাব খুঁজে পাবেন।

এই বইটি ছাড়া আমার লিখিত আরো ৫টি বই প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে। আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিত্ব স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলের অধিনায়ক ও একাধিক জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত জনার জাকারিয়া পিন্টু সাহেবের ঐকান্তিকতায়, ড.এস.এম লুৎফর রহমান সাহেবের উৎসাহে, বন্ধুবর প্রফেসর এম.ডি.এম কামালউদ্দীন চৌধূরী, ড. কামরুল হাসান, ড. শাইখ মোস্তাফিজুর রহমান, এস.এম রাশেদুজ্জামান, ড. মুহাম্মদ আবু ইউসুফ, গবেষক এম, ওসমান গনি, জাতীয় প্রেসক্লাব সভাপতি কামাল উদ্দীন সবুজ,সংগঠক এডভোকেট মুজিবুর রহমান ও এম তাজুল ইসলাম সাহেবের আগ্রহে এবং পিজন প্রিন্টিং প্রেসের স্বত্তাধিকারী এম,সানোয়ার হোসাইন এর আন্তরিকতায় ও আমার দীর্ঘদিনের সহযোগী কেএম মোকতাদার হাসান চন্দন এর প্রচেষ্টায় বইটি প্রকাশিত হচ্ছে। আমি ধন্যবাদ জানিয়ে তাদের অবদানকে খাটো করতে চাই না। আমি তাদের নিকট কৃতজ্ঞ। কোনো পাঠক গবেষক যদি বাইটিতে কোনো তথ্যবিভ্রাট বা ভুল দেখতে পান অথবা এ সম্পর্কে কোনো প্রশ্নের উত্তর চান তবে আমার সাথে যোগাযোগ করলে বাধিত হব।

ধন্যবাদান্তে

ঢাকা,৩০ মার্চ ২০১৪

এস এম নজরুল ইসলাম
০১৭১১ ৭২০৯২৩

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচিপত্র

ইহুদী চক্রান্তের ঘূর্ণিপাকে বাংলাদেশ ও বিশ্ব ১৯

আলোচ্য বিষয়

ক. অনুপ্রবেশকারী ইহুদী আবদুল্লাহ বিন সাবাহর 'সাবাই' আন্দোলন
খ. অনুপ্রবেশকারী ইহুদী শারতে শিবীর 'দুনমা' আন্দোলন ও তুর্কী সালতানাতের পতন
গ. ইহুদীদের ফ্রী ম্যাসন আন্দোলন
ঘ. পাকিস্তান ও বাংলাদেশ ধ্বংসে যায়নবাদী কর্মসূচি
ঙ. ইহুদী ষড়যন্ত্রের নীলনকশা
চ. দেশ-জাতি ও অর্থনীতি ধ্বংসে ইহুদী কৌশল
ছ. ইহুদীদের কাঙ্ক্ষিত শাসনব্যবস্থা
জ. ইসলামী ঐক্য ধ্বংসে ইহুদী নীতি-কৌশল
ঝ. ইহুদী-আকাঙ্ক্ষা : আমাদের করণীয়

জঙ্গী প্রজনন কেন্দ্রের গডফাদারগণ ৬৬

আলোচ্য বিষয়

ক. টেরর-টেরোরিস্ট ও টেরোরিজম এর সংজ্ঞা
খ. হিন্দু-ইহুদী-খ্রিস্টান ঐক্য ও কারণ
গ. টুইন টাওয়ার হামলার পোস্টমর্টেম
ঘ. জঙ্গী প্রজনন কেন্দ্রের পরিচালক ও সংরক্ষকদের পরিচয়
ঙ. সাম্রাজ্যবাদী শক্তির জঙ্গী সংগ্রহের ক্ষেত্রসমূহ
চ. জঙ্গীবাদ নির্মূলে করণীয়

মার্কিন টর্নেডো ওবামার গন্তব্য এবং দক্ষিণ এশিয়ার ভবিষ্যত ৮০

আলোচ্য বিষয়

ক. রাজনৈতিক টর্নেডোর কেন্দ্রের পরিচয়
খ. মার্কিন প্রেসিডেন্ট যায়নবাদী ইহুদীদের পার্সোনাল সেক্রেটারি
গ. AIPAC-এর নিয়ন্ত্রণে মার্কিন রাজনীতি
ঘ. দক্ষিণ এশিয়ার ভবিষ্যত
ঙ. আফগানিস্থানে মার্কিন এবং পশ্চিমা স্বার্থ
চ. দি গ্রেট গেম
ছ. আফগানিস্তানে ভারতের স্বার্থ ও তৎপরতা
জ. দক্ষিণ এশিয়ায় পশ্চিমা স্বার্থ ও চীন
ঝ. পশ্চিমাদের চীনভীতির কারণসমূহ
ঞ. দঃ পূর্ব এশিয়ায় স্বার্থের দ্বন্দ্ব এবং এর পরিণাম
ট. চীন-ভারতের রণপ্রস্তুতি ও করণীয়

www.pathagar.com

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী মতবাদ : মুসলিম বিশ্বের মরণফাঁদ ১১৫
আলোচ্য বিষয়
ক. ধর্মনিরপেক্ষতার সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ
খ. মুসলিম নামধারী ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা সাম্রাজ্যবাদের অনুচর
গ. ধর্ম-সভ্যতা ও ন্যায়বিচার
ঘ. ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ
ঙ. ফরাসী বিপ্লব এবং এর মনস্তাত্ত্বিক কারণ
চ. কার্লমার্কস এবং সমাজতন্ত্র
ছ. মানবিক সভ্যতাকে পাশবিকতায় পরিণত করার কারিগরগণ
জ. পাশ্চাত্য ধর্মনিরপেক্ষতার বর্তমান রূপ
ঝ. মুসলিম ও অমুসলিম ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী

নিউটনের তৃতীয় সূত্র এবং ইসরাইলী আগ্রাসন ১৩৫
আলোচ্য বিষয়
ক. নিউটন এই সূত্রের জনক নন
খ. ইহুদী-খ্রিস্টানদের ধর্মচ্যুতির ইতিহাস
গ. ইহুদীবাদী কার্যক্রম
ঘ. ইসরাইলী আগ্রাসনের বিশ্বব্যাপী প্রতিক্রিয়া
ঙ. ইসরাইলী আগ্রাসনের সম্ভাব্য পরিণতি
চ. বশংবদ আরব শাসকদের পরিণাম

২০০৬ সালের হারিকেনের নাম হামাস ১৪১
আলোচ্য বিষয়
ক. হামাস একটি রাজনৈতিক হারিকেন
খ. গণতন্ত্র-সমাজতন্ত্র-ধর্মনিরপেক্ষতা ও ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদের পরিণাম
গ. গণতন্ত্রের 'সোল-এজেন্ট' যুক্তরাষ্ট্রকে গণতন্ত্র শিক্ষা দেবে নির্যাতীত জাতিসমূহ

শ্রীমতি ইন্দিরা মায়ের স্মরণে ১৪৪
আলোচ্য বিষয়
ক. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ইন্দিরা গান্ধীর ভূমিকা
খ. বিভিন্ন গোপন ও প্রকাশ্য বাহিনী গঠনের নায়ক ভারত ও ইন্দিরা গান্ধী
গ. বাংলাদেশে ভারতের নাক গলানোর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে উঠবে

মাইনাস ফর্মূলার অতীত বর্তমান– দেশপ্রেমিকদের করণীয় ১৪৬
আলোচ্য বিষয়
ক. সাম্রাজ্যবাদী শক্তি প্রতিপক্ষকে দুর্বল করতে তাদের নেতৃত্বকে মাইনাস করতে চায়
খ. দেশ দখলে সাম্রাজ্যবাদী পলিসি
গ. আগ্রাসন ভুটান মডেল
ঘ. নেহেরু ডকট্রিন

www.pathagar.com

ঙ. মাইনাস ফর্মূলা দেশে দেশে
চ. মাইনাস ফর্মূলার আওতায় বাংলাদেশ
ছ. মাইনাস ফর্মূলা আগ্রাসী শক্তির এজেন্ডা
জ. দেশপ্রেমিকদের করণীয়

অশান্ত কাশ্মীর–নীরব বিশ্ববিবেক ১৬৫
আলোচ্য বিষয়
ক. কাশ্মীরের ইতিহাস ও সমস্যার কারণ
খ. গাদ্দার শেখ আবদুল্লাহর উত্থান-পতন
গ. শেখ আবদুল্লাহর সেবায় নেহেরু ও ইন্দিরা গান্ধী
ঘ. কাশ্মীরে ভারতীয় শাসন ও গণহত্যা
ঙ. কাশ্মীরের প্রশাসনিক বিন্যাস
চ. কাশ্মীরের গণকবর সমূহ
ছ. ভারতীয় বাহিনীর নির্যাতনের পন্থাসমূহ
জ. কাশ্মীরীদের স্লোগানসমূহ
ঝ. কাশ্মীরিদের ইতিহাস-বাংলাদেশীদের জন্য শিক্ষা

সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্তে সুদান ও পার্বত্য চট্টগ্রাম ১৭৯
আলোচ্য বিষয়
ক. সুদান-দেশ পরিচিতি ও ইতিহাস
খ. সুদানে খ্রিস্টানিটি ও ইসলাম
গ. সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের কবলে সুদান
ঘ. সুদানে অনুসৃত ব্রিটিশ পলিসি
ঙ. সুদানের ভাঙন ও পার্বত্য চট্টগ্রাম পলিসি
চ. আমাদের করণীয়

ঠেকাও করিডোর বাঁচাও দেশ আবহাওয়া বার্তার নির্দেশ ১৮৯
আলোচ্য বিষয়
ক. প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশকে ভারতের হাতে তুলে দেয়ার লক্ষ্যে ৫০ দফা গোপন চুক্তি করেছেন
খ. ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক জাতি টু জাতি নয়– সরকার টু সরকার নয়– বরং পার্টি টু পার্টি সম্পর্ক
গ. ভারত-বাংলাদেশ লেন-দেন
ঘ. আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও বাংলাদেশ এবং করিডোর

সৌদি কূটনীতিক খালাফ আল আলী হত্যাকাণ্ড এবং বাংলাদেশে ন্যায় বিচার প্রাপ্তির সম্ভাবনা ১৯৩
আলোচ্য বিষয়
ক. হত্যাকাণ্ডের ঘটনার বর্ণনা এবং পুলিশ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের পরস্পরবিরোধী বক্তব্য ও কার্যক্রম

www.pathagar.com

খ. খালাফ আল আলী হত্যাকাণ্ডের সম্ভাব্য কারণ
গ. সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্বব্যাপী কূটনীতিক হত্যাপ্রচেষ্টা ও দোষারোপ
ঘ. বাংলাদেশে ন্যায়বিচার প্রাপ্তির সম্ভাবনা নেই
ঙ. মধ্যপ্রাচ্যে বাংলাদেশের শ্রমবাজার ধ্বংসে এ হত্যাকাণ্ড ঘটানো হতে পারে
চ. বিডিআর বিদ্রোহ ও সেনা হত্যাকাণ্ডের তদন্ত রিপোর্টের অবস্থা
ছ. বাংলাদেশের করণীয়
জ. সৌদি আরবের করণীয়

রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সাফল্যগাথা : বিশ্ববাসীর প্রত্যাশা ২০৩
আলোচ্য সূচি
ক. সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনকালীন অবস্থা
খ. তাঁর জন্ম ও বেড়ে ওঠা
গ. তাঁর কৃতিত্ব ও কৃতিত্বের স্বীকৃতি
ঘ. বিশ্ববাসীর প্রত্যাশা–মাল্টিপোলার বিশ্বব্যবস্থা
ঙ. Multipolar world গঠনে বাধাসমূহ
চ. The Great Game Plan
ছ. প্রত্যাশা পূরণে করণীয়

সাম্রাজ্যবাদের তাবেদার সরকার এবং গৃহযুদ্ধ ২১৬
আলোচ্য সূচি
ক. ২য় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সরাসরি অপরের দেশ দখল না করে বিভিন্ন দেশে তাবেদার সরকার ক্ষমতাসীন করে। ফলে তাবেদার সরকার বনাম স্বাধীনচেতা নাগরিকদের মধ্যে সংঘাত সংঘর্ষ ও গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। পরবর্তীতে গৃহযুদ্ধ থামাতে সাম্রাজ্যবাদীরা শান্তিরক্ষী বাহিনীর ছদ্মবেশে কাঙ্ক্ষিত দেশে হাজির হয়। এতে সাপ মরে কিন্তু লাঠি ভাংগে না।
খ. বর্তমান সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মানসিকতা
গ. সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মুসলিম দেশ দখল প্রক্রিয়া
ঘ. তাবেদার সরকার কর্তৃক দেশে গৃহযুদ্ধ বাধানোর নিয়ম
ঙ. টার্গেটকৃত দেশকে কেন গৃহযুদ্ধে নিক্ষেপ করা হয়
চ. তাবেদার সরকারের বৈশিষ্ট্যসমূহ
ছ. স্বীয় দেশ ও অস্তিত্ব রক্ষায় দেশপ্রেমিকদের করণীয়

স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত মুসলিম বিশ্ব স্থিতিশীল সরকারের শর্তাবলী ২২২
আলোচ্য বিষয়
ক. মুসলমানদের গৌরবময় যুগ আবার ফিরে আসবে যদি মুসলিম নেতৃবৃন্দ নিজেদের অপার শক্তি ও সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে পারে
খ. বর্তমান রাজনৈতিক সুনামী আবির্ভাবের কারণসমূহ
গ. বিপ্লব সংরক্ষণের সতর্ক পদক্ষেপসমূহ
ঘ. স্থিতিশীল সরকার প্রতিষ্ঠার শর্তাবলী

www.pathagar.com

ঙ. মুসলমানদের চলার পথে বাধাসমূহ

মুসলিম বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন এবং করণীয় ২২৯

আলোচ্য সূচি

ক. খ্রিস্টান বিশ্ব কেন মুসলিম বিশ্বের উপর হামলা করে
খ. পোপ ২য় আরবান ১ম ক্রুসেড শুরু করেছেন যে ভাষণ দিয়ে তার বর্ণনা
গ. বর্তমান সাম্রাজ্যবাদীরা কি ধর্মনিরপেক্ষ? নাকি ধর্মযোদ্ধা?
ঘ. মুসলিম বিশ্বের অনৈক্যের ব্যাপারে হুঁশিয়ারী
ঙ. যায়নবাদী ইহুদীদের রচিত ষড়যন্ত্রের দলিল
চ. বর্তমান সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের পরিচয়
ছ. পোপ বনাম বুশ-জন মেজরের ভাষণ
জ. বর্তমান সাম্রাজ্যবাদীদের মাস্টার প্লান
ঝ. রাজতান্ত্রিক আরব দেশসমূহের পরিণতি
ঞ. সভ্যতার সংঘাত তত্ত্ব
ট. (ক) মুসলিম দেশসমূহকে টুকরা করার মার্কিন প্লান
(খ) সাম্রাজ্যবাদ রচিত ডকট্রিনসমূহ
দ. অরিয়েন্টালিজম বা প্রাচ্যতত্ত্ব
ধ. মুসলিম বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত সম্পর্কিত কিছু সাম্প্রতিক তথ্য
ন. পতন পরবর্তী মুসলমানদের উত্থানের কারণ
ট. বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের পতনের কারণসমূহ
ঠ. মুসলিম বিশ্বের করণীয়।

মুসলিম বিশ্বে গণজাগরণ, সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত এবং করণীয় ২৪৮

আলোচ্যসূচি

ক. মুসলমানদের পতন ও পাশ্চাত্যের উত্থাণের কারণ
খ. মুসলিম বিশ্বের আধুনিক গণজাগরণের নায়কগণ
গ. ইসলামী গণজাগরণ ও রাজনৈতিক ইসলাম প্রতিষ্ঠায় বাধাসমূহ
ঘ. মুসলিম নেতৃত্বের করণীয়

পাকিস্তানের বর্তমান সংকট, কারণ ও সম্ভাব্য প্রতিকার ২৫৯

আলোচ্য সূচি

ক. অঢেল প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ এবং ভূরাজনৈতিকভাবে অতীব গুরুত্বপূর্ণ আফগানিস্তান দখল করার জন্য পাকিস্তানের দেশপ্রেমিক ও জনপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফকে সরিয়ে সেনাপ্রধান পারভেজ মোশাররফকে ক্ষমতাসীন করে যুক্তরাষ্ট্র।

ঘ. সাম্রাজ্যবাদের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করতে গিয়ে মোশাররফ চরমভাবে অজনপ্রিয় হলে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি আরেক Puppet আসিফ আলী জারদারীকে পাকিস্তানের ক্ষমতায় বসায়। পাকিস্তানকে পরমাণু অস্ত্রশূন্য করা, দেশটিকে ব্যর্থরাষ্ট্রে পরিণত করে তিন টুকরা করার লক্ষ্যেই দুর্নীতিবাজ ও অদক্ষ জারদারীকে ক্ষমতাসীন করা হয়।

www.pathagar.com

পাকিস্তানের শক্তিশালী বিচার বিভাগ ও গোয়েন্দা সংস্থার কারণে সাম্রাজ্যবাদ তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছতে না পেরে অন্য পাপেটকে ক্ষমতাসীন করার চেষ্টায় লিপ্ত হয়েছে।
গ. ইরান-পাকিস্তান গ্যাস লাইন ও জারদারী
ঘ. পাশ্চাত্যের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া পলিসি
ঙ. যুক্তরাষ্ট্রের পাকিস্তান নীতি ও পাপেট সরকার প্রতিষ্ঠার কার্যক্রমের লক্ষ্য উদ্দেশ্য সম্পর্কে সাবেক আইএসআই প্রধান হামিদ গুল
চ. সমূহ ধ্বংস থেকে রক্ষা পেতে পাকিস্তানিদের করণীয়

উপমহাদেশে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠায় মানচিত্রের পুনর্বিন্যাস অপরিহার্য ২৬৪

আলোচ্য বিষয়

ক. ইউরোপের ক্ষমতাকেন্দ্র দখলে ইহুদী কার্যক্রম
খ. বিড়লা-ইস্পাহানী ও অন্যায্য ভারত বিভাগ
গ. উপমহাদেশে অশান্তির কারণ
ঘ. হিন্দুমানস সৃষ্টি ও ভারতীয়দেরকে বিভক্ত করার ব্রিটিশ কর্মসূচি
ঙ. হিন্দেন বা হিন্দু নামকরণ তত্ত্ব
চ. মুসলমানদেরকে সংখ্যালঘু করার ব্রিটিশ পলিসি
ছ. অন্যায্য ও অযৌক্তিক ভারত বিভাগ
জ. ভারত বিভাগের বিভিন্ন ঘোষিত প্লান
ঝ. ১৯৪৭-এর পর ভারত কর্তৃক ২৮৩টি দেশীয় রাজ্য দখল পদ্ধতি
ঞ. অন্যায্য দেশ বিভাগ ও দেশীয় রাজ্য দখলের কুফল
ট. শান্তিময় উপমহাদেশ প্রতিষ্ঠায় করণীয়।
ঠ. বর্তমান ভারতকে সোভিয়েত ইউনিয়নের পরিণতি ভোগ করতে হবে

এশিয়াকেই বিশ্বের নেতৃত্ব প্রদানে এগিয়ে আসতে হবে ২৮৪

আলোচ্যসূচি

ক. প্রাচ্যের নেতৃত্ব মানবীয় পাশ্চাত্যের নেতৃত্ব দানবীয়
খ. এশিয়ার নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় একটি থিংকট্যাংক, ঋণদান সংস্থা ও সংবাদ সংস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে
গ. যুক্তরাষ্ট্রের ঋণ
ঘ. ভারতের দারিদ্র

www.pathagar.com

ইহুদী চক্রান্তের ঘূর্ণিপাকে বাংলাদেশ ও বিশ্ব

প্রাচীন কাল থেকেই মুসা আঃ-এর উম্মত হিসেবে পরিচয়দানকারী ইহুদীদের অধিকাংশই ছিল সুবিধাবাদী, বিশ্বাসঘাতক ও সুদী মহাজন চরিত্রের। তারা নিজেদের পবিত্র তাওরাত কিতাবকে বহুবার পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন, বিয়োজন করে নিজেদের অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থের হাতিয়ারে পরিণত করেছে। যে মুসা (আঃ)-এর নেতৃত্বে তারা জালিম শাসক ফেরআউনের কবল থেকে মুক্ত হয়ে মিসর থেকে গাজায় ও ফিলিস্তিনে হিজরত করেছিল সেই মুসা (আঃ) হারুন (আঃ)-এর সাথেও তারা অসংখ্যবার বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল এবং আল্লাহর একত্ববাদ থেকে সরে গিয়ে গরুর বাছুর পুজায় আত্মনিয়োগ করেছিল। তারা আল্লাহ প্রেরিত অসংখ্য নবী-রাসুল (সা.) ও তাদের উম্মতদেরকে অবর্ণনীয় অত্যাচারের দ্বারা হত্যা করেছিল। পবিত্র কুরআন ও হাদীছে তাই এদেরকে অভিশপ্ত জাতি ও মুসলমানদের প্রকাশ্য শত্রু হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর বংশে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (দ.) জন্মগ্রহণ করবেন। তিনি কিরূপ শহরে জন্মগ্রহণ করবেন, কিরূপ শহরে হিজরত করবেন একথা অন্যান্য আসমানি কিতাবের অনুসারীদের ন্যায় ইহুদী পণ্ডিতগণও জানতেন। ইহুদীরা ধরে নিয়েছিল সর্বশেষ নবী (যিনি দুনিয়াতে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করবেন) ইসরাইলী বংশোদ্ভূত হবেন। কিন্তু যখন তারা দেখল নবী মুহাম্মদ (সা.) ইব্রাহীম আঃ-এর বংশে দুনিয়াতে এসেছেন ঠিকই তবে ইসরাইল বংশে নয় বরং হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশে। তখন থেকেই তারা সাম্প্রদায়িক প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে নবী (সা.)-এর বিরোধীতাকেই তাদের প্রধান কর্ম হিসেবে সাব্যস্ত করে।

নবী (সা.) ১২ বছর বয়সে নিজ চাচার সাথে সিরিয়া গমন করলে ইহুদীরা জ্যোতির্বিদ্যার মাধ্যমে জানতে পেরে তাঁকে হত্যার ব্যর্থ চেষ্টা করে। পরবর্তীতে রাসুল (সা.) মদিনায় হিজরত করলে ইহুদীরা তাঁকে একাধিকবার হত্যার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে অবশেষে ইসলাম ও মুসলমানদেরকে চিরতরে ধ্বংস করার জন্য কাফের, মুশরেক, মুনাফিক ও পৌত্তলিকদের সাথে হাত মিলায়। মদিনা সনদের শর্ত লংঘন করে তারা বদর, উহুদ ও খন্দক যুদ্ধে মুসলমানদের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েও মুসলিম অগ্রযাত্রায় বাধা দিতে ব্যর্থ হয়। খায়বর যুদ্ধে ইহুদীরা মুসলমানদের নিকট

www.pathagar.com

শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে মদিনা ও পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে দূরবর্তী স্থানে নির্বাসিত হয়। রাসুল (সা.)-এর ইন্তেকালের পর ইহুদীরা মদিনা রাষ্ট্র ধ্বংসে মরণপণ তৎপরতা শুরু করে। ইহুদীদের প্ররোচনায় হাজার হাজার আরববাসী ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে ইহুদীদের পক্ষ নেয়। ইহুদীদের প্ররোচনায় বেশ কয়েকজন ভণ্ড নবী নবুয়তি দাবি করে মুসলমানদেরকে নিশ্চিহ্ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর দৃঢ় সাহসী ও সুচিন্তিত পদক্ষেপ গ্রহণে রিদ্দার যুদ্ধে ইহুদী ও ভণ্ড নবীরা শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করায় ইহুদীরা সম্মুখ যুদ্ধের পরিবর্তে মুসলমানদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে, মুসলমানদের মধ্যে চিন্তা ও কর্মের বিভেদ সৃষ্টি করে, বিভিন্ন দল-উপদল ফের্কা সৃষ্টি করে এক পক্ষের দ্বারা অপর পক্ষকে নির্মূলের কর্মসূচি গ্রহণ করে। তাদের এই অপতৎপরতা সম্পর্কে কয়েকটি উদাহরণ পেশ করা হলো।

সাবাই আন্দোলন

হযরত ওসমান (রা.)-এর খেলাফতকালে ইয়েমেনের সানা এলাকার ইহুদী আবদুল্লাহ বিন সাবাহ বসরার গভর্নর আবদুল্লাহ ইবনে আসীরের নিকট গিয়ে স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করে। সে কোরআন এবং হাদীস ব্যাপকভাবে অধ্যয়ন করে বিভিন্ন দ্বান্দ্বিক মতবাদ প্রচার করা শুরু করে মুসলমানদের মধ্যে দল-উপদল সৃষ্টি করে। এরূপ একটি উপদল প্রথমে হযরত ওসমান (রা.)কে হত্যা করে। এ হত্যাকাণ্ডের পর তৎকালীন মুসলিম সমাজ সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। সাবাহর অনুসারীরা উভয় দলে মিশে গিয়ে হযরত আলী বনাম হযরত আয়েশার মধ্যে উষ্ট্রের যুদ্ধ এবং হযরত আলী বনাম হযরত মুয়াবিয়ার মধ্যে সিফফীনের যুদ্ধ সংঘটিত করে। সরলপ্রাণ মুসলমানদের ধোকা দেয়ার জন্য এ সময় তারা 'জমিয়তে মুহিব্বিনে আহলে বায়াত' নামে সংগঠন তৈরি করে। তারা রাসুল (সা.) ও হযরত আলী (রা.)কে মাত্রাতিরিক্ত ভক্তির কথা প্রচার করে মুসলমানদের মধ্যে মতপার্থক্য সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। কুচক্রী আবদুল্লাহ ইবনে সাবহর প্ররোচনায় হযরত আলী (রা.)-এর আমলে মুসলমানদের মধ্যে শিয়া, খারিজী ও সাবাইপন্থী উপদলের সৃষ্টি হয়। উমাইয়া ও আব্বাসীয় যুগে এই সাবাইপন্থীরা মুসলমানদের আরও অনেক উপদলে বিভক্ত করে ভ্রাতৃঘাতী সংঘর্ষের বিস্তার ঘটায়।

হযরত ওমর (রা.)-এর ইন্তেকালের পর থেকে আব্বাসীয় আমলের মধ্যে এই সাবাইপন্থীরা কুরাইশ বনাম অকুরাইশ, হাশেমী বনাম উমাইয়া, আনসার বনাম মুহাজির, হিমারাইট বনাম মুযাহারাইট, মুরুয়ার বনাম দীন, বেদুঈন বনাম স্থায়ী অধিবাসী, শিয়া বনাম সুন্নী, হানাফী বনাম মুতাজিলা, অমুসলিম বনাম মুসলিম, আরবী বনাম পার্সী, ইরাকী বনাম ইরানী প্রভৃতি নৃতাত্ত্বিক, জাতিতাত্ত্বিক, ভাষা, অঞ্চল, ভূখণ্ড ও মতবাদ ভিত্তিক দল উপদল ও দ্বন্দ্ব সংঘাত সৃষ্টি করে ঐক্যবদ্ধ

www.pathagar.com

মুসলিম শক্তির ঐক্যের মূলে কুঠারাঘাত করে। সর্বশেষ শিয়া বনাম সুন্নী দ্বন্দ্ব কাজে লাগিয়ে বাগদাদের সুন্নী খলিফা মুতাসিম বিল্লাহর পতন ঘটানো হয় তার শিয়া প্রধানমন্ত্রী আলকামীর মাধ্যমে। উক্ত আলকামী ও শিয়া বুদ্ধিজীবী নাসির উদ্দীন তুসী হালাকু খানের সাথে গোপন ষড়যন্ত্র করে সূর্যপূজারী হালাকু খানের নিকট মুসলিম আরবের পতন ঘটায়।

শারতে শিবীর 'দুনমা' আন্দোলন

আব্বাসীয় খেলাফতের পতনের পর কিছুদিন মিসরে ফাতেমীয় খেলাফত প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তুর্কী মুসলমানরা শক্তিশালী হলে তুর্কী খেলাফতের প্রতিষ্ঠা হয় এবং ফাতেমীয় খেলাফত তুর্কী খেলাফতের মধ্যে বিলীন হয়ে যায়। এমতাবস্থায় ইহুদীদের প্রধান টার্গেটে পরিণত হয় তুর্কী খেলাফত কেন্দ্রীয় মুসলিম ঐক্য। এ সময় ইহুদীরা বিশ্বব্যাপী নতুন মতবাদ প্রচার করা শুরু করে। তন্মধ্যে ভাষা ভিত্তিক, অঞ্চলভিত্তিক জাতীয়তাবাদ, ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদ ও সমাজতান্ত্রিক মতবাদ প্রধান। এ সকল মতবাদ ভিত্তিক সৃষ্ট দল-উপদল আভ্যন্তরীণভাবে তুরস্ক সালতানাতকে দুর্বল করে দেয়। ইতোমধ্যে ইহুদী বংশোদ্ভূত খ্রিস্টান মাইকেল আফলাফের আরব ভূখণ্ড কেন্দ্রীক আরব বাথপন্থী আন্দোলন আরবদের মধ্যে চরম ভাষাভিত্তিক আন্দোলনের সূচনা করে। এমতাবস্থায় ইহুদী থেকে মুসলমান হওয়া শারতে শিবী তুরস্কে তুর্কী ভাষাভাষীদের মধ্যে ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূচনা করে। ফলশ্রুতিতে আরবীয় জাতীয়তাবাদ বনাম তুর্কী জাতীয়তাবাদের দ্বন্দ্বে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মাধ্যমে তুর্কী সালতানাত ও খেলাফত বিলুপ্ত হয়।

১৬৬৬ সালে শারতে শিবী নামক স্নানাবাসী একজন ইহুদী নিজেকে মসীহ মসউদ বা প্রতিশ্রুতি মসীহ দাবি করে। বিপুল সংখ্যক ইহুদী তার উপর ইমান আনে। শিবী সদলবলে সিরিয়া ও বায়তুল মুকাদ্দাস সফর করে ইস্তাম্বুলে উপস্থিত হলে খলিফা তাকে গ্রেফতার করেন। গ্রেফতারের পর শিবী ও তার অনুসারীরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করায় 'দুনমা' (প্রত্যাবর্তনকারী) পরিচয়ে পরিচিত হয়। এরা তুরস্কে Commite of Union & progress নামে দল গঠন করে। এ দলের সদস্যগণ তুর্কী যুবকদেরকে নিজ দলে অন্তর্ভুক্ত করে এবং তুরস্ক সালতানাতের গুরুত্বপূর্ণ পদ দখল করে। এরা তুর্কী সেনাবাহিনীতে একটি গোপন ইউনিট গঠন করে এবং ১ম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে উক্ত ইউনিট কামাল পাশার নেতৃত্বে তুর্কী সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ও তুর্কী খেলাফত উচ্ছেদের মাধ্যমে নিজেরা ক্ষমতাসীন হয়। কামাল পাশা ইহুদীদের গোপন আন্দোলন ফ্রী ম্যাসন দলের সদস্য ছিল। ইহুদীদের নির্দেশে সে তুরস্ক থেকে ইসলাম উচ্ছেদের কর্মসূচি গ্রহণ করে। তার আমলে হাজার হাজার ধর্মীয় আলেমকে হত্যা করা হয়, কোরআন অধ্যয়ন, আরবীতে আযান ও ইসলামী শিক্ষা নিষিদ্ধ করা হয়। সে ধর্মীয় রাষ্ট্র তুরস্ককে ধর্মহীন বা তথাকথিত

www.pathagar.com

ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত করে এবং আরবী নামের স্থলে তুর্কী ভাষায় জনগণের নাম রাখতে বাধ্য করে।

বাংলার স্বাধীনতা হরণে ইহুদী ফ্রী ম্যাসন আন্দোলন

শারতে শিবীর দুনমা আন্দোলনের মাধ্যমে তুর্কী খেলাফত ধ্বংসের ব্যবস্থা করার পর কুচক্রী ইহুদীরা তৎকালীন পৃথিবীর ২য় বৃহত্তম মুসলিম সাম্রাজ্য মোঘল ভারতের প্রতি মনোযোগী হয়। বিশ্বব্যাপী আধিপত্য বিস্তারে ইহুদীদের গোপন সংগঠনসমূহের মধ্যে 'ফ্রী ম্যাসন আন্দোলন' অন্যতম। এ সংস্থার অফিসের নাম ফ্রী ম্যাসন লজ। উদীয়মান শক্তি বৃটেনের রাজধানী লন্ডনে ১৭১৭ সালে United grand lodge of England গঠিত হয়। দ্রুত এর শাখা প্রশাখা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেয়া হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৭২৯ সালে কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম ও ১৭৫৩ সালে ভারতের মাদ্রাজ শহরে ফ্রী ম্যাসন লজ স্থাপিত হয়।[১] এ লজসমূহের গোপন তৎপরতায় এদেশের কিছুসংখ্যক অর্থ ও ক্ষমতালোভী হিন্দু-মুসলিম নেতৃবৃন্দ ফ্রী ম্যাসন লজের ফাঁদে পা দেয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৭৫৭ সালে উভয় ফ্রী ম্যাসন লজের গোপন সহযোগিতায় লর্ড ক্লাইভ বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার স্বাধীনতা হরণে সামর্থ হয়।

পাকিস্তান ধ্বংসে ফ্রী ম্যাসন লজ

১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে লাহোরের আনারকলিতে, ১৯১০ সালে ঢাকার পল্টনে ফ্রী ম্যাসন লজ স্থাপিত হয়। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলে ইহুদীরা প্রমাদ গোনে। কেননা এটি ছিল আধুনিক বিশ্বের প্রথম ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র এবং বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র। দ্রুত পাকিস্তানের হায়দরাবাদ, কোয়েটা, মুলতান, শিয়ালকোট, রাওালপিন্ডি, পেশোয়ার ও চট্টগ্রামে ফ্রী ম্যাসন লজ প্রতিষ্ঠা করা হয়।[২] এসব লজের প্রকাশ্য কোনো সাইনবোর্ড বা পরিচিতি থাকে না। ইহুদীবাদ সৃষ্ট কাদিয়ানী মতবাদ, বাহাই মতবাদ, লায়ন ও রোটারী ক্লাবের মাধ্যমে ইহুদীরা ছদ্মবেশে তৎপরতা চালায়। ফ্রী ম্যাসন লজের সদস্য ব্যতিত অপর কাহারও নিকট গোপন লজের অবস্থান সম্পর্কে জানা সম্ভব নয়। পরিক্ষীত ইহুদী ব্যতিত অপর কাউকে ফ্রী ম্যাসন লজের সদস্য করা হয় না। ইহুদীদের এ গোপন লজসমূহের নেপথ্য সহযোগিতায় অইহুদীদের দ্বারা গঠিত বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সংস্থার মাধ্যমে যায়নবাদী ইহুদীরা নিজেদের এজেন্ট সংগ্রহ করে। ইহুদীদের গোপন ধ্বংসাত্মক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সক্ষম এমন অ-ইহুদীদেরকে ইহুদী লবী সমাজ ও রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদ দখলে সাহায্য করে। সাধারণত অর্থ ও ক্ষমতালোভী, চরিত্রহীন, ধর্মবিমুখ বা স্বধর্মবিরোধী, মাথামোটা, মাদকাসক্ত, নারীলোলুপ অইহুদী ব্যক্তিদেরকেই ইহুদীরা নিজেদের এজেন্ট হিসেবে নিয়োগ করে। ইহুদী ষড়যন্ত্রের গোপন দলিল বা প্রোটকল থেকে এ বিষয়ক দু-একটি তথ্য উপস্থাপন করা হল–

www.pathagar.com

১. অ-ইয়াহুদী জনগণের মধ্য থেকে আমাদের একান্ত অনুগত সেসব লোকদের আমরা শাসন পরিচালনার জন্য বাছাই করব যারা শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে আমাদের প্রতিভাশালী বিশেষজ্ঞদের হাতের পুতুল হয়ে যাবে। এসব বিশেষজ্ঞদের শৈশব থেকেই এ ধরনের অবস্থায় শাসন পরিচালনার জন্য উপযুক্ত ট্রেনিং দিয়ে তৈরি করা হয়েছে যেন তারা এসব পুতুলদের ঠিকভাবে নাচাতে পারে। (সূত্র : The Protocol of the learned elders of zion-চ্যাপ্টার ২)

২. আমাদের পরিকল্পনা থেকে ফলপ্রাপ্তির জন্য আমরা এমন সব ব্যক্তিদের স্বপক্ষে প্রেসিডেন্ট (বা প্রধান নির্বাহী) পদের ভোট সংগ্রহ করব যাদের অতীত জীবনের কেলেঙ্কারি জনগণের কাছে অজ্ঞাত রয়েছে। এ ধরনের ব্যক্তি শীর্ষ পদে অধিষ্ঠিত হলে আমাদের পরিল্পনা বাস্তবায়নের জন্য অত্যন্ত বিশ্বস্ত এজেন্টে পরিণত হবে। কেননা তার কেলেঙ্কারি প্রকাশ করে দেয়ার হুমকি দিলেই সে ক্ষমতা হারানোর ভয়ে আমাদের নির্দেশ মোতাবেক কাজ করতে বাধ্য হবে। (সূত্র : ঐ চ্যাপ্টার-১০)

৩. সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে কোনো একজনকেও প্রবেশ করতে দেয়া যায় না। যদি তার অতীত জীবনে কোনো কলঙ্কের দাগ না থাকে। ঐ কলঙ্ক প্রকাশ হয়ে যাবার ভয়ে সাংবাদিক গোপন তথ্য ফাঁস করা থেকে বিরত থাকে। (সূত্র : ঐ চ্যাপ্টার-১২)

ছদ্মবেশী ইহুদীবাদী কর্মকাণ্ডে আধুনিক বিশ্বের প্রথম ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র পাকিস্তান দুই টুকরা হয়ে যায়। বর্তমানেও তারা পাকিস্তান ও বাংলাদেশকে আরও টুকরা করার অন্তহীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। বড় দেশকে ছোট ছোট দেশে পরিণত করার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রটোকলে যে কারণ উল্লেখ করা হয়েছে তা নিম্নরূপ–

আঞ্চলিকতা ও ভাষার ভিত্তিতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের আগুন ছড়িয়ে পড়ে তা নিছক সে জাতিকে অসহায় ও খণ্ড করে তাদেরকে ঋণ সাহায্য ইত্যাদি দিয়ে নির্ভরশীল করে তোলাই মুখ্য উদ্দেশ্য। এ বিরাট সাফল্যের জন্য অইহুদী সমাজের এজেন্টগণ ধন্যবাদার্হ। .... অর্থের জন্য তাদের সর্বদাই আমাদের মুখাপেক্ষী হতে হয়। (সূত্র : ঐ ১ম অধ্যায়)

ইহুদী ষড়যন্ত্র ও বাংলাদেশ (১৯৭২-২০১০)

সমগ্র বিশ্বের সকল অ-ইয়াহুদী জাতিকে শক্তিহীন করে ইহুদীবাদীদের অধীনে এনে বিশ্বজোড়া ইহুদী শাসন কায়েম করার যে সকল কর্মসূচি রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হলো জাতির সকল সেক্টরে দ্বন্দ্ব সংঘাত সৃষ্টি করা, প্রতিভাবান ও অভিজাত শ্রেণীকে ধ্বংস করে উচ্ছৃঙ্খল, মাথামোটা, অর্থ ও ক্ষমতালোভী নীতি নৈতিকতাহীন, অনভিজ্ঞ, নিম্নশ্রেণীর লোককে দেশে দেশে ক্ষমতাসীন করা, সৎও যোগ্য লোকদের

www.pathagar.com

বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করে তাদেরকে নেতৃত্বের আসন থেকে বিতাড়িত করা, নৈরাজ্যবাদীদের ক্ষমতাসীন করা, জনগণকে ধর্মবিমুখ এবং ধর্মবিরোধী করা, ধর্ম ও দেশবিরোধী রাজনীতি, শিক্ষানীতি ও অর্থনীতি চাপিয়ে দেয়া, যুব সমাজকে ভুলপথে পরিচালিত করে দুর্নীতিপ্রবণ ও মদ-নারীতে আসক্ত করা, বুদ্ধিজীবী ও মিডিয়াকে বিপথগামী করা, শাসক ও শাসিতের মধ্যে অনতিক্রমনীয় বাধার সৃষ্টি করা, পুতুল সরকার প্রতিষ্ঠা ও সকল প্রকার অনৈক্য ও বিচ্ছিন্নতাবাদে মদদ দেয়া, জাতিসমূহকে চুক্তি ও ঋণের জালে আটক করা, দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করা প্রভৃতি। উপরোক্ত কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়নেই যায়নবাদী ইহুদীরা রচনা করেছে The Protocol of the elders of the zion. আমাদের প্রাণপ্রিয় বাংলাদেশে উক্ত কর্মসূচিসমূহ কিভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে তা প্রটোকলের আলোকে বিশ্লেষণ করলে আমাদের দেশ নিয়ে কিরূপ ষড়যন্ত্র পরিচালনা করা হচ্ছে তা দিবালোকের মত স্পষ্ট হবে।

দ্বন্দ্ব-সংঘাত সৃষ্টির যায়নবাদী কর্মসূচি

ক. ক্ষমতাসলিপ্সুদের ক্ষমতা অপব্যবহার করার জন্য উস্কানি দেয়ার উদ্দেশ্যে আমরা এদের পরস্পরের মধ্যে স্থায়ী ঝগড়া বিবাদ জিইয়ে রাখার যাবতীয় উপায় পন্থা অবলম্বন করেছি। ... এ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য আমরা নানা ধরনের সংস্থা স্থাপন করেছি। বিশেষ করে অনুন্নত মুসলিম বা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে ইহুদীদের নানা প্রকারের ভলান্টারী সংস্থা ছদ্মাবেশে ইহুদী স্বার্থে বিরামহীন কাজ করে যাচ্ছে। সেখানে পেটের তাগিদে মুসলিম যুবক ও শ্রম দিচ্ছে। বিভিন্ন দল গঠন করে আমরা এদেরকে অস্ত্রসজ্জিত করে দিয়েছি এবং শাসন ক্ষমতাটিকে প্রতিটি উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণের লক্ষ্যবস্তু হিসেবে ঠিক করে দিয়েছি। রাষ্ট্রগুলোকে আমরা শক্তি পরীক্ষার ক্ষেত্রে পরিণত করেছি। এখানে অসংখ্য বিভ্রান্তিকর আলোচ্য বিষয় নিয়ে পরস্পরের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। ... আরও একটু তারপর বিশৃঙ্খলা ও দেউলিয়াপনা ছড়িয়ে পড়বে বিশ্বব্যাপী। (সূত্র : প্রটোকল, প্রতীক সাপের রহস্য অধ্যায়)

খ. অন্তহীন গোলমাল সৃষ্টিকারীগণ পার্লামেন্টের অধিবেশন ও শাসন বিভাগীয় বোর্ডগুলোতে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়।... ক্ষমতার অপব্যবহার প্রতিটি সংস্থাকে উৎখাত করার চরম মুহূর্তটিকে ডেকে নিয়ে আসবে এবং উন্মত্ত জনতার চাপে সব কিছুই শূন্যে বিলীন হয়ে যাবে। (সূত্র-ঐ, অধ্যায়-ঐ)

গ. অইহুদী সমাজে আমরা এক ব্যক্তিকে অপর ব্যক্তির এবং এক জাতিকে অপর জাতির বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছি। গত ২০ শতাব্দী জুড়ে এদের মধ্যে ধর্মীয় ও অন্যান্য ধরনের বিদ্বেষ ছড়িয়েছি। এ জন্যই আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করার সময় একটি রাষ্ট্র ও অপর কোনো রাষ্ট্রের সহযোগিতা আশা করতে পারে না। (সূত্র : প্রটোকল, ঈমান হরন অধ্যায়)

www.pathagar.com

ঘ. কিন্তু তোমাদের ভালোভাবেই জেনে রাখা উচিত যে, বিশ্বের সকল মানুষের মুখ দিয়ে আমাদের কাঙ্ক্ষিত দাবি প্রকাশ করার উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য প্রতিটি দেশে সরকার ও জনসাধারণের মধ্যে বিবাদ বাধিয়ে অবিরাম অশান্তি সৃষ্টি করতে হবে। পারস্পরিক মতানৈক্য, ঘৃণা, মারামারি, হিংসা, দৈহিক নির্যাতন, ক্ষুধা ও অভাব সৃষ্টি, রোগের বিস্তার সাধন প্রভৃতির মাধ্যমে অইহুদী সমাজকে এমন অস্থিরতার মধ্যে নিক্ষেপ করতে হবে যে, তারা বাধ্য হয়ে আমাদের অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্বের আশ্রয় গ্রহণ করবে এবং এরপর পূর্ণরূপে আমাদের সর্বময় কর্তৃত্ব মেনে নিবে। (সূত্র : ঐ, রাজনৈতিক চালবাজী অধ্যায়)

ইহুদী প্রটোকলের উপরোক্ত কর্মসূচির সাথে বাংলাদেশের (১৯৭২-২০১০) অধ্যায়কে মিলিয়ে দেখলে চিন্তাশীল নাগরিকগণ উপলব্ধি করতে পারবেন কারা এ দেশে ক্ষমতার অপব্যবহারে উস্কানি দেয়, কারা ক্ষমতার অপব্যবহার করে, কারা অস্ত্রসজ্জিত গ্রুপকে লালন করে, কারা পার্লামেন্ট অধিবেশনকে মাছের বাজারে পরিণত করে, কারা ধর্মীয় ও অন্যান্য বিদ্বেষ ছড়ায়, কারা ঘৃণা-বিদ্বেষ, মারামারি ও দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করে। যারা এসব অপকর্ম করে তারা নিঃসন্দেহে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে ইহুদীদের ক্রীড়নকের ভূমিকা পালন করছে এবং দেশকে অস্তিত্বহীনতার সংকটে নিমজ্জিত করছে।

অবশ্য নৈরাজ্য সৃষ্টিকারীদের কয়েকটি গ্রুপের নাম ইহুদী প্রটোকলে রয়েছে। যথা–

আমরা রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হই মজলুম শ্রমিকদের ত্রাণকর্তা সেজে। ত্রাণকর্তা হিসাবেই আমাদের সংগ্রামী বাহিনীতে যোগদান করার জন্য জনগণকে উস্কানি দেই। আমাদের সংগ্রামী বাহিনী হচ্ছে সমাজতন্ত্রী, নৈরাজ্যবাদী ও কম্যুনিস্ট দল। আমরা সর্বদা এদের সমর্থন করে থাকি। (সূত্র : প্রটোকল : প্রতীক সাপের রহস্য অধ্যায়)

উক্ত তথ্য আমাদেরকে এ শিক্ষা দেয় যে, সমাজতন্ত্রীরা, সমাজতন্ত্রীদের সাথে জোটবদ্ধ দল সংস্থা এবং এনজিওসমূহই হচ্ছে মুসলিম দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী ইহুদীবাদের এজেন্ট। এ দেশবাসী প্রতিনিয়ত এদের নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী কর্মকাণ্ডের প্রত্যক্ষদর্শী।

প্রতিভাবান ও অভিজাত শ্রেণী ধ্বংসের কর্মসূচি

একটি দেশকে ধ্বংস করার জন্য, পরাজিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট দেশের অভিজাত শ্রেণীকে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন করা এবং প্রতিভাবান লোকদেরকে দৃশ্যপট থেকে সরিয়ে দেয়া বা ক্রয় করা অথবা তাদের নামে কুৎসা রটনা করা ইহুদী ষড়যন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচির অন্যতম। ইহুদী প্রটোকলে এ সংক্রান্ত বিষয়াদি নিম্নরূপ :

ক. অইহুদী সমাজে সম্ভ্রান্ত শ্রেণী নামক যে মহলটি আমাদের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিরক্ষার কাজ করতে সমর্থ ছিল আমরা সে শ্রেণীর অস্তিত্ব মিটিয়ে দিয়েছি।

www.pathagar.com

অইহুদী সমাজের স্বাভাবিক ও বংশানুক্রমিক সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর ধ্বংসস্তূপের উপর আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত শিক্ষিত ও অর্থশালী লোকদের দিয়ে নতুন সম্ভ্রান্তগোষ্ঠী স্থাপন করেছি। (সূত্র : প্রটোকল : ষড়যন্ত্রের সর্বমুখী জাল-অধ্যায়)

খ. আমাদেরই উস্কানির দরুন জনগণ তাদের সমাজে অভিজাত শ্রেণীর ধ্বংস সাধন করেছে। অথচ এ শ্রেণীতেই ছিল তাদের সুযোগ সুবিধা ও অধিকারের একমাত্র রক্ষাকবচ। আজকাল অভিজাত শ্রেণী ধ্বংস হয়ে যাবার পর জনগণ নিষ্ঠুর অর্থ লোলুপ বদমায়েশদের খপ্পরে পড়েছে। আর এ বদমায়েশ শ্রেণী জনগণের ঘাড়ের উপর নির্মম ফাঁস এঁটে দিয়েছে। (সূত্র : ঐ, প্রতীক সাপের রহস্য অধ্যায়)

গ. আমাদের উদ্দেশ্যমূলক প্রচারনার ফলে জনগণ সৎলোকের নিন্দা করে আর দুর্বৃত্তদের করে প্রশংসা এবং এভাবেই তারা তাদের অজ্ঞতা ও অস্থিরতার দরুন নিজেদের সমাজের সকল প্রকার স্থিতিশীলতা বিনষ্ট করে চলেছে ও প্রতিপদে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে। (সূত্র : ঐ, প্রতীক সাপের রহস্য অধ্যায়)

ঘ. অইহুদী জনগণের অন্তর থেকে খোদার অস্তিত্ব সম্পর্কিত বিশ্বাস ও আধ্যাত্মিকতার ধারণা মুছে ফেলতে হবে এবং সে স্থলে শুধু গণিতের হিসাবপত্র ও বস্তুতান্ত্রিক প্রয়োজনের অনুভূতি প্রবল করে তুলতে হবে। এমতাবস্থায় তারা পরস্পরের উপর প্রাধান্য বিস্তারের তীব্রতার দ্বন্দ্ব এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমাদের বজ্র আঘাত নিরাসক্ত, উদাসীন ও হৃদয়হীন সম্প্রদায়ের জন্ম দিবে বরং জন্ম দিয়েছে। এ ধরনের সম্প্রদায়গুলো উচ্চতর রাজনীতি ও ধর্মের প্রতি চরম ঘৃণা পোষণ করবে। তাদের একমাত্র আদর্শ হবে স্বার্থ অর্থাৎ সোনা। ... এ স্তরে পৌছার পর অইহুদী সমাজের নিম্নশ্রেণীর লোকেরা আমাদের নেতৃত্বে তাদের সমাজের বুদ্ধিমান শ্রেণীকে আক্রমণ করবে। এ শ্রেণীটিই প্রকৃতপক্ষে আমাদের দুশমন। অইহুদী জনতা কোনো কল্যাণের জন্য বা সকল সম্পদ হস্তগত করার জন্য এ আক্রমণ করবে না। আমাদের দ্বারা দীর্ঘকাল যাবত বুদ্ধিমানদের বিরুদ্ধে একটানাভাবে প্রচারিত বিদ্বেষের ফলেই এরা নিজেদের সমাজের উত্তম লোকদের আঘাত করতে এগিয়ে আসবে। (সূত্র : ঐ, ঈমান হরণ অধ্যায়)

ঙ. আমরা সুকৌশলে উৎপাদনের পরিমাণ কমানোর সুদূরপ্রসারী ব্যবস্থা অবলম্বন করব। এ কাজে সাফল্য অর্জন করার জন্য শ্রমিকদের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা ও পানাসক্তি বাড়িয়ে দেব। সাথে সাথে পানাসক্ত ও অপরাধপ্রবণ শ্রমিকদের মাধ্যমেই অইহুদী সমাজের শিক্ষিত শ্রেণীকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে মুছে ফেলার ব্যবস্থা করব। (সূত্র : ঐ, অর্থনৈতিক নৈরাজ্য সৃষ্টি অধ্যায়)

চ. আমাদের শাসন ক্ষমতা নিরাপদ রাখার জন্য আমরা অবশ্যই শ্রেণী বিভাগ ও শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্বিশেষে সকলের ভোটদানের ব্যবস্থা করব। এর ফলে আমরা নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে সক্ষম হবো। শিক্ষিত

www.pathagar.com

বিত্তশালীদের কাছ থেকে এটা পাওয়া যাবে না। এভাবে সকলের মনেই নিজের সম্পর্কে একটা গুরুত্ববোধ জাগিয়ে দিয়ে আমরা পারিবারিক গুরুত্ব ও শিক্ষার মর্যাদা মিটিয়ে দেব। উত্তেজিত জনতা আমাদের পরিচালনায় এসব শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্তদের কখনও পাত্তা দেবে না। এমনকি তাদের কথায়ও কর্ণপাত করবে না। (সূত্র-ঐ, রাজনৈতিক চালবাজী অধ্যায়)

(উল্লেখ্য, ইহুদী থেকে মুসলমান হওয়া আবদুল্লাহ ইবনে সাবাহ হযরত ওসমান (রা.) ও আলী (রা.)-এর সময় সর্বপ্রথম সার্বজনীন ভোটাধিকারের দাবিতে আন্দোলন করে। বিংশ শতাব্দীর পূর্বে এরূপ ভোটাধিকার প্রথা কার্যকর ছিল না। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে অস্ট্রিয়ার ইহুদী সাংবাদিক থিওডর হার্টজেল বিশ্বব্যাপী ইহুদী ষড়যন্ত্রকে ঐক্যবদ্ধ ও সমন্বিত রূপ দান করে। প্রটোকলের কর্মসূচিসমূহ এর বহু পূর্ব থেকেই বিভিন্ন দেশে বাস্তবায়ন করা হয়। –লেখক)

ছ. ব্যক্তিগত উদ্যম-উৎসাহের চেয়ে অধিকতর বিপজ্জনক বিষয় আমাদের জন্য আর কিছু নাই। প্রতিভা দ্বারা পরিচালিত ব্যক্তিগত উদ্যম আমাদের জন্য লক্ষ লক্ষ লোকের বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার চেয়েও বেশি বিপজ্জনক। এ জন্য আমাদের লক্ষ্যপথে বাধা সৃষ্টি করতে সক্ষম ব্যক্তিদের উদ্যম-উৎসাহকে স্তিমিত করি। (সূত্র-ঐ, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী অদৃশ্য সরকার-অধ্যায়)

ইহুদী প্রটোকলের উপরোক্ত কর্মসূচির সাথে যদি আমরা আমাদের জাতীয় জীবনের বিগত ৭০ বছরকে মিলিয়ে দেখি তবে দেখা যাবে আমরা জাতীয়ভাবে পর্যায়ক্রমিকভাবে উক্ত রূপ ষড়যন্ত্রের জালে আটকা পড়ে বর্তমানে ধ্বংসের শেষপ্রান্তে উপনীত হয়েছি। আমরা যদি উক্ত সময়কে ৭ দশকে ভাগ করি তবে আমরা স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করতে সক্ষম হব যে আমরা পর্যায়ক্রমিকভাবে প্রত্যেক দশকে সৎ ব্যক্তি, সৎ ও যোগ্য নেতা, প্রতিভাশালী ব্যক্তিত্ব ও অভিজাত নেতৃবৃন্দকে সরিয়ে তদস্থলে ইহুদীবাদের কাঙ্ক্ষিত প্রতিভাহীন, দুর্বল ও বদমায়েশদেরকে আমাদের নেতা রূপে বরণ করে নিয়েছি। ফলে ইহুদীবাদের লক্ষ্য হাসিল হয়েছে অর্থাৎ নতুন স্বার্থান্বেষী নেতৃত্ব উচ্চতর রাজনীতি ও ধর্মের প্রতি চরম বিদ্বেষ পোষণ করে, সৎলোকের নিন্দা করে আর দুর্বৃত্তদের প্রশংসা করে এবং নিম্নশ্রেণীর লোকেরা সমাজের উত্তম লোকদের আঘাত করতে এগিয়ে আসে।

নৈরাজ্যবাদীদের ক্ষমতাসীন করা

ইহুদী প্রটোকল অনুযায়ী নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী দল ও গোষ্ঠসসমূহের পরিচয় নিম্নরূপ:

ক. আমরা রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হই মজলুম শ্রমিকদের ত্রাণকর্তা সেজে। আর ত্রানকর্তা হিসাবেই আমাদের সংগ্রামী বাহিনীতে যোগদান করার জন্য তাদের উস্কানি দেই। আমাদের সংগ্রামী বাহিনী হচ্ছে সমাজতন্ত্রী, নৈরাজ্যবাদী ও কম্যুনিস্ট দল। (প্রটোকল : প্রতীক সাপের রহস্য অধ্যায়)।

www.pathagar.com

খ. অ-ইহুদী সমাজের যে সব লোক হামাগুড়ি দিয়ে ক্ষমতার গদীর দিকে অগ্রসর হয়, তাদের সীমাহীন বদমায়েশী, দুর্বলের প্রতি নির্মম আচরণ, দোষ ও অপরাধের প্রতি সীমাহীন কঠোরতা, স্বাধীন সমাজের পারস্পরিক মতভেদের প্রতি অসহিষ্ণু মনোভাব, হিংসাত্মক পন্থায় সর্বময় কর্তৃত্ব বহাল রাখার সংকল্পই আমাদের বিজয়ের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছে। (প্রটোকল : প্রতীক সাপের রহস্য অধ্যায়)

গ. প্রত্যেক প্রজাতন্ত্রেরই কতকগুলো স্তর অতিক্রম করতে হয়। প্রথমে গণউন্মাদনার সৃষ্টি হয় এবং জনতা উত্তেজনার বশে অন্ধ হয়ে এদিক সেদিক ছুটোছুটি করে। দ্বিতীয়স্তরে উত্তেজনা সৃষ্টিকারীদের নেতৃত্ব। এ নেতৃত্ব থেকেই নৈরাজ্যের জন্ম হয়। আর নৈরাজ্যই অনিবার্যরূপে স্বৈরাচারী শাসন ডেকে আনে। এ স্বৈরাচার আইনসঙ্গতও নয়– জনগণের সরল চোখে ধরা পড়ার মতও নয়। এটা অদৃশ্য ও গুপ্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট দায়ী শাসন ব্যবস্থা। ঐ প্রতিষ্ঠানটিই পর্দার আড়ালে থেকে দক্ষতার সাথে তার এজেন্টদের মাধ্যমে সব কাজ করিয়ে নেয়। অপর দিকে ক্রীড়নক সরকার বা এজেন্টদের ঘন ঘন পরিবর্তনের মাধ্যমে আমাদের গুপ্ত প্রতিষ্ঠানের শক্তি মজবুত থেকে অধিকতর মজবুত হতে থাকে। (প্রটোকল : ঈমান হরণ অধ্যায়)

ঘ. ফরাসী বিপ্লবের পর থেকে আমরাই জনগণকে একটা বিশৃঙ্খলা থেকে অপর বিশৃঙ্খলার দিকে পরিচালিত করে আসছি। ধারাবাহিকভাবে বিশৃঙ্খলার পর বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কাজ আমরা এ জন্যই করছি যেন জনগণ এক সময় সকলের প্রতি আস্থা হারিয়ে সর্বময় ও চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী ইহুদী বাদশাহর দিকে ঝুঁকে পড়ে। (প্রটোকল : প্রতীক সাপের রহস্য অধ্যায)

উপরোক্ত তথ্যাবলীর আলোকে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, যারা এ দেশে 'দুনিয়ার মজদুর এক হও' বলে শ্লোগান তোলে, যারা সমাজতন্ত্রী ও কম্যুনিস্ট, যারা পারস্পরিক মতভেদকে হিংসাত্মক পন্থায় দমন করে দেশকে বিরোধী মত ও বিরোধী দল শূন্য করতে চায়, যারা সর্বদা দেশে উত্তেজনা সৃষ্টিকারী কথা ও কাজ করে, যারা স্বৈরাচারের সাথে আঁতাত করে, যারা বিশৃঙ্খলার পর বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে এবং সাম্রাজ্যবাদের ক্রীড়নক সরকারের ভূমিকা পালন করে তারা জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে ইহুদীবাদের এজেন্ট ও ক্রীড়নক। এদের কার্যকলাপের দরুনই দেশে স্বৈরশাসন ও সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

অ-ইহুদী জনগণকে ধর্মবিরোধী করার কর্মসূচি

পৃথিবীতে ইহুদীদের রাষ্ট্র মাত্র ১টি। উক্ত রাষ্ট্রটি কিন্তু ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র– তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র নয়। ইহুদীরা শুধুমাত্র নিজেদের জন্য নিজেদের ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র দেখতে চায়। অইহুদীদের ধর্ম বা ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র ইহুদীদের প্রধান দুশমন। কেননা

www.pathagar.com

তারা শুধুমাত্র ইহুদী জাতির সুখ সমৃদ্ধি ও কল্যাণ চায় কিন্তু অপরাপর জাতির পতন ও বিনাশ চায়। অপরাপর জাতির ধ্বংসস্তুপের উপর ইহুদীরা নিজেদের প্রাসাদ প্রতিষ্ঠায় তৎপর। অইহুদী জনগণকে ধর্মবিমুখ করার কারণ ও কর্মসূচিসমূহ নিম্নরূপ–

ক. আজাদী সত্যিকারের কল্যাণকর হতে পারে এবং রাষ্ট্রীয় অর্থ ব্যবস্থা জনগণের ক্ষতি করার পরিবর্তে উপকার করতে পারে যদি আজাদী আন্দোলনের ভিত্তি আল্লাহর উপর ঈমান ও মানব জাতির পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের উপর স্থাপিত হয়। সকলের সমানাধিকারের দাবিই ইচ্ছে সকল অনর্থের মূল। কেননা সৃষ্টিকর্তাই কোন মহলকে কোন মহলের উপর প্রাধান্য দান করেছেন। উপরোল্লেখিত ঈমানের জোরেই মানুষকে ধর্মীয় নেতাদের অভিভাবকত্বে সহজে শাসন করা সম্ভব। পৃথিবীর ওপর আল্লাহর সর্বময় কর্তৃত্ব স্বীকার করে নিয়ে আধ্যাত্মিক ক্ষমতাসম্পন্ন নেতাদের নিকট আত্মসমর্পণ করে মানুষ পরিপূর্ণ তৃপ্তি ও আনুগত্য সহকারে জীবন-যাপন করতে সর্বদাই প্রস্তুত। আমাদের জন্য তাই মানুষের ঈমানকে দুর্বল করে ফেলা অত্যন্ত জরুরি। অইহুদী জনগণের অন্তর থেকে খোদার অস্তিত্ব সম্পর্কিত বিশ্বাস ও আধ্যাত্মিকতার ধারণা মুছে ফেলতে হবে এবং সে স্থলে শুধু গণিতের হিসাবপত্র ও বস্তুতান্ত্রিক প্রয়োজনের অনুভূতি প্রবল করে তুলতে হবে। (প্রটোকল : ঈমান হরন অধ্যায়)

খ. অ-ইহুদী ধর্ম গুরুদের বদনাম করে ধরাপৃষ্ঠে তাদের মতবাদকে অচল করে দেয়ার জন্য আমরা প্রাচীনকাল থেকেই চেষ্টা করে আসছি। নতুবা তারা আমাদের পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারত। এখন অবস্থা এই যে, পৃথিবীর মানব সমাজে ধর্মনেতা ও পুরোহিতদের প্রভাব প্রতিদিনই কমে আসছে। সর্বত্রই স্বাধীন চিন্তাধারার দাবি উঠছে। তাই মাত্র কয়েক বছর পরই খ্রিস্টানদের ধর্ম সম্পূর্ণরূপে বাতিল হয়ে যাবে। আর অন্য ধর্মগুলোকে নাস্তানাবুদ করা আমাদের জন্য আরো সহজ হবে। ... ধর্মযাজক ও পাদ্রীদের কর্মক্ষেত্রকে আমরা এমনভাবে সংকীর্ণ করে দেব যে, তাদের প্রভাব দিন দিন হ্রাস পেতে থাকবে। (প্রটোকল : আইন ব্যবসা, ধর্ম ও গুপ্তচর বৃত্তি অধ্যায়)

গ. আমরা ধর্ম ও গীর্জার বিরুদ্ধে সমালোচনার একটা অভিযান পরিচালনা করে নব্য সমাজকে ধর্ম ও গীর্জার প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন করে তুলব। আমাদের সংবাদপত্রগুলো সাধারণভাবে রাষ্ট্র সম্পর্কিত কার্যকলাপ, ধর্ম, অইহুদীদের অযোগ্যতা ইত্যাদি বিষয়ে সমালোচনা চালিয়ে যাবে। যার ফলে অইহুদীদের মর্যাদা দিন দিন খাটো হতে থাকবে। (প্রটোকল, ঐ)

ঘ. আমাদের রাজ্যে ক্ষমতাসীন হবার পর অন্যান্য কোনো ধর্মের অস্তিত্ব আমরা বরদাস্ত করবো না।. কেননা বিধাতার মনোনীত জাতি হিসেবে আমরাই পৃথিবীর মানুষের শাসক এবং আমাদের মনিব স্বয়ং বিধাতা। তাই আমরা অন্যান্য

www.pathagar.com

যাবতীয় ধর্মমত মুছে দেব। যদি এ ব্যবস্থার ফলে নাস্তিকতার জন্ম হয় তবে এটা একটা অস্থায়ী ব্যাপার হবে এবং আমাদের মতবাদ প্রচারে কোনো বাধা সৃষ্টি করতে পারবে না। (প্রটোকল : দাসত্বের নয়ারূপ অধ্যায়)

উপরোক্ত তথ্যাবলী আমাদেরকে এই শিক্ষা দেয় যে, মানুষ তখনই সার্বজনীন আজাদী লাভ করবে যখন মানুষ আল্লাহর উপর ঈমান এনে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধের সমাজ কায়েম করে একজন ন্যায়পরায়ণ ধর্মনেতার উপর নিজেদের শাসন ভার অর্পণ করবে। ইহুদীরা এ বিষয়টি ভালোভাবে জানে এবং নিজেদের জন্য পছন্দ করে। কিন্তু যেহেতু তারা শুধু নিজেদের কল্যাণ চায় এবং অ-ইহুদীদের বিনাশ চায় সেহেতু তারা পৃথিবী থেকে অপরাপর সকল ধর্মকে উচ্ছেদ করার জন্য এবং সংশ্লিষ্ট ধর্মনেতাদেরকে নিশ্চিহ্ন করতে অবিরাম কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সুতরাং যারা বাংলাদেশ থেকে ধর্মকে, ধর্মীয় নেতাদেরকে, ধর্মীয় অনুশাসনকে, ধর্মীয় রাজনীতিকে, ধর্মীয় মূল্যবোধকে উচ্ছেদ করতে চায় তারা মূলত সর্বনাশা ইহুদী ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নকারী, এবং নিজ দেশ ও জাতিকে সাম্রাজ্যবাদী ইহুদীদের পদতলে বলি দেয়ার আয়োজনে লিপ্ত রয়েছে। আরও লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে, বাংলাদেশের এই শ্রেণীটি শুধু মাত্র ইসলাম ধর্মের বিনাশ চায় এবং অন্যান্য ধর্ম ও ধর্মীয় লোকজনকে পৃষ্ঠপোষকতা করে।

ইহুদীদের পছন্দনীয় অ-ইহুদী শাসক

ইহুদীরা যেহেতু অ-ইহুদীদের বিনাশ চায় সেহেতু তারা অ-ইহুদী জনগোষ্ঠীর জন্য এমন শ্রেণীর শাসক পছন্দ করে যারা নিজ দেশ ও জাতিকে বিনাশ করে ইহুদী এজেন্ডা বাস্তবায়নে সক্ষম। ইহুদীরা এ জাতীয় ব্যক্তিদেরকে অ-ইহুদী দেশের শাসন ক্ষমতা দখলে সর্বাত্মক সহযোগিতা করে। ইহুদী প্রটোকলে এ সংক্রান্ত কর্মসূচি নিম্নরূপ–

ক. আমাদের বিজয় আরো সহজতর করার জন্য আমরা যে সমস্ত মানুষের সাথে সম্পর্ক গড়েছি– সর্বদাই তাদের অন্তরের দুর্বলতম স্থানগুলোতে হস্তসঞ্চালন করেছি। নগদ লেনদেন, সম্পদের লোভ, বস্তুতান্ত্রিক প্রয়োজন পূরণের জন্য মানসিক চাঞ্চল্য ইত্যাদি প্রতিটি বিষয় মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত কর্মপ্রেরণা চিরদিনের জন্য স্তব্ধ করে দিতে পারে। কেননা এসব দুর্বলতার দরুণ মানুষ তার নিজের ইচ্ছাশক্তিকে তাদের হাতে তুলে দেয়। যারা কর্মপ্রেরণার মূল্য দিয়ে তাদের সত্তাকেই খরিদ করে নেয়। (প্রটোকল : ষড়যন্ত্রের সর্বমুখী জাল অধ্যায়)

খ. নেশাগ্রস্ত জানোয়ারের দিকে তাকাও– শরাব পানের ফলে তার মাতাল অবস্থা লক্ষ্য কর। এটাই হচ্ছে তাকে যদৃচ্ছ ব্যবহার করার উপযুক্ত সময়। এভাবে গইম (অ-ইহুদী)দের মাতাল করে কাজ উদ্ধার করার পথ একমাত্র আমাদেরই জ্ঞাত। এরা তরল পানীয়ের নেশায় বিভোর। এদের যুব সমাজ নৈতিক

www.pathagar.com

অধঃপতন ও শ্রেণী বিদ্বেষে বোধশক্তিহীন হয়ে গেছে। এদের এ অবস্থায় ঠেলে দেয়ার জন্য আমাদের এজেন্টগণ ধনীদের গৃহশিক্ষক, উর্দী পরিহিত ভৃত্য ও ধাত্রীরূপে, কেরানী ও অপরাপর শ্রেণীর কর্মচারীর বেশে কাজ করছে। জনসমাগম স্থলে আমাদের বিশেষ নারী এজেন্টগণ ও গইমদের নৈতিক চরিত্রের পতন ঘটানোর জন্য কাজ করছে। আর নারী এজেন্টদের সঙ্গে গইম সমাজের ঐসব 'সোসাইটি গার্ল'ও রয়েছে, যারা স্বেচ্ছায় দুর্নীতি ও বিলাসিতার ক্ষেত্রে তাদের অনুসরণ করে চলে। (সূত্র : ঐ, অধ্যায় ঐ)

গ. যেসব সভ্যতার মাঝখানে আমাদের কাজ চালিয়ে যেতে হবে সে সভ্যতাগুলোর মধ্যে যে শক্তি রয়েছে তা অবশ্যই আমাদের ডিরেক্টরেটের চারিদিকে জমায়েত করতে হবে। প্রচারক, বাস্তবধর্মী আইনজীবী, শাসনদণ্ড পরিচালনাকারী, রাজনীতি বিশারদ এবং আমাদের বিশেষ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকদের আমরা নিয়োগ করব। তারা তাদের সমাজের সকল গোপন তথ্য অবগত থাকবে, রাজনৈতিক বর্ণমালা ও শব্দ সমষ্টির সমন্বয়ে কখন কোন ভাষা রচনা করতে হবে তা তাদের বিলক্ষণ জানা থাকবে। মানব মনের সকল দুর্বলতা সম্পর্কে তারা ওয়াকিফহাল হবে এবং এ দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে কখন কিভাবে স্পর্শকাতর সুতো ধরে টান দিতে হবে তা তাদের শেখানো হবে। অইহুদী সমাজের মানসিক অবস্থা, ঝোঁক প্রবণতা, দোষত্রুটি, লাম্পট্য, মন্দ গুণাবলী, বিশেষ শ্রেণী ও অবস্থার সূত্রে আমাদের হাতে বাধা থাকবে। (প্রটোকল : প্রতিভাবান কর্তৃত্ব অধ্যায়)

ঘ. যতদিন পর্যন্ত আমাদের ইহুদী ভাইদের হাতে রাষ্ট্র পরিচালনার এসব দায়িত্ব অর্পণ নিরাপদ না হয়, ততদিন পর্যন্ত এমন লোকদের হাতে শাসন ক্ষমতার ভার দিতে থাকব– যাদের সঙ্গে জনসাধারণের বিরোধ এত প্রবল থাকবে যে, উভয় পক্ষের মাঝখানে বিরাট ফাটল দেখা যাবে। এসব লোক আমাদের অবাধ্য হলে বিচারের সম্মুখীন হবে বা ধরাপৃষ্ঠ থেকে মুছে যাবে। আর বিচারের সম্মুখীন হওয়া বা দুনিয়া থেকে মুছে যাওয়ার ভয়ে এরা আমাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করবে। (সূত্র-ঐ, অধ্যায়-ঐ)

ঙ. সীমাহীন উচ্চাকাঙ্ক্ষা, ক্রমবর্ধমান লালসা, নির্মম প্রতিহিংসা, ঘৃণা ও বিদ্বেষের হাতিয়ার আমাদের হাতেই রয়েছে। সর্বগ্রাসী ভীতি আমাদেরই সৃষ্টি। সকল মত ও আদর্শে বিশ্বাসী রাজতন্ত্রের পুনরুদ্ধারকামী, উত্তেজনা সৃষ্টিকারী জননেতা, সমাজতন্ত্রী, সাম্যবাদী এবং অপরাপর সকল সুখরাজ্যের কল্পনা বিলাসীগণ আমাদেরই নিয়োজিত। আমরা তাদের সকলের কাঁধে জোয়াল তুলে দিয়েছি। তাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ পন্থায় সকল প্রকার প্রতিষ্ঠিত শৃঙ্খলা নির্বিকার চিত্তে ভেঙ্গেচুরে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কাজ করে যাচ্ছে। (প্রটোকল : উদারতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের ধুয়া অধ্যায়)

www.pathagar.com

ইহুদী প্রটোকলের উপরোক্ত বিষয়গুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, যায়নবাদী ইহুদীরা অ-ইহুদীদের জন্য এমন শাসক পছন্দ করে এবং চাপিয়ে দেয় যারা লোভী, ঘুষখোর, নিজস্ব সত্তা বিক্রি করে দেয় ইহুদীদের নিকট, মদ ও নারী আসক্ত, শ্রেণীবিদ্বেষী, আবেগপ্রবণ, উচ্চাকাঙ্ক্ষী, প্রতিহিংসাপরায়ণ, সমাজতন্ত্রী, সাম্যবাদী, উত্তেজনা সৃষ্টিকারী ও প্রতিষ্ঠিত শৃঙ্খলা বিনষ্টকারী। এমতাবস্থায় আমরা যদি আমাদের দেশের অতীত ও বর্তমান শাসক দলের কর্মকাণ্ড প্রত্যাশা করি তবে সুস্পষ্টভাবে দেখতে পাব আমাদের দেশের কোন কোন দল বা জোট ইহুদীবাদের পছন্দনীয় ও সহযোগী। ইতোমধ্যে আমরা দেখতে পেয়েছি কারা পেশীশক্তির জোরে আইন বিভাগের শৃঙ্খলা বিনষ্ট করেছে, স্বেচ্ছাচারিতার মাধ্যমে শাসন বিভাগকে তছনছ করেছে এবং বিচার বিভাগ ও প্রধান বিচারপতির এজলাসে হামলা করে প্রতিষ্ঠিত শৃঙ্খলা বিনষ্ট করেছে। রাষ্ট্রের প্রধান ৩টি স্তম্ভের মূলে যারা কুঠারাঘাত করেছে তারাই আমাদের দেশ ও জাতির পতন ঘটাতে কাজ করে যাচ্ছে।

অ-ইহুদী দেশের অর্থনীতি ধ্বংসে ইহুদী কর্মসূচি

ক. অভাব এবং অভাব থেকে সৃষ্ট হিংসা ও ঘৃণার সাহায্যে আমরা জনতাকে আমাদের ইচ্ছামত চলতে বাধ্য করব এবং আমরা তাদের খতম করব– যারা আমাদের স্বার্থ উদ্ধারের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।.... অর্থনৈতিক দুর্গতি বিদ্বেষের মাত্রা আরো বাড়িয়ে দেবে। কারণ ঐ অবস্থায় অর্থ বিনিময় সংস্থা ও শিল্প কারখানা বন্ধ হয়ে যাবে। আমরা সকল গুপ্ত পন্থার মাধ্যমে ইউরোপীয় দেশগুলোতে আমাদের ষড়যন্ত্রমূলক বুদ্ধি ও পুঞ্জীভূত স্বর্ণের সাহায্যে এমন অর্থনৈতিক দুরবস্থা সৃষ্টি করব যে, সকল শ্রমজীবীগণ পথে বের হয়ে আসতে বাধ্য হবে। উত্তেজিত জনতা তখন সোল্লাসে ঐ সব লোকের রক্তপাত ঘটানোর জন্য ছুটে যাবে। যাদের প্রতি ঘৃনায় নিজেদের অন্তর শৈশব থেকেই ভরপুর। আর হৈ চৈ ও গোলমালের মধ্যে জনতা ঘৃণিত সম্পদশালীদের সকল বিত্তসম্পদ লুটে নেবে। (প্রটোকল : প্রতীক সাপের রহস্য অধ্যায়)

খ. অ-ইহুদী সমাজের লোকজন যেন চিন্তা ও লক্ষ্য করার সুযোগ না পায় সে জন্য আমরা এদের মনমগজকে শিল্প ও ব্যবসায়ের দিকে ঝুঁকিয়ে দেব। এর ফলে স্বার্থের নেশা অ-ইহুদী জাতিকে গ্রাস করে ফেলবে এবং পারস্পরিক প্রতিযোগিতায় এরা এমনভাবে অন্ধ হয়ে যাবে যে, এদের সকলের একমাত্র শত্রুর দিকে চোখ তুলে তাকাবার ফুরসৎ পাবে না। পুনরায় আজাদীর মারফত জাতিগুলোকে চিরদিনের মত ধ্বংস ও বিক্ষিপ্ত করে দেয়ার উদ্দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠানকে ফটকা বাজারের (শেয়ার ব্যবসা) আবর্তে নিক্ষেপ করব। এর ফলে শিল্প কারখানা দেশ থেকে যা কিছু সংগ্রহ করবে ফটকা বাজারের মাধ্যমে তা আমাদের হাতে এসে পড়বে। পরস্পরের উপর প্রাধান্যের দ্বন্দ্ব এবং অর্থনৈতিক

www.pathagar.com

ক্ষেত্রে আমাদের বজ্র আঘাত নিরাসক্ত, উদাসীন ও হৃদয়হীন সম্প্রদায়ের জন্ম দিবে বরং জন্ম দিয়েছে। এ ধরনের সম্প্রদায়গুলো উচ্চতর রাজনীতি ও ধর্মের প্রতি চরম ঘৃণা পোষণ করবে। তাদের একমাত্র আদর্শ হবে স্বার্থ অর্থাৎ সোনা। (প্রটোকল : ঈমান হরণ অধ্যায়)

গ. সমবায় ব্যবস্থার মাধ্যমে পুঁজিকে যদি অবাধে অগ্রসর হতে দেয়া হয় তাহলে সে শিগগিরই শিল্প এবং ব্যবসা ক্ষেত্রে ইজারাদারী কায়েম করে ফেলবে। বিশ্বের সর্বত্র এক অদৃশ্যহাতের কারসাজিতে এ ব্যবস্থা ইতিপূর্বে কার্যকরী হতে চলেছে। এ ধরনের স্বাধীনতা শিল্পপতিদের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা তুলে দেবে এবং এর ফলে তারা সাধারণ লোকদের উপর অধিকতর জুলুম করতে পারবে। আধুনিক যুগে মানুষকে যুদ্ধের দিকে ঠেলে দেয়ার পরিবর্তে নিরস্ত্র করে দেয়া অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। জ্বলন্ত অগ্নিশিখাকে আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির কাজে ব্যবহার করা আগুন চাপা দেয়ার চাইতে সঙ্গত। (প্রটোকল : ঈমান হরণ অধ্যায়)

ঘ. অ-ইহুদী সমাজের সম্ভ্রান্তশ্রেণী উত্তরাধিকার সূত্রেই ক্ষুদ্রদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে অসমর্থ। তাই এরা আমাদের ব্যবস্থা মোতাবেক ব্যবসা ও শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা করবে। আমরা সবচেয়ে বেশি উৎসাহ দেব ফটকা বাজারের প্রতি। ফটকাবাজার শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে ভেতর থেকে ধ্বংস সাধন করবে। ফটকাবাজারীর অবর্তমানে শিল্প প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সম্পদ ব্যক্তিগত তহবিলে পুঞ্জিভূত হতে থাকবে এবং এর ফলে শিল্পপতিগণ ঋণমুক্ত হয়ে তাদের হারানো সম্পদ পুনরুদ্ধার করার সামর্থ অর্জন করতে পারে। আমরা যা চাই তা হচ্ছে এই যে, শিল্প কারখানা দেশ থেকে শ্রম ও সম্পদ কুড়িয়ে হস্তগত করবে এবং ফটকাবাজারের মাধ্যমে পৃথিবীর সকল সম্পদ আমাদের হাতে তুলে দিয়ে গোটা গইম (অইহুদী) সমাজকে সর্বহারায় পরিণত করবে। এ অবস্থায় উপনীত হলেই গইম সমাজ অন্য কোনো কারণে না হোক অন্তত নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য আমাদের নিকট নতি স্বীকার করবে। (প্রটোকল : অর্থনৈতিক নৈরাজ্য সৃষ্টি অধ্যায়)

ঙ. অইহুদী সমাজের ধ্বংস সাধনের কাজ পরিপূর্ণ মাত্রায় পৌঁছাবার জন্য আমরা ফটকাবাজারীর সহকারী হিসেবে বিলাসিতা আমদানি করেছি। বর্তমানে বিলাসী জীবন যাপনের উদগ্র আকাঙ্ক্ষা অইহুদী সমাজকে ক্রমেই গ্রাস করে চলেছে। আমরা শ্রমজীবীদের পারিশ্রমিকের হার বৃদ্ধি করব কিন্তু এতে শ্রমিক সমাজের কোনোই লাভ হবে না। কেননা আমরা উৎপাদনের পরিমাণ কমানোর ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দাম বাড়ানোর ব্যবস্থা করব। (সূত্র-ঐ, অধ্যায়-ঐ)

ইহুদী প্রটোকলে বর্ণিত নীতিমালাসমূহ পর্যালোচনা করলে আমরা বুঝতে পারব অঢেল সম্পদের মালিক হওয়া সত্ত্বেও কেন আমরা এবং অ-ইহুদী সমাজ পর্যায়ক্রমিকভাবে অভাবগ্রস্ত হচ্ছি। ইহুদীদের মাস্টার প্লান অনুযায়ী অইহুদীদেরকে

www.pathagar.com

ভাববাদ ও আধ্যাত্মিকার থেকে প্রথমে বস্তুবাদীতে পরিণত করে স্বার্থের নেশায় নিমজ্জিত করা হবে যাতে তারা নিরাসক্ত, উদাসীন ও হৃদয়হীন সম্প্রদায়ে পরিণত হয়ে উচ্চতর রাজনীতি ও ধর্মের প্রতি চরম ঘৃণা পোষণ করে নিজেদের দেশ ও সমাজকে অস্থিতিশীল করে তোলে। তাদের প্লানের দ্বিতীয় অংশ হলো অভিজাতদেরকে প্রথমে শিল্পপতি বানানো হবে এবং পরবর্তীতে ফটকাবাজারের মাধ্যমে উক্ত শিল্পকে ভিতর থেকে নিঃশেষ করে দেয়া হবে। প্লানের পরবর্তী কার্যক্রম হল ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদেরকে রাজনৈতিক ক্ষমতার অংশীদার করে তাদের দ্বারা জনগণকে অধিকতর শোষণ নিপীড়ন করা যাতে এক সময় নিম্নশ্রেণীর লোকেরা বিদ্রোহ করে সমাজের প্রভাবশালীদেরকে নিশ্চিহ্ন করে। এর পরবর্তী ধাপ হলো জনগণকে বিলাসীতার মধ্যে নিমজ্জিত করা, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি করা ও উৎপাদন কমিয়ে দেশে অশান্তি সৃষ্টি করা এবং চুক্তি ও ঋণের জালে অ-ইহুদীদেরকে আটকে ফেলা।'

বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থার সাথে ইহুদীদের পরিকল্পনাকে মিলিয়ে দেখলে দেখা যাবে বাংলাদেশ বর্তমানে পরিপূর্ণভাবে ইহুদী চক্রান্তের ঘূর্ণিপাকে পতিত হয়ে নিজেকে চুক্তি ও ঋণের জালে জড়িয়ে বন্দীত্ব বরণের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। উচ্চতর রাজনীতি ও ধর্মীয় মূল্যবোধ প্রচণ্ড হামলার শিকার হচ্ছে এবং দেশ পর্যায়ক্রমিকভাবে চরম অশান্তি ও নৈরাজ্যের দিকে ধাবিত হচ্ছে।

তথ্যসূত্র :

১. ইহুদী চক্রান্ত, আবদুল খালেক

২. ইসরাইল ও মুসলিম জাহান, সাইদুর রহমান।

অর্থনীতি ধ্বংসের কর্মসূচি–

ক. মুদ্রার আবর্তন বন্ধ করে দিয়েই আমরা অ-য়াহুদীদের রাজ্যে অর্থনৈতিক অচলাবস্থা সৃষ্টি করেছি। বিপুল পরিমাণ পুঁজি রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে তুলে নিয়ে পুঞ্জীভূত করে রাখা হয়েছে এবং রাষ্ট্র পুনঃ পুনঃ এ পুঞ্জীভূত অর্থ থেকে ঋণ গ্রহণের আবেদন করতে বাধ্য হচ্ছে। এসব ঋণ সুদের ভারে রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিতে বোঝা সৃষ্টি করেছে এবং দেশের জনগণকে পুঁজির কেনা গোলামে পরিণত করেছে। শিল্প-কারখানা ক্ষুদ্র কুটির শিল্প মালিকদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে বড় বড় পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দেয়ার ফলে জনসাধারণ ও রাষ্ট্রের সকল রক্ত পুঁজিপতিদের হাতে চলে গিয়েছে। (প্রটোকল : অর্থনৈতিক চালবাজী অধ্যায়)

খ. তোমরা অবগত আছ যে, স্বর্ণকে আদান প্রদানের মাধ্যম হিসেবে পরিগণিত করার নীতি রাষ্ট্রগুলোকে ধ্বংস করে দিয়েছে। কেননা আমরা বাজার থেকে

www.pathagar.com

স্বর্ণ উধাও করে দিয়ে এমন অবস্থার সৃষ্টি করেছি যে, অবশিষ্ট স্বর্ণ সমাজের অর্থনৈতিক প্রয়োজন পূরণ করতে ব্যর্থ হচ্ছে। (সূত্র : ঐ, অধ্যায়, ঐ)

গ. অ-য়াহুদী সমাজ যেসব বিশৃঙ্খলা ও অনিয়মতান্ত্রিকতার দরুন দুর্দশার সম্মুখীন হয়েছে, সেগুলো উল্লেখ করছি। তাদের প্রথম বিশৃঙ্খলা হচ্ছে রাষ্ট্রের বাজেট। অয়াহুদী রাষ্ট্র বছরের পর বছর একই ধরনের বাজেট প্রণয়ন করে। কিন্তু নিম্ন কারণে তার কলেবর ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রণীত বাজেটে অয়াহুদী রাষ্ট্র মাত্র ছয় মাসকাল টানাটানি করে কাজ চালায়। তারপর তারা অপর একটি বাজেট (সম্পূরক) প্রণয়ন করে। এর দ্বারাও তিন মাস চলে। পুনরায় একটি অতিরিক্ত বাজেট প্রণয়ন করে। এভাবে পূর্বে প্রণীত বাজেট সম্পূর্ণরূপে অকেজো প্রমাণিত হয়। পূর্ব অভিজ্ঞতার দরুন পরবর্তী বাজেট অন্তত শতকরা পঞ্চাশ ভাগ বাড়িয়ে তৈরি করে। তাও ব্যর্থ হয়। এভাবে পরবর্তী ১০ বছরে অ-য়াহুদী রাষ্ট্রের বাজেট তিনগুণ বড় হয়ে যায়। এ অসতর্কতার দরুন তাদের অর্থ ভাণ্ডার আজ শূন্য। গৃহিত ঋণ শোধ করার তারিখ অতিক্রান্ত হয়েছে এবং ঋণ তাদের মূলধন গ্রাস করে চলেছে। আর এভাবেই অ-য়াহুদী রাষ্ট্রসমূহ দেউলিয়া পর্যায়ে নেমে এসেছে। আমাদের প্ররোচনাতেই অয়াহুদী রাষ্ট্র এ ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। আমাদের রাষ্ট্রে কখনো এরূপ দেউলিয়া অর্থনীতি প্রশ্রয় লাভ করবে না। (সূত্র : ঐ, অধ্যায়-ঐ)

ঘ. ঋণ করার অর্থই হচ্ছে দুর্বলতা এবং রাষ্ট্রের দায়িত্ব সম্পর্কিত জ্ঞানের অভাব। ডেমোকলের (গ্রীক দেবতা) তরবারির মতোই শাসকদের মাথার উপর ঋণের বোঝা ঝুলতে থাকে। শাসকগণ অস্থায়ী করের মাধ্যমে অল্প-অল্প করে ঋণ পরিশোধ করার পরিবর্তে প্রসারিত হাতে আমাদের ব্যাংক মালিকদের নিকট ভিক্ষাপ্রার্থী হয়। এভাবে বিদেশী ঋণ জোঁকের মতো রাষ্ট্রদেহে বসে অয়াহুদী জনগণের রক্ত শোষণ করে। যতক্ষণ না এ জোঁক নিজে সরে যায়, কিংবা রাষ্ট্র একে টেনে জোর করে দেহ থেকে আলাদা না করে ততক্ষণ পর্যন্ত জোঁকের শোষণ থেকে মুক্তির কোনো সম্ভাবনা নাই। আয়াহুদী রাষ্ট্রগুলো কখনো এ জোঁককে দেহ থেকে জোর করে বিচ্ছিন্ন করতে পারে না বরং তারা দেহের উপর আরো জেঁকে বসতে থাকে। তাই তাদের স্বেচ্ছায় রক্তদানের এ পন্থা অ-য়াহুদী রাষ্ট্রকে মরণের পথে ঠেলে নিয়ে যায়। (সূত্র : ঐ, অধ্যায়-ঐ)

ঙ. অ-য়াহুদী রাষ্ট্র প্রধানের রাষ্ট্র পরিচালনা সংক্রান্ত ভাসা ভাসা জ্ঞান, তাদের মন্ত্রীদের দুর্নীতিপরায়ণতা এবং শাসনকার্যে নিয়োজিত অন্যান্যদের অর্থনীতি সংক্রান্ত অজ্ঞতা অয়াহুদী দেশগুলোকে আমাদের নিকট এত বিপুল পরিমাণ ঋণী করে দিয়েছে যে, কখনো তারা তা শোধ করতে পারবে না। তাদের এ অবস্থায় পৌছানোর জন্য আমাদের যথেষ্ট অর্থ নিয়োগ করতে হয়েছে। (সূত্র : ঐ, অধ্যায়-ঐ)

www.pathagar.com

চ. অ-য়াহুদীদের পশু সদৃশ মগজ চিন্তাশক্তির দিক দিয়ে কি পরিমাণ অনুন্নত তা তাদের ঋণ গ্রহণ নীতি থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়। এরা আমাদের নিকট থেকে সুদী ঋণ গ্রহণ করার সময় একবারও চিন্তা করে দেখে না যে, ঋণের সবটুকু টাকা এবং এর সুদস্বরূপ আরো অতিরিক্ত পরিমাণ টাকা তাদেরই পকেট থেকে বের করে আমাদের হাতে তুলে দিতে হবে। অথচ যাদের পকেট থেকে আসল টাকা ও সুদ বের করে নিয়ে এসে আমাদের শোধ করবে তাদেরই পকেট থেকে ঋণ গ্রহণ করা কি তাদের জন্য সহজতর ছিল না? (সূত্র : ঐ, অধ্যায়-ঐ)

ছ. শাসকশ্রেণীর দুর্নীতিপরায়ণতা ও শৈথিল্যের সুযোগ গ্রহণ করে আমরা আমাদের অর্থ দ্বিগুণ, ত্রিগুণ ও বহুগুণে বাড়ানোর জন্য অয়াহুদী সরকারকে বারবার ঋণ দিয়েছি। যদিও এ ঋণের সবটুকু তাদের জন্য জরুরি ছিল না। আমাদের সঙ্গে কেউ কি এরূপ আচরণ করতে পারবে?

অয়াহুদী রাষ্ট্রের অর্থনীতিকে ধ্বংস করার লক্ষ্যে ইহুদীবাদীদের কর্মসূচিসমূহ বর্তমানে বাংলাদেশ ও সকল অ-য়াহুদী দেশে বাস্তবায়িত হয়েছে। ফলে অয়াহুদী দেশসমূহ ইহুদীদের ঋণের জালে আটকা পড়ে বিশ্বমন্দায় পতিত হয়েছে। প্রটোকলে বর্ণিত অর্থনীতি ধ্বংসের কর্মসূচিসমূহের মধ্যে উল্লেখযেগ্য বিষয়গুলো হলো অয়াহুদী রাষ্ট্রের মুদ্রার আবর্তন বন্ধ করে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে অলস ফেলে রাখা, কুটির শিল্প ধ্বংস করে বৃহৎ শিল্প গড়ে তোলা, স্বর্ণকে আদান-প্রদানের মাধ্যম করা, অপরিকল্পিত রাষ্ট্রীয় বাজেট প্রণয়ন, বিদেশী ঋণ গ্রহণ, দুর্নীতিপরায়ণ ও অনভিজ্ঞদের হাতে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান অন্যতম। বাংলাদেশের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এদেশে সকল ইহুদি ষড়যন্ত্র সরকারিভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

ইহুদীবাদী ষড়যন্ত্রের ক্রীড়নক

অ-ইয়াহুদী এজেন্ট

পাঠকবৃন্দের স্মরণ রাখতে হবে যে, যায়নবাদী ইহুদীদের রচিত The protocol of the Elders of the Zion বইটি মূলত একটি ষড়যন্ত্রের গোপন দলিল। ১৯০৫ সালে একজন রুশ ইহুদী মহিলা এজেন্ট ইহুদীদের গোপন আস্তানা থেকে চুরি করে এনে তার বিশেষ সুহৃদ জার্মান খ্রিস্টান প্রফেসর নাইলাসের হাতে প্রদান করে। প্রফেসর নাইলাস দ্রুত হিব্রু থেকে অনুবাদ করে protocolটি বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেন। উক্ত সময় থেকে মহিলা ইহুদীদের স্ত্রী ম্যাসন লজের সদস্য করা হয় না তদুপরি ইহুদী ষড়যন্ত্রে ইহুদী বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিবিদদের দ্বারা সংঘটিত রুশ বিপ্লবের পর রুশ কমিউনিস্টরা প্রফেসর নাইলাসকে গোপন দলিল ফাঁস করার অপরাধে হত্যা করে। এ অপ্রত্যাশিত প্রাপ্তির ফলে আমরা ইহুদীবাদীদের সাবেক

www.pathagar.com

এজেন্টদের সম্পর্কে কিছু কিছু অবগত হতে পেরেছি। ইতিমধ্যে আরো কত প্রকার সংস্থা ইহুদীবাদ বাস্তবায়নে কাজ করছে তা আমাদের জানা নেই। প্রটোকলে ইহুদীবাদী এজেন্টদের পরিচয় নিম্নরূপ –

ক. সিআইএ ও কেজিবি আপাতদৃষ্টিতে আমেরিকা ও রাশিয়ার গোয়েন্দা সংস্থা হিসেবে পরিচিত হলেও মূলত এ দুটো ইয়াহুদীদের দ্বারা ও স্বার্থে পরিচালিত। জাইওনবাদের নীল নকশায় এদেরকেই আন্তর্জাতিক এজেন্ট বলা হয়েছে। (প্রটোকল : য়াহুদী প্রাধান্যের গোড়ার কথা অধ্যায়)।
(বর্তমানে বিশ্বের আরো অনেক দেশের গোয়েন্দা সংস্থা জ্ঞানত ও অজ্ঞানবশত ইহুদী এজেন্ট হিসেবে কাজ করছে। –লেখক)

খ. অ-য়াহুদী জনগণের মধ্য থেকে আমাদের একান্ত অনুগত যেসব লোকদের আমরা শাসন পরিচালনার জন্য বাছাই করবো তারা শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে আমাদের প্রতিভাশালী বিশেষজ্ঞদের হাতের পুতুল হয়ে যাবে। (সূত্র : ঐ, অধ্যায়-ঐ)

গ. অয়াহুদী সমাজের বুদ্ধিজীবী মহলের মনমগজকে আমাদের মতলব অনুযায়ী গড়ে তোলা এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে তাদের ব্যবহার করার জন্য আমাদের দালালগোষ্ঠীর বিশেষজ্ঞ মহল অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা সহকারে বিশেষ ধরনের জ্ঞান ও তথ্য পরিবেশন করে চলেছে। আর ঐসব বুদ্ধিমানেরা বিচার-বিশ্লেষণ না করেই আমাদের পরিবেশিত তথ্যগুলোকে কার্যকরী করতে প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। (সূত্র : ঐ, অধ্যায়-ঐ)

ঘ. সমাজ কাঠামো সংক্রান্ত প্রকৃত জ্ঞান আমরা কখনো অয়াহুদীদের নিকট প্রকাশ করি না। অয়াহুদীদের আমরা যে ধরনের কাজ করতে আদেশ করি সেসব কাজ করার ফলে তাদের গোটা সমাজের দুঃখ-দুর্দশা বেড়ে যায়। (বিঃদ্রঃ মুসলিম দেশের ভেতর বিদেশী সংস্থাগুলোতে চাকরিরত মুসলিম যুব সম্প্রদায় নিজেদের অজান্তে ইহুদীদের পক্ষে কাজ করে যাচ্ছে।) (প্রটোকল : প্রতীক সাপের রহস্য অধ্যায়)

ঙ. আমরা উচ্চ ও নিম্ন সকল শ্রেণীর লোকদের মধ্য থেকেই আমাদের এজেন্ট বাছাই করে নেব। এদের মধ্যে শাসন বিভাগের লোক থাকবে যারা আমোদ-আহ্লাদে দিন কাটায়, সংবাদপত্র, সম্পাদক, মুদ্রাকর ও প্রকাশক, পুস্তক বিক্রেতা, কেরানী, দোকানদার, শ্রমিক, কোচম্যান (ড্রাইভার) ইত্যাদি সকল লোকই আমাদের এজেন্ট বাহিনীতে শামিল থাকবে। আর এ বিরাট বাহিনী সম্পূর্ণরূপে কর্তৃত্বহীন থাকবে। স্বীয় ক্ষমতাবলে এ দলের এজেন্টগণ কারো বিরুদ্ধে কোনো কিছু করার অধিকারী হবে না। এটাকে কর্তৃত্বহীন পুলিশ বাহিনী বলা যায়। এদের কাজ হবে দেখা এবং যথাস্থানে রিপোর্ট পৌছে দেয়া। (প্রটোকল : আইন ব্যবসা, ধর্ম ও গুপ্তচরবৃত্তি অধ্যায়)

www.pathagar.com

চ. গুপ্ত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাটিকে আরো মজবুত করার প্রয়োজন বোধ হলে (কর্তৃপক্ষের জন্য যা মারাত্মক ক্ষতিকর) আমরা একটা কপটতামূলক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবো অথবা অসন্তুষ্টি জ্ঞাপন বিক্ষোভ প্রদর্শন করবো। এগুলো করার জন্য কিছুসংখ্যক ভালো বক্তার সহযোগিতা হাসিল করা হবে। বক্তাদের চারদিকে ঐসব লোক জমায়েত হবে, যারা বক্তৃতায় পেশকৃত বিষয়গুলো সম্পর্কে সহানুভূতিশীল। এ অবস্থা সৃষ্টি হলে অয়াহুদী পুলিশের মধ্যে আমাদের যেসব এজেন্ট রয়েছে তাদের সক্রিয় তৎপরতার সাথে তদন্ত ও পর্যবেক্ষণ করার একটা বাহানা পাওয়া যাবে। (প্রটোকল : রক্ষা ব্যবস্থার গুপ্ত রহস্য অধ্যায়)

ছ. কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বারবার ষড়যন্ত্র আবিষ্কৃত হলে কর্তৃত্বের মর্যাদা কমে যায়। এ ধরনের ঘটনার বারবার পুনরাবৃত্তি হলে কর্তৃপক্ষের দুর্বলতা অথবা জুলুম-নিষ্পেষণের হার বেড়ে যায়। তোমরা জানো যে, অয়াহুদী রাজাদের মর্যাদা কমানোর জন্য আমরা এই পন্থাই গ্রহণ করেছিলাম। আমাদেরই এজেন্টদের দ্বারা বারবার এসব রাজ-রাজড়াদের জীবননাশের চেষ্টা করিয়েছি। অন্ধ ভেড়ার দলকে দু'চারটি স্তোকবাক্যে যে কোনো মারাত্মক ধরনের অপরাধের জন্যও প্রস্তুত করা যায়। শুধু অপরাধটিকে রাজনৈতিক রঙে রঞ্জিত করে দিতে হয়। (সূত্র : ঐ, অধ্যায়-ঐ)

উপরোক্ত উদ্ধৃতিসমূহের মাধ্যমে ইহুদী এজেন্ডা বাস্তবায়নরত অইহুদী এজেন্টদের পরিচয় হলো তারা দেশের শাসন বিভাগে, পুলিশ বিভাগে, গোয়েন্দা সংস্থায়, সংবাদপত্র শিল্পে, বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে, পুতুল সরকারের অভ্যন্তরে বিশ্ব ব্যাংক, আইএমএফসহ ইহুদী এজেন্ডা বাস্তবায়নরত বিদেশী সংস্থাসমূহের অয়াহুদী কর্মচারীদের মধ্যে, বাক্যবাগীশ রাজনীতিকদের মধ্যে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে থেকে কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

বাংলাদেশের প্রতিটি সেক্টরে দেশবিরোধী, দেশের শান্তি, সমৃদ্ধি ও স্থিতিশীলতা বিনষ্টকারী এজেন্টদের আমরা লক্ষ্য করছি প্রতিনিয়ত। এসব এজেন্ট বমাল ধরা পড়লেও অদৃশ্য হাতের ইশারায় বিনা বিচারে ছাড়া পেয়ে যায়। এরাই সরকারের বিরুদ্ধে, সরকার প্রধানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করে, ষড়যন্ত্রমূলক হামলা পরিচালনা করে যাতে ভীতসন্ত্রস্ত সরকার জনগণের উপর জুলুম নিপীড়ন বাড়িয়ে দেয়, অরাজনৈতিক ঘটনাকে রাজনীতির রঙে রাঙিয়ে দেশপ্রেমিক রাজনীতিকদের হয়রানি ও দমনে কাজ করে। ইহুদী প্রটোকলে রাজনীতি দমনে যে কৌশল লিপিবদ্ধ রয়েছে তা হলো 'রাজনৈতিক অপরাধীদের বীরত্বজনিত সুনাম নষ্ট করার জন্য আমরা তাদের চুরি, হত্যা, খুন-জখম ইত্যাদি ধরনের অভিযোগে বিচার করবো। ফলে জনগণ বিভ্রান্ত হয়ে যাবে এবং সাধারণ চোর-ডাকাতের মতোই রাজনৈতিক অপরাধীদের ঘৃণা করবে।' (প্রটোকল :

www.pathagar.com

রাজনৈতিকদের হয়রানি অধ্যায়) বর্তমান সরকার ও বর্তমান সরকারের আন্দোলনের ফসল মইনুদ্দীন-ফখরুদ্দীন সরকারকে আমরা ইহুদী প্রটোকল অনুযায়ী দেশপ্রেমিক রাজনীতিকদের হয়রানি করতে দেখেছি। এ সরকার সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোরশেদ খানকে হোটেলের ক্যাশ লুট মামলায় আসামি করেছিল, সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীকে গরু চুরি মামলার আসামি করেছিল, সফল শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এহসানুল হক মিলনকে ভ্যানিটি ব্যাগ চুরির মামলায় জেলে পুরেছে এবং জোট সরকারের সফল ও সৎ মন্ত্রী মতিউর রহমান নিজামী ও আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদকে কথিত ও কল্পিত খুন, ধর্ষণ, হত্যা মামলায় জড়ানোর চেষ্টায় মানবতাবিরোধী ট্রাইব্যুনাল গঠন করেছে। বর্তমান সরকার শুধুমাত্র ইহুদী প্রটোকল বাস্তবায়ন করছে না– সরকারের কর্তাব্যক্তিরা ইতিমধ্যে ইহুদী-খ্রিস্টান ও মুশরিকদের সাথে পারিবারিক বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে বাংলাদেশ থেকে ইসলাম, ইসলামী মূল্যবোধ ও ধর্মীয় নেতাদের উৎখাতে প্রকাশ্য তৎপরতা শুরু করেছে।

ইহুদীদের নিজেদের জন্য কাঙ্ক্ষিত শাসন ব্যবস্থা

ক. উপরে যেসব উপায় পন্থা উল্লেখ করা হলো এগুলোর মাধ্যমে আমরা অয়াহুদী সমাজকে এমনভাবে চিৎপটাং করে মাটিতে শুইয়ে দেব যেন তারা বাধ্য হয়ে আন্তর্জাতিক ক্ষমতা আমাদের হাতে তুলে দেয় এবং ধীরে ধীরে বিনা বাধায় আমরা পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতাকে আমাদের নিয়ন্ত্রণে আনয়ন করে একটি বিশ্বজোড়া সুপার গভর্নমেন্ট কায়েম করতে পারি। আজকের শাসকদের স্থলে আমরা এমন একটি ব্যবস্থা স্থাপন করবো, যাকে সুপার গভর্নমেন্টের শাসন ব্যবস্থা বলা যাবে। আমাদের সুপার গভর্নমেন্টের হাত সর্বত্র সাঁড়াশির ন্যায় নির্বিবাদে পৌঁছে যাবে এবং অধীনস্থ বিভিন্ন সংস্থা এমন ব্যাপক ক্ষমতাসম্পন্ন হবে যে, পৃথিবীর বর্তমান রাষ্ট্রগুলোকে পদানত করা আমাদের সুপার গভর্নমেন্টের পক্ষে বিন্দুমাত্র কঠিন হবে না। (প্রটোকল : সর্বময় ক্ষমতায় অধিকারী অদৃশ্য সরকার অধ্যায়)

উল্লেখ্য, ইহুদী প্রটোকলে ৩টি বিশ্বযুদ্ধের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। তন্মধ্যে ১ম বিশ্বযুদ্ধের পর 'লীগ অব নেশনস' প্রতিষ্ঠা করে ইহুদীরা সুপার গভর্নমেন্টের সূচনা করে। ২য় বিশ্বযুদ্ধের পর জাতিসংঘ, বিশ্ব ব্যাংক, আইএমএফ গঠন করে ইহুদীরা সুপার গভর্নমেন্টের একটি দৃশ্যমান প্লাটফর্ম তৈরি করে। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাধ্যমে অয়াহুদী জাতিগুলো শক্তিহীন হয়ে পড়লে ইহুদীরা ইহুদী ধর্মভিত্তিক একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করবে, যার প্রধান হবে হযরত দাউদ আঃ-এর বংশের এবং যার পদ হবে বাদশাহ। ইহুদীরা নিজেদের কল্যাণের জন্য নিজেদের ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র চায় এবং উক্ত রাষ্ট্রের কাঠামো হবে প্রেসিডেন্সিয়াল সিস্টেমের। উক্ত বাদশাহ বা

www.pathagar.com

প্রেসিডেন্ট হবেন সর্বময় ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি। অর্থাৎ তিনিই পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের প্রধান নির্বাহী হবেন।

খ. আমাদের রাজ্যে ক্ষমতাসীন হবার পর অন্যান্য কোনো ধর্মের অস্তিত্ব আমরা বরদাস্ত করবো না। কেননা বিধাতার মনোনীত জাতি হিসেবে আমরাই পৃথিবীর মানুষের শাসক এবং আমাদের মনিব হবেন স্বয়ং বিধাতা। তাই আমরা অন্যান্য যাবতীয় ধর্মমত মুছে দেব। যদি এ ব্যবস্থার ফলে নাস্তিকতার জন্ম হয় তবে এটা একটা অস্থায়ী ব্যাপার হবে এবং আমাদের মতবাদ প্রচারে কোনো বাধা সৃষ্টি করতে পারবে না। (প্রটোকল : দাসত্বের নয়ারূপ অধ্যায়)

গ. একমাত্র নিরঙ্কুশ ক্ষমতাপ্রাপ্ত শাসকের পক্ষেই সুষ্ঠু ও বিস্তারিত পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং রাষ্ট্রযন্ত্রের বিভিন্ন অংশের উপর সে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের দায়িত্ব বণ্টন সম্ভব। আমরা তাই এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, সকল দেশের জন্যই উত্তম শাসন ব্যবস্থা হচ্ছে একজন মাত্র দায়িত্বশীল লোকের হাতে সর্বময় ক্ষমতা কেন্দ্রীভূতকরণ। সর্বাত্মক শাসন ক্ষমতা ছাড়া কোনো সভ্যতাই টিকতে পারে না। কেননা জনসাধারণ সভ্যতার ধারক-বাহক নয় বরং তাদের পরিচালকগণই সভ্যতার প্রকৃত সংরক্ষক। (প্রটোকল : ষড়যন্ত্রের সর্বমুখী জাল অধ্যায়)

ঘ. আমাদের ধর্মরাজ্যে এক কোটি হাতের প্রতিটিতে সমাজযন্ত্রের এক একটি সূত্র থাকবে। আমরা সরকারি পুলিশ বাহিনীর সহায়তা ছাড়াই সকল বিষয় অবলোকন করতে পারবো। আমরা অয়াহুদী রাষ্ট্রে পুলিশ বাহিনীর জন্য যেসব কর্তব্য নির্ধারণ করে দিয়েছি তার ফলে অয়াহুদী শাসকগণ রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে সরাসরি কোনো তথ্য অবগত হতে পারবে না। আমাদের কর্মসূচি মোতাবেক রাজ্যের এক-তৃতীয়াংশ অধিবাসী অবশিষ্ট লোকদের তৎপরতা ও কার্যকলাপের উপর নজর রাখবে। (প্রটোকল : আইন, ব্যবসা, ধর্ম ও গুপ্তচরবৃত্তি অধ্যায়)

ঙ. আমাদের শাসন ব্যবস্থার যে বাহ্যিক রূপটি অতি সযত্নে সকলের সামনে তুলে ধরা হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, আমাদের শাসক তার নিজের বা বংশের কল্যাণের খাতিরে কোনো কিছুই করবেন না। যা করবেন সবই জাতির জন্য। এ জন্যই তার শাসন কর্তৃত্ব সর্বত্র সমাদৃত হবে, জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার হেফাজতে কাজ করবে। (প্রটোকল : রক্ষা ব্যবস্থার গুপ্ত রহস্য অধ্যায়)

চ. আমাদের শাসন ব্যবস্থার শাসনকর্তা আইনসঙ্গতভাবেই বিশ্বাস করবেন যে, রাষ্ট্রের সবকিছুই তার মালিকানাধীন। আর বিশ্বাসকে ইচ্ছা করলেই বাস্তবায়ন করা যায়। রাষ্ট্রের সর্বত্র সম্পদের আবর্তনের উদ্দেশ্যে তিনি সকল প্রকারের অর্থসম্পদ বাজেয়াপ্তের অধিকারী হবেন। এরপর সম্পদের উপর প্রগতিশীল পন্থায় কর ধার্য করার নীতি অবলম্বন করা হবে।

www.pathagar.com

ছ. রাষ্ট্রীয় তহবিলের প্রতি যার কোনো লোভ নাই তিনিই হবেন মালিক বা শাসক। তাই তার ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণে সম্পদের অপচয় ও অপহরণ বন্ধ হতে বাধ্য। বিভিন্ন ধরনের অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে যোগদান করার দরুন রাষ্ট্র প্রধানের অনেক সময় অহেতুক নষ্ট হয়ে যায়। এ জন্য আমরা এসব অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেব যেন শাসনকর্তা রাষ্ট্রযন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার জন্য বেশি সময় কাজে লাগাতে পারেন। তার শাসনক্ষমতা বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করে এমনসব লোকদের হাতে তুলে দেয়া হবে না, যারা জাঁকজমক দেখাবার উদ্দেশ্যে শাহী তখতের আশপাশে ঘোরাফেরা করে এবং নিজেদের স্বার্থের চিন্তায় নিমগ্ন থাকে। (প্রটোকল : অর্থনৈতিক চালবাজী অধ্যায়)

জ. আমরা কখনো অর্থ সম্পদের আবর্তন বন্ধ করে পুঞ্জীভূত করা বরদাস্ত করতো না। এ জন্যই রাষ্ট্র কর্তৃক কোনো সুদী কাগজ জারি করা হবে না। তবে শতকরা মাত্র ১% হারে কিছু কাগজ চলতে পারে। এ পদক্ষেপের ফলে রক্তপিপাসু জোঁক রাষ্ট্রের সমগ্র শক্তি শোষণ করে নেয়ার সুযোগ পাবে না। সুদী কাগজ জারি করার অধিকার একমাত্র শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে দেয়া হবে। কারণ লাভের অংশ থেকে সুদ পরিশোধ করা তাদের পক্ষে মোটেই কঠিন হবে না। অপরদিকে রাষ্ট্র কখনো ঋণ গ্রহণ করে শিল্প প্রতিষ্ঠানের মতো সুদ আদায় করতে পারে না। কেননা রাষ্ট্র নিজের কাজে খরচ করার জন্য ঋণ গ্রহণ করে ব্যবসা করার জন্য নয়। ...অয়াহুদী সমাজ যতদিন স্বাধীন ছিল ততদিন তাদের মধ্যে এসব দোষ থাকা আমাদের জন্য সুবিধাজনক ছিল। কিন্তু আমাদের শাসন ব্যবস্থায় এরূপ দোষ-ত্রুটি কেনোভাবেই প্রশ্রয় পাবে না।

ঝ. আজাদী কল্যাণকর হতে পারে এবং রাষ্ট্রীয় অর্থব্যবস্থা জনগণের ক্ষতি করার পরিবর্তে উপকার করতে পারে যদি আজাদী আন্দোলনের ভিত্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান ও মানব জাতির পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের উপর স্থাপিত হয়। সকলের সমানাধিকারের দাবিই হচ্ছে সকল অনর্থের মূল। কেননা সৃষ্টিকর্তাই কোনো মহলকে কোনো মহলের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। উপরোল্লিখিত ঈমানের জোরেই মানুষকে ধর্ম নেতাদের অভিভাবকত্বে সহজে শাসন করা সম্ভব। পৃথিবীর উপর আল্লাহর সর্বময় কর্তৃত্ব স্বীকার করে নিয়ে আধ্যাত্মিক ক্ষমতাসম্পন্ন নেতাদের হাতে আত্মসমর্পণ করে মানুষ পরিপূর্ণ তৃপ্তিলাভ করতে পারে। (প্রটোকল : ঈমান করণ অধ্যায়)

ইহুদীরা নিজ জাতির জন্য সবচেয়ে কল্যাণকর শাসন চায় পক্ষান্তরে অ-ইয়াহুদীদের জন্য সবচেয়ে অকল্যাণকর শাসন চায় যাতে অয়াহুদীদের অস্থিতিশীলতা ও অশান্তির হাত থেকে রক্ষা পেতে ইহুদীদের গঠিত সুপার গভর্নমেন্টের নিকট আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়। ইহুদীদের কাঙ্ক্ষিত শাসন হলো–আধ্যাত্মিক ক্ষমতাসম্পন্ন এবং নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী একজন ন্যায়পরায়ণ

www.pathagar.com

প্রেসিডেন্ট বা বাদশা যিনি হবেন ইহুদী ধর্ম রাষ্ট্রের প্রধান, যিনি হবেন নির্লোভ এবং ব্যক্তিগত সম্পদ থেকে মুক্ত। ইহুদী রাষ্ট্রই হবে তার সম্পদ।

অয়াহুদী শাসন ব্যবস্থা ধ্বংসে ইহুদী নীতি কৌশল

ধর্মীয়ভাবে ইহুদীরা বিশ্বাস করে যে, ইহুদীরাই পৃথিবীতে আল্লাহর মনোনীত সর্বোত্তম জাতি। পৃথিবীর সকল সম্পদ ও শাসন ক্ষমতার অধিকারী একমাত্র ইহুদী জাতি। এ জন্য অয়াহুদী সকল জাতিসমূহের সম্পদ ও শাসনক্ষমতা কেড়ে নিয়ে নিজেদের আয়ত্তে আনা তাদের ধর্মীয় কর্তব্য। এ বিশ্বাসের বাস্তবায়নার্থে ইহুদীরা বিগত আড়াই হাজার বছর যাবত নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। অয়াহুদী জাতিসমূহ ধ্বংসের লক্ষ্যে ইহুদীদের প্রধান প্রধান কর্মসূচিসমূহ নিম্নরূপ :

ক. অ-ইয়াহুদীদের ধর্মহীন করা এবং ধর্মীয় শাসন ব্যবস্থা থেকে বঞ্চিত করে সীমাহীন দুর্ভোগে পতিত করা যাতে অ-য়াহুদীরা শেষ পর্যন্ত ইহুদীদের নিকট আত্মসমর্পণ করে।

খ. অইয়াহুদীদের ঐক্যকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা

ঐক্যবদ্ধ অ-ইয়াহুদীরা ইহুদী আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নে সবচেয়ে বড় বাধা। এ জন্য অইয়াহুদীদের ঐক্য নষ্ট করে পারস্পরিক হানাহানিতে লিপ্ত করে দুর্বল বা ধ্বংস করার জন্য ইহুদীরা ঐক্যের সকল প্রধান প্রধান সূত্র ধ্বংসে দীর্ঘদিন কাজ করে যাচ্ছে। প্রত্যেক জাতির ঐক্যের প্রধান প্রধান সূত্রসমূহ হচ্ছে ধর্ম, পরিবার, গোত্র, রাজতন্ত্র, নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী প্রেসিডেন্ট বা বাদশা, ধর্মীয় শাসন, গোত্রীয় শাসন, রাজতান্ত্রিক শাসন। এ সকল সূত্রসমূহকে সমূলে উৎখাত করার জন্য ইহুদীরা বিভিন্ন ধর্মে ধর্মীয় ফের্কা, গ্রুপ, উপগ্রুপ সৃষ্টি করেছে। জনগণকে ধর্মবিমুখ করার যাবতীয় উপায়-উপকরণ কাজে লাগিয়েছে। গোত্রীয় শাসন ও রাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা উৎখাতের জন্য বিভিন্ন মতবাদ প্রচার ও কার্যকর করেছে। সমানাধিকার, উদারতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের শ্লোগান, ভাষা, অঞ্চল ও ভূখণ্ডভিত্তিক জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র ও ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদী মতবাদ ইহুদী কর্তৃক রচিত। সার্বজনীন ভোটাধিকারের প্রচলনের মাধ্যমে ইহুদীরা সকল মানুষকে সমান করার মন্ত্রণা দিয়ে জাতিসমূহের শিক্ষিত, বুদ্ধিমান ও অভিজাত শ্রেণীকে ধ্বংস করে তদস্থলে অর্ধশিক্ষিত, অনভিজ্ঞ মাথামোটা বদমায়েশদেরকে ক্ষমতাসীন করে জাতিসমূহকে শোচনীয় পরিণতির পথে পরিচালনা করছে। জাতির প্রতিরোধ শক্তি ও ঐক্যের প্রধান প্রধান সূত্রসমূহ কর্তন করছে। জাতির অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও সম্ভাবনা ধুলিসাৎ করে বিশ্বব্যাপী দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করেছে এবং পারস্পরিক শত্রুতা সৃষ্টি করে অইয়াহুদী জাতিসমূহকে যুদ্ধাবস্থায় লিপ্ত রেখেছে।

www.pathagar.com

গ. অ-ইয়াহুদীদের পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র ভেঙে দেয়া

ইহুদী প্রটোকলে রয়েছে 'সার্বজনীন সমনাধিকার হচ্ছে সকল অনর্থের মূল'। ইহুদীরা নিজেদের ক্ষেত্রে এ বিষয়টি মেনে চলে কিন্তু অইয়াহুদী সমাজকে ধ্বংস করার জন্য সাম্যবাদ ও সমানাধিকারের শ্লোগান তোলে যাতে অয়াহুদী সমাজ এরূপ প্রকৃতিবিরুদ্ধ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে গিয়ে ভেঙে যায়। আমরা জানি, নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে ইলেক্ট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন ঘোরে। এর মাধ্যমেই পরমাণু, অণু ও বস্তুর সৃষ্টি। ঠিক তদ্রূপ পরিবার প্রধানকে ঘিরে পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা ঐক্যবদ্ধ থাকলে সুন্দর ও সুস্থ পরিবার ব্যবস্থা, সমাজের প্রধানকে ঘিরে পরিবারসমূহের ঐক্যের মাধ্যমে গঠিত হয় সুশঙ্খল সমাজ, রাষ্ট্র প্রধানকে ঘিরে সুশৃঙ্খল সমাজের ঐক্যের মাধ্যমে সৃষ্টি হয় শান্তিপূর্ণ ও শক্তিশালী রাষ্ট্র। এরূপ রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাহী যদি সৎ, নির্লোভ, বিচক্ষণ, নীতিবান ও সাহসী হয় তবে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র ব্যবস্থা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে মানব সভ্যতাকে বহুদূর এগিয়ে নিয়ে যায় এবং সমাজের সর্বত্র শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহুদীরা যেহেতু অয়াহুদীদের শান্তি ও সমৃদ্ধি চায় না সেহেতু তারা অয়াহুদীদের পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে ভাঙার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এর পদ্ধতিসমূহ সংক্ষেপে নিম্নরূপ :

পরিবার প্রথায় ভাঙন : ইতোমধ্যে পাশ্চাত্য দেশসমূহে পরিবার প্রথা প্রায় নিঃশেষ হতে চলেছে। এ পরিবার প্রথা ভেঙে দেয়ার জন্য য়াহুদীরা পাশ্চাত্যে সমানাধিকারের ধুয়া তুলে পাশ্চাত্যের নারীদেরকে ঘর থেকে বের করে আনতে সক্ষম হয়েছে। এ জন্য য়াহুদীরা উক্ত দেশে অপসংস্কৃতি হিসাবে মাদক, বেলেল্লাপনা, দেহব্যবসা, লিভ টুগেদার, সমকাম ও সমলিঙ্গ বিবাহকে সরকারিভাবে আইনসিদ্ধ করেছে। পাশ্চাত্যের প্রত্যেক দেশে এবং বর্তমানে প্রাচ্যেও নারী অধিকারের নামে নারী নির্যাতন বিরোধী কঠোর আইন পাস করেছে কিন্তু নারী কর্তৃক পুরুষ নির্যাতনের বিরুদ্ধে কোনো আইন করা হয়নি। ফলে প্রকৃতি বিরোধী এই নীতি পাশ্চাত্য পরিবার প্রথাকে নিঃশেষ করে দিয়ে প্রাচ্যকেও একই সমতলে আনার প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছে। দেশের যদি একজন প্রধান না থাকে তবে দেশ যেভাবে বিশৃঙ্খলার মাধ্যমে ধ্বংস হয়ে যাবে ঠিক তদ্রূপ পরিবারের যদি একজন প্রধান না থাকে তবে সে পরিবারও শৃগাল-কুকুরের পরিবারের ন্যায় বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত হতে বাধ্য। কিন্তু সমানাধিকার নীতি মানতে গেলে পরিবারের প্রধান থাকার কোনো পথ খোলা থাকে না। বাস্তবিকভাবে স্রষ্টার বিধান অনুযায়ী সৃষ্টিকূলের সকল প্রাণীকুলে পুরুষরাই নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল। পাশ্চাত্যের পুরুষরা ব্যতিত প্রাচ্যের পুরুষরাও নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল। কেউ কি কখনও দেখেছে মুরগি-মোরগের উপর কর্তৃত্ব করতে অথবা ষাঁড় গাভীর নেতৃত্ব মেনে নিয়েছে? বিধাতার নিয়ম যারা ভাঙবে তাদেরকে অবশ্যই এর মাশুল দিতে হবে।

পরিবার প্রথা ভাঙার নিয়মসমূহ : বর্তমান বিশ্ব ইহুদীদের গোপন ষড়যন্ত্র

www.pathagar.com

অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে অথবা পৃথিবীর বর্তমান মোড়লগণ মূলত ইহুদী এজেন্ডা বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে। তাই বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী পলিসির মাধ্যমে পরিবারসমূহকে ভাঙা সম্ভব না হলে উক্ত দেশের উপর যুদ্ধ চাপিযে দিয়ে হলেও পরিবার প্রথা ভাঙার কাজ করা হচ্ছে। ফিলিস্তিন, ইরাক, আফগানিস্তানের দিকে তাকিয়ে দেখুন। সেখানে ভয়াবহ অমানবিক যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়ে উক্ত দেশসমূহকে পুরুষশূন্য করা হচ্ছে, জনগণকে বাস্তুচ্যুত করে বিধবা ও এতিম নারীদেরকে ঘরের বাইরে এনে বেশ্যাবৃত্তিতে ও নেশায় লিপ্ত করেছে। চরিত্র নষ্ট করা এসব নারী-পুরুষকে দিয়ে পর্যায়ক্রমে পরিবার ভাঙার কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

বাংলাদেশে পরিবার ভাঙার ইহুদী বা পাশ্চাত্য কর্মসূচি

আমাদের দেশে চিন্তাশীল সমাজ বিজ্ঞানী আছে কিনা আমার জানা নেই। থাকলেও উক্ত সমাজবিজ্ঞানীরা এ দেশের পরিবার প্রথা রক্ষায় দৃশ্যমান কোনো কর্মসূচি গ্রহণ করেছে বলে আমার জানা নেই। অথচ ১৯৭১ পরবর্তী সময় থেকে এদেশে পাশ্চাত্য প্রভাব দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং অনেক পরিবার ইতোমধ্যে ভেঙেছে এবং অসংখ্য পরিবারে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। এভাবে চলতে থাকলে আগামী ২০ বছরের মধ্যে এ দেশের পরিবারসমূহ তীব্র গতিতে ভেঙে পড়বে। পরিবার ভাঙার প্রধান প্রধান কর্মসূচিসমূহ নিম্নরূপ :

আকাশ সংস্কৃতি : ডিশ কালচারের কারণে এ দেশের মহিলারা প্রতিনিয়ত হিন্দী ও ইংরেজি সংস্কৃতি প্রত্যক্ষ করছে। এতে করে অনেকে পাশ্চাত্যের ন্যায় তথাকথিত সমনাধিকার ও বেলেল্লাপনায় আসক্ত হয়ে পরিবার ভাঙার কার্যক্রম শুরু করেছে।

সংবাদপত্র, টিভি, নাটক ও সিনেমা : এ দেশের সংবাদপত্র শিল্পের অধিকাংশ বিদেশী ভাবধারা পুষ্ট, ক্ষেত্রবিশেষে ইহুদী ও ভারতীয় লবির সাথে সম্পৃক্ত। ফলে এ সকল সংবাদপত্রের মাধ্যমে দিন দিন আমাদের পারিবারিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ হারিয়ে যাচ্ছে এবং হিন্দী ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির বেলেল্লাপনা নতুন প্রজন্মকে গ্রাস করছে। ৯০-এর দশকে এ দেশের টিভি নাটকসমূহে কিছুটা সৃজনশীল উপাদান বিদ্যমান ছিল কিন্তু বিগত এক দশকের নাটকসমূহে পাশ্চাত্যের জিউস-আফ্রিদী ও হিন্দু সংস্কৃতির রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের ধারায় সিক্ত হচ্ছে। ফলে উঠতি বয়সী যুবক-যুবতীরা দেখছে, জীবন মানে নারী-পুরুষের ঢলাঢলি মাত্র। জীবনের অন্য কোনো মহৎ উদ্দেশ্য নেই। অথচ ভারতীয় বাংলা নাটকসমূহ এর ব্যতিক্রম। ভারতের বাংলা নাটকে দেশপ্রেম রয়েছে, জীবন যুদ্ধের বিভিন্ন সংকট, সমস্যা ও সংকট উত্তরণের দিক নির্দেশনা রয়েছে।

সিনেমা বর্তমানে জাতির মানস গঠনের সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম। পাশ্চাত্যের প্রতিটি দেশে জাতীয় মানস গঠনের কাজে সিনেমাকে প্রধান উপাদান

www.pathagar.com

হিসেবে প্রাধান্য দেয়া হয়। যুক্তরাষ্ট্রের হলিউডে নির্মিত প্রত্যেকটি চলচ্চিত্রকেই পেন্টাগনের সম্মতি আদায় করতে হয়। উন্নত দেশসমূহে সিনেমার মাধ্যমে জাতীয় মানস গঠন করা হয়। জাতীয় শত্রু-মিত্র চিহ্নিত করা হয়, জাতির ভবিষ্যৎ লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে জাতির সামনে তুলে ধরা হয় এবং ভবিষ্যতে জাতির স্বরূপ কি হবে তা সিনেমার মাধ্যমে দিক-নির্দেশনা দেওয়া হয়। ভারতীয় হিন্দী সিনেমাসমূহ এবং ইরানী সিনেমা ও নাটকসমূহ জাতীয় মানস গঠনে স্ব স্ব দেশের জনমনে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করছে।

আমাদের বাংলাদেশের নাটক-সিনেমাসমূহ সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। এ দেশের বর্তমানে প্রদর্শিত নাটক-সিনেমাসমূহের অধিকাংশই জাতীয় মানসকে সঠিক দিক নির্দেশনার পরিবর্তে বিভ্রান্ত করছে। ভারতীয় নাটক-সিনেমায় সে দেশের জাতীয় শত্রুমিত্র চিহ্নিত করার জন্য ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের নায়কদের নিয়ে, চীন-ভারত যুদ্ধের নায়কদের নিয়ে, '৬৫ সালের ও '৭১ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের নায়কদের নিয়ে অসংখ্য নাটক-সিনেমা নির্মিত ও প্রদর্শিত হয়েছে। এতে ভারতীয় জাতি তাদের ঐতিহাসিক শত্রু-মিত্র চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছে এবং শত্রুদের বিরুদ্ধে জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে ভারতীয় স্বাধীনতার চেতনাকে সমৃদ্ধ করেছে। ফলে শত বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও ভারত সম্মুখপানে এগিয়ে চলেছে। পক্ষান্তরে বাংলাদেশের নাটক-সিনেমায় আমাদের ১৭৫৭-১৯৪৭ সময়কার শত্রু-মিত্রদের ব্যাপারে কোনো কথা নাই, জাতীয় জীবনের অগ্রগতির নায়ক ও পরাজয়ের সাথে জড়িত ভিলেনদের চিহ্নিত করে কোনো সিনেমা করা হয় নাই, '৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের নায়কদের নিয়ে কোনো সিনেমা-নাটক করা হয় নাই, দেশের এক-দশমাংশ ভূখণ্ড রক্ষায় আমাদের বীর সেনাবাহিনীর গৌরব গাথা নিয়ে কোনো সিনেমা-নাটক নির্মিত হয়নি, রৌমারী-বড়াই বাড়িতে আমাদের বিজয় সম্পর্কে কোনো নাটক-সিনেমা নির্মিত হয়নি। ফলে সমগ্র জাতি নিজেদের স্থায়ী শত্রু-মিত্র চিহ্নিত করে নিজেদের করণীয় সম্পর্কে ঐকমত্যে পৌঁছতে ব্যর্থ হচ্ছে। এছাড়া ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের উপর যেসব নাটক-সিনেমা নির্মিত হচ্ছে তাও দলীয় ও গোষ্ঠীগত সংকীর্ণতায় সাম্রাজ্যবাদী এজেন্ডা বাস্তবায়নের হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। সর্বোপরি এ দেশের অনেক রাজনৈতিক ও পেশাজীবী পরিবার আমাদের জাতির শত্রুস্থানীয় জাতিসমূহের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে জাতিকে আরও বিপদের সম্মুখীন করছে।

এভাবে ইহুদী প্রটোকলের গোপন হাতের কারসাজিতে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা, সাহিত্য, নাটক ও সিনেমা জাতীয় সংহতিকে দৃঢ় করার পরিবর্তে জাতিকে দ্বিধাবিভক্ত করছে, জাতীয় মানস ও মেধাকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থেকে সরিয়ে হালকা ও অপ্রয়োজনীয় বিষয়ের প্রতি ধাবিত করছে। ফলে জাতি লক্ষ্য-উদ্দেশ্যহীন যাত্রায় নিমজ্জিত হয়েছে।

www.pathagar.com

ঘ. শিক্ষায় ও চাকরিতে মেয়েদেরকে বাড়তি সুবিধা প্রদান : ইহুদীদের ঘনিষ্ঠ মিত্র ভারতীয় শাসকগোষ্ঠীর নেপথ্য সহযোগিতায় ক্ষমতাসীন হওয়া এরশাদের শাসন আমল থেকে এ দেশের শিক্ষা ও সমাজবিরোধী পদক্ষেপসমূহের মধ্যে অন্যতম পদক্ষেপসমূহ হলো শিক্ষাক্ষেত্রে মেয়েদেরকে এবং সংখ্যালঘু ধর্মীয় গোষ্ঠীকে শিক্ষায় ও চাকরিতে অতিরিক্ত সুবিধা প্রদান। উপরোক্ত দুটি পদক্ষেপের বিষময় ফল দেশবাসী ইতোমধ্যে প্রত্যক্ষ করছে। তা হলো :

গ্রামাঞ্চলের মেয়েদেরকে শিক্ষা ভাতা প্রদান করায় ইতোমধ্যে সমগ্র দেশের বিদ্যালয়সমূহে ৬৫% মেয়ে এবং ৩৫% ছেলে অধ্যয়নরত আছে। তদুপরি সরকারি কলেজসমূহে মেয়েদের ভর্তি কোটা ৬০% করায় অনেক মেধাবী ছাত্র উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। চাকুরির ক্ষেত্রেও মেয়েদেরকে প্রাধান্য দেয়ায় সমাজে বিশৃঙ্খলা শুরু হয়েছে। বিশৃঙ্খলার ধরনটি হলো মেয়েরা শিক্ষিত হচ্ছে, চাকুরি পাচ্ছে অথচ ছেলেরা অশিক্ষিত থেকে যাচ্ছে এবং বেকার থাকতে বাধ্য হচ্ছে। এমতাবস্থায় শিক্ষিত মেয়ের সাথে অশিক্ষিত ছেলের বিয়ে হচ্ছে না। হলেও সংসারে অশান্তির সৃষ্টি হচ্ছে, চাকুরীজীবী মেয়ে বেকার যুবককে বিয়ে করতে রাজী হচ্ছে না, বিয়ে হলেও উক্ত সংসারে অশান্তির আগুন জ্বলছে অথবা সংসার ভেঙে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় অসংখ্য শিক্ষিত মেয়ে বর্তমানে যোগ্য বরের অভাবে অবিবাহিত থেকে যাচ্ছে এবং অনেকে বেআইনি কাজে লিপ্ত হতে বাধ্য হচ্ছে। বিগত দশকসমূহে গার্মেন্টস শিল্পসমূহে অধিকাংশ মেয়েরা চাকুরী পেয়েছে কিন্তু ইহুদীদের কারসাজিতে সৃষ্ট বিশ্ব মন্দায় অসংখ্য গার্মেন্টস শিল্প বন্ধ হয়ে যাওয়ায় উক্ত বেকার মেয়েরা না পারছে শহরে থাকতে না পারছে গ্রামে ফিরে যেতে। এমতাবস্থায় শহরের অলি-গলিতে গজিয়ে উঠছে বিভিন্ন ছদ্মবেশী পতিতালয়। এ সকল বেকার মেয়েদের অনেকেই শহরে থাকার জন্য দেহ ব্যবসায় লিপ্ত হতে বাধ্য হচ্ছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে দীর্ঘদিন যাবত মেয়েদেরকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হচ্ছে বিশেষ সুবিধা দিয়ে। বিশেষ ধর্মের নারীদেরকে এক্ষেত্রে অঘোষিতভাবে প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে। ফলে প্রাইমারী স্কুলগুলোতে শিক্ষার মান অত্যন্ত নিচে নেমে গেছে। স্কুল চলাকালীন অফিসে বসে মাথায় উকুন চাওয়া ও কাঁথা সেলাইয়েরত অবস্থায় দেখা যায় অনেক শিক্ষয়িত্রীকে। বর্তমানে অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পুরুষ-মহিলা শিক্ষকের হার ২:৫-এ উন্নীত হয়েছে। এমতাবস্থায় যারা নিজেদের ছেলেমেয়েদেরকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করতে চান তারা বাধ্য হয়ে শহরের বেসরকারি স্কুলের দ্বারস্থ হতে বাধ্য হয়েছেন।

উপরোক্ত পারিবারিক ও সামাজিক শৃঙ্খলা ও সংস্কৃতি বিরোধী কার্যক্রমের নেপথ্য পরিচালক জায়ানবাদী ইহুদীরা, প্রকাশ্য পরিচালক হচ্ছে বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ ও তাদের পরিচালিত বিভিন্ন এনজিওসমূহ। উভয় শক্তির এজেন্ডা

www.pathagar.com

বাস্তবায়নকারীরা হচ্ছে অইয়াহুদী দেশসমূহের অর্বাচীন, মাথামোটা, অদূরদর্শী নেতানেত্রীগণ।

অয়াহুদীদের সমাজ ও সামাজিক শৃঙ্খলা নষ্টের ইহুদী কর্মসূচি

অভিজাত ও শিক্ষিত শ্রেণীকে নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দেয়া : এই অপকর্মটি ব্যাপকভাবে শুরু হয় ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে এবং স্বাধীনতা অর্জনের অব্যবহিত পরবর্তী সময়ে। পাকিস্তান সরকার পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য স্বাভাবিকভাবেই নির্বাচিত স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি ইউপি মেম্বার ও ইউপি চেয়ারম্যানদেরকে বিভিন্ন দায়িত্ব প্রদান করে। নিরীহ জনগণ যাতে হয়রানির শিকার না হয় সে জন্য এ সকল জনপ্রতিনিধির অনেকেই তখন সরকারি নির্দেশে গঠিত শান্তি কমিটির কোনো না কোনো দায়িত্ব গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য জনগণকে উত্তেজিত করে দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে কোনো কোনো নেতা পাকিস্তানিদের হেফাজতে স্বেচ্ছায় ধরা দেয় এবং বেশির ভাগ নেতা ২৫ মার্চের পরই জনগণের জন্য কোনো প্রকার দিক-নির্দেশনা না দিয়েই ভারতে পালিয়ে যায়। ফলে যেসব সমাজনেতা ও জনতা স্বদেশে অবস্থান করে মুক্তিযুদ্ধাদেরকে আশ্রয় দিয়েছিল, খাবার সরবরাহ করেছিল এবং শান্তিরক্ষার্থে তৎকালীন সরকারের সাথে সুসম্পর্ক রাখতে বাধ্য হয়েছিল তারা স্বাধীনতার পর পর শত্রু হিসেবে চিহ্নিত হয় এবং চরম দুর্ভোগের শিকার হয়ে হত্যা, নির্যাতন ও লুণ্ঠনের শিকার হয়। অথচ উক্ত সময়ে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের বেশির ভাগই ছিল অভিজাত ও শিক্ষিত শ্রেণীর লোক। তারাই সমাজে, গ্রামে, ইউনিয়নে বিচার-আচার করতো, জনসেবা করতো এবং সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় প্রধান ভূমিকা পালন করতো। যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিটি এ দেশের উন্নয়ন, সমৃদ্ধি ও শান্তি চায় না তাদের মদদে একশ্রেণীর শরণার্থী ও মুক্তিযোদ্ধারা এসব অভিজাত জনপ্রতিনিধিদেরকে জুলুম, নির্যাতন ও হত্যার মাধ্যমে দেশকে নেতৃত্ব শূন্য করে এবং ইহুদী প্রটোকলের সূত্র অনুযায়ী স্থানীয় সরকারের কর্তৃত্ব অভিজাত ও শিক্ষিত শ্রেণীর হাত থেকে বদমাশ শ্রেণীর নেতৃত্বে স্থানান্তরিত হয়। ভারতের দেরাদুনে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ভারতীয় এজেন্ডা বাস্তবায়নে গঠিত মুজিব বাহিনী স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালীন পাকিস্তানি বাহিনী বা রাজাকারদের সাথে কোনো সম্মুখযুদ্ধে লিপ্ত হয় নাই। সে সময় তাদের মূল কাজ ছিল দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধা নিধন ও দেশকে নেতৃত্বশূন্য করার জন্য অভিজাত ও শিক্ষিত নেতৃবৃন্দকে হত্যা করা। তখন থেকে অদ্যাবধি বেশির ভাগ স্থানীয় নেতৃত্বের পদ দখলে রেখেছে চোর, ডাকাত, খুনি, দাগী অপরাধী ও সমাজ বিরোধী লোকেরা। ফলে স্বাধীনতার পর থেকে কখনও সমাজে ও দেশে স্থায়ীভাবে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। পর্যায়ক্রমে ভদ্র ও শিক্ষিত ব্যক্তিরা স্থানীয় সরকার ও রাজনীতি থেকে দূরে সরে গেছে।

www.pathagar.com

বহু বিবাহ ও দাস প্রথা বন্ধ করা : দাস-দাসী রাখার পদ্ধতি বাহ্যিকভাবে অমানবিক মনে হলেও সামাজিক শৃঙ্খলা, সমৃদ্ধি ও স্থিতিশীলতা রক্ষায় এর গুরুত্ব অপরিসীম। রসুল করিম (সা.) দাস প্রথাকে নিরুৎসাহিত করেছেন কিন্তু নিষিদ্ধ করেননি। মুসলমান খলিফা ও রাজা বাদশাগণ দাস-দাসীদের সাথে মুক্ত মানুষের ন্যায় আচরণ করতেন এবং দাসদাসীদেরকে শিক্ষা-দীক্ষায় প্রশিক্ষিত করে যোগ্যতা অনুযায়ী রাষ্ট্রের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ দিতেন এবং মুক্তি দিতেন। এ জন্য ইসলামের ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই অসংখ্য দাস মিসরে, তুরস্কে ও ভারতবর্ষে সর্বোচ্চ শাসক পদে অধিষ্ঠিত হয়ে যোগ্যতার সাথে দেশ পরিচালনা করতে। এ জন্য ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী ও আচরণের মাধ্যমে দাসদাসী প্রথা মানবতার জন্য কল্যাণকর একটি প্রথা হিসেবে গণ্য করা যায়। ইহুদী প্রভাবান্বিত পাশ্চাত্য সভ্যতাকে গ্রহণ করতে গিয়ে আমরা সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষার এই প্রথাটি বর্জন করায় বর্তমানে অসহায় লোকগুলো ফুটপাতে, রেলস্টেশনে, বসবাস-অযোগ্য, অস্বাস্থ্যকর ঘিঞ্জি বস্তিতে বাস করতে বাধ্য হচ্ছে এবং অসংখ্য সামাজিক ও রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও অপরাধের জন্ম দিচ্ছে। বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমরা দেখতে পাই এ দেশের লাখ লাখ নারী-পুরুষ সহায়-সম্বলহীন ও আশ্রয়হীন হয়ে প্রচণ্ড গরম, শীত ও বৃষ্টিতে খোলা আকাশের নিচে দিবারাত্রি অবর্ণনীয় দুঃখ ভোগ করছে। অথচ দাসদাসী প্রথা চালু থাকলে টোকাই, পথশিশু বা ছিন্নমূল সমাজের অস্তিত্ব থাকতো না। এ সকল ছিন্নমূল মানুষগুলো ধনীদের গৃহে দাসদাসীরূপে প্রতিপালিত হতো এবং নিজেদের যোগ্যতা অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে প্রতিষ্ঠিত হতে পারত। ফলে সমাজ ও দেশ সন্ত্রাস, বেশ্যাবৃত্তি ও এইডসের ন্যায় ভয়াবহ যৌন রোগসমূহ থেকে অনেকাংশে মুক্ত থাকতো।

বহুবিবাহ প্রথা ইসলামে জায়েজ। আমরা পাশ্চাত্যকে অনুকরণ করতে গিয়ে আল্লাহর দেয়া বিধানকে রদ করে আইন প্রণয়ন করেছি। এতে কি সমাজের লাভ হয়েছে? এই প্রথা চালু থাকলে হোটেলে-মোটেলে অলিতে-গলিতে বেশ্যাখানা গজিয়ে উঠত না, যৌন হয়রানি, যৌন নির্যাতন, যৌন অপরাধ অনেকাংশে হ্রাস পেয়ে সামাজিক শৃঙ্খলা ফিরে আসত। অসহায় বিধবা ও অবিবাহিত নারীরা শান্তির আবাস ভূমির মালিক হতো। অথচ বর্তমানে ইহুদী প্রভাবিত পাশ্চাত্যকে অনুসরণ করতে গিয়ে বহুবিবাহ প্রথা বাদ দিয়ে লিভ টুগেদার করা হয়। যত্রতত্র গজিয়ে উঠা বেশ্যালয়, হোটেল, ক্যাসিনো ও নাইট ক্লাবে গিয়ে অসংখ্য লোক যৌনক্ষুধা মিটায়। এতে বহু বিবাহের চেয়ে বেশি মাত্রায় পারিবারিক ও সামাজিক শান্তি বিনষ্ট হচ্ছে, অর্থ ও সময়ের অপচয় হচ্ছে। কর্মক্ষমতা ও কর্মোদ্যম হ্রাস পাচ্ছে। পাশবিকতা, বেলেল্লাপনা, বেহায়াপনা, সমকামীতা, বহুগামীতা জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

www.pathagar.com

অয়াহুদীদের রাষ্ট্র ভাঙার ইহুদী কর্মসূচি : ফরাসী বিপ্লবের পূর্বে ইউরোপে ইহুদীদের কোনো নাগরিক অধিকার ছিল না। ইহুদীদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ষড়যন্ত্রে ফরাসী বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে মর্মে ইহুদী প্রটোকলে বর্ণিত আছে। এরপর থেকে সমগ্র ইউরোপ জুড়ে সংঘাত সংঘর্ষ-সরকার পতন, রাষ্ট্রের বিলুপ্তি, রাষ্ট্রের পুনর্গঠন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এসব অপকর্মের সর্বত্র ইহুদী ষড়যন্ত্র কার্যকর ছিল। ইউরোপের প্রত্যেক যুদ্ধে এবং যুদ্ধ পরবর্তী চুক্তিতে, রাষ্ট্রের বিলুপ্তিতে ও পুনর্গঠনে ইহুদীদের অদৃশ্য বা দৃশ্য ভূমিকা কার্যকর ছিল। রাষ্ট্রগুলো পুনর্গঠন এমনভাবে করা হতো যাতে পরবর্তীতে উক্ত রাষ্ট্রকে পুনরায় অস্থিতিশীল করে ভাঙা যায়, চুক্তিতে এমন সব শর্ত জুড়ে দেয়া হতো যাতে উক্ত শান্তিচুক্তিই পরবর্তীতে বৃহত্তর অশান্তির কারণ হয়। এটা সর্বজন স্বীকৃত যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ অবসানের পর জার্মানির উপর যে চুক্তি চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল তাহাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংঘঠনের প্রধান কারণ ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইহুদী প্রভাবাধীন মিত্র শক্তির বিভিন্ন দেশের সীমানা পুননির্ধারণ সম্পর্কে চিন্তা করলে বিষয়টি সুস্পষ্ট হবে।

ইউরোপের বিরুদ্ধে ক্রুসেডে নেতৃত্বদানকারী গাজী সালাউদ্দীন আইয়ুবীর কুর্দিস্থানকে ২য় বিশ্বযুদ্ধের পর এমনভাবে টুকরা করা হয় যাতে ইউরোপীয়দের ক্রুসেডীয় শত্রু কুর্দীরা চরমভাবে নিগৃহীত হয়। এ লক্ষ্যে মিত্র শক্তি কুর্দিস্থানকে ৪টি ভাগে ভাগ করে ৪টি সার্বভৌম মুসলিম রাষ্ট্রের সাথে জুড়ে দেয়। উক্ত ৪টি দেশ হল ইরান, ইরাক, সিরিয়া ও তুরস্ক। পরবর্তীতে ইহুদীরাই এসব দেশের সংখ্যালঘু কুর্দীদেরকে অস্ত্র-অর্থ-প্রশিক্ষণ দিয়ে সংশ্লিষ্ট দেশসমূহে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনে প্রধান ভূমিকা পালন করছে। এ সময় নির্দিষ্ট সীমানাবিহীন অবৈধ ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে মধ্যপ্রাচ্যে স্থায়ী অশান্তির বীজ বপন করা হয় এবং ইরাকের অংশ কুয়েতকে এবং মালয়েশিয়ার অংশ সিঙ্গাপুরকে আলাদা রাষ্ট্রের মর্যাদা দিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় অপর দুটি অশান্তির বীজ বপন করা হয়। কাশ্মীর ইস্যুটি ঝুলিয়ে রেখে উপমহাদেশে স্থায়ী অশান্তি জিইয়ে রাখা হয়েছে।

বর্তমানে ইউরোপ, আমেরিকা, কানাডা ও পৃথিবীর আরও অনেক দেশ অ-ইহুদীদের রাষ্ট্রীয় অস্তিত্ব, মর্যাদা ও স্বার্থের বিপরীতে ইহুদী এজেন্ডা বাস্তবায়নে লিপ্ত রয়েছে। ইহুদী এজেন্ডা বাস্তবায়ন করতে গিয়ে পরাশক্তি আমেরিকা এখন পতনোন্মুখ, ইউরোপের বেশ কয়েকটি দেশ ব্যর্থ রাষ্ট্র হওয়ার ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। সমগ্র বিশ্ব এখন ব্যাপক সংঘাত-সংঘর্ষের ঝুঁকিতে পতিত হয়েছে। বিভিন্ন দ্বন্দ্ব-সংঘাত সৃষ্টি করা এবং প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র ভাঙার কর্মসূচিসমূহ নিম্নরূপ :

সংখ্যালঘু-সংখ্যাগুরু দ্বন্দ্ব : যায়নবাদী ইহুদীরা দেশসমূহ ধ্বংসে প্রধান যে বিষয়টিকে কাজে লাগায় তা হলো সংখ্যাগুরু-সংখ্যালঘু দ্বন্দ্ব। জাতিগত, নৃতাত্ত্বিক, মতবাদগত, ধর্মীয়, ভাষাগত সংখ্যালঘুদেরকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্ররোচনা দিয়ে

www.pathagar.com

প্রথমত দাবি আদায়ের নামে, সাম্য, সমানাধিকারের নামে সংখ্যাগুরুর মুখোমুখি করে, পরবর্তী পর্যায়ে সংখ্যাগুরুদেরকে প্ররোচনা দিয়ে সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন পরিচালনার ব্যবস্থা করা হয়। হতাশ বিক্ষুব্ধ সংখ্যালঘুদেরকে প্রতিশোধ গ্রহণের প্ররোচনা দিয়ে তাদেরকে অস্ত্রসজ্জিত করা হয়। এমতাবস্থায় উভয় পক্ষকে অস্ত্রসজ্জিত করে তুমুল সংঘর্ষে লিপ্ত করানো হয় যেন ভবিষ্যতে আর কখনও উভয় পক্ষ একত্রিত হওয়ার সম্ভাবনা তিরোহিত হয়ে যায় এবং চূড়ান্ত পর্বে সংখ্যালঘুরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। চূড়ান্ত পর্যায়ে ইহুদী প্রভাবিত বিভিন্ন সংস্থা বন্ধুবেশে ও ধাত্রীরূপে আবির্ভূত হয়ে উভয় পক্ষকে চুক্তি ও ঋণের নামে আবদ্ধ করে গোলামে পরিণত করার কর্মটি সমাধা করে। পৃথিবীর অতীত ও বর্তমানে চলমান সকল বিচ্ছিন্নতাবাদী তৎপরতাকে বিশ্লেষণ করলে বিষয়টি দিবালোকের ন্যায় হৃদয়ঙ্গম করা যাবে।

ধর্মীয় কোন্দল ও পীরবাদকে সহায়তা করা : ইতোপূর্বে আমরা দেখেছি আবদুল্লা বিন সাবাহ ও শারতে শিবী কিভাবে ধর্মীয় কোন্দল সৃষ্টি করে মদীনা রাষ্ট্র, উমাইয়া শাসন ও আব্বাসীয় শাসনের এবং তুর্কী সালতানাতের পতন ঘটিয়েছিল। ফরাসী বিপ্লবের পর ইহুদীরা ইউরোপে নাগরিক অধিকার লাভ করার পর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সকল অ-য়াহুদী ধর্মকে বিলুপ্ত করার জন্য কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। ফলে খ্রিস্টান ধর্ম ও ইসলাম ধর্মসহ সকল অয়াহুদী ধর্ম অনুসারীরা বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত।

ইসলামের সূতিকাগার ও সংরক্ষক মক্কা-মদিনায় এবং আরব উপদ্বীপে কোনো পীরবাদ ও পীর নেই। মুসলমান শাসনাধীন পারস্য থেকেই পীরবাদ ও পীরের সূচনা ও বিকাশ। সূচনাকাল থেকে বহু শতাব্দী যাবত শরিয়তপন্থী পীর সাহেবগণ অনারব মুসলিম বিশ্বে ইসলামের প্রচার-প্রসার ও মানবকল্যাণে অনন্য অবদান রেখেছেন। ফলে পীর সাহেবদের প্রতি ভারতবর্ষ ও বাংলাদেশের মানুষ স্বভাবতই শ্রদ্ধাশীল। এ সুযোগে জায়নবাদী ইসরাইল, ইসরাইলের মদদপুষ্ট সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ এবং ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারতের পৃষ্ঠপোষকতায় অনারব মুসলিম বিশ্বে অসংখ্য ভণ্ডপীরের উদ্ভব হয়েছে। বর্তমান বাংলাদেশে কে আল্লাহর প্রিয় পীর আর কে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের ক্রীড়নক পীর তা সাধারণ মানুষের পক্ষে শনাক্ত করা খুবই কঠিন। ফলে সাধারণ মানুষ প্রতিনিয়ত বিভিন্ন নীতি আদর্শ ও উদ্দেশ্যের পীরগণ কর্তৃক বিভ্রান্ত হচ্ছে এবং বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে অনর্থক সংঘর্ষের সৃষ্টি করে জাতিকে বহুধা বিভক্ত করে দুর্বল করছে এবং সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্তে নিমজ্জিত করছে। (বাংলাদেশের কোনো কোনো ধর্মভীরু ব্যক্তি আমাকে যখন প্রশ্ন করেন, 'ভাই, আসল পীর চিনার উপায় কি?' তখন আমি তাঁদেরকে উত্তর দেই– ১. পবিত্র কুরআন ও প্রধান প্রধান হাদিস গ্রন্থসমূহ অর্থসহ বুঝে পাঠ করে আমল করলে আসল-নকল পীর বিচার করার কোনো প্রয়োজন নেই। ২. যে সকল পীর

www.pathagar.com

সাহেব শরিয়তসম্মত জীবনযাপন করে তাঁদের খাঁটি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। ৩. যে পীর সাহেবের নাম যতো বড় দীর্ঘ, যিনি শরিয়তবিমুখ, তিনি নিঃসন্দেহে ভণ্ডপীর। কেননা আল্লাহ, তাঁর রাসূল (সা.), সাহাবা (রা.) ও তাবেঈনগণের নাম ছিল ছোট, সাদামাটা এবং আল্লাহর স্বীকৃত প্রিয় ব্যক্তিগণ সদা-সর্বদা শরিয়তের আদেশ-নিষেধকে আন্তরিকভাবে পালন করতেন। এমতাবস্থায় যেসব পীর সাহেব নিজের পীর মাহাত্ম্য প্রকাশ করার জন্য এক-দেড় মাইল লম্বা নাম ধারণ করেন ও শরিয়তের বাইরে নতুন নতুন ধর্মীয় অনুষ্ঠান চালু করেন, ধর্মের নির্দেশ পরিবর্তন করেন তারা নিঃসন্দেহে ভণ্ডপীর)। বিভিন্ন উদ্দেশ্যমূলক ধর্ম প্রচারকদের সম্পর্কে বহু প্রামাণ্য তথ্য রয়েছে, তন্মধ্যে– পাঠকদের জ্ঞাতার্থে আমি একটি তথ্য উল্লেখ করছি। ইসরাইলের হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে হাইফা শহরে একটি ইসলামী স্কুল অফ ফিকাহ পরিচালিত হয়। উক্ত স্কুলে বিপথগামী মুসলিম ব্যক্তিদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়ে স্বদেশে পাঠানো হয় এবং তাবলিগ জামাতে শামিল করে বিশ্বব্যাপী মুসলিম জাতিকে বহুধাবিভক্ত ও বিপদগামী করা হয়। (তথ্যসূত্র : The India Doctine, M. B. I Munshi, P. 600)। উক্ত ব্যক্তিরা বিশ্বের দেশে দেশে বিভিন্ন ফেরকার চালু করে। এ বছরের (২০১০ ইংরেজি) পবিত্র ঈদুল ফিতরের সময় বাংলাদেশের একটি ফেরকা হাস্যাস্পদ অবস্থায় পতিত হয়েছে। উক্ত ফেরকাটি– প্রতিবছর মক্কার সাথে মিল রেখে রমজানের রোজা, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহা উদ্‌যাপন করে জাতীয় মহান দিবসটিতে অনৈক্যের সৃষ্টি করত। এ বছর উক্ত ফেরকার লোকজন হিসাব মেলাতে না পেরে মক্কার ১ দিন পূর্বে ঈদুল ফিতর উদ্‌যাপন করে নিজেদের ফেরকার দেউলিয়াত্ব প্রমাণ করেছে। এভাবে সাম্রাজ্যবাদী ও ইহুদি চক্রান্তে বাংলাদেশে অসংখ্য পীর, পীরের আস্তানা ও অনুসারী গজিয়ে ওঠে বাংলাদেশের ইসলামী ঐক্যকে প্রতিনিয়ত দুর্বল করছে। মূর্তিপূজা বা মনুষ্যপূজা ইসলামে নিষিদ্ধ হলেও কোনো কোনো পীরের মুরিদ ছবি (প্রতিকৃতি) পূজায়রত। মাজার পূজা, মাজারে সেজদা প্রদান সুস্পষ্ট হারাম হওয়া সত্ত্বেও একশ্রেণীর পীরের অনুসারীরা মাজারকে সেজদা করে, পীরকে সেজদা করে। শরিয়ত নিষিদ্ধ সকল কাজ করে। ধর্মবিরোধী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়েও অনেক ব্যক্তি নিজেকে মুসলমান দাবি করে এবং একশ্রেণীর পীরের মুরিদ হয়, যাতে পীর তাদেরকে অর্থ ও উপহারের বিনিময়ে পরকালীন নাজাতের ব্যবস্থা করে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ ইসলামবিরোধী এ সকল পীরদেরকে নিরাপত্তা ও মদদ প্রদান করে। ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগণের রোষানল থেকে এসকল পীরগণ নিরাপদ থাকে। কাদিয়ানি, বাহাই ও ধর্মবিরোধী শক্তিসমূহের ন্যায় সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ক্রীড়নক পীরগণ সাম্রাজ্যবাদের ছত্রছায়ায় অবাধে তাদের ধর্ম ব্যবসা পরিচালিত করে জনগণকে বিভ্রান্ত, বিচ্ছিন্ন, বিপথগামী ও ধর্মহীন করছে।

www.pathagar.com

ইহুদি আকাঙ্ক্ষা : আমাদের করণীয়

সৎ, অভিজ্ঞ ও প্রতিভাশালী সমাজনেতা, আমলা ও রাজনীতিকদের সরিয়ে অসৎ, অনভিজ্ঞ ও মাথা মোটাদেরকে প্রতিষ্ঠা করা :

সৎ ব্যক্তিগণ সহজাতভাবেই দেশপ্রেমিক হন। পক্ষান্তরে অসৎ ব্যক্তিরা অর্থ, প্রতিপত্তি, নারী বা নেশার বিনিময়ে দেশের স্বার্থকে সাম্রাজ্যবাদের নিকট বিকিয়ে দিতে দ্বিধা করে না। এ জন্যই ইহুদিবাদ কবলিত সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তাদের টার্গেটকৃত দেশের কর্তৃত্ব থেকে সৎ, অভিজ্ঞ ও প্রতিভাশালী সমাজনেতা, আমলা ও রাজনীতিকদের অপসারণের ব্যবস্থা করে এবং তদস্থলে অসৎ, অনভিজ্ঞ ও মাথা মোটাদেরকে, রং-হেডেডদেরকে ক্ষমতাসীন করে দেশের অস্তিত্ব বিনাশ করার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে। এ প্রসঙ্গে ইহুদি ষড়যন্ত্রের দলিল প্রটোকলে বলা হয়েছে :

ক. রাজনৈতিক অপরাধীদের বীরত্বজনিত সুনাম নষ্ট করার জন্য– আমরা তাদের চুরি, হত্যা, খুন-জখম ইত্যাদি ধরনের অভিযোগে বিচার করব। ফলে জনগণ বিভ্রান্ত হয়ে যাবে এবং সাধারণ চোর-ডাকাতদের মতোই রাজনীতিকদের ঘৃণা করবে। (উল্লেখ্য, দক্ষ, সৎ, দেশপ্রেমিক ও ইহুদি চক্রান্ত প্রতিহত করতে সক্ষম ব্যক্তিরা সাম্রাজ্যবাদের দৃষ্টিতে রাজনৈতিক অপরাধী হিসেবে গণ্য)। *(প্রটোকল : রাজনীতিকদের হয়রানি অধ্যায়)*

খ. অতি প্রাচীনকাল থেকেই আমরাই সর্বপ্রথম জনগণের মাঝখানে দাঁড়িয়ে উদারনীতি, সমানাধিকার ও ভ্রাতৃত্বের ধুয়া তুলেছি। ...বোকা জনগণ আমাদের ফাঁদে পা দিয়েছে এবং গণতন্ত্রের নামে এমন সব রাজনীতিককে নির্বাচিত করেছে, যারা জনগণের মতোই অন্ধ। তারা এটাও ভেবে দেখেনি যে, 'অভিজ্ঞ ব্যক্তি নির্বোধ হলেও শাসনকার্য চালাতে পারে। পক্ষান্তরে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি প্রতিভাশালী হলেও রাজনীতির ক্ষেত্রে কিছুই বুঝতে পারে না। *(প্রটোকল : ষড়যন্ত্রের সর্বমুখী জাল অধ্যায়)*

গ. খোদা আমাদেরকে কার্যসিদ্ধির উপযুক্ত প্রতিভাও দান করেছেন। যদি আমাদের বিরুদ্ধে শক্তির নিকট প্রতিভা ধরা দেয় তাহলে তারা আমাদের বিরুদ্ধে লড়বে। কিন্তু পুরাতন প্রতিভার তুলনায় নবজাত প্রতিভা শিশুমাত্র। ...হায়! তাদের হাতে প্রতিভা যেন অনেক দেরিতে আসে। *(প্রটোকল : ঈমানহরণ অধ্যায়)*

ঘ. আমাদের কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে সকল দলের লোকদের মধ্যে অনৈক্যের বীজ বপন, আমাদের বশ্যতা স্বীকার করতে অনিচ্ছুক সকল ঐক্যবদ্ধ শক্তিগুলোকে বিচ্ছিন্নকরণ এবং আমাদের লক্ষ্য পথে বাধা সৃষ্টি করতে সক্ষম ব্যক্তিদের উদ্যম ও উৎসাহকে স্তিমিতকরণ। ব্যক্তিগত উদ্যম-উৎসাহের চেয়ে অধিকতর বিপজ্জনক বিষয় আমাদের জন্য আর কিছু নেই। প্রতিভা দ্বারা পরিচালিত

www.pathagar.com

ব্যক্তিগত উদ্যম আমাদের জন্য লাখ লাখ লোকের বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার চেয়েও বেশি বিপজ্জনক। *(প্রটোকল : অধ্যায়-ঐ)*

আমাদের জাতীয় জীবনের বিগত ৬৩ (১৯৪৭-২০১০) বছরের কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করলে আমরা দেখতে পাবো বিগত ৬৩ বছরে ইহুদি চক্রান্তের গোপন কারসাজিতে আমাদের সমাজপতি পদে আমরা যোগ্য ও অভিজাতদের স্থলে অযোগ্য ও দুর্বৃত্তশ্রেণীর লোককে পুনর্বাসিত করেছি, সৎ রাজনীতিবিদদের সরিয়ে অসৎ রাজনীতিকদের পুনর্বাসিত করেছি। দেশপ্রেমিক, অভিজ্ঞ ও প্রতিভাশালীদের সমাজের ও রাষ্ট্রের সকল গুরুত্বপূর্ণ স্থান থেকে সরিয়ে অসৎ, অনভিজ্ঞ ও মাথা মোটাদের পুনর্বাসিত করে বর্তমানে চূড়ান্ত ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলেছি। এ অবস্থা থেকে ঘুরে দাঁড়াতে না পারলে আমাদের ধ্বংস অনিবার্য।

শিক্ষাক্ষেত্র ও বুদ্ধিজীবীবিষয়ক ইহুদি চক্রান্ত

সমগ্র বিশ্বের কর্তৃত্ব গ্রহণের লক্ষ্যে ইহুদিরা, অ-ইহুদিদের শিক্ষাব্যবস্থা, শিক্ষানীতি ও জাতীয় মানস গঠনকে সুকৌশলে নিজেদের ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের অনুকূলে বিন্যস্ত করেছে এবং অ-ইহুদি সমাজের বুদ্ধিজীবীদের সুকৌশলে নিজেদের অনুকূলে পরিচালিত করছে। এ প্রসঙ্গে ইহুদি প্রটোকলে রয়েছে–

ক. আমরা শত শত বছরের অভিজ্ঞতা থেকে জানতে পেরেছি যে, মানুষ খেয়ালের বশে পরিচালিত হয় ও খেয়ালের নেশায় জীবনযাপন করে। এসব খেয়াল মানুষের মন-মগজে শিক্ষার মাধ্যমে বদ্ধমূল হয়ে যায়। বিভিন্ন ধরনের বৈচিত্র্যময় পদ্ধতিতে আমরা মানুষের স্বাধীন চিন্তার শেষ বিন্দুটি পর্যন্ত তাদের নিকট থেকে ছিনিয়ে নিয়ে মানুষগুলোকে আমাদের কাজে প্রয়োগ করব। আর এ উদ্দেশ্য সামনে রেখেই সুদূর অতীত থেকে আমরা আমাদের ইঙ্গিত মতবাদের দিকে মানবসমাজকে পরিচালনা করে আসছি। চিন্তাধারা নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশে আমরা ইতিমধ্যেই উদ্দেশ্যমূলক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা জারি করেছি। এর উদ্দেশ্য হলো– অ-ইয়াহুদি সমাজকে চিন্তাশক্তিহীন অনুগত পশুর স্তরে নামিয়ে আনা, যেন তাদের চোখের সামনে কোনো কিছু পেশ না করা পর্যন্ত তারা নিজস্ব চিন্তার সাহায্যে কোনো ধারণাই পোষণ করতে না পারে। ফ্রান্সে আমাদের একজন উত্তম বুর্জোয়া এজেন্ট ইতিমধ্যেই উদ্দেশ্যমূলক শিক্ষাদানের নয়া কর্মসূচি জনসমক্ষে প্রচার করে দিয়েছে। *(প্রটোকল : শিক্ষাব্যবস্থার নয়ারূপ অধ্যায়)*

খ. একমাত্র আমাদের ছাড়া বিশ্বের যাবতীয় সমষ্টিগত শক্তি বিনষ্ট করার জন্য প্রথমেই আমরা সমষ্টির শিক্ষাকেন্দ্র-বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে এক নবতর শিক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে নিস্প্রাণ করে দেবো। এ শিক্ষাগারের সকল অধ্যাপক ও কর্মচারীবৃন্দ একটা বিস্তারিত কার্যসূচি অনুসারে নতুন দায়িত্ব পালনের জন্য

www.pathagar.com

প্রস্তুত হবেন এবং কখনো একচুল পরিমাণও এদিক-সেদিক নড়াচড়া করবেন না। বিশেষ সতর্কতার সাথে তাদের নিয়োগ করা হবে এবং তারা সম্পূর্ণরূপে সরকারের উপর নির্ভরশীল হবে। *(সূত্র : ঐ, অধ্যায় ঐ)*

গ. রাষ্ট্রের প্রচলিত আইন-কানুন ও রাজনীতি সংক্রান্ত অপরাপর প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো পাঠ্য তালিকাবহির্ভূত করা হবে। এ বিষয়গুলো আমাদের বাছাইকৃত কিছু ব্যক্তিকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা রাখা হবে। ...শাসনতন্ত্রকে শিথিল করার উদ্দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলো থেকে প্রস্তাবাদি প্রেরণ বন্ধ করে দিতে হবে। শাসনতান্ত্রিক ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে নাক গলাতে দেয়া হবে না। *(সূত্র : ঐ, অধ্যায় ঐ)*

ঘ. অ-ইয়াহুদিদের বিশ্বজোড়া শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি লক্ষ্য করলে তোমরা বুঝতে পারবে যে, রাষ্ট্র সংক্রান্ত ব্যাপারে ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী বিপুল জনতা অবাস্তব কল্পনাবিলাসী ও অবাঞ্ছিত নাগরিক সৃষ্টি করে মাত্র। আমরা অবশ্যই তাদের শিক্ষাব্যবস্থায় এমন সব মূলনীতি শামিল করব, যা প্রচলিত শিক্ষানীতিকে সম্পূর্ণরূপে অচল করে দেবে। কিন্তু আমরা ক্ষমতালাভ করার পর পাঠ্য তালিকা থেকে গোলযোগ সৃষ্টিকারী সকল বিষয় বাদ দিবো এবং যুবসমাজকে শাসন কর্তৃপক্ষের অনুগত সন্তান শ্রেণীতে পরিণত করব। *(সূত্র : ঐ, অধ্যায় ঐ)*

ঙ. অ-ইয়াহুদিদের আমরা যে ধরনের কাজ করতে আদেশ করি তারা তা করার ফলে গোটা সমাজের দুর্দশা বেড়ে যায়, এ সত্যটি তাদের নিকট গোপন রাখা জরুরি। আমাদের প্রণীত পাঠ্যবিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করার পর মানুষ স্বেচ্ছায় রাষ্ট্রকর্তাদের নিকট আত্মসমর্পণ করে এবং রাষ্ট্রকর্তাগণ তাদের যে মর্যাদা দান করে ও যে কাজে নিয়োগ করে তারা তাতেই সন্তুষ্ট থাকে। বিভ্রান্তি সৃষ্টির উদ্দেশে রচিত নিয়ম-কানুন ও জনতার অজ্ঞতার প্রতি ধন্যবাদ। *(সূত্র : ঐ, অধ্যায় : প্রতীক সাপের রহস্য অধ্যায়)*

শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষানীতি সম্পর্কে ইহুদি প্রটোকলে বর্ণিত উপরোক্ত ষড়যন্ত্রসমূহের মূল কথা হলো– ইহুদিবাদ রচিত ও প্রণীত শিক্ষাব্যবস্থার দ্বারা অ-ইয়াহুদি বিশ্বে স্বাধীন চিন্তাশক্তিহীন একদল শিক্ষিতের সৃষ্টি হবে যাতে অ-ইয়াহুদিরা সমাজ চিন্তাশক্তিহীন পশুর স্তরে নেমে আসবে, অবাস্তব কল্পনাবিলাসী ও অবাঞ্ছিত নাগরিক সৃষ্টি হবে, যারা স্বদেশ ও সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে ইহুদি ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন করবে। এসব দেশের শিক্ষকগণ ইহুদিবাদ কর্তৃক নিয়োজিত পুতুল সরকারের অনুগত হবে। ইহুদি ষড়যন্ত্রই পাঠ্য তালিকায় গোলযোগ সৃষ্টিকারী বিষয়গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা ও গরিষ্ঠসংখ্যক শিক্ষক এবং ছাত্রদের অবস্থা ইহুদিদের ষড়যন্ত্রের অনুকূলে নয় কি?

www.pathagar.com

ইহুদিবাদ পরিকল্পিত মিডিয়া ও বুদ্ধিজীবী

রাজনৈতিক সচেতন ব্যক্তিমাত্রই জানেন, সম্পদ, মিডিয়া ও অস্ত্রের জোরেই বর্তমানে বিশ্ব শাসন করছে ইহুদিরা। তাদের ক্রীড়নক রাষ্ট্রসমূহ বর্তমানে বিশ্বের অধিকাংশ মিডিয়া, সম্পদ ও অস্ত্রের মালিক। উক্ত সম্পদসমূহের মালিক অনেকাংশে অ-ইহুদি নামধারী ব্যক্তিদের হলেও উক্ত ব্যক্তি ও রাষ্ট্রসমূহ জায়নবাদী ইহুদি শক্তির ক্রীড়নক শক্তি। ফলে উক্ত সম্পদসমূহ ইহুদিদের কল্যাণেই ব্যাপৃত রয়েছে। মিডিয়া ও বুদ্ধিজীবী সম্পর্কে প্রটোকলে রয়েছে :

ক. আধুনিক যুগের রাষ্ট্রগুলোর হাতে জনগণের চিন্তারাজ্যে বিপ্লব সৃষ্টিকারী একটি বিরাট শক্তি রয়েছে। আর সে শক্তিটি হচ্ছে প্রেস। অত্যন্ত জরুরি কোন কাজ করা হচ্ছে প্রেস তার ফিরিস্তি পেশ করে। জনগণের অভাব-অভিযোগ ও অসন্তুষ্টির কারণগুলো প্রকাশ করে এবং অসন্তুষ্টি সৃষ্টিও করে। বাক-স্বাধীনতার বিজয় প্রেসের মাধ্যমেই স্বীকৃতি লাভ করেছে। কিন্তু অ-ইহুদি রাষ্ট্রগুলো প্রেসের এ শক্তিটি কাজে লাগানোর সঠিক কৌশল আয়ত্ব করতে পারেনি। তাই প্রেস আমাদের হস্তগত হয়েছে। প্রেসের মাধ্যমেই আমরা নিজেদেরকে লোকচক্ষুর অন্তরালে রেখে প্রভাব বিস্তার করার ক্ষমতা অর্জন করেছি। প্রেসের প্রতি ধন্যবাদ। *(সূত্র : ঐ, ইয়াহুদি প্রাধান্যের গোড়ার কথা অধ্যায়)*

খ. সময় না আসা পর্যন্ত অ-ইয়াহুদিদেরকে আমোদ-ফূর্তিতে দিন কাটাতে দাও অথবা ভবিষ্যতে নতুন ধরনের সুখভোগের সম্ভাবনার আনন্দে বিভোর হয়ে থাকতে দাও অথবা সুখস্মৃতিতে ভুলিয়ে রাখ। আমাদের কার্যক্রমের চাহিদা পূরণ করার জন্য আমরা তাদের যে কাজে ব্যবহার করতে চাই সে কাজ সম্পাদনে যেন তারা প্রধান ভূমিকায় জড়িত হয় তার ব্যবস্থা কর। এ উদ্দেশের প্রতি লক্ষ্য রেখেই আমরা আমাদের প্রেস মারফত অবিরাম প্রচার চালিয়ে আমাদের নীতিগুলোর প্রতি জনগণের অন্ধ আস্থা সৃষ্টির চেষ্টা করে চলেছি। *(সূত্র : ঐ, প্রেস ও সংবাদপত্রের ভূমিকা অধ্যায়)*

গ. সাহিত্য ও সাংবাদিকতা গণশিক্ষার দুটি শক্তিশালী উপাদান– তাই আমাদের সরকার অধিকসংখ্যক সংবাদপত্রের মালিকানা হস্তগত করবে। এর ফলে বিরোধী ভাবাপন্ন সংবাদপত্রের ক্ষতিকারক প্রচারকার্যের মোকাবিলা করা সহজ হবে এবং গণমনে প্রভাব বিস্তার হবে। আমরা যদি ১০টি সংবাদপত্র প্রকাশের অনুমতি দেই তবে নিজেরা ৩০টি সংবাদপত্র চালু করব। এ অনুপাতই আমরা অনুসরণ করব। *(সূত্র : ঐ, অধ্যায় ঐ)*

ঘ. সংবাদপত্রের প্রথম সারিতে থাকবে সরকারি ধরনের পত্রিকাগুলো। এগুলো যেহেতু সর্বদা আমাদের স্বার্থ রক্ষার দায়িত্ব পালন করবে, সেহেতু জনমনে এর প্রভাব থাকবে কম। দ্বিতীয় সারিতে আধাসরকারি পত্রিকাগুলো থাকবে।

www.pathagar.com

এগুলো নির্জীব ও লক্ষ্যহীনদের নিকটে টেনে আনার কাজ করবে। তৃতীয় সারিতে আমাদের নিজেদের বিরোধিতার জন্য আমাদেরই প্রকাশিত পত্রিকাগুলো থাকবে। এসব পত্রিকা বাহ্যত এমন হাবভাব দেখাবে যে, মনে হবে এরা আমাদের ঘোরবিরোধী। আমাদের প্রকৃত বিরোধী মহল এ সংবাদপত্রগুলোর ছদ্ম আবরণ দেখে অকপটে এদের প্রতি আস্থা স্থাপন করবে এবং তাদের প্রকৃতরূপ আমাদের নিকট উন্মোচিত হবে।

আমাদের সংবাদপত্রগুলো সকল প্রকার সম্ভাব্য রং ধারণ করবে। তাদের মধ্যে সামন্তবাদী, প্রজাতন্ত্রী, বিপ্লবী এমনকি নৈরাজ্যবাদী পর্যন্ত দেখা যাবে। অবশ্য এ অবস্থা ততদিন থাকবে যতদিন শাসনতন্ত্র টিকে থাকবে। ভারতবাসীদের তৈরি বিষ্ণুদেবের মূর্তির ন্যায় আমাদের সংবাদপত্রগুলোর ১০০টি হাত থাকবে এবং প্রতিটি হাতের এক একটি আঙ্গুল জনমতের কোনো না কোনো একটি সুর বাজাতে থাকবে। সময় এলে এ হাতগুলো একত্রে আমাদের জন্য অনুকূল পরিবেশ গড়ে তুলবে। অ-ইয়াহুদি নির্বোধেরা মনে করে যে, তারা তাদের পক্ষীয় সংবাদপত্রের মতামত আবৃত্তি করছে। প্রকৃতপক্ষে এরা আমাদেরই মতামত আবৃত্তি করে থাকে এবং আমাদের পতাকার পিছনেই এগিয়ে আসছে। সংবাদপত্রের তৃতীয় সারি থেকে আমরা নিজেদের লক্ষ্য করে গুলি করব এবং আমাদের আধাসরকারি প্রেসগুলো থেকে সাফল্যজনকভাবে এসব মোকাবিলা করব। জনগণ মনে করবে আমাদের বিরোধীপক্ষ অহেতুক আমাদের বিরুদ্ধে বিষোদগার করছে। *(সূত্র : ঐ, অধ্যায় ঐ)*

ঙ. সংবাদ প্রতিষ্ঠানের সকল বিভাগই পেশাগত গোপনীয়তা রক্ষা করতে বাধ্য। আমরা যদি প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করি তাহলে সাংবাদিকতার কোনো গোপন সূত্র তারা প্রকাশ করবে না। কোনো একজন সাংবাদিকও গোপন সূত্র প্রকাশ করার মতো বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে কোনো একজনকেও প্রবেশ করতে দেয়া যায় না। যদি তার অতীত জীবনে কোনো কলঙ্কের দাগ না থাকে। ঐ কলঙ্ক প্রকাশ হয়ে যাওয়ার ভয়ে সাংবাদিক গোপন তথ্য ফাঁস করা থেকে বিরত থাকবে। *(সূত্র : ঐ, অধ্যায় ঐ)*

চ. অ-ইয়াহুদি সমাজের বুদ্ধিজীবী মহলের মনমগজকে আমাদের মতলব অনুযায়ী আমাদের রচিত বিভিন্ন নতুন নতুন তত্ত্বের প্রচারক হিসেবে ব্যবহার করব। উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে তাদের ব্যবহার করার জন্য আমাদের দালালগোষ্ঠীর বিশেষজ্ঞ মহল অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা সহকারে বিশেষ ধরনের জ্ঞান ও তথ্য পরিবেশন করে চলেছে। আর ঐসব বুদ্ধিজীবীরা কোনোরূপ বিচার-বিশ্লেষণ ব্যতিরেকে আমাদের পরিবেশিত তথ্যগুলোকে কার্যকর করতে প্রস্তুত হয়ে যাচ্ছে। ডারউইনি মতবাদ, নাজী মতবাদ, মার্ক্সীয় মতবাদ সাফল্যের জন্য কি

www.pathagar.com

কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিল তা খুব সাবধানে স্মরণ করে দেখো। এসব মতবাদের মধ্যে লুকায়িত সংহতিবিরোধী গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশাবলী প্রত্যেক ইহুদির অনুধাবন করা উচিত। *(সূত্র : ঐ, ইহুদি প্রাধান্যের গোড়ার কথা অধ্যায়)।*

উল্লেখ্য, বিশ্বব্যাপী প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার বর্তমান কার্যকলাপ ও অ-ইয়াহুদি বুদ্ধিজীবীদের কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করলে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, বিশ্বব্যাপী প্রচারিত ও প্রকাশিত গণমাধ্যমসমূহ এবং অ-ইয়াহুদি বুদ্ধিজীবীদের কার্যকলাপ ইহুদি ষড়যন্ত্রের নীলনকশা বাস্তবায়নে নিয়োজিত রয়েছে। এর বিপরীত কর্মকাণ্ডে লিপ্ত মিডিয়া ও বুদ্ধিজীবীদের তৎপরতা অত্যন্ত হতাশাজনক।

যুবসমাজ ও মাদক

ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি অ-ইয়াহুদি সমাজ ও রাষ্ট্রের ধ্বংস সাধনে ইহুদি পরিকল্পিত শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষানীতি কিভাবে অ-ইয়াহুদি ছাত্র ও শিক্ষকসমাজকে অবাস্তব কল্পনাবিলাস ও স্বাধীন চিন্তায় অক্ষম অবাঞ্ছিত নাগরিকে পরিণত করছে। অ-ইয়াহুদি যুবসমাজকে ভুল পথে পরিচালিত করে স্বীয় দেশ-জাতি ধ্বংসের ইহুদি পরিকল্পনা আরো ভয়াবহ। এ প্রসঙ্গে প্রটোকলে যা রয়েছে তা হলো–

ক. অ-ইয়াহুদিদের যুবসমাজের মধ্যে কতগুলো মিথ্যা ও ভিত্তিহীন আদর্শ প্রচার করে আমরা তাদের বোকা বানিয়েছি, বিভ্রান্ত করেছি এবং দুর্নীতিপরায়ণ করে তুলেছি। আমরা জানি, তারা যে আদর্শের বুলি আওড়ায় সেগুলো সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। আমরাই এসব ফাঁকা আদর্শ সৃষ্টি করেছি এবং আমরাই এদের মন-মগজে এসব মেকী আদর্শের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করেছি। *(সূত্র : ঐ, প্রতিভাবান কর্তৃত্ব অধ্যায়)*

খ. রাজনৈতিক প্রশ্নে যেসব লোক আমাদের জন্য কষ্টদায়ক হতে পারে তাদের অন্য পথে ধাবিত করার জন্য আমরা শিল্প-কারখানার প্রশ্নটি উত্থাপন করেছি। এক্ষেত্রে নির্বোধের দল ঘুরপাক খাবে। নতুন নতুন চাকরি পাবার আশায় এক্ষেত্রে জনগণ রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে দূরে সরে থাকতে রাজি হয়ে যাবে। তাদেরকে আরো বেখবর ও প্রয়োজনীয় কাজ থেকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য আমরা আমোদ-প্রমোদ, খেলাধুলা এবং সময় অপচয় ও ভাবাবেগ বৃদ্ধির অন্যান্য উপাদান সর্বত্র ছড়িয়ে দেবো। আমাদের পত্রপত্রিকা ও মিডিয়া মারফত খেলাধুলা ও সাহিত্য সংস্কৃতির প্রতিযোগিতা শুরু করব। এসব বিষয় অ-ইয়াহুদিদের মন-মগজকে আচ্ছন্ন করে রাখবে। আমরা কিভাবে, কোথায় তাদের ক্ষতিসাধন করতে চাই, তা তারা বুঝতে পারবে না। কোনো বিষয়ে স্বাধীনভাবে চিন্তা করার অভ্যাস হারিয়ে ফেলার কারণে এরা অবশেষে আমাদের সুরে সুর মিলিয়ে কথা বলতে শুরু করবে। কেননা, চিন্তার নতুন সূত্র

www.pathagar.com

একমাত্র আমরাই পেশ করি। আমরা এমন লোকদের দ্বারা নতুন চিন্তাধারা প্রবর্তন করি যাদের সম্পর্কে জনগণ বিন্দুমাত্র সন্দেহ পোষণ করবে না যে, আমাদের সাথে এদের কোনো যোগাযোগ আছে। *(সূত্র : ঐ, উন্নয়নের ধুয়া অধ্যায়)*

গ. আমরা অ-ইয়াহুদি শ্রমিকদের মধ্যে অপরাধপ্রবণতা ও পানাসক্তি বাড়িয়ে দেবো। উক্ত পানাসক্ত ও অপরাধপ্রবণ শ্রমিকদের মাধ্যমেই অ-ইয়াহুদি সমাজের শিক্ষিত শ্রেণীকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে মুছে ফেলার ব্যবস্থা করব। সবাইকে বিভ্রান্ত করার জন্য আমরা শ্রমিকশ্রেণীর নিঃস্বার্থ মঙ্গল কামনার মুখোশ ধারণ করব এবং বড় বড় মুখরোচক অর্থনৈতিক আদর্শ প্রচার করে তাদের মন-মগজকে আচ্ছন্ন করে রাখব। *(প্রটোকল : অর্থনৈতিক নৈরাজ্য সৃষ্টি অধ্যায়)*

বর্তমান বাংলাদেশের শিল্প ধ্বংস, অশিক্ষিত বর্বরশ্রেণী কর্তৃক অভিজাত ও শিক্ষতশ্রেণীর ওপর হামলা এবং মাদকের ভয়াবহ বিস্তৃতি ইহুদি নীলনকশারই অংশ। কেননা বর্তমান সরকারের পৃষ্ঠপোষক দেশসমূহ জায়নবাদী ইহুদিদের বরকন্দাজ মাত্র।

ইহুদীদের টার্গেট সমগ্র বিশ্ব শাসন। এ জন্য বিগত ২ হাজার বছর যাবত ইহুদীরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও জাতির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। বিগত শতকে এবং বর্তমানে ইহুদীদের উক্তরূপ আকাঙ্ক্ষা কাঠামোগত রূপলাভ করেছে। লীগ অব নেশনস, জাতিসংঘ, আইএমএফ, বিশ্বব্যাংক, বহুজাতিক সংস্থা ও কর্পোরেশন ইহুদীদের গোপন এজেন্ডা বাস্তবায়নে প্রকাশ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এজন্যই পৃথিবীর অন্যান্য ধর্মের ধর্মীয় রাষ্ট্র গঠনে ইহুদীরা ও তাদের লাঠিয়াল দেশগুলো সর্বশক্তি দিয়ে বাধা দেয়, অথচ পৃথিবীর একমাত্র ইহুদী রাষ্ট্রটি একটি ধর্মীয় রাষ্ট্র। এ রাষ্ট্রের ব্যাপারে বর্তমান বিশ্ব মোড়লগণের কোনো কথা নেই, তাদের পারমাণবিক অস্ত্র বা স্থাপনার ব্যাপারে বিশ্ব মোড়লদের কোনো মাথাব্যথা নেই, তাদের জঘন্য নরহত্যার ব্যাপারে আইসিসির কোনো বক্তব্য নেই। ইহুদীরা নিজেদের জন্য ধর্মীয় রাষ্ট্র চায় কিন্তু অপরাপর জাতির জন্য ধর্মীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিরোধী। ইহুদীরা চায় নিজেরা ধর্মরাষ্ট্রের মাধ্যমে সুখী-সমৃদ্ধশালী থাকতে, অন্যদেরকে ধর্মরাষ্ট্র থেকে বঞ্চিত করে সীমাহীন অশান্তিতে নিমজ্জিত করে তাদের উপর স্থায়ীভাবে আধিপত্য বজায় রাখতে। এ লক্ষ্যেই তারা রচনা করেছে ষড়যন্ত্রের নীলনকশা-Protocol of the Elders of the Zion.

বর্তমান প্রবন্ধে ইতোপূর্বে যে সকল বিষয় আলোচিত হয়েছে তা হলো নিম্নরূপ–

সমগ্র বিশ্বের সকল অ-য়াহুদী জাতিকে শক্তিহীন করে ইহুদীবাদের অধীনে এনে বিশ্বজোড়া ইহুদী শাসন কায়েম করার যে সকল কর্মসূচি রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হলো জাতির সকল সেক্টরে দ্বন্দ্ব-সংঘাত সৃষ্টি করা, প্রতিভাবান ও

www.pathagar.com

অভিজাত শ্রেণীকে ধ্বংস করে উচ্ছৃঙ্খল, মাথামোটা, অর্থ ও ক্ষমতালোভী, নীতিনৈতিকতাহীন অনভিজ্ঞ নিম্নশ্রেণীর লোককে দেশে দেশে ক্ষমতাসীন করা। সৎ ও যোগ্য লোকদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করে তাদেরকে জাতীয় নেতৃত্বের আসন থেকে বিতাড়িত করা, নৈরাজ্যবাদীদের ক্ষমতাসীন করা, জনগণকে ধর্মবিমুখ ও ধর্মবিরোধী করা, ধর্ম ও দেশবিরোধী রাজনীতি, শিক্ষানীতি ও অর্থনীতি চাপিয়ে দেয়া, যুবসমাজকে ভুল পথে পরিচালিত করে দুর্নীতিপ্রবণ ও মদ-নারীতে আসক্ত করা, বুদ্ধিজীবী ও মিডিয়াকে বিপথগামী করা, শাসক ও শাসিতের মধ্যে অনতিক্রম্য বাধার দেয়াল সৃষ্টি করা, পুতুল সরকার প্রতিষ্ঠা ও সকল প্রকার অনৈক্য ও বিচ্ছিন্নতাবাদে মদদ দেয়া, জাতিসমূহকে চুক্তি ও ঋণের জালে আবদ্ধ করা ও দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করা। এভাবে শক্তিহীন হলে জাতিসমূহ ইহুদীদের গোলামী করতে বাধ্য হবে।

অ-য়াহুদী জাতির শাসনব্যবস্থা ধ্বংসে ইহুদী নীতি-কৌশল

ক. অ-য়াহুদীদেরকে ধর্মীয় শাসন থেকে বঞ্চিত করা এবং ধর্মহীন, চরিত্রহীন ও মাদকাসক্ত করা।

খ. নতুন নতুন ধর্মীয়, জাতিগত, ভূখণ্ডগত, রাজনৈতিক মতবাদ রচনা ও প্রচার করে ঐক্যবদ্ধ জাতিকে শতধা বিচ্ছিন্ন করা।

গ. সমানাধিকারের শ্লোগানের মাধ্যমে নারীদেরকে রাস্তায় বের করে পরিবার ও সমাজ ভেঙে দেয়া।

ঘ. নীতি-নৈতিকতাবর্জিত উদ্দেশ্যমূলক সাহিত্য রচনা ও চর্চার মাধ্যমে জাতীয় মানসকে বিপদগামী করা।

অ-য়াহুদী দেশের অর্থনীতি ধ্বংসে ইহুদী নীতি-কৌশল

ক. ফটকাবাজারের প্রতি উৎসাহ প্রদান করে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে ভেতর থেকে ধ্বংস করা। ইহুদী প্রটোকলের 'অর্থনৈতিক নৈরাজ্য সৃষ্টি' অধ্যায়ে উল্লেখ রয়েছে, 'আমরা চাই, শিল্প কারখানা দেশ থেকে শ্রম ও সম্পদ কুড়িয়ে হস্তগত করবে এবং ফটকাবাজারের মাধ্যমে পৃথিবীর সকল সম্পদ আমাদের হাতে তুলে দিয়ে সমগ্র অ-য়াহুদী সমাজ সর্বহারায় পরিণত হয়ে আমাদের বশ্যতা স্বীকার করবে।

খ. সমবায় ব্যবস্থা চালুর মাধ্যমে ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও প্রতিভার বিকাশ বন্ধ করা।

গ. মুদ্রার আবর্তন বন্ধ করা ও মূল্যস্ফীতির প্রসার ঘটানো।

ঘ. অভাব সৃষ্টি করে জাতিসমূহকে ঋণ ও চুক্তির জালে আবদ্ধ করা।

ঙ. ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ধ্বংস করা এবং বৃহৎ শিল্প গড়ে তোলা। এতে পুঁজি কেন্দ্রীভূত হয়ে ইহুদীদের হাতে পৌঁছে যাবে।

www.pathagar.com

চ. প্রতিবছর একই ধরনের রাষ্ট্রীয় বাজেট প্রণয়ন করার ব্যবস্থা করলে বাজেট খুব দ্রুত কয়েকগুণ বৃদ্ধি পাবে এবং দেশ অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলায় নিমজ্জিত হবে।

অ-য়াহুদী জাতি-রাষ্ট্র ভাঙার ইহুদী কর্মসূচি

ক. সংখ্যাগুরু-সংখ্যালঘু দ্বন্দ্ব-সংঘাত সৃষ্টি করা।

খ. ভাববাদ উচ্ছেদ করে বস্তুবাদ চালু করা।

গ. ধর্মীয় কোন্দল ও পীরবাদকে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান।

ঘ. সংশ্লিষ্ট দেশের শিক্ষানীতি, সিলেবাস ইহুদী স্বার্থের অনুকূলে প্রণয়ন করা ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে নিষ্প্রাণ করা।

ঙ. নীতিহীন উকিলদেরকে বিচারক নিয়োগ করা।

চ. বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক ও মিডিয়া নিয়ন্ত্রণ।

ছ. যুবসমাজ ও শ্রমিকদেরকে মাদকাসক্ত করা।

জ. সৎ, অভিজ্ঞ ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন শাসককে সরিয়ে গণবিরোধী ব্যক্তি ও গোষ্ঠীকে ক্ষমতাসীন করা, যাতে শাসক ও শাসিত পরস্পর মুখোমুখি হবে।

ঝ. অতীতের কেলেঙ্কারি গোপন রয়েছে এমন ব্যক্তিদেরকে গুরুত্বপূর্ণ পদে ক্ষমতাসীন করা যাতে উক্ত গোপনীয়তা ফাঁস করার ভয় দেখিয়ে কাজ আদায় করা যায় এবং দেশপ্রেমিকদের হয়রানি করা যায়।

ঞ. রাষ্ট্রযন্ত্রকে বিকল করার উপযোগী যাবতীয় উপায়-উপাদান সমৃদ্ধ বিতর্কিত শাসনতন্ত্র রচনা করা। এতে শাসনতান্ত্রিক ঝগড়া-বিবাদে জাতীয় অস্তিত্ব বিপন্ন হয়।

ট. সার্বজনীন ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠা। এ পদ্ধতিটিও ষড়যন্ত্রকারী ইহুদীদের আবিষ্কার। অ-য়াহুদী জাতির ঘাড়ে দুর্বৃত্তদের শাসন প্রতিষ্ঠায় এ পদ্ধতি যথেষ্ট ফলপ্রসূ প্রমাণিত হয়েছে।

ইহুদী ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নে অ-য়াহুদী এজেন্ট ও সংস্থা

ইহুদীরা বিভিন্ন জাতির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অ-য়াহুদী ব্যক্তি ও সংস্থাকে কাজে লাগিয়েছে। তারা নেপথ্যে থেকে দৃশ্যমান সংস্থা পরিচালনা করে। এতে তাদের দূরভিসন্ধি সম্পর্কে অন্যরা বুঝতে পারে না এবং ইহুদীদের ক্ষয়ক্ষতি সীমিত থাকে। ইহুদী প্রটোকলে বর্ণিত অ-য়াহুদী এজেন্টদের পরিচয় হলো উচ্চাকাঙ্ক্ষী, অসৎ, মাথামোটা, চরিত্রহীন, লোভী, আবেগপ্রবণ, নৈরাজ্যবাদী, বহুজাতিক সংস্থার অ-য়াহুদী কর্মচারী এবং বাক্যবাগীশ বা বাকপটু রাজনীতিক। ইহুদী প্রটোকলে যেসব সংস্থার কথা উল্লেখ রয়েছে সেগুলো হলো লায়ন ক্লাব, রোটারি ক্লাব, সমাজতান্ত্রিক দল, সাম্যবাদী দল, বিভিন্ন এনজিও, ধর্মবিরোধী দল, জাতিসংঘ ও বিশ্বব্যাংক।

www.pathagar.com

মুসলমান ও মুসলমানদের রাষ্ট্র ধ্বংসে ইহুদীবাদ অনুসৃত নীতি-কৌশল

ইসলামের নবী মুহাম্মদ (দ.)-এর হিজরত পরবর্তী জীবনের শুরু থেকে ইহুদীরা রাসুল (দ.)কে হত্যা করার একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে ব্যর্থ হয়। এরপর তারা শিশুরাষ্ট্র মদীনা আক্রমণে মক্কার কাফের-মোশরেকদের উস্কানি ও সহায়তা প্রদান করে। এরপর কয়েকবার মুসলমানদের বিরুদ্ধে সম্মুখযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে পরাজিত হয়। তৎপর রাসুলের (সা.) ইন্তেকাল-পরবর্তী সকল ভণ্ড নবীদেরকে মদদদান করে ইসলামের ক্ষতি করার চেষ্টা করে। ইসলামী রাষ্ট্র শক্তিশালী, সুসংহত ও কল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত হলে ইহুদীরা ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে। এ সকল ভিন্ন পন্থাসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো ইহুদীরা পরিকল্পিতভাবে ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমানদের আস্থাভাজনে পরিণত হয় এবং মুসলমানদের মধ্যে বিভিন্ন মতবাদ, ফেরকা, দল, উপদল গঠন করে পরস্পরকে পরস্পরের বিরুদ্ধে দ্বন্দ্ব-সংঘাতে লিপ্ত করে শক্তিহীন এবং মুসলমানদের সর্বোৎকৃষ্ট শাসন খেলাফত রাষ্ট্রব্যবস্থা থেকে বিচ্যুত করে। খেলাফত থেকে রাজতন্ত্রে, রাজতন্ত্র থেকে স্বৈরতন্ত্রে, স্বৈরতন্ত্র থেকে গণতন্ত্রে এবং গণতন্ত্র থেকে ধর্মনিরপেক্ষতন্ত্রে বা ধর্মবিরোধী রাষ্ট্রব্যবস্থা গ্রহণের ব্যবস্থা করে।

মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা ধ্বংসে ইহুদী আবদুল্লাহ বিন সাবাহ প্রথমে সাবায়ী আন্দোলন গড়ে তোলে। এ আন্দোলনের ফলে মুসলমানরা ত্রিধাবিভক্ত হয়ে সুন্নী, শিয়া ও খারেজী উপদলে বিভক্ত হয়। বিভক্ত উপদলসমূহের দ্বন্দ্ব-সংঘাতে ও যুদ্ধে বিপুল মুসলিম শক্তি ক্ষয় হয়। হযরত ওসমান (রা.) ও হযরত আলী (রা.) নিহত হন। আমীর মুয়াবিয়া (রা.) কর্তৃক খেলাফতের পরিবর্তে রাজতন্ত্র চালু হয়। আদর্শের পরিবর্তে গোত্রীয় শাসন চালু হয়। এরই ধারাবাহিকতায় শুরু হয় উমাইয়া-আব্বাসীয় দ্বন্দ্ব। উমাইয়া শাসন বিলুপ্ত হয়, আব্বাসীয় শাসন চালু হয়। ন্যায়পরায়ণ আব্বাসীয় রাজতান্ত্রিক শাসনে মুসলমানরা পুনরায় ঐশ্বর্যশালী হলে নতুন মুতাজিলা মতবাদের উদ্ভব হয়। এই মুতাজিলা মতবাদ ইসলামের ভিত্তিমূলে আঘাত হানে। পরবর্তীতে এই মুতাজিলা মতবাদ এবং পূর্বোক্ত শিয়া-সুন্নী দ্বন্দ্বের পরিণতিতে আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের পতন হয় এবং অসভ্য মঙ্গোলগণ কর্তৃক বাগদাদের পতন হয়।

পরবর্তীকালে তুরস্ককেন্দ্রিক ওসমানীয় সাম্রাজ্য এবং ভারতকেন্দ্রিক মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে মুসলিম গৌরব আবার জেগে উঠে। মুসলমানদের এই দুটি গৌরবময় শাসন ও রাষ্ট্রব্যবস্থা ভাঙার জন্য ইহুদীরা নতুন পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হয়। ওসমানীয় সাম্রাজ্য ভাঙার লক্ষ্যে তুরস্কে সূচিত হয় দুন্‌মা আন্দোলন আর মোগল সাম্রাজ্য ধ্বংসে কলকাতা ও মাদ্রাজে স্থাপিত হয় ফ্রী ম্যাসন লজ। দুন্‌মা আন্দোলনের সূচনা করে স্মার্নাবাসী শারতে শিবী (সে সদলবলে ইহুদী থেকে

www.pathagar.com

মুসলিম হয়ে তুরস্কের রাজনীতিতে অনুপ্রবেশ করে। তুরস্কের খেলাফত ধ্বংসকারী কামাল পাশা এ আন্দোলনের ফসল)। মোগল সাম্রাজ্য ধ্বংসে যায়নবাদী ইহুদীদের সরাসরি পরিচালনাধীন ২টি ফ্রী ম্যাসন লজ স্থাপন করা হয়। ১৭২৯ সালে কলকাতার Fort william-এ এবং ১৭৫৩ সালে মাদ্রাজে স্থাপিত ফ্রী ম্যাসন লজ থেকে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে ইহুদীরা তৎকালীন মোগল সাম্রাজ্যের শাসক মহলে অনুপ্রবেশ করে এবং পরস্পর বিবাদ-বিসংবাদ, দ্বন্দ্ব-সংঘাত সৃষ্টি করে ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশী নাটকের মাধ্যমে ভারতের একাংশ থেকে মুসলিম শাসন বিলুপ্ত করা হয়। ১৮৫৭-৫৮ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে হিন্দু-শিখ ও গুর্খাদের অসহযোগিতায় মুসলমানরা পরাজিত হলে দিল্লির মোগল সাম্রাজ্যের বিলুপ্তি ঘটে। এরপরই ১৮৫৯ সালে লাহোরের আনারকলিতে এবং ১৯১০ সালে ঢাকার পল্টনে আরও দুটি ফ্রী ম্যাসন লজ স্থাপিত হয়। উল্লেখ্য, ইহুদী প্রটোকল মোতাবেক ফ্রী ম্যাসন লজ হলো ইহুদী ষড়যন্ত্রের গোপন ঘাঁটি যা ছদ্মনামে পরিচালিত হয়। লন্ডনে এর প্রধান অফিস অবস্থিত।

ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র পাকিস্তান ধ্বংসে ইহুদী তৎপরতা

ইহুদীরা নিজেদের জন্য নিজেদের ধর্মরাষ্ট্র চায়। কিন্তু অন্য জাতির ধর্ম রাষ্ট্রের অস্তিত্ব সহ্য করতে রাজি নয়। এ জন্য পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই এর ভাঙনে তৎপর হয়ে উঠে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর দ্রুত হায়দরাবাদ, মুলতান, কোয়েটা, শিয়ালকোট, রাওয়াল পিন্ডি, পেশোয়ার ও চট্টগ্রামে ফ্রী ম্যাসন লজ স্থাপন করা হয়। সিআইএ/কেজিবিসহ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের গোয়েন্দা সংস্থায় লুকায়িত ইহুদী এজেন্টদের দ্বারা ইহুদীরা নিজেদের ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন করে। পাকিস্তানে ভাষাগত ও ভূখণ্ডগত জাতীয়তাবোধের জিগির তুলে জনগণকে বিভ্রান্ত করে এবং বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার দ্বারা স্বীয় উদ্দেশ্য হাসিল করে। অপরাপর জাতিতে লুকায়িত ইহুদী এজেন্টগণ ইহুদী প্লান বাস্তবায়ন করে পাকিস্তানকে ভেঙে দেয়।

বাংলাদেশ ধ্বংসে ইহুদী তৎপরতা

মোসাদ, সিআইএ, 'র', এমআইফাইভসহ ইহুদী এজেন্ডা বাস্তবায়নকারী দেশসমূহের গোয়েন্দা সংস্থা, পাশ্চাত্যের অর্থপুষ্ট এ দেশের বিভিন্ন এনজিও, বহুজাতিক সংস্থার এদেশীয় কর্মচারী, ইহুদী এজেন্ট হিসাবে কর্মরত মিডিয়া ব্যক্তিত্ব, রাজনীতিক, বুদ্ধিজীবী, পীর, ঠাকুর, জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে সম্মিলিতভাবে বাংলাদেশ থেকে মুসলিম শাসন বিলুপ্ত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদী (যারা মূলত ধর্মবিরোধী) সমাজতন্ত্রী, সাম্যবাদী, নৈরাজ্যবাদী দলসমূহের ছত্রছায়ায় ইহুদীরা নির্বিবাদে তাদের ষড়যন্ত্রের কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। ইদানীং হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্যপরিষদ, ইসকন ও কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন

www.pathagar.com

যায়নবাদীদের সহযোগী হিসাবে কর্মরত বলে শোনা যাচ্ছে। উল্লেখ্য, ইসকন বা আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনা কেন্দ্র' উগ্রপন্থী ইহুদী ও হিন্দু যুবকদের যৌথ সংগঠন। ইহুদীবাদ পরিচালনাধীন বর্তমান সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহ ভারতবর্ষের অপর অংশের মুসলিম দেশ পাকিস্তান ভূখণ্ড থেকে মুসলিম শাসন উৎখাতে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে। বাংলাদেশে সাম্প্রতিক ১/১১ সংগঠনে ইহুদীবাদী পাশ্চাত্য দেশসমূহ, তাদের স্থানীয় পার্টনার ভারত এবং এ দেশের ভারতপন্থী রাজনীতিকদের স্বরূপ জনসমক্ষে প্রকাশিত হয়েছে।

ইহুদীদের নিজেদের কাঙ্ক্ষিত শাসনব্যবস্থা

বর্তমান ইহুদী নিয়ন্ত্রিত বিশ্বে ধর্মের পক্ষে কথা বললে তাকে মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক আখ্যা দেয়া হয়। ধর্মের পক্ষে কাজ করলে জঙ্গী বলা হয়, ধর্মীয় শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কথা বললে তাকে মধ্যযুগীয় বর্বর ও পশ্চাদপদতা বলা হয়। ধর্মীয় রাষ্ট্র কায়েম করলে তা উৎখাতে সর্বশক্তি নিয়োগ করা হয়। (যথা– ইসলামী ইরানের ব্যাপারে পাশ্চাত্যের তৎপরতা)। রাজতান্ত্রিক শাসনকে পশ্চাদপদ ও মানবাধিকার লংঘন আখ্যায়িত করা হয়। অথচ ইহুদীরা নিজেদের জন্য ধর্মীয় রাষ্ট্র ইসরাইল প্রতিষ্ঠা করেছে এবং বিশ্বব্যাপী ইহুদী ধর্মীয় শাসন চাপিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে বিশ্বের মানুষকে ধর্মহীন করার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। ইহুদীরা বিশ্বের দেশে দেশে গণতন্ত্র, স্বৈরতন্ত্র, সামরিকতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র, ধর্মবিরোধী ধর্মনিরপেক্ষতন্ত্র চাপিয়ে দিয়েছে কিন্তু নিজেদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য হিসেবে সাব্যস্ত করেছে ধর্মীয় শাসন এবং নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী বাদশাহী শাসন যার প্রধান হবেন মুসলমানদের খলিফাসদৃশ নিষ্কলুষ, নিষ্পাপ, অভিজ্ঞ ও জ্ঞানী ব্যক্তি। ইহুদী প্রটোকলেই ইহুদীদের কাঙ্ক্ষিত শাসনব্যবস্থা ও শাসক সম্পর্কে এসব উল্লেখ করা হয়েছে। তার কয়েকটি নিম্নরূপ–

ক. আজাদী সত্যিকার অর্থে কল্যাণকর হতে পারে এবং রাষ্ট্রীয় অর্থ ব্যবস্থা জনগণের ক্ষতি করার পরিবর্তে উপকার করতে পারে যদি আজাদী আন্দোলনের ভিত্তি স্রষ্টার ওপর ঈমান ও মানবজাতির পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের উপর স্থাপিত হয়। সকলের সমানাধিকার দাবিই হচ্ছে সকল অনর্থের মূল। (প্রটোকল : ঈমান হরণ অধ্যায়)

খ. সকল দেশের জন্যই উত্তম শাসনব্যবস্থা হচ্ছে একজন মাত্র দায়িত্বশীল লোকের হাতে রাষ্ট্রের সর্বময় ক্ষমতা কেন্দ্রীভূতকরণ। সর্বাত্মক শাসনক্ষমতা ছাড়া কোনো সভ্যতাই টিকতে পারে না। কেননা জনগণ সভ্যতার ধারক-বাহক নয়; বরং তাদের পরিচালকগণই সভ্যতার প্রকৃত সংরক্ষক। (প্রটোকল : ষড়যন্ত্রের সর্বমুখী জাল অধ্যায়)

গ. আমাদের সরকারের শাসনের বৈশিষ্ট্য হবে বংশের মুরুব্বীর মতো। তিনি

www.pathagar.com

পিতৃসুলভ অভিভাবকের ন্যায় শাসন পরিচালনা করবেন। ...তিনি মাতা-পিতার ন্যায় তাদের যাবতীয় কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করবেন। (প্রটোকল : ইহুদীদের সাংস্কৃতিক বিপ্লব অধ্যায়)

ঘ. তাঁর শাসনক্ষমতা বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করে এমন সব লোকদের হাতে তুলে দেয়া হবে না, যারা জাঁকজমক প্রদর্শনের উদ্দেশে শাহী তখতের পাশে পাশে ঘোরাফেরা করে এবং নিজেদের স্বার্থের চিন্তায় মগ্ন থাকে। (প্রটোকল : অর্থনৈতিক চালবাজী অধ্যায়)

ঙ. শাসনকর্তার কোনো ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকবে না। কেননা রাষ্ট্রপ্রধান দেশের সকলের পিতৃতুল্য এবং এ জন্য সকলের সম্পদ তাঁর সম্পদ।... ব্যক্তিগত সম্পদের মালিক হয়ে সকলের সম্পদের উপর অধিকার অসংগত। (প্রটোকল : অধ্যায়-ঐ)

চ. রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে অর্থ অপহরণ করার ব্যাপারে যার কোনো লোভ থাকবে না তিনিই হবেন মালিক ও শাসক। তাঁর ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণে সম্পদের অপচয় ও অপহরণ বন্ধ হতে বাধ্য। (প্রটোকল-ঐ)

ছ. জনগণ যেন তাদের শাসন কর্তাকে সরাসরি জানতে ও ভালবাসতে পারে সে জন্য তাঁর পক্ষে জনগণের সঙ্গে সরাসরি আলাপ-আলোচনা করা জরুরি। আমরা এ দুই পক্ষকে এ যাবতকাল ভয় দেখিয়ে আলাদা করে রেখেছি।... যতদিন পর্যন্ত এ দুটি শক্তি পৃথক পৃথকভাবে আমাদের করায়ত্তে ছিল ততদিন আমরা উভয়ের মধ্যে ভীতি সৃষ্টি করে আলাদা রাখা জরুরি ছিল। আমাদের রাজ্যে আমরা এ দুটি পক্ষকে একত্র করব। (প্রটোকল : ত্রাণকর্তার আবির্ভাব অধ্যায়)

জ. আমাদের রাজ্যে ক্ষমতাসীন হবার পর অন্যান্য কোনো ধর্মের অস্তিত্ব আমরা বরদাশত করবো না। কেননা বিধাতার মনোনীত জাতি হিসেবে আমরাই পৃথিবীর মানুষের শাসক এবং আমাদের মনিব হবেন স্বয়ং বিধাতা। তাই আমরা অন্যান্য যাবতীয় ধর্মমত মুছে দেব। (প্রটোকল : দাসত্বের নয়ারূপ অধ্যায়)।

আমাদের করণীয়

উপরোক্ত আলোচনায় আমরা দেখতে পেয়েছি, বিশ্বব্যাপী ইহুদী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পরিচালিত ষড়যন্ত্রমূলক কর্মকাণ্ড এবং এ ষড়যন্ত্র সম্পর্কে উদাসীনতা, অজ্ঞতা ও ষড়যন্ত্র প্রতিরোধে সচেষ্ট না হওয়াই পৃথিবীব্যাপী অ-য়াহুদী জাতির দুর্ভোগের মূল কারণ। বিগত ১৪শ' বছর যাবত ইহুদীবাদ কর্তৃক মুসলমানদের বিরুদ্ধে পরিচালিত ষড়যন্ত্রসমূহ বর্তমানে প্রকাশ্য রূপ লাভ করেছে এবং বিশ্বব্যাপী মুসলিম নিধনের, মুসলিম রাষ্ট্র ভাঙা ও বিলুপ্তির প্রধান কারণে পরিণত হয়েছে।

www.pathagar.com

এমতাবস্থায় আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে নিজেদের ধর্মকে কেন্দ্র করে। আমাদের জাতীয় নেতৃবৃন্দ ও সদস্যদেরকে এবং বিশ্বের অপরাপর জাতিসমূহকে ইহুদী ষড়যন্ত্রের স্বরূপ সম্পর্কে অবহিত করতে হবে। ইহুদী ষড়যন্ত্রের ব্যবস্থাপনাকে ও মতবাদসমূহকে মতবাদের স্রষ্টাদের দিকে ছুঁড়ে ফেলতে হবে এবং ইসলামের সোনালী যুগের ধর্মমত ও রাষ্ট্রব্যবস্থাকে বাস্তবায়ন করতে হবে। তবেই বাংলাদেশসহ মুসলিম বিশ্ব ও অপরাপর জাতিসমূহ নিরাপদ বিশ্বে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতে সক্ষম হবে। সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধির অপর কোনো পথ নেই।

ফেব্রুয়ারি ২০১১

www.pathagar.com

জঙ্গি প্রজনন কেন্দ্রের গডফাদারগণ

যে দিবস ২০০৯ সালে বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী জনসভায় দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেন যে, "বাংলাদেশে কোনো জঙ্গি নেই অথচ সরকার জঙ্গিবাদের প্রচারণা চালিয়ে বিদেশী হস্তক্ষেপের প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছে।" বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী আমীর মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীও উক্ত দিবসে প্রায় একই প্রকার বক্তব্য রাখেন। অপরদিকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর বক্তব্যে বাংলাদেশে জঙ্গি রয়েছে প্রচার করেন এবং জঙ্গি নির্মূলে সকল প্রকার বিকল্প অবলম্বনের প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। বর্তমান সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী ও বেশ কয়েকজন মন্ত্রী বাংলাদেশের জঙ্গি দমনে টাস্কফোর্স গঠন, ভিন্ন রাষ্ট্রের সেনা-সহায়তা গ্রহণের কথা রীতিমতো ঘোষণা করছেন। উভয় শিবিরের পরস্পরবিরোধী বক্তব্যকে আমি বাংলাদেশের রাজনীতির স্বাভাবিক বুলি হিসেবে ধরে নিয়েছিলাম। কিন্তু পরদিন সরকারি বক্তব্যকে সমর্থন করে War for terror & Robberyতে লিপ্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত মরিয়ার্টি যখন বললেন, 'বাংলাদেশে জঙ্গি আছে'। তখনই আমার টনক নড়ে। আমি বিলক্ষণ উপলব্ধি করলাম যেহেতু সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও ক্ষমতাসীন সরকার বলছে জঙ্গি আছে, সেহেতু জঙ্গি না থাকার কোনো উপায় নেই। ক্ষমতাধররা নিজেদের বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণের জন্য নিশ্চয়ই জঙ্গি আছে প্রমাণের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করবে। অথবা সরকারি সংস্থা অথবা বন্ধু দেশ নিশ্চয়ই সরকারকে জঙ্গি আছে মর্মে তথ্য সরবরাহ করেছে। উভয় পক্ষের পরস্পর বিরোধী বক্তব্যে উৎসুক হয়ে আমি Terror, Terrorist, Terrorism সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করে বিস্ময়াভিভূত হলাম। আমার সংগৃহীত তথ্যের প্রকৃতি এমন যে, সুনির্দিষ্ট তথ্যসমূহ বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে এবং তথ্যের পরিমাণ এরূপ যে, উক্ত তথ্যসমূহ দিয়ে দশ ফর্মার একটি বই লেখা যাবে। শেষ পর্যন্ত বই লেখার ব্যাপারটা ভবিষ্যতের জন্য রেখে দিয়ে প্রবন্ধের কলেবরে অতি সংক্ষেপে বিষয়টি উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত নিলাম।

Terror/Terrorist/ Terrorism-এর সংজ্ঞা

SAMSAD English-Bengali Dictionary ৫ম সংস্করণ থেকে প্রথমে উক্ত শব্দত্রয়ের অর্থ উদ্ধার করলাম। উক্ত ডিকশনারীতে টেরর শব্দের অর্থ পেলাম

www.pathagar.com

সন্ত্রাস/ ভয়ঙ্কর ব্যক্তি, টেররিস্ট-এর অর্থ পেলাম সন্ত্রাসী/ সংঘবদ্ধভাবে ভয় দেখাইয়া বশ মানানোর রীতি/ সন্ত্রাসবাদ, টেররিজম-এর অর্থ করা হয়েছে আতঙ্কিত করা/ ভয় দেখাইয়া শাসন করা, ইত্যাদি। উক্ত শব্দার্থ দেখে মনের আয়নায় ভেসে উঠল কতগুলো নাম, যার মধ্যে কয়েকটি হলো– হিটলার, মুসোলিনী, চেঙ্গিস খাঁ, হালাকু খাঁ, শ্যারন, বুশ, ইন্দিরা গান্ধী, নেতানিয়াহু, ডোনাল্ডস রামসফেল্ড, ওসামা বিন লাদেন, বায়তুল্লাহ মেহসুদ ও ভেলুপিল্লাই প্রভাকরণের ন্যায় ভয়ঙ্কর ব্যক্তিদের মুখ। উক্ত আতঙ্কবাদী ব্যক্তিগণ আবার দুই প্রকারের। প্রথমোক্ত ৯ জন সন্ত্রাসবাদের স্রষ্টা আর শেষোক্ত ৪ জন সন্ত্রাসবাদের সৃষ্টি। বর্তমান বিশ্ব যেন স্রষ্টা ও সৃষ্টির যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করছে। এই স্রষ্টা সৃষ্টি সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বিশিষ্টজনদের বক্তব্য যাচাই করলাম। Terror/ Terrorist/ Terrorism সম্পর্কে বিশিষ্টজনদের অভিমত পাঠকদের জ্ঞাতার্থে উল্লেখ করা হলো :

১. যারা আমেরিকার ইরাক-আফগানিস্তান আগ্রাসনকে সমর্থন করে না তারা টেররিস্ট, যারা প্রতিরোধ করতে চায় তারা টেররিস্ট। যারা ফিলিস্তিনে ইসরাইলী দখলদারিত্ব প্রতিরোধ করতে চায় তারা টেররিস্ট, যারা ভারতীয় দখলদারিত্ব থেকে কাশ্মীরকে মুক্ত করতে চায় তারা টেররিস্ট। যে সকল দেশ সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন প্রতিরোধ করতে চায় তারা সন্ত্রাসী রাষ্ট্র। আরব-আফগান-মুসলিম যুবকরা যতদিন যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমা বিশ্বের স্বার্থে রাশিয়ার দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে ততদিন তারা ছিল মুজাহিদ কিন্তু বর্তমানে তারা যেহেতু পশ্চিমা দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে সেহেতু তারা টেররিস্ট। (সূত্র : ওসমান খালিদ, লিজা জার্নাল, অক্টোবর-ডিসেম্বর-০৭, পৃ. ২০ ও ২৮)।
২. রিগ্যান প্রশাসনের এসিসট্যান্ট সেক্রেটারী অব ট্রেজারী ও ওয়াল স্ট্রীট জার্নালের সহযোগী সম্পাদক পল ক্রেইগ রবার্টস নিম্নোক্ত ভাষায় যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টিতে টেররিস্ট-এর সংজ্ঞা প্রদান করেছেন।
   ক. ইরান, হিজবুল্লাহ, হামাস, টেররিস্ট। কারণ ইরান, হামাস ও হিজবুল্লাহর ন্যায় প্রতিরোধ যোদ্ধাদের সাহায্য করে।
   খ. হামাস ও হিজবুল্লাহ টেররিস্ট, কারণ তারা অবৈধ ইসরাইল রাষ্ট্রের জুলুম, নির্যাতন ও আগ্রাসনকে প্রতিরোধ করে।
   গ. সে সকল দেশ সন্ত্রাসী রাষ্ট্র, যারা যুক্তরাষ্ট্র, বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ থেকে টাকা নিয়ে উক্ত টাকায় অস্ত্র কিনে সিআইএ'র নির্দেশনা মোতাবেক ইহুদী ও মার্কিন এজেন্ডা বাস্তবায়ন করে না বা করতে রাজী নয়।
   ঘ. সে সকল দেশ টেররিস্ট, যারা নিজ দেশের বিভিন্ন বাহিনী ব্যবহার করে

www.pathagar.com

নিজ দেশের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শক্তিকে ধ্বংস করতে রাজী নয়।

ঙ. আমেরিকা, ইসরাইল ও তার দোসরগণ যখন লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ মানুষ হত্যা করে তখন তা টেররিজম হয় না, আগ্রাসন প্রতিরোধ করাই টেররিজম। (সূত্র : লিজা জার্নাল, এপ্রিল-জুন ২০০৮)।

৩. ষাটের দশক থেকে যুক্তরাষ্ট্র ফিলিস্তিনীদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারকে অস্বীকার করছে। দক্ষিণ এশিয়ায় ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলগত পার্টনার হওয়ার পর বর্তমানে ভারত কাশ্মীরী প্রতিরোধ যোদ্ধাদেরকে আখ্যা দিচ্ছে টেররিস্ট নামে। ইরাক ও আফগানিস্তানে প্রতিরোধ যোদ্ধাদেরকে আখ্যা দেয়া হচ্ছে টেররিস্ট হিসেবে। War on terror একটি প্রচারণা মাত্র। মূলত যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বব্যাপী স্থায়ী আধিপত্য কায়েমকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে মনে করে দেশসমূহকে ধ্বংস করা হচ্ছে, জনগণকে নির্মম-নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হচ্ছে। (ওসমান খালিদ, সম্পাদক, লিজা জার্নাল)।

৪. ইসলামিক টেররিজম মূলত ফিলিস্তিনী, আরব ও মুসলিম জনগণকে যন্ত্রণা দেয়া, ক্রোধান্বিত ও অপমানিত করার ফসল। এ যন্ত্রণা, ক্রোধ ও অপমানের তিনটি প্রধান কারণ হলো- প্রথমতঃ, সাধারণভাবে আমেকিরার শক্তি মদমত্ততা, দ্বিতীয়তঃ, জায়নবাদী ইসরাইলের প্রতি আমেরিকার অন্ধ সমর্থন, তৃতীয়তঃ বর্তমান আরব ও মুসলিম সরকারসমূহের শোচনীয় ব্যর্থতা। (এলান হার্ট, সাংবাদিক ও কলামিস্ট)।

৫. ভারত আমেরিকার চেয়েও অধিক আওয়াজে ইসলামী সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রপাগান্ডা চালাচ্ছে। এর কারণ হিন্দু ভোট লাভ করা এবং খ্রিস্টান বিশ্বকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করা। অথচ সত্যিকারভাবে হিন্দুত্ববাদ মুসলমানদের উপর অবিরাম আক্রমণ চালাচ্ছে, সমাজে মুসলমানদেরকে নিম্নতর শ্রেণীতে কোণঠাসা করে অপমান করছে। মুসলমানরাই ভারতে হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসের করুণ শিকার। মুসলমানরা ভারতে হিন্দু সন্ত্রাসবাদ কর্তৃক পরিকল্পিত ও সংঘটিত হত্যা এবং লুণ্ঠনের শিকার হচ্ছে। (M.C. Raj, A Leading dalit Intellectual).

৬. 'ভারতের ইহুদী'খ্যাত ব্রাহ্মণরা U.S. War on Terrer-এর সুযোগ গ্রহণ করে ভারতের মুসলমানদের বিরুদ্ধে রক্তাক্ত যুদ্ধ শুরু করেছে। ভারতে এমন কোনোদিন যায় না যেদিন ভারতের মুসলমানরা সন্ত্রাসের শিকার হয় না। সুতরাং বর্তমানে এটি দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, 'U.S. War on terror' ইসলাম ও মুসলিমের বিরুদ্ধে পরিচালিত অমানবিক নৃশংস যুদ্ধ। (V.T. Rajshekar, India)

সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র ইসরাইল, যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, বৃটেন, ফ্রান্স ও জার্মানির দৃষ্টিতে জঙ্গি হওয়ার এবং জঙ্গি রাষ্ট্র হওয়ার বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ :

www.pathagar.com

১. মুসলমান হওয়া ও ইসলামের পক্ষের শক্তি হওয়া।
২. এমন দেশের অধিবাসী হওয়া যে দেশটির অবস্থান ভূ-রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ এবং যে দেশে তেল-গ্যাস রয়েছে।
৩. যে দেশের অধিকাংশ জনগণ স্বাধীনচেতা ও যে কোনো বহিঃশক্তির আধিপত্যের বিরোধী ও বৈদেশিক আগ্রাসন প্রতিরোধে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ বা দোষসমূহ যেহেতু বাংলাদেশ ও এদেশের অধিকাংশ মানুষের মাঝে বিদ্যমান সেহেতু এদেশ যে জঙ্গিবাদীতে পরিপূর্ণ তা বলা বাহুল্য। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির চোখে যারা জঙ্গি, সাম্রাজ্যবাদের পুতুল মাহমুদ আব্বাস, হোসনী মোবারক, নূরী আল মালিকী ও হামিদ কারজাইর চোখে তারা জঙ্গি হতে বাধ্য এবং উক্ত জঙ্গি দমনে প্রভু দেশকে আমন্ত্রণ জানাতে পুতুল সরকারসমূহ কমিটেড। অপরদিকে ডিকশনারীর শব্দার্থের প্রতি মনোযোগ দিলে দেখা যায়, যারা আতঙ্ক সৃষ্টি করে, যারা সংঘবদ্ধভাবে ভয় দেখাইয়া, চোখ রাঙাইয়া অপরকে শাসন করতে চায়, অপরের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব-আমিত্ব-মর্যাদা-অস্তিত্ব বিলীন করতে চায় তারা সন্ত্রাসী, যারা দেশে দেশে রক্তাক্ত সন্ত্রাস রফতানি করে মানব জীবনকে অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশায় নিমজ্জিত করছে তারা সন্ত্রাসী, তাদের এহেন কার্যাবলীর নাম টেররিজম। যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পরিচালিত বর্তমান 'ওয়ার অন টেরর'-এর কারণ ও অজুহাত বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই, ওয়ার অন টেরর শুরু করার নেপথ্য কারণ হলো বিশ্বব্যাপী জায়নবাদী আধিপত্য বাস্তবায়ন করা। যুক্তরাষ্ট্র-ভারত-ইইউ জায়নবাদের বাহন বা ঘোড়া মাত্র। ওয়ার অন টেরর-এর প্রকাশ্য অজুহাত হলো– মুসলিম নামধারী সন্ত্রাসী কর্তৃক নাইন-ইলেভেনের টুইন টাওয়ার হামলা। অথচ বর্তমানে আমরা জানতে পেরেছি যেহেতু তেলসমৃদ্ধ ও ভূ-গুরুত্বপূর্ণ মুসলিম বিশ্ব দখল করা জায়নবাদীদের আপাতঃ টার্গেট সেহেতু সিআইএ-মোসাদ সৃষ্ট মুসলিম নামধারী সন্ত্রাসীদের দ্বারা টুইন টাওয়ার হামলা সংঘটিত করা হয়েছিল।

টুইন টাওয়ার হামলার পোস্টমর্টেম

১. ক্রিসেন্ট ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন, ডিসেম্বর ২০০৮ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে– ইসরাইলের মোসাদের পক্ষে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে সিরীয় সীমান্তের বেকা উপত্যকায় লেবাননী সৈন্যরা আলী এবং ইউসুফ জারবাহ নামে দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে। তাদের নিকট থেকে অত্যাধুনিক গোয়েন্দা সরঞ্জামাদি ও তথ্যাদি উদ্ধার করা হয়েছে। উক্ত আলী ৯/১১ হামলার কথিত বিমান ছিনতাইকারী জিয়াদ আল জাররাহর চাচা। বৈরুতের আরবী দৈনিক সাফির-এর মতে, উক্ত ব্যক্তিদ্বয় 'অপারেশন রোম' এবং হিজবুল্লাহর সিনিয়র সামরিক কমান্ডার ইসমাইল মুগনিয়াকে লেবাননে গাড়ি বোমা দ্বারা হত্যার সাথে জড়িত

www.pathagar.com

ছিল। তদন্তকারীরা বলেছেন, সিরীয় সীমান্তে তৎপর ইসরাইলী মদদপুষ্ট ফিলিস্তনী গ্রুপ 'ফাতহুল ইনতেফাদা'র সদস্য ছিল উক্ত আলী ভ্রাতৃদ্বয়। (সূত্র : ক্রিসেন্ট ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন, ডিসেম্বর ০৮ সংখ্যা)

২. নিউইয়র্ক টাইমস সম্প্রতি লিখেছে, জিয়াদ আল জাররাহ্‌র কাজিন আল জাররাহ ১৯৮৩ সাল থেকে ফিলিস্তিন যোদ্ধা ও হিজবুল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে অন্তর্ঘাতি তৎপরতা চালাচ্ছে। ইসরাইল নিজেদের অপকর্ম ঢাকতে আরব-লেবাননী যুবকদেরকে অর্থের বিনিময়ে রিক্রুট করে সন্ত্রাসী কার্যক্রম পরিচালনা করছে। নিউইয়র্ক টাইমস আরও লিখেছে, টুইন টাওয়ারে হামলার খবরে ফ্লাইট-১১ এবং ফ্লাইট-১৭৫ এর যাত্রী ৫ ইসরাইলী উল্লাস প্রকাশ করায় তাদেরকে সন্দেহভাজন হিসেবে আটক করা হয়। ৭১ দিন পর ইসরাইলী চাপে তাদেরকে মুক্তি দেয়া হয়। উক্ত ৫ জনের ২ জন মোসাদ-এর সার্ভিলেন্স টিমের সদস্য। হোয়াইট হাউসের নির্দেশে সিআইএ ৯/১১ ঘটনায় ইসরাইলী সম্পৃক্ততা আড়াল করেছে।

৩. ইতালীর স্থানীয় 'কোরিয়ার ডে-লা-সেরা' পত্রিকা লিখেছে, 'ইতালীর সাবেক প্রধানমন্ত্রী ফার্নেসকো কেসিগো বলেছেন, ৯/১১ এর ঘটনা মোসাদ-সিআইএ-এর যৌথ প্রযোজনার ফসল।

৪. ইসরাইলী টেলিকম ফার্ম 'অভিগো'র সার্বক্ষণিক বার্তায় টুইন টাওয়ারে হামলার ২ ঘণ্টা পূর্বে বিষয়টি অবহিত হয়। ফলে ৯/১১ হামলার সময় কোনো ইহুদী টুইন টাওয়ারে ছিল না। এই হামলা সম্পর্কে ইসরাইলী সরকার আগে-ভাগে জানত বিধায় ইসরাইলী প্রধানমন্ত্রীর নিউইয়র্ক সফর আকস্মিকভাবে বাতিল করা হয়। (সূত্র : দৈনিক সংগ্রাম, ১১/০৫/০৯ইং)

মার্কিন আগ্রাসী শক্তি ইতিপূর্বে কম্যুনিজম প্রতিরোধের নামে পৃথিবীর দেশে দেশে আগ্রাসন পরিচালনা করেছে। তখন মুসলিম কমরেডগণ ছিল মার্কিনীদের শক্র আর ইসলামপন্থীরা ছিল মার্কিন বন্ধু। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর রক্ত পিপাসু-যুদ্ধবাজ মার্কিনীদের প্রয়োজন হয়ে পড়ে নতুন শক্রর। কেননা রক্ত ও অস্ত্র ব্যবসাই মার্কিনীদের আজীবন পেশা। এ পেশাকে টিকিয়ে রাখতে কমরেডগণকে বন্ধু বানানো হয়েছে আর মুজাহিদদেরকে জঙ্গি আখ্যা দেয়া হয়েছে।

জঙ্গিবাদের প্রজনন কেন্দ্রের সন্ধানে

জঙ্গিবাদের প্রজনন কেন্দ্রে মানুষ পয়দা করা হয় না। নিপিড়িত, লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, অত্যাচারিত, দরিদ্র ও বেকার যুবকদেরকে বিভ্রান্ত করে তাদের মধ্যে প্রতিশোধস্পৃহা জাগিয়ে তোলা হয়, তাদের মনে রঙিন স্বপ্নের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করা হয় এবং তাদেরকে অস্ত্র-অর্থ-প্রশিক্ষণ দিয়ে দেশে দেশে সংঘাত সৃষ্টি করা হয়। উক্ত সংঘাত নির্মূলের নামে জঙ্গিবাদের গডফাদারগণ সংশ্লিষ্ট দেশকে চাপ

www.pathagar.com

দিয়ে কাঙ্ক্ষিত সুবিধা আদায় করে নেয় অথবা সংশ্লিষ্ট দেশে হামলা করে জনপ্রাণী নিশ্চিহ্ন করে দেশের সকল সম্পদ ও সম্ভাবনা গ্রাস করা হয় এবং নিজেদের আধিপত্য সম্প্রসারণ করা হয়।

স্যামুয়েল হান্টিংটনের সভ্যতার সংঘাত থিওরী রচনার পূর্বে এবং সিনিয়র বুশের Clash of Civilization তত্ত্ব ফেরি করার পূর্বে মুসলিম বিশ্বে কোনো জঙ্গি ছিল না– ছিল শুধু ফিলিস্তিনী প্রতিরোধ যোদ্ধা ও কাশ্মীরী মুজাহিদ। উক্ত সভ্যতার সংঘাত তত্ত্ব বাস্তবায়ন করতে গিয়ে ৯/১১-এর আয়োজন করা হয় এবং তারপর থেকে পৃথিবীর সকল মুসলিম দেশ জঙ্গিময় হয়ে যায়। শুরু হয় সন্ত্রাসী দমনের নামে রক্তাক্ত আগ্রাসন ও হত্যাযজ্ঞের অবিরাম কার্যক্রম। নিজেদের সৃষ্ট জঙ্গি দমনের অজুহাতে জঙ্গির বাপ-দাদার ভিটেমাটি কেড়ে নেওয়ার প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। বর্তমান ওয়ার অব টেরর-এর গডফাদার হলো জায়নবাদী ইহুদীরা এবং তাদের বরকন্দাজ হলো যথাক্রমে যুক্তরাষ্ট্র-ভারত এবং ইইউ। জঙ্গিবাদের লালন-পালন ও বিকাশে তাদের ব্যাপক ভূমিকার সংক্ষিপ্তসার এখানে উল্লেখ করা হলো।

সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহের জঙ্গি প্রজনন কেন্দ্রের ঠিকানা

১. ২০০৪ সালের মাঝামাঝি বালুচিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী জাম ইউসুফ বলেন, ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' বালুচিস্তানের বিভিন্ন স্থানে ৩০-৪০টি জঙ্গি ঘাঁটি পরিচালনা করছে। ভারত প্রত্যেক টেররিস্টকে প্রতিমাসে ১০ হাজার টাকা বেতন প্রদান করে। ২৯/১২/২০০৫ সালে প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশাররফ বালুচিস্তানে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টিতে প্রতিবেশী দেশের হাত রয়েছে বলে অভিযোগ করেন। (সূত্র : Dr. Mahboob Hossain, India Behabior, (The Nation, Jan, 23, 06, See Also Muhammad Tahir, Tribes & Rebells The Players in the Balochistan Insurgencey (The James town Foundation, April-3, 08)

২. পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা বিষয়ক মুখপাত্র মেজর জেনারেল শওকত সুলতান এবং তথ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী দুররানী ৪ সেপ্টেম্বর ২০০৬ সালে মিডিয়াকে বলেন, ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' বিপুল পমিরাণ অর্থ ও অস্ত্র (যার মধ্যে ভূমি থেকে আকাশে নিক্ষেপযোগ্য SAM মিসাইল ও ১০৭ মি.মি. রকেটও রয়েছে) সরবরাহ করে বালুচিস্তানকে অস্থিতিশীল করে তুলছে। জেনারেল সুলতান আরো বলেন, আফগানিস্তানের কান্দাহারস্থ কনস্যুলেট ও ইরানের জাহিদানস্থ ভারতীয় কনস্যুলেট থেকে পাকিস্তানী জঙ্গিদেরকে ভারত অস্ত্র-শস্ত্র সরবরাহ করছে। ভিন্ন প্রেস ব্রিফিংয়ে পাকিস্তানের পররাষ্ট্র বিষয়ক মুখপাত্র তাসনীম আলম বলেন, 'ভারত আফগান ভূখণ্ড থেকে পাকিস্তান বিরোধী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে।' (সূত্র : PTI- Weapon Supply routes to

www.pathagar.com

Balochistan sealed, Pak Govt. (The Hindu Sept. 5, 06) Hindustan Times, Sept. 5, 06/ Hindustan Times Sept. 8, 06 (The Jamestown Foundation, Nov. 16, 06)

৩. বালুচ লিবারেশন আর্মী নেতা আকবর বুগতি, বালাচ মারী এবং তেহেরিক তালিবান পাকিস্তান নেতা আবদুল্লাহ মেহসুদ, তার কাজিন বায়তুল্লাহ মেহসুদ, আবদুর রশীদ গাজীসহ পাকিস্তানের বর্তমান আলোচিত জঙ্গি নেতৃবৃন্দের অস্ত্র-অর্থ, প্রশিক্ষণের দায়িত্ব পালন করছে যুক্তরাষ্ট্র-ভারত-ইসরাইল-বৃটেন ও জার্মানী। ইসলামাবাদের লাল মসজিদে সেনাবাহিনীর অভিযানে ক্ষুব্ধ সাধারণ মুসলমানদের ক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে উক্ত সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ সাধারণ মুসলমানদেরকে জঙ্গি বানিয়ে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাজে লাগাচ্ছে। উক্ত জঙ্গিদেরকে সরবরাহকৃত যোগাযোগ সরঞ্জাম পাকিস্তানকে সরবরাহকৃত যোগাযোগ সরঞ্জামের চেয়ে বেশি আধুনিক। উক্ত শক্তিসমূহ পাকিস্তানকে ধ্বংস করার জন্য আল কায়েদাসহ অন্যান্য ইসলামী আন্দোলনকে অস্ত্র-অর্থ সরবরাহ করছে। (সূত্র : The India Doctrine, 2nd edition 08, M.B.I. Munshi, page 592-93)

৪. **তাবলীগ জামাত ইন্ডিয়া ও ইসরাইল :** নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওয়াশিংটন থিংক ট্যাংকে কর্মরত একজন মার্কিন বিশ্লেষক তাঁর এক পাকিস্তানী বন্ধুকে এই মর্মে একটি ই-মেইল বার্তা পাঠান যে, তাঁর ভাষায়– "২০০৭ সালের শুরুতে আমার ইসরাইল সফরের সময় আমি জানতে পারি যে, ইসরাইল হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে হাইফা শহরে একটি ইসলামী স্কুল অব ফিকাহ্ পরিচালনা করে। উক্ত শরীয়াহ (ফিকাহ্) স্কুলে ভারতীয় ও পাকিস্তানী বংশোদ্ভুদ মুসলমানরা প্রশিক্ষণ নিয়ে তাবলীগ জামাতে শামিল হয়ে ভারতের বিভিন্ন মুসলিম সংস্থা ও মধ্য এশিয়ার মুসলমান সংস্থায় কাজ করে। আফগানিস্তানে ভারত-ইসরাইল কর্মকাণ্ডের অধীনে এ তৎপরতা পরিচালিত হয়।" (সূত্র : ঐ, পৃ. ৬০০)

৫. যুক্তরাষ্ট্র-ভারত-বৃটেন-জার্মানীসহ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ তাদের আফগানিস্তানে অবস্থিত ঘাঁটি থেকে পাকিস্তানী উপজাতীয় এলাকায় নাশকতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। অনেক পাকিস্তানী ও আফগান তালেবান আত্মসমর্পণ করার পর জিজ্ঞাসাবাদে বলেছে– প্রধানত পাকিস্তানে হামলা পরিচালনা করার জন্য ভারতীয় ও আফগান কর্মকর্তারা আফগানিস্তানে প্রশিক্ষণ শিবির পরিচালনা করছে।" (সূত্র : Happymoon Jacob, 24.3.07, www.orgonline.org)

৬. ২০০৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ভারতের Out Look Magazine-এর সাথে সাক্ষাৎকারে ভারতস্থ ইসরাইলী রাষ্ট্রদূত মার্ক সোফার বলেন, "ভারত

www.pathagar.com

১৯৮০'র দশক থেকে সিন্ধু প্রদেশে বিচ্ছিন্নতাবাদী জঙ্গি চাষাবাদ কার্যক্রম চালু করেছে।"

৭. পাকিস্তানের অভ্যন্তরে ও বাইরে বসবাসরত সিন্ধী হিন্দুদেরকে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা অস্ত্র-অর্থ-প্রশিক্ষণ দিয়ে বিচ্ছিন্নতাবাদে মদদ দিচ্ছে। ভারতীয় মদদপুষ্ট দল 'Sindhu Desh Movement' অর্থ দিয়ে সমর্থক ও অস্ত্র কিনে এবং পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর ছবি সরিয়ে এম কে গান্ধীর ছবি স্থাপনের কাজে নিয়োগ করে গরীব কৃষকদের। (সূত্র : The India Doctrine, MBI Munshi, 2nd edition, Page 573-574)

৮. ভারত নিজ ভূখণ্ডে তামিল গেরিলাদল এলটিটিইকে প্রশিক্ষণ দিয়ে শ্রীলঙ্কায় তামিলদের পৃথক রাষ্ট্রের দাবিকে সমর্থন করে। (সূত্র : সুনীল জয়াশ্রী, The New Nation, June 10, 07)

৯. পাকিস্তানী, তিব্বতী, বাংলাদেশী ভিন্নমতাবলম্বীদের ন্যায় ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' তামিলদের অতি গোপনীয় 'চক্রথা' সামরিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ প্রদান করে। (সূত্র : টি, সাবারত্নম, পিরাপাহারান, ভলিউম-১, চ্যাপ্টার-২৮)

১০. ভারতীয় দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে কাশ্মীরী মুজাহিদদেরকে বিভ্রান্ত করে আন্দোলনকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার জন্য ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' কাশ্মীরীদের মধ্য থেকে জনবল সংগ্রহ করে জঙ্গি জিহাদী গ্রুপ গঠন ও পরিচালনা করে। (The India Doctrine Do, Page 571)

১১. জামায়াতুল মুজাহেদীন বাংলাদেশ বা জেএমবি'র কেন্দ্রীয় নেতা আবদুর রহমান ও বাংলাভাই এর গ্রেফতারের পর প্রকাশ হয়ে পড়ে যে, ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা জেএমবিকে অস্ত্র, প্রশিক্ষণ ও নিরাপদে সীমান্ত পারাপারের ব্যবস্থা করে। জেএমবি'র বিভিন্ন আস্তানা থেকে উদ্ধারকৃত অস্ত্র ও বিস্ফোরকের গায়ে ভারতীয় সমরাস্ত্র কারখানার সীল ছিল। (সূত্র : Holiday, July 21, 06/ PROBE, June 15-21, 06)

১২. জেএমবি'র সহযোগী সংগঠন হিসেবে পরিচিত হুজি-বি এর আমীর মুফতি হান্নান গ্রেফতার হওয়ার পর স্বীকারোক্তি প্রদান করেছেন যে, 'সকল গ্রেনেড ভারত থেকে সরবরাহ করা হয়েছে।' (সূত্র : PROBE, Feb. 16-22)

১৩. ইসরাইলের সহযোগীতায় ও পরামর্শে ভারত ১৯৯০-এর দশক থেকে মুসলমানদের বিভিন্ন দল-উপদলে ও ধর্মীয় গোষ্ঠীতে অনুপ্রবেশ করে সংঘাতময় পরিস্থিতি সৃষ্টি করে এবং উক্ত দল-উপদলের মধ্য থেকে জনবল সংগ্রহ করে প্রশিক্ষণ দিয়ে তালেবানদের ভেতরে অনুপ্রবেশ করে। বিংশ শতকের প্রথম অর্ধাংশে ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থা ও ইসরাইল অনুরূপ কৌশল

www.pathagar.com

অবলম্বন করা শুরু করে, যা পরবর্তীতে প্রকাশিত হয়। (সূত্র : The India Doctrine, Do, Page 600)

১৪. পাকিস্তানের সাবেক সেনাপ্রধান জেনারেল আসলাম বেগ (২৬.৩.০৮) পত্রিকায় Pakistanis Foil one Conspiracy, To check Another one is Afganistan শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন, যার সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ :

আফগানিস্তানে এংলো-আমেরিকান দখলদারিত্বের পর জাবাল-উস-সিরাজে C.I.A./RAW/MOSSAD/MI-6 (বৃটেন) এবং BND (German Intelligence) গোয়েন্দা সংস্থাসমূহ সুবিশাল ও অত্যাধুনিক গোয়েন্দা ঘাঁটি স্থাপন করে। উক্ত কেন্দ্র থেকে পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে জঙ্গি তৎপরতা বিস্তারের লক্ষ্যে ৪টি আউটপোস্ট স্থাপন করা হয়। উক্ত ৪টি আউটপোস্ট হলো :

ক. **সারোবী এবং কান্দাহারের অগ্রবর্তী ঘাঁটি :** সারোবীতে এর মূল কেন্দ্র অবস্থিত। এর অধীনে রয়েছে কান্দাহার, গজনী, খোস্ত, গারদেজ, জালালাবাদ, আসাদাবাদ, ওয়াখান ও ফয়েজাবাদ ঘাঁটি। সারোবী ঘাঁটির দায়িত্বে রয়েছেন একজন ভারতীয় কর্মকর্তা, যিনি Border Road Organization (BRO) পরিচালনা করেন। সারোবী কেন্দ্র থেকে পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে জঙ্গি সরবরাহ করা হয়। পাকিস্তানের ভিন্নমতাবলম্বীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে NWFP অঞ্চলে পাঠানো হয় নাশকতা সৃষ্টির জন্য। কান্দাহারের ঘাঁটির অধীনে রয়েছে লস্করগাহ ও নাওয়াহতে আরও ২টি ঘাঁটি। বালুচ ভিন্নমতাবলম্বীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে বালুচিস্তানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ও বালুচিস্তান উপকূলের গভীর সমুদ্র বন্দর 'গোয়াদর' সানডাক ও হাবে চীন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পে বাধাদানের কাজে ব্যবহার করা হয়।

খ. **ফয়েজাবাদ (বাদাখশান) ঘাঁটি :** এ ঘাঁটি থেকে চীন, তাজিকিস্তান ও উজবেকিস্তানে জঙ্গি সরবরাহ করা হয়। তাজিকিস্তান-উজবেকিস্তান ও চীনের ঝিনঝিয়াং প্রদেশের ভিন্নমতাবলম্বী মুসলিম যুবকদেরকে অস্ত্র-অর্থ-প্রশিক্ষণ দিয়ে জঙ্গিবানানো হয় এবং অপারেশনে পাঠানো হয়। ভারতের ৪০০ মুসলিম সৈন্য, বহু সংখ্যক প্রকৌশলী ও শ্রমিক এ কেন্দ্র পরিচালনা করে। উর্দুভাষী ভারতীয় মুসলিম উলেমারা এসব জঙ্গিদের মানসিক মোটিভেশনের কাজ করে এবং ধারণা দেয়া হয় যে, পাকিস্তানই এ ঘাঁটির সঙ্গে জড়িত। (সম্ভবতঃ ইসরাইল পরিচালিত হাইফার স্কুল অব ফিকাহর প্রশিক্ষিত ব্যক্তিরাই এসব কেন্দ্রে মোটিভেশনের কাজ করে–লেখক)।

(বাংলাদেশের জেএমবি জঙ্গিদের মোটিভেশনেও আমরা ২ জন ভারতীয়

www.pathagar.com

উলেমার নাম জানতে পারি। তাদের একজন ২৪ পরগনার মাওলানা মহসিন ভাদুরিয়া এবং অন্যজন বশিরহাটের মাওলানা আবদুল মাকিত সালাফী। প্রথমজন ২৪ পরগনায় 'র' পরিচালিত জেএমবির ৯টি প্রশিক্ষণ ঘাঁটির সাথে জড়িত। –লেখক)

গ. **মাজার-ই-শরীফ ঘাঁটি :** তুর্কমেনিস্তান ও চেচনিয়ার ভিন্নমতাবলম্বীদের এ ঘাঁটিতে প্রশিক্ষণ দিয়ে সংশ্লিষ্ট অঞ্চল ও রাশিয়ায় নাশকতার জন্য পাঠানো হয়। সাবেক সোভিয়েত রাশিয়ার আফগান সহযোগী ওয়ারলর্ড রশীদ দোস্তাম ও আহমদ জিয়া মাসুদ এ কেন্দ্র থেকে উজবেকিস্তান ও তাজিকিস্তানে কার্যক্রম পরিচালনা করে। এ গোয়েন্দা ঘাঁটিটি C.I.A./RAW/ MOSSAD/এবং BND (German) যৌথভাবে পরিচালনা করে।

ঘ. **হিরাত ঘাঁটি :** C.I.A./RAW/MOSSAD যৌথভাবে এই ঘাঁটি পরিচালনা করে। এ ঘাঁটির অধীনে ফারাহ্ ঘাঁটি এবং পাকিস্তানের অভ্যন্তরে কালামাত, জিওয়ানী ও মান্দ ঘাঁটি কার্যক্রম পরিচালনা করে। ইরানের অভ্যন্তরে নাশকতা সৃষ্টির জন্যই মূলত এসব ঘাঁটিসমূহ ব্যবহৃত হয়। ইরানের অভ্যন্তরে তৎপরতায় লিপ্ত জঙ্গি গোষ্ঠী 'জান্দাল্লাহ' হিরাত ঘাঁটির অধীনে কাজ করে।

(তথ্য সূত্রঃ http://www.ahmedquraishi.com/ article_detail. php?id =252)

এংলো-আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পুতুল হামিদ কারজাই উপরোক্ত গোয়েন্দা ঘাঁটি (জঙ্গি প্রজনন কেন্দ্র)সমূহকে কনস্যুলেটের মর্যাদা দিয়ে একটি কূটনৈতিক রক্ষাকবচ পরিয়েছেন। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির তাবেদার সরকারসমূহ এইভাবে জঙ্গি প্রজনন কেন্দ্র পাহারায় ও জঙ্গিগোষ্ঠী বিস্তারে প্রভুর সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে। যে সকল সরকার নিজ দেশে বিদেশী সেনাঘাঁটি স্থাপন করতে চায় তারা মূলত শুধুমাত্র ক্ষমতার লোভে নিজ দেশে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি কর্তৃক জঙ্গি প্রজনন কেন্দ্র স্থাপন করে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণকে ধ্বংস করতে চায়।

১৫. পাকিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি সামরিক ঘাঁটি রয়েছে। পাকিস্তানের আকাশসীমা নিয়ন্ত্রণ করে যুক্তরাষ্ট্র। উক্ত ঘাঁটির মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের বিভিন্ন গোষ্ঠীকে অস্ত্র-অর্থ ও ট্রেনিং দিয়ে পাকিস্তানে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টিতে ব্যবহার করে। (সূত্র : উইলিয়াম আরকিন, ওয়াশিংটন পোস্ট, ডিসেম্বর ০৭)

১৬. পাকিস্তানকে অস্থিতিশীল করতে যুক্তরাষ্ট্র পারভেজ মোশাররফ অথবা বেনজির ভুট্টোর মধ্যে একজনকে হত্যার সিদ্ধান্ত নেয় এবং বেনজির নিহত হন। (সূত্র : Larry Chin, Global Research, 29.12.07)

www.pathagar.com

১৭. ১১ মার্চ ২০০৯ তারিখে যুক্তরাষ্ট্রের মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত এক সেমিনারে আমেরিকার অনুসন্ধানী রিপোর্টার পুলিৎজার পুরস্কার বিজয়ী সিমুর হার্শ বলেছেন, প্রেসিডেন্ট বুশের ভাইস প্রেসিডেন্ট ডিক চেনী পরিচালিত 'নির্বাহী আততায়ী চক্র' বেনজির ভুট্টো, রফিক হারিরী ও লেবাননের সেনাপ্রধানকে হত্যা করে। আল কায়েদা কর্মী ওমর শেখ সাঈদ কর্তৃক ওসামা বিন লাদেনের নিহত হওয়ার খবর ফাঁস করায় বেনজিরকে এবং লেবাননে মার্কিন ঘাঁটি স্থাপনে অনুমতি না দেয়ায় প্রেসিডেন্ট হারিরী ও সেনাপ্রধানকে হত্যা করা হয়। শেষোক্ত ঘটনায় ইসরাইলী প্রধানমন্ত্রী এরিয়েল শ্যারন জড়িত ছিল। (সূত্র : দৈনিক আমার দেশ, ২০.০৫.০৯)

১৮. সিআইএ পাকিস্তানী গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআইকে পরিচালনা করে। আইএসআই আল কায়েদাকে সহায়তা করে প্রভুর নির্দেশে। সত্যিকার অর্থে আল কায়েদা সিআইএ'র Brain Child.

(সূত্র : Michel Chossudovsky, Author, Global Research)

(বেনজির, রফিক হারিরী ও লেবাননের সেনাপ্রধানের মৃত্যুর ঘটনা থেকে আমরা এই শিক্ষা পাই যে, যারা একবার সাম্রাজ্যবাদের দালালের খাতায় নাম লেখায় তাদেরকে প্রভুর নির্দেশে প্রভুর পালিত সন্ত্রাসী বা আততায়ী কর্তৃক নিহত হওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়। উপরোক্ত তিনজনই সাম্রাজ্যবাদী আকাঙ্ক্ষা মেটাতে নিজ দেশ ও জনগণের ব্যাপক ক্ষতি সাধনে লিপ্ত ছিলেন। বাংলাদেশের কেউ যদি শুধুমাত্র ক্ষমতার লোভে সাম্রাজ্যবাদের দালালের খাতায় নাম লিখিয়ে থাকেন তবে তাঁর বা তাদের পরিণতিও অনুরূপ হতে বাধ্য। কেননা, সাম্রাজ্যবাদের দৃষ্টিতে দালালগণ টয়লেট পেপার মাত্র। -লেখক)

সাম্রাজ্যবাদী শক্তির জঙ্গি সংগ্রহের ক্ষেত্রসমূহ

সীমাহীন জুলুম, নির্যাতন, অপমান, লাঞ্ছনার শিকার ব্যক্তিরা যখন ন্যায়বিচারের জন্য কোনো আদালত পায় না, মাথা গোঁজার ঠাঁই পায় না, ক্ষোভ প্রকাশের পথ পায় না, আশা-ভরসা-সান্ত্বনার বাণী পায় না- তখনই উক্ত ব্যক্তিগণ প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে উঠেন। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির এজেন্টগণ এহেন ক্ষুব্ধ ব্যক্তিদের আশ্রয় প্রদান, লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং তার ক্ষোভকে বহুগুণ বর্ধিত করে অস্ত্র-অর্থ-প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রতিশোধমূলক কাজে লিপ্ত করায় এবং উক্ত ব্যক্তির নাম দেয় জঙ্গি। এ জন্যই দেখা যায়, অপরাধী যে ধর্মের, সম্প্রদায়ের বা দলের হোক না কেন সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহ তাদেরকে আশ্রয় প্রদান করে এবং নিজের স্বার্থসিদ্ধির কাজে ব্যবহার করে। জাতিগত বিরোধ, সম্প্রদায়গত বিরোধ, সাম্প্রদায়িক বিরোধ, ভাষা-কৃষ্টি-সংস্কৃতিগত বিরোধ, ধর্মীয় ও দলীয় বিরোধকে উস্কে দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি নেপথ্যে উভয়পক্ষকে সহযোগিতা করে। ফলে উভয়

www.pathagar.com

পক্ষ রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। কয়েকটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি বোধগম্য হবে।

ইরাক : ইরাকের নিহত প্রেসিডেন্ট ছিলেন ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থার Brain Child। বিশ্বশক্তি হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের উত্থানের পর সাদ্দাম সিআইএ'র পক্ষপুটে আশ্রয় নেয়। সিআইএ ও মোসাদ-এর দিক-নির্দেশনায় সুন্নী সাদ্দাম নিজ দেশের শিয়া ও কুর্দীদের উপর অবর্ণনীয় জুলুম অত্যাচার করে। ক্ষুব্ধ শিয়া ও কুর্দীরা সাদ্দামের অত্যাচার থেকে বাঁচতে বন্ধু যুক্তরাষ্ট্রকে নিজ দেশে ডেকে আনে এবং ফুটন্ত কড়াই থেকে জ্বলন্ত উনুনে পতিত হয়। এ প্রসঙ্গে ০৬/০৫/২০০৯ইং তারিখে প্রচারিত Inside Story অনুষ্ঠানে সাবেক জাতিসংঘ দূত লাখদার ব্রাহিমী বলেন, ইরাকের প্রতিটি মিলিশিয়া গ্রুপকে মদদ দিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। শিয়া-সুন্নী-কুর্দী দ্বন্দ্ব-সংঘাত উস্কে দিয়ে ইরাককে খণ্ডিত করা হচ্ছে। এক সময় শিয়াদেরকে শক্তিশালী করে সুন্নীদের উপর হামলা করাচ্ছে অন্য সময় সুন্নীদের শক্তিশালী করে শিয়াদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণের ব্যবস্থা করছে। উক্ত অনুষ্ঠানে বিখ্যাত রিপোর্টার সিমুর হার্শ বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র নূরী আল মালিকীকে ভবিষ্যতের সাদ্দাম হিসেবে গড়ে তুলছে।

আফগানিস্তানের বিগত দিনের ইতিহাস দেখুন। সেখানে সুন্নী পশতুনরা সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং সে দেশের সরকার পরিচালনার দায়িত্ব পালন করতো পশতুনরা। সোভিয়েত ইউনিয়ন আফগানিস্তান দখল করার লক্ষ্যে সেখানকার জাতিগত সংখ্যালঘু তাজিক উজবেক ও শিয়াদের নিকট থেকে দালাল কমরেড সংগ্রহ করে এবং আফগানিস্তান দখল করে সংখ্যাগরিষ্ঠ পশতুনদের দেশ ছাড়া করে। সোভিয়েত শত্রু পশ্চিমা বিশ্ব ক্ষুব্ধ-অপমানিত পশতুনদের অস্ত্র-অর্থ-প্রশিক্ষণ দিয়ে এক সময় ক্ষমতায় বসায় এবং নিজ প্রয়োজনে পুনরায় সাবেক শত্রুপক্ষ জাতিগত সংখ্যালঘুদের ক্ষমতায় বসায় এবং আফগানিস্তান দখল করে বর্তমানে অসংখ্য জঙ্গি প্রজনন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে বিশ্বব্যাপী জঙ্গি সরবরাহ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। আর দোষ চাপাচ্ছে ঢালাওভাবে ইসলামের উপর– শান্তিপ্রিয় মুসলমানদের ঘাড়ে। পাকিস্তান, সুদান, সোমালিয়া, ইয়েমেন ও লেবাননের বেলায়ও একই ব্যবস্থা কার্যকর রেখেছে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি।

বাংলাদেশ সাম্রাজ্যবাদের জন্য কঠিন পরীক্ষা

অন্যান্য দেশে যে প্রক্রিয়ায় জঙ্গি সংগ্রহ করা হচ্ছে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তা সম্ভব হচ্ছে না। কেননা বাংলাদেশে কোনো জাতিগত, সম্প্রদায়গত, ধর্মীয়, ভাষাগত বিভেদ নেই। এখানে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই সমান অধিকার ভোগ করছে। এতদসত্ত্বেও সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এই একক জাতিসত্তাকে বিভাজন করার জন্য মতবাদগত অনৈক্য সৃষ্টি করেছে, যথা– ইসলামপন্থী- ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী, বাঙালি-বাংলাদেশী। এই কৃত্রিম বিভাজন বর্তমানে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের রক্তক্ষরণ ঘটাচ্ছে

www.pathagar.com

কিন্তু এরপরও পারস্পরিক বৈরিতাকে কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় উন্নীত করা যাচ্ছে না। এর মূল কারণ হলো একক জাতিসত্তা। এ জন্য দেখা যায়, ছোট ভাই মৌলবাদী হলেও বড় ভাই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী, পিতা বাঙালী হলেও ছেলে বাংলাদেশী। ফলে এই কৃত্রিম বিভাজন দ্বারা ব্যাপক সংঘর্ষের পরিস্থিতি সৃষ্টি করা যাচ্ছে না। এমতাবস্থায় জঙ্গি সংগ্রহের প্রচেষ্টায় সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যে সকল ষড়যন্ত্র করতে পারে তা নিম্নরূপ :

১. দেশের প্রধান দুই জোটকে মদদ দিয়ে সংঘর্ষে লিপ্ত করানো। (বি.দ্র. পাকিস্তান সরকারকে বালুচ লিবারেশন আর্মীকে দমানোর জন্য যুক্তরাষ্ট্র এফ-১৬ সরবরাহ করেছে, আর যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগী মিত্র ভারত, বৃটেন, জার্মানী বিমান বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র সরবরাহ করেছে বালুচ লিবারেশন আর্মীকে)।
২. বাঙালী ও ধর্মনিরপেক্ষ গোষ্ঠীকে অস্ত্র-অর্থ-প্রশিক্ষণ দিয়ে বাংলাদেশীদের উপর তীব্র হামলা পরিচালনা করতে পারলে ক্ষুব্ধ বাংলাদেশীরা হয়তো সাম্রাজ্যবাদী জোটের কারো সহায়তায় রুখে দাঁড়াতে পারে।
৩. দেশের অর্থনীতিকে ধ্বংস করার মাধ্যমে দুর্ভিক্ষ-হাহাকার সৃষ্টি করতে পারলে ক্ষুধার্ত মানুষের ক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ক্ষুধার্তদের অন্ন, অস্ত্র, প্রশিক্ষণ দিয়ে দেশবিরোধী কাজে নিয়োজিত করতে পারে।
৪. দেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে বেনজির-রফিক হারিরী কৌশলে মাইনাস করে দেশকে অস্থিতিশীল করে জঙ্গি সংগ্রহ করতে পারে।
৫. পলাতক বিডিআর/ ক্ষুব্ধ সেনা পরিবার ও বিডিআর পরিবারের সদস্যদের ক্ষোভকে উস্কে দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি কাজে লাগাতে পারে।
৬. নিরীহ মোল্লা-মওলবী, কওমী মাদ্রাসার তালেবানদের উপর মিথ্যা দোষ আরোপ করে তাদের উপর জুলুম-নির্যাতন করিয়ে জঙ্গি সংগ্রহের চেষ্টা করতে পারে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি।

বাংলাদেশের জঙ্গি উৎপাদন কারখানা– কারাগার

মুক্তিপ্রাপ্ত কয়েদী ও হাজতীদের মুখে শুনেছি, জেএমবি'র যে সকল সদস্য বর্তমানে কারাগারে বন্দী আছে তারা সেখানে অবাধে সদস্য সংগ্রহ করছে। নিরপরাধ যেসব ব্যক্তি বাংলাদেশ পুলিশের কল্যাণে হাজতী ও কয়েদী জীবন যাপন করছে তাদের ক্ষোভকে পুঁজি করে তাদেরকে মোটিভেট করে জেএমবির সদস্য করা হচ্ছে এবং দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসীদের কেউ কেউ জেল থেকে মুক্ত হওয়ার অর্থ সংগ্রহ করতে জেএমবির সদস্য হচ্ছে। কেননা, জেএমবি'র সদস্য হলে নাকি পরিবারের জন্য টাকা পাঠানোর ব্যবস্থাও করা হয়। সরকারের উচিত বিষয়টি খতিয়ে দেখে যথাযথ কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া।

www.pathagar.com

উপরোক্ত তথ্য-উপাত্তের মাধ্যমে জঙ্গি কাকে বলে, জঙ্গি প্রজনন কেন্দ্রের ঠিকানা, জঙ্গিদের গডফাদার, War on Terror-এর স্বরূপ, War on Terror-এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমরা সম্যক অবগত হলাম। এমতাবস্থায় আমাদের সুন্দর-শান্তিপ্রিয় দেশটি যাতে জঙ্গিময় না হয়, আমরা যেন ইরাক-আফগানিস্তান-পাকিস্তানের ন্যায় অবস্থার শিকার না হই তার জন্য সময় থাকতে দল-মত নির্বিশেষে সকল পক্ষকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে, প্রতিবেশীর ঘরে আগুন লাগলে সে আগুন এক সময় আমার ঘরেও লাগবে। আগুনের অসীম ধ্বংসলীলা থেকে কেউ রক্ষা পাবে না।

জঙ্গিবাদ নির্মূলে করণীয়

১. জায়নবাদী ইসরাইল ও জায়নবাদকে প্রতিরোধ করা।
২. যেসব দেশ জঙ্গি উৎপাদন এবং সরবরাহে লিপ্ত রয়েছে তাদের কার্যক্রম ও দূতাবাসসমূহ কঠোর নজরদারিতে রাখা।
৩. দেশে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি হয়, এমন কার্যক্রম থেকে বিরত থাকা এবং সরকারি ও বিরোধী দলের মধ্যে জাতীয় স্বার্থে সমঝোতা ও সমন্বয় সাধন।
৪. সকল দেশরক্ষা বাহিনীকে অধিকতর শক্তিশালী ও সজাগ করা।
৫. জাতীয় শত্রু-মিত্র চিহ্নিত করে জাতিকে জানানো।

এমতাবস্থায় জঙ্গিবাদের গডফাদার দেশের পক্ষ থেকে যখন বলা হবে অমুক দেশে জঙ্গি আছে এবং সরকারও যখন সাম্রাজ্যবাদীদের সুরে সুর মিলিয়ে বলবে, দেশে জঙ্গি আছে তখন ধরে নিতে হবে উক্ত দেশে জঙ্গি আছে অথবা উক্ত দেশে পাঠানোর জন্য ইতিমধ্যে একদল জঙ্গিকে প্রজনন কেন্দ্রসমূহে ট্রেনিং দিয়ে প্রস্তুত রাখা হয়েছে। সময়-সুযোগ মতো অথবা সরকারের সহায়তায় দেশে অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি করে উক্ত জঙ্গিদেরকে কাঁটাতারের বেড়ার ফাঁক দিয়ে পুশব্যাক করা হবে। সাম্রাজ্যবাদের সৃষ্ট ও পাঠানো উক্ত জঙ্গিরা যখন নিরীহ মানুষের উপর রক্তাক্ত হামলা পরিচালনা করবে সংশ্লিষ্ট তাবেদার সরকার তখন জঙ্গি হামলার অজুহাতে নিজ দেশের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ব্যক্তি ও দলকে নিশ্চিহ্ন করার কাজ শুরু করে দেশে গৃহযুদ্ধ পরিস্থিতি সৃষ্টি করবে। রক্তাক্ত গৃহযুদ্ধ থেকে উক্ত দেশকে বাঁচানোর নামে এবং নিজেদের সৃষ্ট জঙ্গি দমনের অজুহাতে গডফাদার দেশসমূহ সংশ্লিষ্ট দেশে সসৈন্যে হাজির হয়ে দেশ দখল, তাবেদার সরকার রক্ষা, গণহত্যা ও লুণ্ঠন শুরু করবে। এই হলো War on terror-এর নামে War for Terror & Roberry'র অনুসৃত নীতি।

দেবপাহাড়, চট্টগ্রাম, ১৯ মে ২০০৯

www.pathagar.com

মার্কিন টর্নেডো 'ওবামা'র গন্তব্য এবং দক্ষিণ এশিয়ার ভবিষ্যত

পৃথিবীর সকল ভূখণ্ডেই ঝড়, তুফান, হারিকেন, টর্নেডো আঘাত হেনে প্রতিনিয়ত জানমালের ক্ষতি করে থাকে। যে ভূখণ্ড ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ঝড়ের উৎপত্তি সাধারণত তার চেয়ে অনেক দূরে। আবহাওয়াবিদগণ ঝড়ের গতিপথ সম্পর্কে জনগণকে বারবার সতর্ক করে দেন, যাতে জনগণ পূর্ব প্রস্তুতি নিয়ে ঝড়ের ক্ষয়ক্ষতি থেকে আত্মরক্ষা করে। তীব্র হারিকেন-টর্নেডোর জন্ম হয় সাগর, মহাসাগরে। সবচেয়ে প্রলংকরী ঝড় ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্মস্থান হলো প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণ ভাগে– যেখানে সমুদ্র স্রোত ও তাপমাত্রার তারতম্যের কারণে এল্ নিনো ও লা-নিনা অবস্থার সৃষ্টি হয়। আবহাওয়াবিদগণ বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে ঝড়ের পূর্বাভাস দিয়ে থাকেন।

প্রাকৃতিক ঝড় অপেক্ষা শত-সহস্র গুণ ক্ষতিকারক ঝড়ের নাম রাজনৈতিক ঝড়। এ রাজনৈতিক ঝড়ের কেন্দ্রে থাকে ব্যক্তি ও দলবিশেষের ক্ষমতার লোভ এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের দেশ দখল ও সম্পদ লুণ্ঠনের আকাঙ্ক্ষা। বর্তমান এককেন্দ্রিক বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদী মোড়লের নাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এ দেশটি হতে বিশ্বের দেশে দেশে যে প্রলয়ংকরী ঝড় ধেয়ে আসে তারও একটি নাম দেওয়া যায়। পালাবদলের সাথে সাথে এর নাম পাল্টায়, কিন্তু চরিত্র পাল্টায় না, পাল্টানোর কোনো উপায়ও নেই। কেননা এই ঝড় নিজের ইচ্ছায় আসে না, এ ঝড়েরও একটি কেন্দ্র আছে যা দেখা যায় না। আমরা শুধু দেখি তার মুখটি এবং তার ধ্বংসলীলা। হ্যাঁ, এই ঝড়ের বা টর্নেডোর বর্তমান নাম 'ওবামা'। আর তার কেন্দ্র হলো যায়নবাদী চক্র। এই টর্নেডো কোনো অবস্থাতেই কেন্দ্রকে অমান্য করতে পারে না।

বাংলাদেশের সকল উচ্চতর শ্রেণীর রাষ্ট্রবিজ্ঞান বইতে লেখা রয়েছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রেসিডেন্ট। অথচ যারা মূল বিষয়টি জানেন তাদের দৃষ্টিতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট পৃথিবীর সবচেয়ে অসহায় প্রেসিডেন্ট। তিনি শুধুমাত্র যায়নবাদী ইহুদীচক্রের মাউথপিস ও সচিব মাত্র। ছোটবেলায় রূপকথার গল্পে শুনেছিলাম, এক রাজকন্যাকে বিশাল এক দৈত্য অপহরণ করে সাত সমুদ্র তের নদীর ওপারে বন্দি করে রেখেছিল। রাজকুমার উক্ত রাজকন্যাকে উদ্ধার করতে দৈত্যপুরীতে গিয়ে হাজির হলো এবং দৈত্যকে হত্যা করার প্রস্তুতি গ্রহণ

www.pathagar.com

করেন। রাজকুমারী বিষয়টি জানতে পেরে রাজকুমারকে বলেন, দৈত্যের প্রাণ দৈত্যের দেহে নাই– অমুক জায়গায় গেলে দেখবেন সোনার খাঁচায় একটি কালো ভোমর আছে, উক্ত ভোমরকে হত্যা করলে দৈত্য মারা যাবে।

২০০৮ সালের ডিসেম্বর মাসে উক্ত গল্পের সত্যতা প্রত্যক্ষ করলাম। বিষয়টি এই– তখন ইসরাইল গাজায় নৃশংস হামলা পরিচালনা করছে, নিরাপত্তা পরিষদ এ বিষয়ে একটি প্রস্তাব পাস করার জন্য জাতিসংঘে বৈঠকরত। হঠাৎ মার্কিন দৈত্য বুশের পিএস-এর মোবাইল বেজে উঠলো– অপর প্রান্তে ইসরাইলী প্রধানমন্ত্রী এহুদ ওলমার্ট। দৈত্যের পিএস জবাব দিলেন– প্রেসিডেন্ট গুরুত্বপূর্ণ সভায় বক্তৃতা দিচ্ছেন। ওলমার্ট পাল্টা ধমক দিয়ে বলেন, রাখো তোমার বৈঠক– এখনি আমার সাথে কথা বলতে বল। আশ্চর্য! বিরাট মার্কিন দৈত্য বৈঠক মুলতবী করে তার গডফাদারের নির্দেশ শুনলেন এবং নিরাপত্তা পরিষদ যাতে ইসরাইলের বিরুদ্ধে কোনো প্রস্তাব গ্রহণ না করে তার ব্যবস্থা করলেন। প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন যখন ফিলিস্তিনীদের প্রতি কিছুটা সহানুভূতি প্রদর্শনের চেষ্টা করেন তখনই তাকে মনিকা কেলেঙ্কারীতে জড়িয়ে হেনস্থা করা হয়। বর্তমান মার্কিন টর্নেডো 'ওবামা'র গতিপথও নির্ধারণ করবে নেপথ্যের শক্তি যা সকল মার্কিন প্রেসিডেন্টের ভাগ্যলিপি। মার্কিন জাতি, এর মানস ও নেপথ্যের পরিচালক সম্পর্কে ধারণা লাভ করলে 'ওবামা'র গতিপথ কি হতে পারে তা আন্দাজ করা যাবে।

১৪৯২ সালের ১২ অক্টোবর স্পেনের নাবিক ও জলদস্যু কলম্বাস আমেরিকায় পদার্পণ করে। ১৫০২ সালে ইতালীর কসাই আমেরিগো ভেসপুচির নেতৃত্বে স্থলদস্যু-জলদস্যু, জেল পলাতক আসামী, নির্বাসন দণ্ডের আসামি, বেকার, ভবঘুরের দল আমাজন নদী অববাহিকায় পদার্পণ করে। পরবর্তীতে ইউরোপের বখে যাওয়া লোকেরা ভাগ্যান্বেষণে মার্কিন মুলুকে পৌছে। তারাই মার্কিন জনগোষ্ঠীর মূল অংশ। এরা পরবর্তীতে ১৪ মিলিয়ন আফ্রিকাবাসীকে দাস হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে যায় এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশ থেকে দাস হিসেবে অনেককে ধরে নিয়ে যায়। ১৪৯২ সাল থেকে ১৯১০ সাল পর্যন্ত সাদা চামড়ার এই জনগোষ্ঠী সমগ্র উত্তর আমেরিকার আদিবাসীদের নৃশংসভাবে হত্যা করে তাদের নিকট থেকে তাদের দেশ ছিনিয়ে নেয়। ১৭৭৬ সালে ইতিমধ্যে স্থায়ী হওয়া মার্কিন অধিবাসীদের নিকট শাসন ক্ষমতা প্রত্যার্পণ করে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী নিজ দেশে চলে আসে। তখন থেকে ১৯০৩ সালের মধ্যে মার্কিন ভূখণ্ডের প্রকৃত নাগরিক রেড ইন্ডিয়ানদের কাছ থেকে অঞ্চল ছিনিয়ে নেয়া, তাদের ঘরবাড়ি ধ্বংস করা ও তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করার মাধ্যমে বর্তমান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অস্তিত্ব লাভ করে। মার্কিনীদের জাতীয় চরিত্র সম্পর্কে বিখ্যাত পশ্চিমা লেখক **মেইল ভিল বলেন,** "স্বাধীন আমেরিকা এমন একটি আত্মপূজারী দেশ, যার কোনো মূলনীতি নেই। তার ধরন চোর ও ডাকাতের ন্যায়– যার চাহিদা সীমাহীন। বাহ্যত আমেরিকা সভ্য

www.pathagar.com

হওয়ার দাবি করে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা একটি জংলী বর্বর দেশ। (সূত্র : বিশ্বায়ন : সাম্রাজ্যবাদের নতুন স্ট্রাটেজী, ইয়াসীর নাদিম, অনুবাদ : শহীদুল ইসলাম ফারুকী, পৃ. ৯৭)।

এফ. হেনরী লিখেছেন, "মার্কিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরই রেড ইন্ডিয়ানদের কাছ থেকে তাদের অঞ্চল ছিনিয়ে নিয়ে তাদেরকে বেছে বেছে হত্যা করা হয়েছিল।" (সূত্র : ঐ, পৃ. ৯৫)।

মার্কিন অর্থনীতি হলো যুদ্ধ অর্থনীতি

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সূচনাকাল থেকে এমন একটি বছরও পাওয়া যাবে না যখন তারা পৃথিবীর কোথাও না কোথাও যুদ্ধ ও লুটতরাজে লিপ্ত ছিল না। যুদ্ধ ও লুণ্ঠনের মাধ্যমেই মার্কিনীরা নিজেদের অর্থনীতিকে পরিপুষ্ট ও সচল রাখে। যুদ্ধ করার জন্য মার্কিনীরা একটি সম্পদপূর্ণ অঞ্চল বা দেশকে টার্গেট করে, অতঃপর টার্গেটের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালায় এবং এক পর্যায়ে হামলা ও লুটপাট করে। এ প্রসঙ্গে ২টি উদাহরণ দেয়া হলো :

১. মার্কিন নীতিনির্ধারক ও বুদ্ধিজীবী স্যামুয়েল হান্টিংটন ১৯৯৩ এর জুন সংখ্যায় 'ফরেন অ্যাফেয়ার্স' পত্রিকায় লিখেন : "সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর পশ্চিমা জগতের এক নতুন শত্রুর প্রয়োজন ছিল। কারণ যুদ্ধ কখনো থেমে থাকবে না।... নতুন শত্রু ইসলামী বিশ্বও হতে পারে, চীনও হতে পারে।

২. ওবামার পূর্বসূরি বুশ ইহুদী-খ্রিস্ট ইউনিয়নের অধিবেশনে প্রদত্ত ভাষণে বলেছেন, "আমরাই সে সকল দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ছুঁড়ে দেব, যাদেরকে আমরা টার্গেট বানাব এবং আমরাই সে সকল দেশকে পুনঃনির্মাণ ও পুনর্গঠনের পূর্বে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন করে দেব।... আজ থেকে সব সময়ের জন্য আমেরিকাই এ ফায়সালা করবে– কবে, কোথায়, কিভাবে ও কেন যুদ্ধ করা হবে এবং কেন শান্তি প্রতিষ্ঠা করা হবে।" (সূত্র : The Washington Post, 13.05.2003)

মার্কিন টর্নেডোর শক্তি কেন্দ্র, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

মূলত যায়নবাদী ইহুদী (যারা সারা বিশ্বের মালিক ও শাসক হতে চায়) সম্প্রদায় দস্যু চরিত্রের মার্কিন জাতির ঘাড়ে চেপে বসে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে। ইহুদীরা সুকৌশলে তাদের ধর্মগ্রন্থ তাল্‌মুদ-এর শিক্ষা মার্কিনীদের মনমগজে ঢুকিয়ে দেয়। ফলে যায়নবাদী ইহুদী ও মার্কিন জাতির চিন্তা চেতনা একাকার হয়ে পড়ে। তাল্‌মুদের শিক্ষা হলো :

১. অ-ইহুদী মানুষের ধন সম্পদের কোনো মালিকানা নাই। ধন-সম্পদের প্রকৃত মালিক ইহুদীরা। অ-ইহুদীদের অর্জিত ধন সম্পদ ন্যায়তই ইহুদীগণ দখল

www.pathagar.com

করে নিতে পারে। (সূত্র : ইহুদী চক্রান্ত, সম্পাদনা : আবদুল খালেক, পৃ. ২০)।

২. অ-ইহুদী মানুষ ও তাদের ধন-সম্পত্তির উপর কর্তৃত্ব করার জন্য আল্লাহ ইহুদী জাতিকে মনোনীত করেছেন। (সূত্র : ঐ, পৃ. ঐ)। [উল্লেখ্য, উপরোক্ত কথাগুলো প্রায় একইভাবে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে রয়েছে।]

উভয় জাতির মানসিকতা ও লক্ষ্য উদ্দেশ্য একাকার হওয়ার পর ইহুদীদের পরিকল্পনায় যুক্তরাষ্ট্রে এমন কিছু সংগঠন, সংস্থা, থিংকট্যাঙ্ক জন্ম লাভ করে যে সংগঠনগুলো মার্কিন টর্নেডোর গতিপথ নিয়ন্ত্রণ করে। উল্লেখ্যযোগ্য সংগঠনগুলো হলো :

New Conservative (নব্য রক্ষণশীল) বা নিউকন : কয়েকজন ইহুদী ১৯৬০-এর দশকে এ প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠা করেন। ইসরাইলকে শক্তিশালী করা ও বিশ্বব্যাপী ইহুদী নীল-নকশা বাস্তবায়ন এর লক্ষ্য। মার্কিন খ্রিস্টানদেরকে সম্পৃক্ত করতে তারা তাদের লক্ষ্যের সাথে জুড়ে দেয়– "বিশ্বব্যাপী মার্কিন আদর্শবাদ (আগ্রাসন) সম্প্রসারণে যুক্তরাষ্ট্র নিজের সামরিক শক্তি ব্যবহার করার ক্ষেত্রে সব সময় স্বাধীন থাকবে।" নিউকনদের প্রকল্পের নাম 'নিউ আমেরিকান সেঞ্চুরী'। তারা নিউ ওয়ার্ল্ড এম্পায়ার প্রতিষ্ঠা করবে ও নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার প্রদান করবে। মার্কিন প্রেসিডেন্টের গুরুত্বপূর্ণ ভাষণটিও এরা প্রস্তুত করে দেয়। উদাহরণস্বরূপ প্রেসিডেন্ট বুশের ২০০২ সালে প্রদত্ত State of Union ভাষণ প্রস্তুত করেন ইহুদী নিউকন সদস্য ডেভিড ফ্রাম। প্রথমবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়ে প্রেসিডেন্ট জুনিয়র বুশ নিউকনকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হন। এর পরই ঘটে টুইন টাওয়ার হামলা। এই হামলার পর নিউকনরা বুশকে হাতের পুতুলে পরিণত করে। ওবামা যদি নিউকনকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করেন তবে একই রূপ ব্যবস্থা নেয়া হবে। অবশ্য ওবামা এ পর্যন্ত নিউকনদের পক্ষেই কাজ করেছেন– উদাহরণ হলো :

১. ওবামা বোম্বে হামলার ব্যাপারে ত্বরিৎ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন কিন্তু গাজায় ইসরাইলী হামলার প্রতিবাদ করেননি।

২. ওবামা হোয়াইট হাউসের চিফ অব স্টাফ নিয়োগ করেছেন ইহুদী রাহম ইমানুয়েলকে।

৩. নিউকন বান্ধব হিলারী ক্লিনটনকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও রবার্ট গেটসকে প্রতিরক্ষামন্ত্রী নিয়োগ করেছেন এবং হিলারীকে নিজের সকল স্টাফ নিয়োগের স্বাধীনতা দিয়েছেন।

৪. ওবামা গুয়েনতানামো কারাগার বন্ধের নির্দেশ দিয়েছেন কিন্তু কাবুলের বাগরাম কারাগার আরও ৪০ একর সম্প্রসারণ করছেন ৬০ মিলিয়ন ডলার ব্যয় করে। (সূত্র : আল জাজিরা, ২০.২.২০০৯)

www.pathagar.com

৫. মধ্যপ্রাচ্যে শান্তির জন্য সৌদি প্রস্তাবে ২টি বিষয় আছে। একটি হলো- Two Nation state theory, অপরটি হলো ইসরাইলের সাথে সকল আরব দেশের সম্পর্ক স্বাভাবিক করার উদ্যোগ। ওবামা প্রস্তাবের প্রথম অংশ ইগনোর করেছেন, দ্বিতীয়টি মেনে নিয়েছেন। (সূত্র : দৈনিক নয়া দিগন্ত, ২০.২.২০০৯; তথ্যসূত্র : নোয়াম চমস্কির সাক্ষাৎকার, প্রেস টিভি)।

৬. গাজা যুদ্ধ চলাকালীন মিসরের বর্ডার খুলে দেয়া ও টানেল বন্ধ করার জন্য মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কন্ডোলিসা রাইস ও ইসরাইলী পররাষ্ট্রমন্ত্রী জিপি লিভনী যে চুক্তি করেছে তা ছিল সাম্রাজ্যবাদী ঊদ্ধত্য কেননা উক্ত চুক্তিতে মিসরকে সম্পৃক্ত করা হয়নি। ওবামা উক্ত চুক্তি মেনে নিয়েছেন।

৭. আফগানিস্তান ও পাকিস্তানে ওবামা বুশের নীতি বহাল রেখেছেন।

৮. সিআইএ পরিচালিত জিবুতি, রুমানিয়া, থাইল্যান্ড, মরক্কো ও পোল্যান্ডের অবৈধ বন্দি শিবিরের ব্যাপারে ওবামার নীরব সম্মতি রয়েছে।

AIPAC (America-Israel Public Affairs Commitee)

এটি ওয়াশিংটনের একটি গুরুত্বপূর্ণ লবি। এটি ইসরাইলী লবির অংশ। হাউস ও সিনেটের সদস্যগণ প্রায় নির্দ্বিধায় এর নির্দেশ পালন করে। কারণ তাদের জানা আছে এই সংগঠন ক্যাপিটাল হিলে এমন এক রাজনৈতিক শক্তির প্রতিনিধি, যা নির্বাচনের সময় তাদের সম্ভাবনাকে ওঠাতে ও নামাতে পারে। AIPAC সম্পর্কে কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ আমেরিকানের মন্তব্য নিম্নরূপ :

১. সাবেক কংগ্রেস সদস্য ম্যাক গ্রেসলি বলেছেন, "কংগ্রেসের উপর আইপ্যাক-এর ভয়াল ত্রাস ছেয়ে আছে।" (সূত্র : বিশ্বায়ন : সাম্রাজ্যবাদের নতুন স্ট্রাটেজী, ইয়াসির নাদীম, ভাষান্তর : শহীদুল ইসলাম ফারুকী, পৃ. ১১০, তৎসূত্র : শিকনজা-ই-ইয়াহুদ, পৃ. ৫০-৫২, তৎসূত্র : They Dare to Speak out, Senator Paul Findle.)

২. Washington Post পত্রিকার সহকারী পরিচালক স্টিফেন এম রুজেনফেল্ড এর ভাষায়- "আইপ্যাক এখন স্পষ্টভাবে আমেরিকায় একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক শক্তি।" (সূত্র : ঐ, পৃ. ঐ)।

৩. চারবার নির্বাচিত মার্কিন সিনেটর পল ফিন্ডলে মার্কিন রাজনীতিতে ইহুদীদের ভয়াল প্রভাবের বিষয়ে "They Dare to Speak out" নামক একটি বই লিখেন। এ প্রসঙ্গে পল ফিন্ডলে লিখেন : "আমার এই গ্রন্থ প্রকাশ করতে অনেক কঠিন স্তর অতিক্রম করতে হয়েছে। দুই বছর লেগে যায় প্রকাশক খুঁজতে। এরপর দু'জন প্রকাশক পাণ্ডুলিপির প্রশংসা করে প্রকাশের যোগ্য আখ্যা দিয়ে নিজেদের অক্ষমতা প্রকাশ করে বলেন, এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু খুবই স্পর্শকাতর। এই গ্রন্থ প্রকাশ করলে আমাদেরকে আভ্যন্তরীণ ও

www.pathagar.com

বহিরাগত অনেক বিপদের সম্মুখীন হতে হবে। সুতরাং আমরা বিপদে পড়তে চাচ্ছি না। পরিশেষে অন্য একজন প্রকাশক এই জুয়া খেলতে প্রস্তুত হলেন।" (সূত্র : ঐ, পৃ. ১১১)।

বিল্ডার ব্রীজ : ১৯৪৫ সালে সুইডেনের ইহুদী পুঁজিপতি এ সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। এর সদস্য সংখ্যা থাকে ১১৫ জন, তন্মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ থাকে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, দুই-তৃতীয়াংশ থাকে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলের অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও শিল্প ব্যক্তিত্ব। এদের অধিকাংশ সদস্যই থাকে ইহুদী। ইউরোপ এবং আমেরিকায় কে নেতৃত্ব দেবে তা ঠিক করে এই বিল্ডার ব্রীজ। রোনাল্ড রিগান, জিমি কার্টার, জর্জ বুশ, বিল ক্লিনটন, টনি ব্লেয়ার এ সংগঠনের সদস্যপদ গ্রহণ করার পরবর্তী ৪-৫ বছরের মধ্যেই বিল্ডার ব্রীজের গোপন যোগসাজশে প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী হয়ে যান। এভাবে বিল্ডার ব্রীজ তাদের পছন্দের ব্যক্তিকে অখ্যাত অবস্থা থেকে দেশের দণ্ডমুণ্ডের কর্তায় পরিণত করেন। বারাক ওবামার ব্যাপারটিও এর চেয়ে ব্যতিক্রম বলে মনে হয় না। বিল্ডার ব্রীজের গোপন অধিবেশনে অংশগ্রহণকারী অনেকের জাতীয়তা পর্যন্ত জানা যায় না। কিন্তু এই অধিবেশনে অনুমোদনকৃত প্রস্তাবসমূহ বিশ্বের বিভিন্ন সরকার, রাজনৈতিক ব্যবস্থা, বিশ্ব বাণিজ্য ও সম্পদের ওপর কার্যকর করা হয়।

রকফেলার ফাউন্ডেশন : যায়নবাদ পরিকল্পিত নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগের সময়কাল থেকেই এই ফাউন্ডেশন সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের অর্থের যোগানদাতা। এটি আমেরিকার সবচেয়ে বড় বাণিজ্য সংস্থা হওয়া সত্ত্বেও সেবামূলক সংগঠনের লেবেল লাগিয়ে ট্যাক্স প্রদান থেকে অব্যাহতি লাভ করেছে। এর অনেক অঙ্গ সংগঠন রয়েছে, যা বিভিন্ন নামে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মরত। বিল্ডার ব্রীজের বার্ষিক অধিবেশনের খরচ এ সংস্থা বহন করে।

মার্কিন গীর্জা মিশন : রকফেলার ফাউন্ডেশনের আর্থিক সাহায্যে ১৯০৮ সালে হেনরী ফুয়াড ও রুসিংস এ সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে। নতুন বিশ্বব্যবস্থার রূপরেখা ও আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থার মূলনীতি এ সংস্থা প্রণয়ন করে, যা বিশ্বব্যাংক কর্তৃক বাস্তবায়ন করা হয়।

পররাষ্ট্র সম্পর্ক কমিটি (CFR) : রাহুডস সেপল (ইহুদী) ১৯০৯ সালে এর প্রতিষ্ঠা করেন। মার্কিন প্রশাসন পরিচালনাকারী সকল গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সম্পর্ক এই সংগঠনের সাথে যারা ইহুদী স্বার্থ বাস্তবায়নে সদা তৎপর থাকে। এ সংস্থার কর্মকাণ্ড সম্পর্কে ধারণা পেতে নিম্নে কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা হলো :

১. CFR সদস্য জন ফস্টার ডালেস (প্রেসিডেন্ট আইজেন হাওয়ারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী), নেলসন রকফেলার, এডলাই ইস্টিউনসন মার্কিন প্রশাসনকে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করেন।
২. জন রকফেলার, বারনার্ড বাররুখ (যিনি অনিচ্ছুক প্রেসিডেন্ট উইলসনকে

www.pathagar.com

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগ দিতে বাধ্য করেন এবং যুদ্ধ শেষে স্বাক্ষরিত ভার্সাই চুক্তি রচনা করেন), এলিন ডালস (সাবেক সিআইএ ডিরেক্টর), ক্রিশ্চান হারটার (সাবেক মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী) সিএফআর সদস্য ছিলেন।

৩. মার্কিন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগান ও সিনিয়র বুশের দপ্তরের ৩১৩ জন কর্মকর্তা সিএফআর সদস্য ছিল। জুনিয়র বুশ প্রশাসনের ৩৮৭ জন অফিসার এ সংস্থা সরবরাহ করেছে। মার্কিন সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে যখনই কোনো কর্মচারীর প্রয়োজন হয় সঙ্গে সঙ্গে উক্ত দপ্তর সিএফআর-এর কেন্দ্রীয় দপ্তরে যোগাযোগ করে।

৪. ১৯২১ সাল থেকে এ পর্যন্ত ১৮ জন অর্থমন্ত্রীর মধ্যে ১২ জন ছিল সিএফআর সদস্য, ১৬ জন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর মধ্যে ১২ জনকে সিএফআর সরবরাহ করে। ১৯৪৭ সাল থেকে এ পর্যন্ত ১৫ জন প্রতিরক্ষামন্ত্রীর ৯ জন সিএফআর সরবরাহ করে।

৫. ১৯৫২ সাল থেকে এ পর্যন্ত (১৯৬৪ সাল ছাড়া) উভয় রাজনৈতিক দল (ডেমোক্রেট ও রিপাবলিক) থেকে যত প্রার্থী প্রেসিডেন্ট পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন তাদের সবাই সিএফআর-এর সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। (তথ্যসূত্র : মাগরিবী মিডিয়া, পৃ. ৫৭-৯৯, বর্ধিত সংস্করণ)।

উপরোক্ত তথ্যাদির আলোকে যে কেউ এ সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এমন একটি দেশ, যার ঘাড়ে ও মাথায় চেপে বসে আছে ষড়যন্ত্রপ্রিয়, লুটেরা, রক্তপিপাসু ও বিশ্বশাসনের অভিলাসী যায়নবাদী ইহুদীরা। যে দেশের কংগ্রেস সদস্য হতে ইহুদীদের আশীর্বাদ অপরিহার্য, যে দেশের প্রেসিডেন্টের সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা নেই, যে দেশের প্রেসিডেন্টের নিজের অফিসের কর্মচারী বা নিজ সরকারের মন্ত্রী নির্বাচনের ক্ষমতা নেই, সে দেশের প্রেসিডেন্ট নিশ্চয়ই পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্বল প্রেসিডেন্ট অথবা ইহুদীবাদীদের পার্সোনাল সেক্রেটারী। মার্কিন প্রেসিডেন্ট কখন কি করবেন তার সিদ্ধান্ত দেবে ইহুদীরা, ভাষণ প্রস্তুত করে দেবেন ইহুদী সচিব বা উপদেষ্টারা। ইহুদীদের ইঙ্গিতেই মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তর পেন্টাগন বিভিন্ন দেশে অভিযান পরিচালনা করে এবং তাদের ইচ্ছানুযায়ী ওয়াশিংটনের পররাষ্ট্রনীতি তৈরি হয়। অর্থাৎ কল্কি সাজাবে অ-ইহুদীরা আর সুখটান দেবে ইহুদীরা। রক্ত ঝরবে অ-ইহুদীদের আর সম্পদের মালিক হবে ইহুদীরা।

ইতিপূর্বে আমরা ইহুদী ধর্মগ্রন্থ 'তাল্‌মুদ'-এর শিক্ষা, ইহুদী চরিত্র ও আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করেছি। সুতরাং উক্ত যায়নবাদী ইহুদীরা তাদের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নে ওবামার গন্তব্য নির্ধারণ করবে। অতীত ইতিহাস, বর্তমান পরিস্থিতি ও ইহুদী মানসের আলোকে আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে, মার্কিন টর্নেডো 'ওবামা'র গন্তব্য সম্পর্কে। তদুপরি মার্কিন জাতির বিগত ৫০০ বছরের (১৪৯২-২০০৯) ইতিহাস হলো– অপরের ভূখণ্ড দখল, দখলীকৃত এলাকার জনমানুষকে নিশ্চিহ্ন করা

www.pathagar.com

ও সম্পদ লুণ্ঠন। উক্ত দখল-হত্যার জন্য মার্কিনীদের হাতে রয়েছে বিশাল-বিশাল অত্যাধুনিক অস্ত্র নির্মাণ কারখানা আর লুণ্ঠনের জন্য রয়েছে বহুজাতিক কোম্পানিসমূহ, আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংক।

ইহুদী-খ্রিস্ট অধিবেশনে (২০০২ সালে) প্রেসিডেন্ট বুশের প্রদত্ত ভাষণ থেকে আমরা মার্কিন আকাঙ্ক্ষাসমূহ (যা মূলত যায়নবাদী আকাঙ্ক্ষা) জানতে পেরেছি। উক্ত ভাষণে বুশ বলেছেন, তিনি ইরান, ইরাক ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশ থেকে আমেরিকা পর্যন্ত সমুদ্র তলদেশ দিয়ে পাইপলাইন স্থাপন করে মধ্যপ্রাচ্যের তেল সম্পদ যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে যাবেন। উক্ত আকাঙ্ক্ষার ন্যায় বুশের আর একটি আকাঙ্ক্ষা ছিল মধ্য এশিয়ার সদ্য স্বাধীন হওয়া দেশসমূহের তেল-গ্যাস আফগানিস্তান-পাকিস্তান হয়ে সমুদ্রপথে নিজ দেশে নিয়ে যাবেন। উক্ত আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের জন্যই মূলত আমেরিকা আফগানিস্তান ও ইরাক দখল করেছে। কিন্তু বিধি বাম। কোথা থেকে ইসলামী জঙ্গিরা আল-কায়েদার রূপ ধরে যায়নবাদী ও মার্কিন আশা-আকাঙ্ক্ষা নস্যাৎ করে দিয়েছে।

আফগানিস্তান দখল লাভজনক না হওয়ায় ক্ষতিপূরণে প্রেসিডেন্ট বুশ ইরাক দখল করেছে। এর পরের তালিকায় ছিল ইরান-সিরিয়া-লেবানন ও পাকিস্তান। ২০০৬ সালে ইসরাইলকে দিয়ে লেবানন-সিরিয়া-ইরান দখলের যুদ্ধ শুরু করা হয়েছিল কিন্তু সেখানে দেখা গেল ইসলামী জঙ্গি হিজবুল্লাহ অনঢ় অটলভাবে দাঁড়িয়ে আছে। ২০০৮ সালের গাজা অভিযানও ব্যর্থ হয়েছে, তাও ইসলামী জঙ্গি হামাসের কারণে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, যেখানে ইসলামী জঙ্গি আছে সেখানে হামলা করে লাভ তো হচ্ছে না বরং লাভ করতে গিয়ে বর্তমানে নিজের অর্থনীতির বেহাল অবস্থা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান অর্থনীতির অবস্থা এতই নাজুক যে, চীন ও সৌদি আরব নগদ সহায়তা না করলে কয়েক মাস চলার মতো অবস্থাও এ দেশের নেই। এমতাবস্থায় আল-কায়েদা, হামাস, হিজবুল্লাহ মুক্ত নিরীহ সম্পদশালী দেশ এবং গৃহযুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশসমূহ যুক্তরাষ্ট্রের সহজ শিকারে পরিণত হবে। নচেৎ বৃহৎ শক্তি হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের পতন ঘটবে এবং যুক্তরাষ্ট্র ভেঙে যাবে।

২৭ মার্চ ২০০৯ বিকেল পৌনে ৩টায় আল জাজিরা টিভি চ্যানেলের 'Inside Stroy' অনুষ্ঠানে বলা হয় : চীন ইতিমধ্যে যুক্তরাষ্ট্রকে ৭৪০ বিলিয়ন ডলার ঋণ দিয়েছে এবং সম্পত্তি বন্ধক (Bond) বাবদ আরও ৫০০ বিলিয়ন ডলার দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র চীনকে আরও Bond কেনার অনুরোধ জানালে চীনা প্রধানমন্ত্রী ওয়েন জিয়াবাও বন্ডের নিশ্চয়তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। শুধু তাই নয়, চীন ডলারের দরপতন নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছে এবং চীনের রাষ্ট্রীয় রিজার্ভ তহবিলে জমাকৃত ২ ট্রিলিয়ন (২০০০ বিলিয়ন) ডলার মুদ্রাকে অন্য মুদ্রায় রূপান্তরের ব্যাপারে চিন্তা করছে। আরও খারাপ খবর হলো, রাশিয়া যুক্তরাষ্ট্রকে ঋণ দেয়ার

www.pathagar.com

ব্যাপারে চীনকে নিরুৎসাহিত করেছে। তদুপরি চীন-রাশিয়া যৌথভাবে আইএমএফকে অনুরোধ করেছে, ডলারের বিকল্প হিসেবে অন্য মুদ্রা নির্ধারণ করতে। উল্লেখ্য, বর্তমানে আইএমএফ অনুমোদিত বিনিময় মুদ্রা হলো ডলার, পাউন্ড, ইয়েন ও ইউরো। এমতাবস্থায় যুক্তরাষ্ট্র এবং সারা বিশ্ব ভয়াবহ মন্দায় পতিত হবে এবং বিশ্বের দেশে দেশে সামাজিক, রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও সরকার পতনের আন্দোলন শুরু হবে।

বুড়ো বাঘ ও ওবামার গন্তব্য

বাঘ যখন বুড়ো হয় তখন হরিণের পেছনে দৌড়ায় না। কেননা হরিণ শিকার তখন তার পক্ষে সম্ভব হয় না। এমতাবস্থায় ছাগল, ভেড়া, গরু, আহত মেষ ও অন্যান্য নিরীহ প্রাণী শিকার করে বুড়ো বাঘ বেঁচে থাকে। যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থাও এখন অনুরূপ। ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সবল না হওয়া পর্যন্ত সম্পদশালী ও ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন দুর্বল দেশ, গৃহযুদ্ধ কবলিত দেশ বা অঞ্চল, রাজনৈতিক হানাহানিতে লিপ্ত দেশ দখল ও লুণ্ঠন এবং যায়নবাদীদের টার্গেটকৃত দেশে স্বীয় তৎপরতা সীমিত রাখবে। বর্তমান পরিস্থিতিতে এরূপ সম্ভাব্য দেশসমূহ হলো– মেক্সিকো, কলম্বিয়া, দারফুর, পাকিস্তান, বালুচিস্তান, বাংলাদেশ ও উত্তর কোরিয়া। এই পর্ব ব্যবসা সফল হলে পরবর্তী পর্বে আসবে ইরান, ভারত, সিরিয়া, সৌদি আরব, তুরস্ক ও লেবানন। অনেকে হয়তো ভারতের নাম দেখে আঁতকে উঠবেন, কেননা বর্তমান সময়ে ভারত-যুক্তরাষ্ট্র গলায় গলায় ভাব। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্র কেন বন্ধুর ঘাড় মটকাবে। দক্ষিণ এশিয়ার ভবিষ্যৎ শীর্ষক আলোচনায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। তবে এখানে শুধু একটি আভাস দিতে চাই। আর তা হলো, ভারতীয় কংগ্রেসের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের যতই বন্ধুত্ব থাক না কেন, যুক্তরাষ্ট্রের চরিত্রের সাথে সর্বাধিক মিল রয়েছে বিজেপির, আরএসএস-এর। বিজেপির মাধ্যমেই যুক্তরাষ্ট্র স্বীয় দক্ষিণ এশীয় এজেন্ডা বাস্তবায়ন করা সহজতর মনে করে। এমতাবস্থায় যুক্তরাষ্ট্র ও যায়নবাদীরা পাকিস্তানের বেনজির হত্যাকাণ্ডের মতো কোনো অঘটন ঘটিয়ে হলেও বিজেপিকে ক্ষমতাসীন করবে। আর তখনি শুরু হবে দক্ষিণ এশিয়ার ভবিষ্যৎ রচনা।

দক্ষিণ এশিয়ার ভবিষ্যত

যায়নবাদী ইহুদীদের পরিকল্পনা হলো সমগ্র বিশ্ব শাসন করা। এ লক্ষ্যে তারা ইতিমধ্যে অনেকদূর অগ্রসর হয়েছে। তাদের সৃষ্ট জাতিসংঘ, বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, বহুজাতিক কোম্পানিসমূহ, আন্তর্জাতিক মিডিয়া মূলত বিশ্বের অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি হিসেবে বিরাজ করছে। এ অপশক্তি সমগ্র বিশ্বের প্রতিটি দেশে বর্ণে-বর্ণে, জাতিতে-জাতিতে, দেশে-দেশে সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়,

www.pathagar.com

বর্ণবাদী, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিভেদ সৃষ্টি করে পারস্পরিক সংঘাত-সংঘর্ষ জিইয়ে রেখে দেশ ও জাতিসমূহকে দুর্বলতর করছে, যাতে করে দুর্বলদের উপর নিজেদের আধিপত্য চাপিয়ে দিতে পারে।

মানবীয় সভ্যতার নিরিখে বর্বর এবং বস্তুবাদী সভ্যতার নিরীখে সবল ইউরোপ, আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়াকে যায়নবাদীরা ইতিমধ্যে তাদের হাতের পুতুলে পরিণত করে বিশ্বের অপরাপর জাতিসমূহের ঘাড় মটকিয়ে রক্ত চুষে নিয়ে নিস্তেজ করার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। মূলত যায়নবাদীরা ইহুদী ব্যতীত অপর কোনো জাতি গোষ্ঠীর বন্ধু নয়। ইহুদী ব্যতীত অপর সকল জাতি গোষ্ঠীকে তারা বোকা গইম (মেষপাল) হিসেবে তাদের ষড়যন্ত্রের দলিল Protocol-এ উল্লেখ করেছে। এতদসত্ত্বেও ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভিন্ন জাতির সাথে যায়নবাদীদের সখ্যতার কারণ হলো- নিজেদের রক্তপাত না ঘটিয়ে জাতিসমূহকে পারস্পরিক লড়াইয়ের মাধ্যমে বিনাশ করার প্রক্রিয়া। স্নায়ুযুদ্ধের অবসান হওয়ায় পৃথিবীব্যাপী গণতন্ত্র-সমাজতন্ত্রের লড়াই শেষ হয়ে গেলে যায়নবাদীরা 'সভ্যতার সংঘাত' তত্ত্ব দিয়ে দৃশ্যপটে হাজির হয়। তাদের নিয়ন্ত্রিত আন্তর্জাতিক মিডিয়াসমূহ এই মর্মে প্রচার করতে থাকে যে, 'পাশ্চাত্য সভ্যতার মূল শত্রু হলো ইসলামী বিশ্ব। সুতরাং পাশ্চাত্য যদি টিকে থাকতে চায় তাহলে ইসলামকে ও ইসলামী বিশ্বকে নির্মূল করতে হবে।' যায়নবাদীদের এ প্রচারণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আমেরিকা ও পশ্চিম ইউরোপ মুসলিম বিশ্ব দখল ও লুণ্ঠনের কর্মসূচি হাতে নেয়। এ দখল ও লুণ্ঠনের ধারাবাহিকতায় তারা মুসলিম বিশ্বের সাথে সুসম্পর্ক আছে এমন উদীয়মান শক্তি চীনকেও নিশানা করে আর দক্ষিণ এশিয়া চ্যাপ্টারে এসে তারা তীব্র মুসলিম বিদ্বেষী ও চীন বিদ্বেষী ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারতকে নিজ দলে অন্তর্ভুক্ত করে। এখানেও তাদের একই পলিসি। বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল দুটি দেশকে যুদ্ধক্ষেত্রে মুখোমুখি করা সম্ভব হলে উভয় দেশই ধ্বংস হবে। এর মাধ্যমে যায়নবাদীরা উভয় দেশের সহায়-সম্পদ ও সার্বভৌমত্ব লুণ্ঠন করবে।

দক্ষিণ এশিয়ার মূল শক্তি হলো চীন ও ভারত। আণবিক শক্তির অধিকারী হওয়ায় পাকিস্তানকেও হিসাবে রাখা হয়। যায়নবাদী ইহুদী, সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা ও ভারতের দক্ষিণ এশিয়ায় বর্তমান শত্রু হলো চীন ও পাকিস্তান। এই দুই দেশকে ধ্বংস করতে পারলে আমেরিক-ইসরাইল-ভারতের পক্ষে সমগ্র দক্ষিণ এশিয়া ও পূর্ব এশিয়ায় নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা সহজ হবে। এমতাবস্থায় দক্ষিণ এশিয়ার ভবিষ্যত শীর্ষক আলোচনায় আমাদেরকে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে। উক্ত বিষয়সমূহ হলো-

১. আফগানিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ, ২. আফগানিস্তানে ভারতের স্বার্থ ও তৎপরতা, ৩. যুক্তরাষ্ট্রের ইরান পলিসি, ৪. পাকিস্তানকেন্দ্রীক ভারতের স্বার্থ, ৫. পাকিস্তানে মার্কিন স্বার্থ ও লক্ষ্য, ৬. ভারতের চীন ভীতির কারণ, ৭. যুক্তরাষ্ট্রের চীন

www.pathagar.com

ভীতির কারণ, ৮. আমেরিকা-ইসরাইল-ভারত বনাম চীনা তৎপরতা এবং ৯. ভারত মহাসাগর ও বঙ্গোপসাগরে বৃহৎ শক্তির স্বার্থ ও লক্ষ্য।

আফগানিস্তানে মার্কিন এবং পশ্চিমা স্বার্থ

পশ্চিমা বিশ্বের নেপথ্য নেতৃত্বে রয়েছে যায়নবাদী ইসরাইল, প্রকাশ্য নেতৃত্বে আছে যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়া। স্নায়ুযুদ্ধের অবসানের পর ভারত-ইসরাইল জোটবদ্ধ হওয়ায় বর্তমানে ভারত পশ্চিমা জোটের অংশীদার। উপরোক্ত শক্তিসমূহ বর্তমান বস্তুবাদী সভ্যতার প্রধান শক্তি। এ সভ্যতায় দয়া, মায়া, মানবিকতা ও মানবাধিকারের ধারণা ভাববাদ অনুপস্থিত। বৈষয়িক লাভ বা অধিক মুনাফা অর্জনের পথে এ সভ্যতা পরিচালিত। এ সভ্যতার সংস্পর্শে এসে ইতিমধ্যে আফগানিস্তানে ৫০ লাখ মহিলা বিধবা হয়েছে। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ দেশে-বিদেশে উদ্বাস্তু জীবনযাপন করছে। পর্দানসীন ধর্মপ্রাণ মুসলিম আফগান মহিলারা অবস্থার চাপে পড়ে বর্তমানে দেহ ব্যবসায় লিপ্ত রয়েছে। নিজেদের অর্থ-ক্ষুধা মেটাতে এমন কোনো কাজ নেই যা পশ্চিমা বিশ্ব ও ভারত করতে পারে না। এ জন্যই ফিলিস্তিনিদের ও কাশ্মিরীদের ৬২ বছরের অবর্ণনীয় দুর্ভোগ নিয়ে এরা মাথা ঘামায় না; ইরাকে, আফগানিস্তানে বা পৃথিবীর অন্য কোথাও কতজন লোক আহত-নিহত-পঙ্গু হলো, উদ্বাস্তু হলো তার প্রতি এদের ভ্রুক্ষেপ নেই। তাদের মূল টার্গেট হলো– অপরের সম্পদ লুণ্ঠন প্রক্রিয়া যাতে কোনোক্রমে ব্যাহত না হয়। তাদের আধিপত্য, শোষণ, লুণ্ঠন যাতে চিরস্থায়ী হয়– এটিই তাদের প্রত্যাশা। এক্ষেত্রেও ওবামার গতিপথ নির্ধারণ করবে যায়নবাদ ও পশ্চিমা স্বার্থ।

পাশ্চাত্য সভ্যতার ধর্মনেতারা ধর্ম প্রচার করে আধিপত্য বিস্তারের জন্য, রাজনীতিবিদরা রাজনীতি করে অপরের ঘাড় মটকিয়ে রক্ত পান করার জন্য, সামরিক বাহিনী যুদ্ধ করে প্রতিপক্ষকে নিশ্চিহ্ন করে লুণ্ঠন করার জন্য, বুদ্ধিজীবীরা বুদ্ধি চর্চা করে নিজ জাতির আধিপত্য ও লুণ্ঠন কার্যক্রম স্থায়ী করার জন্য। প্রত্যেকের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য একরূপ হওয়ায় এ সভ্যতার বিভিন্ন সেক্টর সমন্বিতভাবে উক্ত লক্ষ্য পানে এগিয়ে যায়। আফগানিস্তানে পশ্চিমা স্বার্থ, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে বুঝতে হলে তাদের মানসিকতা জানা জরুরি।

আফগানিস্তান কোনো তেল-গ্যাসসমৃদ্ধ দেশ নয়, কৃষি কাজের জন্যও উর্বর নয়, এমতাবস্থায় আফগানিস্তান কেন দখল করা হলো তা জানতে আমাদেরকে এর ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব অনুধাবন করতে হবে। এ দেশে স্থায়ী আসন গেঁড়ে বসতে পারলে এশিয়া ও ইউরোপে কর্তৃত্ব ও লুণ্ঠনবৃত্তি চালিয়ে যাওয়া সহজ। পাশ্চাত্যের শীর্ষস্থানীয় বুদ্ধিজীবীরা বিশ্বব্যাপী স্বীয় আধিপত্য বজায় রাখা ও বিস্তার করার জন্য কিছু সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব ও কর্মসূচি নিজ জাতিকে প্রদান করেছে। জাতির

www.pathagar.com

রাজনীতিকরা উক্ত প্রস্তাব ও কর্মসূচি অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা করে দীর্ঘদিন নিজেদের আধিপত্য ও লুণ্ঠন অব্যাহত রেখেছে। বুদ্ধিজীবীদের উক্ত প্রস্তাব ও কর্মসূচির নাম The great game. উক্ত গ্রেট গেম প্লান বাস্তবায়ন করা ও প্রতিপক্ষকে প্রতিরোধ বা নিশ্চিহ্ন করার প্রথম ধাপ হিসেবে আফগানিস্তান দখল করা হয়। এই গেমের প্রধান লক্ষ্য হলো 'ইউরোয়েশিয়ান হার্টল্যান্ড' হিসেবে পরিচিতি অঞ্চলসমূহ দখল করা, লুট করা এবং চিরস্থায়ী আধিপত্য কায়েম করা। এই কর্মসূচির অংশ হিসেবে চীন-আফগানিস্তান-পাকিস্তান ও মধ্য এশিয়ার সংযোগস্থল ওয়াখান করিডোর দখল করা, সুয়েজখাল, জিব্রাল্টার প্রণালী, এডেন, হরমুজ ও মালাক্কা প্রণালীর উপর পশ্চিমা আধিপত্য বজায় রাখা, পাকিস্তানের পারমাণবিক অস্ত্র দখল করা, বেলুচিস্তান, আফগানিস্তান ও ইরাক থেকে ইরানে হামলা করে দখল করা অন্যতম। পাশ্চাত্য দেশসমূহের দীর্ঘদিনের অনুসৃত The great game সম্পর্কে এবং এ গেম প্রতিরোধ প্রচেষ্টা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো–

দি গ্রেট গেম

ইউরোয়েশিয়ান হার্টল্যান্ড (উত্তরে রাশিয়া, দক্ষিণে ইরান, পূর্বে চীন এবং পশ্চিমে পূর্ব ইউরোপ ও উত্তর আফ্রিকা এলাকাকে ইউরোয়েশিয়ান হার্টল্যান্ড বলে) হিসেবে পরিচিত ভূ-ভাগের ঐক্যকে যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের ন্যায় সমুদ্রে আধিপত্য বিস্তারকারী শক্তিসমূহ একটি ব্যাপক হুমকি হিসেবে দেখে থাকে। এ জন্য এ এলাকার দেশগুলোকে ছিন্নভিন্ন করা, ভেঙে দেয়া ও টুকরা টুকরা করা আমেরিকা, ব্রিটেন ও ফ্রান্সের স্থায়ী অনুসৃত নীতি। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন যৌথভাবে ইরান, সুদান, তুরস্ক, রাশিয়া, সার্বিয়া, চায়না ও ভারতকে টুকরা করতে অনবরত প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে জার্মানি ও রাশিয়া শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করলে ব্রিটেন-ফ্রান্স প্রমাদ গণে। তারা গোপনে উভয়পক্ষকে উস্কানি দেয়। তাদের কূটনৈতিক তৎপরতায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং জার্মানি ও রাশিয়া যুদ্ধে লিপ্ত হয়। বর্তমানে তাদের ভয় রাশিয়া, চীন, ভারত ও ইরান যাতে এক হতে না পারে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজয়ের পর জার্মানিতে যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও রাশিয়ার সৈন্যবাহিনী অবস্থান করা সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও ফ্রান্স জার্মানিকে শক্তিশালী করে গড়ে উঠতে সাহায্য করে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল জার্মানি যদি অটোমান সাম্রাজ্য ও জারের রাশিয়ায় প্রভাব বিস্তার করে তবে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও যুক্তরাষ্ট্র নিরাপদে থাকবে।

পূর্ব ইউরোপকে রাশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করা, ভারত ও মধ্যপ্রাচ্যকে রাশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন রাখা ব্রিটেনের দীর্ঘস্থায়ী নীতি। বিংশ শতকের শুরুতে দার্শনিক

www.pathagar.com

Mackinder ব্রিটেনকে সতর্ক করেন যে, অদূর বা সুদূর ভবিষ্যতে রাশিয়া-চায়না-ইরান এবং ভারত যদি একটি একক অবস্থানে উপনীত হয় তবে সাগরের কর্তৃত্ব যুক্তরাষ্ট্র-ব্রিটেন ও জাপানের নিকট থেকে উক্ত শক্তির অধীনে চলে যাবে। ম্যাকাইন্ডার আরো সতর্ক করেন যে, সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব জনসংখ্যার আধিক্যের উপর নির্ভরশীল। সেক্ষেত্রে অধিক জনসংখ্যা অধ্যুষিত ইউরোয়েশিয়াকে বিভক্তকরণ, গ্রাসকরা ও শাসনকরার নীতি অবলম্বন না করলে কম জনসংখ্যা অধ্যুষিত পশ্চিম ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে দীর্ঘদিন আধিপত্য বজায় রাখা সম্ভব হবে না। ম্যাকাইন্ডার এবং অন্যান্য পশ্চিমা চিন্তাবিদরা আরো লক্ষ্য করেছেন যে, ইউরোয়েশিয়ার হার্টল্যান্ডে অবস্থিত দেশগুলোতে প্রায়ই ঐক্যের প্রবণতা দেখা যায়। এই স্বাভাবিক প্রবণতাকে প্রতিহত না করলে বিশ্ব আধিপত্য বজায় রাখা যাবে না। এ জন্যই প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যুক্তরাষ্ট্র-ব্রিটেন জোট মধ্যপ্রাচ্য, মধ্যএশিয়া, পূর্ব ইউরোপ, ভারত ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অনেকগুলো জাতিসত্তাকে স্বাধীন হওয়ার সুযোগ দিয়ে বিভক্ত করেছে।

নিকোলাস স্পাইকস ম্যানের রিমল্যান্ড থিওরি, হার্বাট স্পেন্সারের মতবাদ এবং হেনরি পাইরেনির থিওরি প্রায় একই কথার পুনরাবৃত্তি করেছে। স্নায়ুযুদ্ধের অবসানের পরও স্যামুয়েল হান্টিংটন সভ্যতার সংঘাতের যে তত্ত্ব হাজির করেছেন তাও মূলত 'ইউরোয়েশিয়ান হার্টল্যান্ড' ভিত্তিক পশ্চিমাদের দীর্ঘদিনের ভাবনার ফসল। তিনি মূল ধারণাকে সভ্যতার সংঘাতের আবরণ পরিয়েছেন মাত্র। হান্টিংটন তত্ত্বের মূল কথা হলো ইউরোয়েশিয়ান হার্টল্যান্ডে নয়টি ভিন্ন ভিন্ন সভ্যতা অবস্থান করছে। এদের পরস্পরের মধ্যে সংঘাত লাগিয়ে দিয়ে এদের নিয়ন্ত্রণ ও গ্রাস করার জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ন্যাশন এস্টেট স্থাপন করলে পশ্চিমা আধিপত্য অক্ষুন্ন থাকবে।

ইতিমধ্যে পশ্চিমা ষড়যন্ত্রের মোকাবেলায় ইউরোয়েশিয়ান হার্টল্যান্ডের শক্তিশালী দেশগুলো ঐক্যবদ্ধ কার্যক্রম এবং চিন্তা-ভাবনা শুরু করেছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টাসমূহ নিম্নরূপ–

১. **SCO (Shanhai Co-operation Organization) গঠন :** EU এবং মার্কিন বাণিজ্য আধিপত্য মোকাবেলায় রাশিয়া, চীন ও মধ্য এশিয়ার সদ্যস্বাধীন মুসলিম দেশ কাজাখস্তান, কিরঘিজিস্তান, তাজিকিস্তান ও উজবেকিস্তান মিলিত হয়ে SCO গঠন করেছে। ইরান এ সংস্থার পর্যবেক্ষক সদস্য হিসেবে যোগ দিয়েছে। বিশ্বের ১৫% তেল, ৫০% গ্যাস রিজার্ভ এবং বিশ্বের অর্ধেক লোক এ দেশগুলোতে বাস করে বিধায় এর রয়েছে বিশাল বাজার সম্ভাবনা।

২. **ইউরোয়েশিয়ান ইউনিয়ন গঠন :** যে ইউরোয়েশিয়া হার্টল্যান্ড কর্তৃত্ব বজায় রাখা পশ্চিমা বিশ্বের দীর্ঘস্থায়ী নীতি, সেখানে নিজেদের কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য রাশিয়া ও কাজাকিস্তান ইউরোয়েশিয়ান ইউনিয়ন গঠনের লক্ষ্যে

www.pathagar.com

কাজ করছে। ইতিমধ্যে রাশিয়া, বেলারুশ ও কাজাখস্তানের মধ্যে সীমান্ত শুল্ক ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। ইউরোয়েশিয়ার সংহতি প্রতিষ্ঠার জন্য ইরান, রাশিয়া ও চীন প্রাচীনকালের বাণিজ্য ও যোগাযোগ মহাসড়ক সিল্ক রোড পুনরুজ্জীবিত করে প্রয়োজনীয় রেলওয়ে নেটওয়ার্ক, পরিবহন করিডোর, বৈদ্যুতিক সংযোগ ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ করেছে। ফলে মধ্য এশিয়া বর্তমানে উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম করিডোরের মূল কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। মধ্য এশিয়ার প্রভাবশালী ত্রিশক্তি রাশিয়া, ইরান ও চীন ইতিমধ্যে ইউরোয়েশিয়ান 'ট্রেড জোন' স্থাপন করায় ল্যাটিন আমেরিকা, আফ্রিকা ও ইউরোপের কিছু দেশকে এ জোনে আকৃষ্ট করা সম্ভব হয়েছে। ফলে ইইউ ও মার্কিন বাণিজ্য স্বার্থ হুমকির সম্মুখীন।

৩. SCO এবং ইউরোয়েশিয়ান ইউনিয়নের বিপরীতে ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, তুরস্ক, ইসরাইল ও সৌদি আরব সমন্বয়ে 'ভূমধ্যসাগরীয় ইউনিয়ন' গঠনে প্রচেষ্টা শুরু করা হয়েছে। কিন্তু সৌদি প্রস্তাব 'Two nation Theory' বাস্তবায়নে ইসরাইল অস্বীকার করায় এই ইউনিয়ন গঠন এখনো পরিকল্পনায় সীমাবদ্ধ রয়েছে। এই ইউনিয়নটি মূলত EU ও Anglo-American Trade Zone-এর সহায়ক হিসেবে পরিকল্পনা করা হয়েছিল।

উপরোক্ত ভূমধ্যসাগরীয় ইউনিয়নের প্রতিপক্ষ হিসেবে ইরান 'ইসলামিক ইউনিয়ন' প্রস্তাব নিয়ে অগ্রসর হয়। ভূমধ্যসাগরের তিনদিকে অবস্থিত মুসলিম দেশসমূহের সমন্বয়ে ইসলামিক ইউনিয়ন গঠিত হলে ফ্রান্স-ইতালি প্রস্তাবিত 'মেডিটারেনিয়ান ইউনিয়ন' গঠন দূরাশায় পরিণত হবে। ইরান প্রস্তাবিত ইসলামিক ইউনয়ন গঠিত হলে 'ইউরোয়েশিয়ান ইউনিয়ন'-এর সহযোগী হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

তথ্যসূত্র : (The great game, Eurasia and the History of war, by Mahdi Darius Nazemroaya, Lisa Journal, Jan-March '08, Page: 11-22)

ইউরোয়েশিয়ান হার্টল্যান্ড কার্যকরভাবে দখল করা, লুণ্ঠন করা, বিশ্ব রাজনীতি ও অর্থনীতিতে স্বীয় আধিপত্য বজায় রাখার লক্ষ্যে পশ্চিমা বিশ্ব ভূ-রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ আফগানিস্তান দখল করেছে। আফগানিস্তানে স্থাপিত সেনা ছাউনি ও গোয়েন্দা ঘাঁটিগুলোতে মুসলিম যুবকদেরকে অস্ত্র-অর্থ-ট্রেনিং প্রদান করে জঙ্গি তৈরি করে ইউরোয়েশিয়ার দেশসমূহে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির কাজে ব্যবহার করছে। তাদের মূল টার্গেট হলো সন্ত্রাসী হামলার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোতে গৃহযুদ্ধ লাগিয়ে দুর্বল করে ফেলা যাতে উক্ত দুর্বল দেশগুলোকে সহজে গ্রাস করা যায়। বিষয়টি সম্পর্কে ধারণা লাভের জন্য ২৬.০৩.০৯ সালে পাকিস্তানি নিউজ পোর্টালে প্রকাশিত পাকিস্তানের সাবেক সেনাপ্রধান জেনারেল আসলাম বেগের লিখিত

www.pathagar.com

প্রবন্ধটি যথেষ্ট সহায়ক হবে। পাঠকদের অবগতির জন্য উক্ত প্রবন্ধের সার-সংক্ষেপ উল্লেখ করা হলো :

আফগানিস্তানে এংলো-আমেরিকান দখলদারিত্বের পর জাবাল-উস-সিরাজে CIA/RAW/MOSSAD/MI-6 (ব্রিটেন) এবং BND (জার্মান) গোয়েন্দা সংস্থাসমূহ সুবিশাল ও অত্যাধুনিক গোয়েন্দা ঘাঁটি স্থাপন করে। উক্ত কেন্দ্র থেকে পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে জঙ্গি তৎপরতা বিস্তারের লক্ষ্যে কান্দাহার, ফয়েজাবাদ, মাজার-ই-শরীফ ও হিরাত এ ৪টি অগ্রবর্তী ঘাঁটি স্থাপন করা হয়। কান্দাহার ঘাঁটির প্রধান একজন ভারতীয়। এখানে প্রশিক্ষিত জঙ্গিদেরকে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বালুচিস্তানে পাঠানো হয় জঙ্গি হামলা পরিচালনার জন্য। ফয়েজাবাদ ঘাঁটির দায়িত্বে আছে ৪০০ ভারতীয় মুসলিম সৈন্য, উর্দুভাষী ভারতীয় উলেমা, শ্রমিক ও প্রকৌশলী। এ ঘাঁটিতে সংগৃহীত ও প্রশিক্ষিত জঙ্গিদের চীন, তাজিকিস্তান ও উজবেকিস্তানে পাঠানো হয় সন্ত্রাসী কার্যক্রম পরিচালনার জন্য। মাজার-ই-শরীফ ঘাঁটিটি যৌথভাবে পরিচালনা করে CIA/RAW/ MOSSAD ও BND। এখানে সংগৃহীত ও প্রশিক্ষিত জঙ্গিরা তুর্কমেনিস্তান, চেচনিয়া, রাশিয়া, উজবেকিস্তান ও তাজিকিস্তানে কার্যক্রম পরিচালনা করে। হিরাত ঘাঁটি যৌথভাবে পরিচালনা করে CIA/RAW ও MOSSAD। ইরানে নাশকতা সৃষ্টির জন্য এ ঘাঁটি থেকে জঙ্গি সরবরাহ করা হয়।

(তথ্যসূত্র : The India Doctrine, MBI Munshi, 2nd edition-2008, Page: 602-603)।

উপরোক্ত তথ্যাদির আলোকে পাঠকবৃন্দ যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পরিচালিত war on terror সম্পর্কে, Terroristদের পরিচালক ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে এবং যুক্তরাষ্ট্রের আফগানিস্তান দখলের কারণ ও স্বার্থ সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে সক্ষম হবেন। ভয় দেখাইয়া ইউরোয়েশিয়ান হার্টল্যান্ড দখল ও বিশ্ব শাসনই বর্তমান war on terror-এর মূল লক্ষ্য। যে দেশগুলো বিক্ষুব্ধ মুসলিম যুবকদেরকে অস্ত্র-অর্থ-ট্রেনিং দিয়ে জঙ্গি বানায় তাদেরকে জঙ্গিবাদের গডফাদার ছাড়া আর কি বলা যায়?

আফগানিস্তানে ভারতের স্বার্থ ও তৎপরতা

আফগানিস্তানে মার্কিন স্বার্থ হলো আফগানিস্তানকে স্প্রিংবোর্ড বানিয়ে পৃথিবীর দেশে দেশে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে নিজের আধিপত্য ও শোষণ অব্যাহত রাখা। কিন্তু আফগানিস্তানে ভারতের স্বার্থ আরো ব্যাপক পরিসরে বিস্তৃত। এই স্বার্থসমূহ ঐতিহাসিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক। নিম্নে সংক্ষেপে এ বিষয়ে আলোচনা করা হলো।

ক. ঐতিহাসিক স্বার্থ : ভারতের বর্তমান বর্ণবাদী ব্রাহ্মণ্যবাদী শাসকগণ

www.pathagar.com

ভারতের ভূমিপুত্র নয়। বহিরাগত আর্যরা সংখ্যানুপাতে ভারতের মোট জনসংখ্যার মাত্র ৯%। এতোদিন তারা বিভিন্ন অলৌকিক কাহিনী রচনা করে ভারতীয়দের উপর বর্ণবাদী শাসন চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে ছিল। কিন্তু বর্তমানে উন্নত তথ্যপ্রযুক্তি, ভারতীয় জনগণের শিক্ষার হার বেড়ে যাওয়া এবং কোটি কোটি ভারতীয় বিভিন্ন উপলক্ষে প্রবাসে অবস্থান করে বিশ্বের মানবগোষ্ঠী, মানবধর্ম, সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতি প্রত্যক্ষ করে ব্রাহ্মণদের চাপিয়ে দেয়া জোয়াল থেকে নিজেদের মুক্ত করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করায় ব্রাহ্মণ্যবাদীরা নিজ দেশের জনগণকে দমন করার জন্য একইরূপ বর্ণবাদী রাষ্ট্র ইসরাইল ও পশ্চিমা বিশ্বের সাথে সখ্য গড়ে তোলে। বর্তমানে ভারতীয় সেনাবাহিনী মূলত পাশ্চাত্য অস্ত্রে নিজ দেশের জনগণকে দমিয়ে রাখার জন্য যুদ্ধ করছে।

ভারতের দ্বিতীয় স্বার্থ হলো- নিজ দেশের নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা হারানোর ভয়। ভারতীয় রাজনীতিক ও বুদ্ধিজীবীরা গজনীর সুলতান মাহমুদ, মুহম্মদ ঘোরী, সম্রাট বাবর, নাদির শাহ ও আহমদ শাহ আবদালী কর্তৃক ভারত দখলের কথা ভুলে যায়নি। অতীতে ভারত প্রত্যক্ষ করেছে, ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী আফগানিস্তান বরাবরই ভারতের স্বাধীনতার জন্য হুমকি। এ জন্য ভারত সবসময় আফগানিস্তানের ঐক্যবদ্ধ হওয়া ও শক্তিশালী হওয়ার বিরুদ্ধে কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। আফগানিস্তানে সোভিয়েত দখলদারিত্বের সময় ভারত রাশিয়ার পক্ষে ছিল, বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান সহযোগী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে এবং সংখ্যালঘু তাজিক, উজবেকদেরকে পশতুনদের বিরুদ্ধে কাজে লাগিয়ে সংঘাত জিইয়ে রাখার লক্ষ্যে সংখ্যালঘু তাজিক ও উজবেকদের অস্ত্র-অর্থ-প্রশিক্ষণ দিয়ে শক্তিশালী করছে।

ভারতের তৃতীয় স্বার্থ হলো স্বীয় সাম্প্রদায়িক মানসিকতা। তীব্র মুসলিম বিদ্বেষী ভারতীয় শাসক সম্প্রদায় কখনো স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তানের অস্তিত্বকে মেনে নিতে রাজি নয়। এ জন্য ভারত ১৯৭১ সালে পাকিস্তানকে দুই টুকরা করেছে এবং বর্তমানে ইসরাইল ও পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের সহায়তায় পাকিস্তানের অস্তিত্ব ধ্বংসে কাজ করছে। পশ্চিমাদের ছত্রছায়ায় ভারত আফগানিস্তানে ও পাকিস্তানের অভ্যন্তরে অসংখ্য গোপন ও প্রকাশ্য জঙ্গি প্রজনন ঘাঁটি স্থাপন করে আফগানিস্তান, পাকিস্তান, ইরান ও মধ্য এশিয়ার মুসলিম দেশে সহিংসতা ছড়িয়ে দিচ্ছে।

রাজনৈতিক স্বার্থ

ভারত ইতিমধ্যে নিজ অপকর্মের মাধ্যমে সকল প্রতিবেশী দেশের সাথে স্থায়ী শত্রুতা স্থাপন করেছে। সে তার প্রতিবেশী পাকিস্তানের সাথে ৩ বার এবং চীনের সাথে ১ বার যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। সীমান্তবর্তী ছোট দেশগুলোর অভ্যন্তরীণ বিষয়ে

www.pathagar.com

অযাচিত হস্তক্ষেপ করে প্রতিবেশী দেশের জনগণের মন বিষিয়ে দিয়েছে। এতদসত্ত্বেও পাকিস্তান ও চীন অদ্যাবধি ভারতের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে রাজনৈতিক ময়দানে ভূমিকা রাখছে। এ জন্য ভারতের বর্তমান প্রচেষ্টা হলো পাকিস্তানের সাথে পশ্চিমাদের কৌশলগত মিত্রতাকে বিচ্ছিন্ন করা। এক্ষেত্রে ভারত অনেকটা সফল হয়েছে। ভারত ও ইসরায়েলের গোপন মিত্রতা ও কার্যকলাপ ইতিমধ্যে পশ্চিমাদের সাথে পাকিস্তানের বৈরিতা চরমে পৌঁছেছে। খুব সহসা এই বৈরিতার বাস্তব ফলাফল প্রত্যক্ষ করা যাবে।

দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়ায় ভারতের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হলো চীন। জনসংখ্যা, সেনাসংখ্যা, অস্ত্রশস্ত্র, অর্থনীতিসহ সকল ক্ষেত্রে চীন ভারত অপেক্ষা অনেক অগ্রসর। চীনা কর্মকাণ্ডের কারণে ভারত স্বাধীনভাবে দক্ষিণ এশিয়ায় ও মধ্য এশিয়ায় নিজ এজেন্ডা বাস্তবায়ন করতে পারে না। চীন ভারতের বাড়া ভাতে ছাই দেয়। চীনের কারণেই ভারত নেপাল ও বাংলাদেশকে হজম করতে সক্ষম হচ্ছে না এবং চীনের কারণেই ভারত এবং ভারতের পালিত তামিল টাইগাররা শ্রীলঙ্কায় নিশ্চিহ্ন হয়েছে। এমতাবস্থায় ভারত তার আফগান গোয়েন্দা প্রশিক্ষণ ঘাঁটি থেকে চীনের মুসলিম অধ্যুষিত ঝিনজিয়াং প্রদেশে জঙ্গি সরবরাহ করছে। ভারতীয় আধিপত্যের মোকাবেলায় চীন প্রধান প্রতিবন্ধক হওয়ায় ভারত সবসময় চীন ভীতিতে আক্রান্ত এবং এই ভীতিই ভারতের পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণে প্রধান ভূমিকা রাখে। ভারতের চীন ভীতির প্রধান প্রধান কারণসমূহ নিম্নরূপ :

১. দক্ষিণ এশিয়ায় চীনের ক্রমবর্ধমান প্রভাব ভারতের প্রভাব ক্ষুণ্ণ করছে। চীনা প্রভাব ও কার্যক্রমের ফলে India doctrine মোতাবেক 'অখণ্ড ভারত' গঠন সম্ভব হচ্ছে না।

২. ভারত অভ্যন্তরীণ সমস্যায় জর্জরিত হওয়ায় কাঙ্ক্ষিত গতিতে সম্মুখপানে অগ্রসর হতে সক্ষম হচ্ছে না। পক্ষান্তরে চীনের জাতীয় ঐক্য ও সংহতি অটুট থাকায় চীন দ্রুতগতিতে সুপার পাওয়ার আমেরিকার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়েছে।

৩. চীন রাশিয়ার সহযোগিতায় স্বীয় সামরিক বাহিনীর আধুনিকায়ন করছে, অর্থনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্টের সমকক্ষ হওয়ার চেষ্টা করছে।

৪. ১১.০১.০৭ তারিখে চীন ভূমি থেকে নিক্ষিপ্ত মিসাইল দিয়ে ৫৩৭ মাইল দূরবর্তী মহাকাশে অবস্থিত স্বীয় অকেজো আবহাওয়া উপগ্রহ ধ্বংসে সক্ষমতা অর্জন করায় ভারত ও যুক্তরাষ্ট্র বিচলিত হয়। ভারত আন্তর্জাতিক বিশ্বকে চীনের ভূমি, আকাশ, সাগর ও মহাকাশ সামর্থ্যের ব্যাপারে সতর্ক করে দেয়।

৫. শ্রীলঙ্কা-চীন ব্যাপক সহযোগিতা চুক্তি সম্পাদন এবং ভারতীয় সীমান্তের নিকটবর্তী শ্রীলঙ্কার বন্দরে চীনা যুদ্ধ জাহাজের অবস্থান ও জ্বালানি সুবিধা লাভ ভারতকে আতঙ্কিত করে।

www.pathagar.com

৬. পাকিস্তানকে টুকরা করা এবং তেল-গ্যাসসমৃদ্ধ বালুচিস্তানকে দখল করার লক্ষ্য নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র-ইসরাইল-ভারত-ব্রিটেন-জার্মানি ও ফ্রান্স। ইতিমধ্যে অনেকদূর অগ্রসর হওয়ার পর দেখা গেল চীন বালুচিস্তানের গভীর সমুদ্রবন্দর গোয়াদরকে আধুনিকায়ন করে চীন থেকে কারাকোরাম মহাসড়ক হয়ে গোয়াদর পর্যন্ত যাতায়াত ব্যবস্থা সম্প্রসারণ করছে। এমতাবস্থায় গোয়াদর বন্দর রক্ষার অজুহাতে চীনের সামরিক হস্তক্ষেপ অসম্ভব কিছু নয়।

৭. বর্তমানে চীন কাশ্মির উপত্যকার ৩৮০০০ বর্গ কিলোমিটার অংশ নিজ ভূখণ্ড বলে দাবি করছে। নভেম্বর ২০০৬ সালে চীনা প্রেসিডেন্ট হু জিন তাওয়ের ভারত সফরকালে ভারতে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত বলেছেন, ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অরুণাচল প্রদেশ চীনের অংশ। চীন বর্তমানে অরুণাচল প্রদেশের অধিবাসীদের চীনা ভিসা দিচ্ছে না।

৮. বাংলাদেশের বিদ্যুৎ ও অবকাঠামো খাতে চীনা বিনিয়োগ বৃদ্ধি ভারতের গোপন লক্ষ্যের পরিপন্থী।

৯. চীন দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সাথে জ্বালানি উন্নয়ন, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক সম্পর্ক উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করছে। বিশেষ করে ভারত সীমান্তবর্তী 'মিয়ানমার'কে উত্তরোত্তর সামরিকভাবে শক্তিশালী করছে।

আফগানিস্তানে ভারতের ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থ

আফগানিস্তানে ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম। এই গুরুত্ব যুগে যুগে সাম্রাজ্যবাদীদেরকে আফগানিস্তান দখলে প্ররোচিত করেছে। চীন-আফগানিস্তান-পাকিস্তান ও মধ্য এশিয়ার সংযোগস্থল 'ওয়াখান করিডোর' নিয়ন্ত্রণ করা ও নিয়ন্ত্রণে রাখা বর্তমানে ভারত ও তার পশ্চিমা মিত্রদের প্রধান লক্ষ্য। ইতিমধ্যে CIA/RAW/ MOSSAD যৌথভাবে 'ওয়াখান করিডোর' সংলগ্ন আফগানিস্তানে অত্যাধুনিক গোয়েন্দা সরঞ্জাম সমৃদ্ধ সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করেছে।

মানচিত্রের দিকে তাকালে দেখা যাবে, বাংলাদেশ যেরূপ তিনদিকে ভারতবেষ্টিত, ভারতও তদ্রুপ চতুর্দিকে মুসলিম দেশ অঞ্চল ও চীন কর্তৃক বেষ্টিত। এমতাবস্থায় মুসলিম দেশ ও অঞ্চলসমূহে এবং চীনের ঝিনঝিয়াং ও তিব্বতে জঙ্গি সরবরাহ করে সংশ্লিষ্ট দেশসমূহে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টিতে ভারত নিজের আত্মরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় মনে করে।

আফগানিস্তানে ভারতের অর্থনৈতিক স্বার্থ

ইতিমধ্যে বিশ্ববাসী জানতে পেরেছে যে, অজনপ্রিয় ও তাঁবেদার সরকারকে টিকিয়ে রেখে উক্ত দেশের সম্পদ লুণ্ঠন করার জন্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তি জাতিসংঘ বাহিনীর নামে সংশ্লিষ্ট দেশে 'লুণ্ঠন নিরাপত্তা বাহিনী' মোতায়েন করে। গরিব দেশগুলো উক্ত

www.pathagar.com

বাহিনীতে এই ভেবে সৈন্য পাঠায় যে, সৈন্যদের বেতন-ভাতা বাবদ লুণ্ঠিত সম্পদের ছিটেফোঁটা হলেও পাওয়া যাবে। একইভাবে ভারত আফগানিস্তানে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি প্রদত্ত ডলার আয় করার জন্য হাজার হাজার সামরিক-বেসামরিক লোক সরবরাহ করেছে। উক্ত সরবরাহকৃত জনবলের বেতন-ভাতা-অস্ত্র-রসদ বাবদ ভারত বিপুল অর্থ হাতিয়ে নিয়ে লাভবান হচ্ছে।

আফগানিস্তানে ভারতের ধর্মীয় স্বার্থ : বর্ণবাদী ইসরাইল ও পশ্চিমা বিশ্বের সাথে মিলিত হয়ে ভারত অজেয় মুসলমানদের উপর 'হাজার সালকা বদলা' নিচ্ছে। পাশ্চাত্যের সহযোগী হয়ে ভারত নিজ দেশের, আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও মধ্য এশিয়ার মুসলমানদের রক্ত ঝরিয়ে একেশ্বরবাদের বিরুদ্ধে বহু ঈশ্বরবাদী যুদ্ধ চালিয়ে মনের ঝাল মেটাচ্ছে। ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে ভারতের বিজয় সম্পর্কে বিদেশী সাংবাদিকগণ নয়াদিল্লিতে ইন্দিরা গান্ধীর অনুভূতি জানতে চাইলে তিনি বলেছিলেন, এর মাধ্যমে তিনি এবং ভারতের জনগণ মুসলমানদের বিরুদ্ধে এক হাজার বছরের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিয়েছেন।

দক্ষিণ এশিয়ায় পশ্চিমা স্বার্থ ও চীন

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সারাবিশ্বে একক আধিপত্য কায়েম করে। শক্তিমদমত্ততায় বিশ্বজনমত ও মানবতাকে উপেক্ষা করে খোঁড়া অজুহাতে ইরাক ও আফগানিস্তানে হামলা চালিয়ে যুক্তরাষ্ট্র বর্তমানে বিশ্বব্যাপী আগ্রাসী শক্তি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। উক্ত ২টি দেশ দখলের যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও নৈতিক ক্ষেত্রে দেউলিয়াত্বের শেষপ্রান্তে উপস্থিত হয়েছে। এমতাবস্থায় বিশ্বের স্বাধীনতাকামী জনতা ও দেশসমূহ রাশিয়া এবং চীনের নেতৃত্বে ক্রমান্বয়ে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রক্রিয়ায় অগ্রসর হচ্ছে। ফলে বর্তমানে একমেরুর স্থলে দু'মেরুর বিশ্ব ক্রমান্বয়ে দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধ নিয়ে ব্যস্ত থাকার সময়ে রাশিয়া-চীন-ইরান ক্রমান্বয়ে শক্তিশালী অবস্থানে উপনীত হয়েছে। ফলে বিশ্বব্যাপী যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন পশ্চিমা আধিপত্যের বিরুদ্ধে চীন-রাশিয়া-ইরান-ভেনিজুয়েলার নেতৃত্বে একটি বিকল্প প্লাটফরম গড়ে উঠেছে।

দক্ষিণ এশিয়ার শক্তিশালী এবং পারমাণবিক ক্ষমতাসম্পন্ন তিনটি দেশ হলো ভারত-পাকিস্তান ও চীন। পাকিস্তান-চীন সখ্যতায় ভারত স্বীয় এজেন্ডা বাস্তবায়নে এবং অস্তিত্ব রক্ষায় যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন পশ্চিমা বিশ্বের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। অপরদিকে যুক্তরাষ্ট্রের একক আধিপত্য মোকাবেলায় রুশ-চীন ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এমতাবস্থায় উভয় শক্তি দক্ষিণ এশিয়ায় বিদ্যমান আধিপত্য বজায় রাখা ও বিস্তৃত করার লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করছে এবং একপক্ষ অন্যপক্ষকে ঘেরাও করার কর্মসূচি বাস্তবায়নে অগ্রসর হচ্ছে। বৃহৎ শক্তিসমূহের পরস্পরবিরোধী

www.pathagar.com

স্বার্থের দ্বন্দ্বই দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহকে অস্থিতিশীল করে তুলেছে। পরস্পরবিরোধী স্বার্থসমূহ নিম্নরূপ–

দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের স্বার্থসমূহ

১. ইন্ডিয়া ডকট্রিন বাস্তবায়ন বা অখণ্ড ভারত গঠন।
২. স্বীয় আধিপত্য বজায় রাখা ও বিস্তৃত করা।
৩. নিজদেশে ও প্রতিবেশী দেশসমূহে ব্রাহ্মণ্যবাদী শাসন-শোষণ অব্যাহত রাখা ও বিস্তৃত করা।
৪. বঙ্গোপসাগর, আরব সাগর ও ভারত মহাসাগরে স্বীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা।
৫. স্বীয় লক্ষ্য অর্জনের প্রধান প্রতিবন্ধক চীনকে প্রতিহত করা।

দক্ষিণ এশিয়ায় পশ্চিমা স্বার্থ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে দীর্ঘকালব্যাপী দক্ষিণ এশিয়ার প্রায় প্রতিটি দেশ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বৃটিশ ও পশ্চিমাশক্তির দখলে ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাধ্যমে শক্তিহীন হওয়ায় পশ্চিমা বিশ্ব উদ্দেশ্যমূলকভাবে সীমানা নির্ধারণ করে দেশসমূহকে স্বাধীনতা প্রদান করে। তাদের বিতর্কিত ও উদ্দেশ্যমূলক সীমানা নির্ধারণ দক্ষিণ এশিয়ার দেশে দেশে সংঘাত-সংঘর্ষ-অশান্তি অব্যাহত থাকে। উক্ত সংঘাত-সংঘর্ষের মাধ্যমে পশ্চিমা বিশ্ব নিজেদের পরোক্ষ শাসন-শোষণ বজায় রাখে। ইতিমধ্যে চীন শক্তিশালী হওয়ায় এবং পাকিস্তান পরমাণু অস্ত্রের অধিকারী হওয়ায় পশ্চিমা ও ভারতীয় স্বার্থ হুমকির সম্মুখীন হয়। এ স্বার্থসমূহ হলো–

১. আধিপত্য বজায় রাখা ও সম্প্রসারণ করা।
২. আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ মালাক্কা প্রণালীতে আধিপত্য বজায় রাখা। উল্লেখ্য, সুয়েজ খালের কর্তৃত্ব বহাল রাখার জন্য পশ্চিমা শক্তি ইসরাইল রাষ্ট্রের পত্তন করেছে ও লালন করছে এবং মালাক্কা প্রণালীর কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য মালয়েশিয়াকে কেটে সিঙ্গাপুর রাষ্ট্রের জন্ম দেয়া হয়েছে এবং ফিলিপিনে মার্কিন সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে ফিলিপাইনে মার্কিন ঘাঁটি নেই তদুপরি মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া মার্কিনবলয় থেকে বেরিয়ে চীনের সাথে সখ্যতা গড়ে তোলায় যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গোপসাগর ও ভারত মহাসাগরে আধিপত্য বজায় রাখার জন্য সম্প্রসারণবাদী ভারতের সাথে গাঁটছড়া বেঁধেছে।
৩. দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব জিইয়ে রেখে অস্ত্র ও পণ্য বিক্রয় করা।
৪. বিদ্যমান সামরিক ঘাঁটিসমূহ বজায় রাখা।
৫. বিশ্বব্যাংক/আইএমএফের সুদী ব্যবসা অব্যাহত রাখা।
(উল্লেখ্য, ২০০৬ সালনাগাদ বাংলাদেশ বিশ্বব্যাংক/আইএমএফের উপর

www.pathagar.com

নির্ভরশীলতা অনেকটা কমিয়ে এনে স্বনির্ভর অর্থনীতির দেশে পরিণত হচ্ছিল। এমতাবস্থায় ভারত-যুক্তরাষ্ট্র-পশ্চিমা বিশ্ব, আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংকের বাংলাদেশ প্রতিনিধিরা এদেশের একশ্রেণীর ক্ষমতালোভী রাজনৈতিক নেতৃত্বের কাঁধে সওয়ার হয়ে ১/১১ কাণ্ড ঘটায় এবং দেশকে পুনরায় পশ্চিমা ঋণের জালে জড়ানোর ব্যবস্থা করে)।

৬. রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসন অব্যাহত রাখা।

৭. খনিজসম্পদে সমৃদ্ধ ও ভূ-রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ মুসলিম দেশ ও অঞ্চল দখল অব্যাহত রাখার স্বার্থে একমাত্র পারমাণবিক শক্তিধর মুসলিম জাতিরাষ্ট্র পাকিস্তানকে টুকরা করা ও পারমাণবিক অস্ত্র অধিকার করা।

দক্ষিণ এশিয়ায় চীনা স্বার্থ

জোরজবরদস্তি করে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা বা ভারত ও পশ্চিমাদের মতো অন্যায়ভাবে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা বর্তমান চীনের নীতি নয়। স্বীয় বাণিজ্যিক স্বার্থ ও রাষ্ট্রীয় সংহতি রক্ষার জন্যই চীন স্বীয় কার্যক্রম পরিচালনা করে। এ জন্যই দেখা যায়, চীন আগ্রাসন পরিচালনা করে না বরং আগ্রাসী শক্তির পিছু নিয়ে আগ্রাসনকে থামিয়ে দিতে চায়। দু'একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি বোধগম্য হবে।

পাকিস্তানে চীনা কার্যক্রম : পশ্চিমা বিশ্ব ও ভারত ২০১৫ সালের মধ্যে পাকিস্তানকে তিন টুকরা করার পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হওয়ার পর চীন পাকিস্তানের সংহতি রক্ষা ও স্বীয় স্বার্থ রক্ষায় দুটি প্রকল্প বাস্তবায়নে অগ্রসর হয়। প্রকল্প দুটি হলো–

ক. চীন বেলুচিস্তানের জিন্নাহ নেভাল বেস ও গোয়াদরে যৌথভাবে নির্মাণাধীন অপর একটি সমুদ্রবন্দর ও নেভাল বেসে স্বীয় মনিটরিং স্টেশন স্থাপন করেছে। এছাড়াও বেলুচিস্তানের ছোট ছোট নৌবন্দরসমূহে চীনা নৌবাহিনীর জাহাজ অবস্থানের ব্যবস্থা করেছে। ফলে পশ্চিমা বিশ্ব ও ভারত স্বীয় নৌ এবং তেলস্বার্থ হুমকির সম্মুখীন বলে মনে করে।

খ. চীন থেকে সরাসরি বেলুচিস্তানের গোয়াদর বন্দর যাওয়ার জন্য চীন যৌথভাবে গুরুত্বপূর্ণ কারগিল ও সিয়াচেন হয়ে রেলসড়ক নির্মাণ করছে।

গ. ০৫/০৩/০৭ সালে যুক্তরাষ্ট্র ও শ্রীলঙ্কার মধ্যে ACSA চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি মোতাবেক যুক্তরাষ্ট্র শান্তি মিশনে, মানবিক সাহায্য কার্যক্রমে এবং যৌথ মহড়ার সময় শ্রীলঙ্কার ভূখণ্ড ও বন্দর ব্যবহার করতে পারবে। যুক্তরাষ্ট্র-শ্রীলঙ্কা চুক্তি স্বাক্ষরের পর চীন শ্রীলঙ্কার সাথে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। উক্ত চুক্তি মোতাবেক চীন-শ্রীলঙ্কা যৌথভাবে হাম্বানটোটা হারবার উন্নয়নে কাজ শুরু করে। মূলত এ চুক্তির দ্বারা চীন শ্রীলঙ্কায় স্বীয় নৌঘাঁটি স্থাপন করছে।

www.pathagar.com

ভারতের অতি নিকটে নির্মিত এ ঘাঁটি ভারতকে রীতিমতো উদ্বিগ্ন করে তুলেছে।

ঘ. স্বাধীন পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা নীতি অনুসরণ করার চেষ্টা করায় ভারত নেপালের প্রত্যেক গোষ্ঠীকে আলাদাভাবে ইন্ধন দিয়ে গৃহযুদ্ধ পরিস্থিতি সৃষ্টি করে এবং রাজা বীরেন্দ্র, রাজা জ্ঞানেন্দ্র ও প্রচণ্ডকে দৃশ্যপট থেকে অপসারণ করে। এতদসত্ত্বেও মাওবাদী নেতা প্রচণ্ডের স্বল্পকালীন সরকারের সময় চীন নেপালের সাথে ২টি চুক্তি স্বাক্ষর করে। তন্মধ্যে একটি হলো লাসা-কাঠমুন্ডু রেল ও সড়ক সংযোগ চুক্তি। চতুর্মুখী বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে ভারত ও যুক্তরাষ্ট্র নেপালকে সিকিমের মতো গ্রাস করতে উদ্যত হলে ২০০৬ সালের জুনে নেপালে নিযুক্ত চীনা রাষ্ট্রদূত এই মর্মে সতর্ক করেন যে, 'চীন নেপালে কোনো বৈদেশিক আগ্রাসন সহ্য করবে না। নেপালের সংহতি ও সার্বভৌমত্ব হুমকির সম্মুখীন হলে চীন নেপালী জনগণের পাশে থাকবে।' এই সতর্কবার্তার পর আগ্রাসী শক্তি নিজেদেরকে সংযত করতে বাধ্য হয়।

ঙ. ভারতে বিজেপি সরকার ক্ষমতাসীন থাকার সময় যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ সামরিক সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হলে ভারত তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। এদেশের ভারতপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোও এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়। ২০০২ সালের ডিসেম্বরে চীন-বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই ব্যাপক পরিসরের চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর ভারত তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। ভারতীয় বিশ্লেষকরা এই চুক্তিকে নিজেদের আধিপত্যবাদী আকাঙ্ক্ষার পথে প্রধান প্রতিবন্ধক মনে করে। কোনো কোনো ভারতীয় বিশ্লেষক এই মর্মে মন্তব্য করেন যে, এই চুক্তির মাধ্যমে বঙ্গোপসাগর চীনা 'লেক'-এ পরিণত হবে।

চীন-বাংলাদেশ চুক্তি সম্পাদিত হওয়ায় বাংলাদেশের বিভিন্ন সেক্টরে চীনা সহযোগিতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকলে ভারত প্রমাদ গোনে। ভারতপন্থী রাজনৈতিক দলগুলো দেশের প্রতিটি সেক্টরে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে এবং হরতাল-ধর্মঘট-জ্বালাও-পোড়াওয়ের মাধ্যমে দেশে চরম নৈরাজ্য সৃষ্টি করে। ভারতীয় সরকারি-বেসরকারি প্রচার মাধ্যম সেদেশে অবৈধ বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ সমস্যা, বাংলাদেশে ইসলামী জঙ্গীবাদের উত্থানের সংবাদ প্রচার করে। ভারতের উগ্রপন্থী রাজনৈতিক নেতৃত্ব বাংলাদেশে ভারতীয় আগ্রাসনের জন্য ভারত সরকারকে আহ্বান করে। বাংলাদেশের ভারতপন্থী রাজনৈতিক, সুশীল সমাজ ও সংবাদমাধ্যম ভারতের সুরে সুর মিলিয়ে দেশবিরোধী প্রচারণা শুরু করে। চীন-বাংলাদেশ চুক্তির প্রেক্ষাপটে ভারত পশ্চিমা শক্তির সাথে হাত মেলায় এবং সবাই সম্মিলিতভাবে ১/১১ সৃষ্টির মাধ্যমে বাংলাদেশের অগ্রগতি, সমৃদ্ধি, নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্বকে চরম হুমকির সম্মুখীন করে। ১/১১ যাদের আন্দোলনের ফসল বলে দাবি করেছে

www.pathagar.com

তারাই বর্তমানে ক্ষমতাসীন হয়ে ভারত, পশ্চিমা শক্তি, বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের এজেন্ডা বাস্তবায়নে ব্যস্ত। দেশ ও জনগণের স্বার্থ এ সরকারের নিকট মূল্যহীন।

বাংলাদেশের একশ্রেণীর জনগোষ্ঠীর এরূপ দেশবিরোধী কার্যকলাপে চীন ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে। চীন উপলব্ধি করেছে যে, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি, সামরিক নীতি ও উন্নয়ন নীতিমালা স্থিতিশীল নয়। সরকার পরিবর্তনের সাথে এদেশের সকল নীতি পাল্টে যায়। এমতাবস্থায় চীন বঙ্গোপসাগর ও দক্ষিণ এশিয়ায় স্বীয় স্বার্থ সংরক্ষণে এবং পশ্চিমা ও ভারতীয় আধিপত্য মোকাবেলায় বার্মার সামরিক সরকারকে বিশ্বস্ত সহযোগী হিসেবে নির্ধারণ করে এবং বার্মাকে সকল ক্ষেত্রে সাহায্য-সহযোগিতা দিয়ে বর্তমানে বাংলাদেশ ও ভারতের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করছে।

আমার ধারণা– বাংলাদেশ যদি বর্তমানে অনুসৃত নতজানু পররাষ্ট্রনীতি ও প্রতিরক্ষানীতি অনুসরণ করে, ভারতীয় ও পশ্চিমা এজেন্ডা বাস্তবায়নে ব্যস্ত থাকে এবং দক্ষিণ এশিয়ায় ও বঙ্গোপসাগরে চীনা স্বার্থ ক্ষুণ্ন করা অব্যাহত রাখে তবে অচিরেই চীনের ইঙ্গিতে বার্মা বাংলাদেশকে স্থল-জল ও আকাশপথে ব্যাপকভাবে আক্রমণ করবে। কেননা চীন স্বীয় ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থে কখনো চাইবে না পার্বত্য চট্টগ্রামে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পরিবর্তে অন্য কোনো সেনাবাহিনী প্রবেশ করুক এবং চট্টগ্রাম বন্দর বা প্রস্তাবিত গভীর সমুদ্রবন্দর চীনবিরোধী শক্তিসমূহের করতলে সোপর্দ হোক। ইতিমধ্যে এই আসন্ন ঝড়ের পূর্বাভাস আমরা পত্রপত্রিকায় লক্ষ্য করছি। অর্থাৎ মায়ানমার আরাকানের মুসলমানদেরকে চরম নির্যাতনের মাধ্যমে বাংলাদেশে পাঠাচ্ছে, বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্তে পরিখা খনন করছে, কাঁটাতারের বেড়া দিচ্ছে এবং নিজস্ব নৌবাহিনীর প্রহরায় বঙ্গোপসাগরের বাংলাদেশ অংশে তেল-গ্যাস অনুসন্ধানের প্রস্তুতি নিচ্ছে। ভূ-রাজনৈতিক কারণেই বাংলাদেশ-চীন ও বাংলাদেশ-মিয়ানমার সম্পর্ক উত্তরোত্তর অবনতির দিকে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে অস্ট্রেলিয়ার দৈনিক সিডনি হেরাল্ড জানিয়েছে, মিয়ানমার আগামী ৫ বছরের মধ্যে পরমাণু বোমা তৈরির লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পশ্চিমা স্বার্থ ও চীন

চীন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি। পশ্চিমা বিশ্ব দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় স্বীয় প্রভাব ধরে রাখতে এবং চীনা প্রভাব প্রতিহত করতে স্বীয় মিত্রদেশসমূহের সাথে যৌথভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পশ্চিমা বিশ্বের মিত্রদেশসমূহ হলো– থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন, পূর্ব তিমুর, দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান ও জাপান। ভারত ও অস্ট্রেলিয়া এ অঞ্চলে পশ্চিমাদের সহযোগী হিসেবে ভূমিকা পালন করছে। পশ্চিমাদের সাথে চীনের দ্বন্দ্ব আঞ্চলিক ও গ্লোবাল উভয়বিধ।

www.pathagar.com

পশ্চিমাদের চীনভীতির কারণসমূহ সংক্ষেপে নিম্নরূপ

১. চীন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন পশ্চিমা বিশ্বের আধিপত্যের প্রতিবন্ধক।

২. চীন বিশ্বব্যাপী সাফল্যজনকভাবে তেল, গ্যাস ও অবকাঠামোগত উন্নয়নে বিনিয়োগ করছে।

৩. মধ্যএশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা ও আমেরিকায় উত্তরোত্তর বাণিজ্য সম্প্রসারণ করছে।

৪. চীন ক্রমান্বয়ে অর্থনৈতিক উন্নতি করে প্রতিযোগিতার সামর্থ্য বৃদ্ধি করছে এবং সামর্থ্যের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রকে অতিক্রম করছে।

৫. বিভিন্ন দেশ-জাতির সাথে পাশ্চাত্যের গণতন্ত্র-গণতন্ত্র খেলায় (ব্যবসায়) চীন প্রধান হুমকি।

৬. বৈদেশিক বিনিয়োগ ও জ্বালানি নিরাপত্তার ক্ষেত্রে চীন এশিয়ার পাওয়ার হাউজে পরিণত হয়েছে।

৭. অত্যাধুনিক সামরিক সরঞ্জাম নির্মাণ ও বিক্রয়ের ক্ষেত্রে চীন পশ্চিমা বিশ্বের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

৮. চীনের সামরিক সক্ষমতা আঞ্চলিক ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় যুক্তরাষ্ট্রের একাধিপত্যের বিরুদ্ধে হুমকি সৃষ্টি করেছে।

৯. চীন-রাশিয়া কর্তৃক ২০০১ সালে সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশন (SCO) গঠন ও এতে তেল-গ্যাসসমৃদ্ধ ও কৌশলগত দেশ কাজাখস্তান, কিরঘিজিস্তান ও উজবেকিস্তানকে অন্তর্ভুক্ত করায় পশ্চিমা বিশ্বের দি গ্রেট গেম প্লান ও মধ্যএশীয় স্বার্থ ক্ষুণ্ন করছে।

১০. SCO কর্তৃক মধ্যএশিয়ায় পরিচালিত ধারাবাহিক সামরিক মহড়া যুক্তরাষ্ট্রকে পূর্ব এশিয়ায় মিসাইল ডিফেন্স সিস্টেম স্থাপনে বাধ্য করেছে।

১১. চীনা সরকারি দৈনিক পিপলস ডেইলি সেপ্টেম্বর ২০০৬ সালে পশ্চিমা বিশ্বকে এই মর্মে সতর্ক করে যে, ন্যাটো স্বীয় আত্মরক্ষার সীমা অতিক্রম করে যুক্তরাষ্ট্রের গ্লোবাল স্বার্থ রক্ষায় নিয়োজিত হওয়ায় চীনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এই সতর্কতা নতুন করে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের সূচনার ইঙ্গিতবাহী।

১২. আসিয়ানের সাথে চীনের কৌশলগত, কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পৃক্ততা এতদঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমা বিশ্বের একাধিপত্য খর্ব করেছে। এ জন্য ওবামা প্রশাসন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ক্ষেত্রে ইতিপূর্বেকার অনুসৃত নীতি 'অপেক্ষা করো ও দেখো' পরিবর্তনে বাধ্য হয়েছে। বর্তমানে এ অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের বিঘোষিত নীতি হচ্ছে– উন্নয়ন, জনকূটনীতি ও বেসরকারি পর্যায়ে মতবিনিময়। যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় স্বীয় বিনিয়োগ দ্বিগুণ করছে। এ বছর (২০০৯) যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারী ক্লিনটন আসিয়ান সম্মেলনে 'Treaty of South-East Asian Amity and Co-Operation' চুক্তি সই

www.pathagar.com

করেছে, যা East Asia Summit-এ যোগদানের পূর্বশর্ত। হিলারী ক্লিনটন মেকং নদী অববাহিকা উন্নয়নের ধারণা তুলে ধরে থাইল্যান্ড, লাওস, কম্বোডিয়া ও ভিয়েতনামের সাথে পরিবেশ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও উন্নয়নের বিষয়ে আলোচনা করেছেন। জাপান জানুয়ারি ২০০৮ সালে মেকং নদী অববাহিকার ৫টি দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের একটি সম্মেলন করেছে এবং মিয়ানমার, থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনামকে যুক্ত করে একটি অর্থনৈতিক করিডোর স্থাপনের প্রস্তাব দিয়েছে। (তথ্যসূত্র : পিপলস ডেইলি, চীন- ০৩/০৮/০৯ইং)। মূলতঃ আসিয়ানকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় চীনা প্রভাব খর্ব করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র-জাপানের উদ্বেগের অংশ হিসেবে এই মেকং নদী অববাহিকা উন্নয়নের শ্লোগান উচ্চারিত হচ্ছে।

১৩. মধ্যপ্রাচ্যে চীনের জ্বালানি নীতি যুক্তরাষ্ট্রের জ্বালানি ও নিরাপত্তার স্বার্থে হুমকি সৃষ্টি করেছে যা দু'দেশকে সাংঘর্ষিক অবস্থায় উপনীত করতে পারে।

১৪. হংকংয়ের মালিকানা চীনের নিকট হস্তান্তর করার পর পশ্চিমা বিশ্ব দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নিজেদের প্রধান অবস্থান হারায়। তাইওয়ান-দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপানকে অস্ত্রসজ্জিত করার পরও পশ্চিমা বিশ্ব হংকংয়ের বিকল্প কোনো ব্যবস্থা এখনো তৈরি করতে পারেনি।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় স্বার্থের দ্বন্দ্ব এবং এর পরিণাম

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর দুই মেরু বিশ্বের অবসান হওয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন পশ্চিমা বিশ্ব বেপরোয়া হয়ে ওঠে। সমগ্র বিশ্বে স্বীয় আধিপত্যের জাল আরো বিস্তৃত করা, বিশ্বের সকল সম্পদ কুক্ষিগত করা এবং অপর কোনো শক্তি যাতে পশ্চিমা শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সামর্থ্য অর্জনে সক্ষম না হয় তার জন্য যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমা বিশ্ব সদা-সর্বদা সতর্ক থেকে সকল প্রকার অমানবিক ও নিষ্ঠুর দমননীতি বিশ্বের উপর আরোপ করতে সচেষ্ট রয়েছে। এতদসত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে বিশাল জনগোষ্ঠীর দেশ চীন খুব দ্রুত পশ্চিমা বিশ্বের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আবির্ভূত হয়েছে। রাজনৈতিক, সামরিক, অর্থনৈতিক দিক থেকে চীনের এই অভাবনীয় উন্নতি সমগ্র বিশ্বে ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পশ্চিমা স্বার্থ এবং আকাঙ্ক্ষার প্রধান প্রতিবন্ধক হিসেবে দেখা দিয়েছে। এমতাবস্থায় চীনকে মোকাবেলা করার জন্য অপর এক বিশাল জনগোষ্ঠীর দেশ ভারতের সাথে যুক্তরাষ্ট্র-ইসরাইল-ই.ইউ একটি জোট গড়ে তোলে। এ জোটের প্রত্যেক দেশ নিজেদের স্বার্থে অপরের সর্বস্ব হরণে বিশ্বাসী এবং চরমভাবে মুসলিম বিদ্বেষী। উক্ত অশুভ জোটের মোকাবেলায় ইতিমধ্যে চীন-রাশিয়া-ভেনিজুয়েলা-ইরানসহ আরো কতিপয় স্বাধীনতাপ্রিয় দেশ অপর একটি অঘোষিত জোটে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। চীনের ব্যাপারে পশ্চিমা বিশ্বের মনোভাব নিম্নরূপ–

www.pathagar.com

১. চলতি বছর প্রণীত (২০০৯) যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় গোয়েন্দা কৌশলে মার্কিন ন্যাশনাল ইন্টিলিজেন্স ডিরেক্টর Dense Blair মার্কিন সরকারকে এই বলে আহ্বান করেছেন যে, "পৃথিবীর প্রাকৃতিক সম্পদের উপর চীনের নিয়ন্ত্রণের পথ বন্ধ করার পাশাপাশি তার সামরিক বিভাগে নতুন নতুন অস্ত্র তৈরির উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে হবে। চীনের সামরিক উন্নতির ফলে মার্কিন নৌবহর ও বিমানঘাঁটিগুলো ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। (সূত্র : দৈনিক নয়াদিগন্ত, ১৫.১০.০৯ইং)।

২. যায়নবাদী ইহুদি কর্তৃক পরিচালিত মার্কিন নীতিনির্ধারক সংস্থা হেরিটেজ ফাউন্ডেশনের প্রধান জন থাকিক বলেছেন, চীনের উদ্দেশ্য যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান দখল করা এবং এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করানো।

পৃথিবীর বর্তমান আধিপত্যবাদী শক্তিসমূহ প্রধানতঃ সাগরসমূহে নিজেদের কর্তৃত্ব বহাল রাখতে বদ্ধপরিকর। সাগরসমূহ এবং গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ পথ বা প্রণালীসমূহে স্বীয় দখল বা কর্তৃত্ব বজায় রাখার মাধ্যমে আধিপত্যকে স্থায়ী করা হয়।

পৃথিবীর প্রধান প্রধান নৌ যোগাযোগ রুটসমূহ হলো সুয়েজ খাল, জিব্রালটার প্রণালী, এডেন উপকূল, হরমুজ প্রণালী, পানামা খাল ও মালাক্কা প্রণালী। উক্ত যোগাযোগ পথসমূহে নিজেদের কর্তৃত্ব বহাল রাখার জন্য বিশ্বশক্তিসমূহ যে কোনো প্রকারের ঝুঁকি নিয়ে থাকে অথবা আগ্রাসন পরিচালনা করে। এডেন উপকূল ও হরমুজ প্রণালী পাহারায় যুক্তরাষ্ট্র উপসাগরে এবং ভারত মহাসাগরে শক্তিশালী নৌবহর মোতায়েন রেখেছে, সুয়েজ খালের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় পশ্চিমা শক্তি মধ্যপ্রাচ্যের বিষবৃক্ষ ইসরাইল প্রতিষ্ঠা ও লালন করছে এবং মিসরে দীর্ঘদিন যাবত উপনিবেশিক শাসন চাপিয়ে দিয়েছিল, বর্তমানে মিসরে তাঁবেদার সরকার প্রতিষ্ঠা করেছে, জিব্রালটার প্রণালীর দু'পাশের দেশ মরক্কো ও স্পেন পশ্চিমা শক্তির দোসর, পানামা খাল খনন পরিকল্পনা করার পরে কলম্বিয়ার প্রদেশ পানামাকে বিচ্ছিন্ন করে আলাদা দেশ করেছে এবং পানামায় তাঁবেদার সরকার প্রতিষ্ঠা করেছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার গুরুত্বপূর্ণ 'মালাক্কা-বান্দাহ আচেহ' প্রণালীতে আধিপত্য ধরে রাখার জন্য এবং আগামীদিনের সম্ভাব্য প্রধান বিশ্বশক্তি চীনকে দমন করার জন্য পশ্চিমা বিশ্ব দক্ষিণ এশিয়ার দেশ ভারতের সাথে গাঁটছড়া বেঁধেছে। নিজেদের সাম্প্রদায়িক ও বর্ণবাদী স্বার্থে ১৭৫৭ সালে ভারতের উচ্চবর্ণের হিন্দুরা ইউরোপের জলদস্যুদেরকে এদেশে ডেকে এনে ক্ষমতায় বসিয়ে এশিয়াকে রক্তাক্ত জনপদে পরিণত করেছিল, বর্তমানেও ভারতের বর্ণবাদী শাসকগোষ্ঠী শুধুমাত্র নিজেদের গোষ্ঠীস্বার্থে পশ্চিমা শক্তিকে ডেকে এনে এশিয়ায় রক্তবন্যা বইয়ে দেয়ার আয়োজন করছে। এমতাবস্থায় এশিয়ায় পশ্চিমা শক্তির বিপর্যয় ভারতকে অস্তিত্ব সংকটে নিমজ্জিত করবে।

www.pathagar.com

উপরোক্ত গুরুত্বপূর্ণ নৌরুটসমূহের মধ্যে পানামা খাল যুক্তরাষ্ট্রের একক আধিপত্যে রয়েছে, জিব্রালটার প্রণালী এখনো পশ্চিমা শক্তির করায়ত্তে থাকলেও আফ্রিকার দেশসমূহের জ্বালানি ও প্রযুক্তি খাতে চীনের বিনিয়োগ এবং সুদান-জিম্বাবুয়ের সাথে চীনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক পশ্চিমাদের উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। সুয়েজ খালের কর্তৃত্ব অদ্যাবধি পশ্চিমা শক্তির রয়েছে, কিন্তু হামাস-হিজবুল্লাহ ও ইরানের উত্তরোত্তর অগ্রগতি, ইরান-রাশিয়া-সিরিয়া ও তুরস্কের পর্যায়ক্রমিক ঘনিষ্ঠতা, ইরাকে লজ্জাজনক পরাজয় পশ্চিমাদের ঘুম হারাম করে দিয়েছে। এডেন উপসাগর ও হরমুজ প্রণালীতে এখন আর যুক্তরাষ্ট্রের একক কর্তৃত্ব নেই। ইরানের সমরশক্তি, বেলুচিস্তানের গোয়াদর বন্দরে চীনা বিনিয়োগ এবং সামরিক উপস্থিতি যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃত্বকে খর্ব করেছে। বঙ্গোপসাগর-ভারত মহাসাগরের সংযোগস্থলের নিকটবর্তী গুরুত্বপূর্ণ মালাক্কা প্রণালীতে (যা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রধান জ্বালানি ও বাণিজ্য রুট) এখন যুক্তরাষ্ট্রের একক কর্তৃত্ব নেই। শ্রীলঙ্কার হাম্বানটোটা হারবার উন্নয়নে চীনা বিনিয়োগ এবং শ্রীলঙ্কার বন্দরে চীনা নৌবাহিনীর জাহাজের উপস্থিতি বঙ্গোপসাগরে যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের একাধিপত্য খর্ব করেছে। বঙ্গোপসাগর উপকূলের দেশ বাংলাদেশে ভারত-মার্কিন-ইসরাইলি জোটের অনুগত সরকার প্রতিষ্ঠিত হলেও এদেশের জনগণের সিংহভাগ আগ্রাসী শক্তির বিরোধী তদুপরি বঙ্গোপসাগর তীরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ দেশ বার্মা চীনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হওয়ায় এবং বার্মার কোকো দ্বীপে চীনা নৌঘাঁটি স্থাপন বঙ্গোপসাগরে ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের একাধিপত্যকে হুমকির সম্মুখীন করেছে। অপরদিকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান মিত্র জাপানে ক্ষমতার পালাবদলে চীন-জাপান সাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান দুর্বল হয়ে গেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর চুক্তির বদৌলতে যুক্তরাষ্ট্র জাপানকে সামরিকভাবে শক্তিশালী হতে দেয়নি, জাপান সরকারের উপর কর্তৃত্ব করেছে, চীন-জাপান দ্বন্দ্ব লাগিয়ে রেখে জাপানের নিকট অস্ত্র বিক্রি করেছে। জাপানের বর্তমান ক্ষমতাসীন দল DPJ যুক্তরাষ্ট্রের তাঁবেদারী করতে রাজি নয়। DPJ প্রধান ও জাপানের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী হাতোয়ামো পরমাণুমুক্ত জাপান, নিচুমাত্রার সামরিক বাহিনীর দেশ অথবা এলডিপির ন্যায় মার্কিন ছত্রছায়ায় থাকতে রাজি নন। দুর্বল ও ক্ষুদ্র উত্তর কোরিয়ার হুমকি-ধমকিতে জাপানিরা ক্ষুব্ধ। হাতোয়ামো যুক্তরাষ্ট্রের অধীনতা থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ঘোষণা দিয়েছেন এবং জাপানের মার্কিন সেনাঘাঁটি অপসারণের আলোচনা শুরু করেছেন। তিনি দীর্ঘদিন লালিত জাপান-চীন দ্বন্দ্ব থেকে বেরিয়ে এসে চীনের সাথে সুসম্পর্ক গড়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। ফলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মার্কিন আধিপত্য ও স্বার্থ বর্তমানে চরম হুমকির সম্মুখীন। কেননা, জাপান যদি মার্কিন সেনাঘাঁটি প্রত্যাহারে যুক্তরাষ্ট্রকে বাধ্য করে তবে দক্ষিণ কোরিয়া ও ফিলিপিন একই ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এমতাবস্থায় যুক্তরাষ্ট্র-ভারত-ইসরাইল-ইইউ জোট দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নিজেদের

www.pathagar.com

কর্তৃত্ব হারানোর পূর্বেই চীনকে ঘেরাও করা ও চীন-ভারত যুদ্ধ লাগানোর কর্মসূচি নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। চীনের উপর হামলা করার পূর্বে চীনকে চতুর্পাশ থেকে ঘেরাও করার কার্যক্রম পরিচালনা করছে। অপরদিকে চীনও বসে নেই। চীন দ্রুত স্বীয় আত্মরক্ষার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে এবং পশ্চিমা আধিপত্যবিরোধী শক্তি ও দেশসমূহের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলছে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ও প্রশান্ত মহাসাগরে পশ্চিমা শক্তির দোসর বর্তমানে দক্ষিণ কোরিয়া, পূর্ব তিমুর, ফিলিপাইন, তাইওয়ান ও অস্ট্রেলিয়া। আসিয়ান জোট চীনের পক্ষে থাকায় সম্ভাব্য যুদ্ধে অস্ট্রেলিয়া ও ভারত ব্যতীত অপর কোনো দেশ যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগী হয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় চীনের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরবে বলে মনে হয় না। এমতাবস্থায় চীন-ভারত যুদ্ধের সূচনাস্থল হতে পারে ভারত-চীন সীমান্ত অথবা বঙ্গোপসাগর তীরবর্তী চীনের ঘনিষ্ঠ মিত্রদেশ বার্মার উপকূল। বার্মাকে দিয়ে বঙ্গোপসাগরে যুদ্ধের সূচনা করে ভারত যুদ্ধের দায়-দায়িত্ব থেকে মুক্ত থাকতে চায়। চীনের ঘনিষ্ঠ মিত্র বার্মা যুদ্ধ শুরু করলে একপর্যায়ে চীন এ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হবে এবং ভারত ও পশ্চিমা বিশ্ব এতে জড়িত হবে। মিয়ানমারকে বলির পাঁঠা হিসেবে ব্যবহার করার ধারাবাহিক কার্যক্রম নিম্নরূপ–

পাশ্চাত্য শক্তি দীর্ঘদিন যাবত তেল ও খনিজসম্পদ সমৃদ্ধ মিয়ানমারে তাঁবেদার সরকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছে। এর অংশ হিসেবে মিয়ানমারের জনপ্রিয় নেত্রী অং সান সুচির সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু মিয়ানমারের সামরিক বাহিনী পাশ্চাত্যের এহেন মনোভাব উপলব্ধি করে সুচিকে ক্ষমতাসীন হতে না দিয়ে দুই দশক যাবত গৃহবন্দী করে রেখেছে। কোনোভাবেই জান্তা সরকারকে বাগে আনা সম্ভব না হওয়ায় গণতন্ত্র ও মানবাধিকার লংঘনের অভিযোগে মিয়ানমারের উপর অবরোধ আরোপ করে। এ সুযোগে চীন মিয়ানমারের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলে। মিয়ানমারের প্রতিরক্ষা ও খনিজসম্পদে চীনের রয়েছে বিশাল বিনিয়োগ। চীনের রাষ্ট্রীয় তেল কোম্পানি দি চায়না ন্যাশনাল পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন বার্মার উপকূলে বন্দর নির্মাণ করে মধ্যপ্রাচ্য থেকে মালাক্কা প্রণালী দিয়ে তেল আমদানি করে পাইপলাইনের মাধ্যমে মিয়ানমার হয়ে ইউনান প্রদেশে পাঠানোর কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। চীন-মিয়ানমার ঘনিষ্ঠ সামরিক সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষর করছে। চুক্তি অনুযায়ী চীন মিয়ানমারের কোকো দ্বীপে স্বীয় নৌঘাঁটি নির্মাণ করেছে। উক্ত চুক্তির শর্তানুযায়ী চীন যুদ্ধের প্রয়োজনে মিয়ানমারের ভূখণ্ড ব্যবহার করে স্বীয় সৈন্য চলাচলের সুবিধা লাভ করেছে।

বঙ্গোপসাগরে চীনের কর্তৃত্ব খর্ব করা এবং সম্ভাব্য চীন-ভারত যুদ্ধে মিয়ানমারকে নিরপেক্ষ রাখার জন্য ভারত স্বপ্রণোদিত হয়ে মিয়ানমারের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়ায়। ভারত মিয়ানমারের সাথে গ্যাস ক্রয় চুক্তি সম্পাদন

www.pathagar.com

করেছে, মিয়ানমারের সমুদ্রসীমা জরিপের ব্যবস্থা করে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা দাবি করার জন্য তথ্য-উপাত্ত সরবরাহ করেছে। ২০০৫ সাল থেকে ভারত পর্যায়ক্রমে মিয়ানমারের সাথে সামরিক সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। ২০০৫ সালে ভারতের তৎকালীন সেনাপ্রধান ভারত সফর করেছেন।

২০০৬ সালে ভারতের নৌবাহিনী প্রধান মিয়ানমার সফর করেছেন, একই সালের ফেব্রুয়ারিতে মিয়ানমারের নৌবাহিনী প্রধান ভারত সফর করেন। ২০০৫ সালে ভারত-মিয়ানমার যৌথ নৌমহড়া অনুষ্ঠিত হয়। ২০০৯ সালের অক্টোবরে ভারত-মিয়ানমার মিলিটারি টু মিলিটারি সম্পর্ককে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করার জন্য ভারতীয় সেনাপ্রধান জেনারেল দীপক কাপুর তিনদিন মিয়ানমার সফর করেন এবং জান্তা সরকারের শীর্ষ পর্যায়ে আলোচনায় মিলিত হন।

যুক্তরাষ্ট্র ইতিমধ্যে গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের বিষয় শিকায় তুলে মিয়ানমারের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ার চেষ্টা করছে। যুক্তরাষ্ট্র নিজ স্বার্থে কোনো দেশকে শত্রু আবার কোনো দেশকে বন্ধু বানায়। যুক্তরাষ্ট্র চীনকে প্রতিহত করতে চায় মিয়ানমার ও তৎসংলগ্ন সাগরে। এ জন্য ওবামা প্রশাসন স্বপ্রণোদিত হয়ে মিয়ানমারের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের কার্যক্রম শুরু করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী কার্ট ক্যাম্পবেল ২৯/০৯/০৯ তারিখে নিউইয়র্কে জাতিসংঘের মিয়ানমার প্রতিনিধি এবং সে দেশের একজন মন্ত্রীর সাথে বৈঠক করেছেন। যুক্তরাষ্ট্র ও ভারত মূলত মিয়ানমারকে চীনের কাছ থেকে সরিয়ে নিজেদের বলয়ে আনার চেষ্টা করছে। সেটি সম্ভব না হলে সমুদ্রসীমা বিরোধের পথ ধরে মিয়ানমারকে দিয়ে বাংলাদেশ আক্রমণ করানোর প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। কেননা ইরাক দখল ও নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনা করা হয়েছিল ১৯৯৬ সালে। মার্কিন সরকারের উপদেষ্টা রিচার্ড পার্ল, ডগলাস ফেইথ, ডেভিড ওরমস যুক্তভাবে 'এ ক্লিন ব্রেক : এ নিউ স্ট্রাটেজি ফর সিকিউরিং দি বিয়ালমস' শিরোনামে ইরাক, সিরিয়া, লেবানন ও ইরানের সরকার পরিবর্তনের নীলনকশা প্রস্তুত করে। উক্ত নীলনকশা বাস্তবায়নের কাজটিও শুরু করানো হয় মার্কিন মিত্র সাদ্দাম হোসেনকে দিয়ে। সাদ্দাম হোসেন ও বাগদাদের তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রদূত এপ্রিল গ্লাসপাইয়ের মধ্যে দীর্ঘ বৈঠকের ৮ দিন পর সাদ্দাম কুয়েত দখল করেন। একইভাবে বার্মার সাথে বন্ধুত্বের ভান করে বার্মাকে দিয়ে বাংলাদেশ আক্রমণ করানো গেলে বার্মাও ইরাকের ন্যায় বলির পাঁঠা হবে।

গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের ফেরিওয়ালা যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের হঠাৎ গণতন্ত্র হত্যাকারী ও মানবাধিকার দলনকারী মিয়ানমারের সামরিক জান্তার সাথে সখ্যতা স্থাপন, বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা দাবি করা, বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া প্রদান, সীমান্তে সেনা সমাবেশ ইত্যাদি ঘটনাবলীতে মনে হচ্ছে ভারত-যুক্তরাষ্ট্র মিয়ানমারের কাঁধে বন্দুক রেখে যুক্তরাষ্ট্র-ভারত বনাম চীন যুদ্ধ শুরু

www.pathagar.com

করতে চায়। কেননা মিয়ানমার যদি সর্বশক্তি দিয়ে বাংলাদেশ আক্রমণ করে তবে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে তা নিম্নরূপ–

ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী ও সামরিক সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষর : বর্তমান সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকেই প্রতিবেশী দেশের সাথে যৌথ টাস্কফোর্স গঠন ও সামরিক সহযোগিতার কথা বলে আসছে। কিন্তু এদেশের ৭০-৮০% জনগণ এরূপ চুক্তির বিরোধী হওয়ায় সরকার দোটানার মধ্যে আছে। এরপরও ডিসেম্বর ২০০৯ সালের মধ্যে ভারত-বাংলাদেশ সামরিক সহযোগিতা চুক্তি সম্পাদনের কার্যক্রম এগিয়ে যাচ্ছে বলে শোনা যাচ্ছে। উক্ত চুক্তির মডেল হবে ভারত-নেপাল মৈত্রী চুক্তির ন্যায়। উক্ত চুক্তির মূল কথা হলো– ১. একদেশের নিরাপত্তা সংকটে অপর দেশ সাহায্য করবে। ২. নয়াদিল্লির অনুমতি ছাড়া নেপাল তৃতীয় কোনো দেশ থেকে সামরিক সহযোগিতা গ্রহণ করতে পারবে না এবং কোনো সামরিক চুক্তি করতে পারবে না। ৩. উক্ত চুক্তির আওতায় ভারতীয় সেনা ও পুলিশ বাহিনী নেপালের যে কোনো এলাকায় প্রবেশ করতে পারে।

উক্ত চুক্তি নেপালকে ভারতের আশ্রিত রাজ্যে পরিণত করেছে। নেপাল স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণের চেষ্টা করায় রাজা বীরেন্দ্র, জ্ঞানেন্দ্র এবং প্রচণ্ডকে দৃশ্যপট থেকে সরিয়ে দেয়া হয়। প্রধানমন্ত্রী গিরিজা প্রাসাদ কৈরালা ও রাজা জ্ঞানেন্দ্র রাশিয়া, ইইউ ও চীন থেকে উন্নত অস্ত্র সংগ্রহ করতে গিয়ে ভারতের রোষানলে পড়েন। নেপালের জন্য Anti Aircraft Missile বহনকারী রুশ AN-12 বিমানকে ভারতের আহমেদাবাদে থামিয়ে দেয়া হয়।

এমতাবস্থায় বার্মা যদি বাংলাদেশের উপর আক্রমণ করে তবে বর্তমান বাংলাদেশ সরকার দেশ উদ্ধারের অজুহাতে ভারতের সাথে নেপাল মডেলের সহযোগিতা চুক্তি সম্পাদন করার সুযোগ পাবে। ভারতীয় সংবাদ মাধ্যমের সূত্রেই আমরা জানতে পেরেছি, ভারতীয় সেনাবাহিনী বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশের জন্য তৈরি হয়ে আছে। ২৫-২৬ ফেব্রুয়ারির বিডিআর বিদ্রোহের সময় ভারতীয় নীতি-নির্ধারকরা হাসিনা সরকারকে রক্ষার জন্য সামরিক শক্তি ব্যবহারের প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়েছিল। উক্ত সময়ে আসামের বিমান ঘাঁটিতে যুদ্ধ বিমানসহ ৩০ হাজার ভারতীয় সেনা বাংলাদেশে প্রবেশের লক্ষ্যে হুকুমের অপেক্ষায় ছিল। বাংলাদেশের সাথে কোনো সামরিক চুক্তি না থাকায় ভারত সেনা পাঠাতে দ্বিধান্বিত ছিল।

চীনবিরোধী জোটের বাংলাদেশ উদ্ধারে বাংলাদেশ ও বঙ্গোপসাগরে আগমন : ভারত-ইসরাইল-যুক্তরাষ্ট্র ও ইইউ'র দক্ষিণ এশিয়ায় মূল টার্গেট হলো চীন। চীনের ঘনিষ্ঠ মিত্র ও সীমান্তবর্তী দেশ বার্মা যদি স্কেপগোট বাংলাদেশে আক্রমণ করে তখন স্বাভাবিকভাবে বাংলাদেশের একান্ত বন্ধু যুক্তরাষ্ট্র সোফা চুক্তির সূত্র ধরে সদলবলে বাংলাদেশে এসে অবস্থান নেবে। ইরাকের কুয়েত দখল প্রতিহত করতে যুক্তরাষ্ট্র যেভাবে পারস্য উপসাগরে হাজির হয়ে অবস্থান নিয়েছে ঠিক তদ্রূপ

www.pathagar.com

এদেশে হাজির হয়ে অবস্থান নিয়ে কুয়েতের ন্যায় বাংলাদেশ উদ্ধার কার্যক্রম শুরু করতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রথমে বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম ও চট্টগ্রাম বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি রয়েছে এবং বার্মায় সক্রিয় ১৭টি সশস্ত্র গেরিলা গোষ্ঠী পশ্চিমা শক্তির ইন্ধনে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বার্মার স্থিতিশীলতা বিপন্ন করবে।

চীন দৃশ্যপটে হাজির হবে : বাংলাদেশ আক্রান্ত হলে বাংলাদেশের বন্ধুরাষ্ট্রসমূহ বাংলাদেশ উদ্ধারে অগ্রসর হলে চীন বঙ্গোপসাগরে স্বীয় স্বার্থ রক্ষা, নিজের সীমান্তে পশ্চিমা শক্তির আগমন ঠেকাতে দৃশ্যপটে হাজির হতে বাধ্য হবে। এমতাবস্থায় পশ্চিমা জোটের বহুল আকাঙ্ক্ষিত চীন-ভারত-যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে এবং সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ায় ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যুদ্ধের দাবানল ছড়িয়ে পড়বে।

পশ্চিমা শক্তি ও চীনের বিগত দিনের কার্যক্রম পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে চীন ও পশ্চিমা শক্তির কার্যক্রম খরগোশ ও কচ্ছপের দৌড়ের ন্যায়। খরগোশ দ্রুতগতিতে দৌড়ানো সত্ত্বেও অবিরাম গতির কচ্ছপের নিকট হেরে যায়। এমতাবস্থায় চীন নিশ্চয়ই বার্মাকে ভারত ও পশ্চিমা শক্তির ফাঁদে পা দেওয়া থেকে নিবৃত্ত রাখবে। ফলে পরিকল্পিত চীন ভারত-যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধের জন্য অন্য অজুহাত ও অন্য ভূখণ্ড ব্যবহারের প্রয়োজন হবে অথবা আগামী বছরে অনুষ্ঠিতব্য বার্মার নির্বাচন পর্যন্ত অপেক্ষা করবে।

বিবদমান পক্ষসমূহের রণপ্রস্তুতি : দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রণদামামা বেজে উঠলে চীন-পাকিস্তান-ইরান-রাশিয়া ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। অপরদিকে যুক্তরাষ্ট্র-দক্ষিণ কোরিয়া-ভারত-অস্ট্রেলিয়া-ইসরাইল-ইইউ শক্তিজোট বিপরীত পক্ষে অবস্থান করবে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় জাপানের বর্তমান সরকার ও জনগণ যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্যের বিরোধী হওয়ায় যুক্তরাষ্ট্র এ যুদ্ধকে বঙ্গোপসাগর-কেন্দ্রিক কেন্দ্রীভূত রাখার চেষ্টা করবে। আঞ্চলিক পরাশক্তি ভারত পশ্চিমা জোটের পক্ষে থাকায় পশ্চিমা শক্তিসমূহ সর্বশক্তি দিয়ে চীনের প্রধান জ্বালানি রুট মালাক্কা প্রণালী অবরুদ্ধ করার চেষ্টা করবে। ফলে সম্ভাব্য যুদ্ধ স্থলের চেয়ে জলে ও আকাশে তীব্রতর হবে। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বেশিরভাগ দেশ ও দেশের জনগণ চীনের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ায় যুদ্ধের ফলাফল চীনের অনুকূলে যাবে। কেননা যুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধি পেলে ভারতের তাঁবেদার প্রতিবেশী দেশসমূহের সরকার পরিবর্তন হতে পারে এবং ভারতের বিচ্ছিন্নতাবাদী রাজ্য ও গোষ্ঠীসমূহ অভ্যন্তরীণভাবে ভারতকে অস্তিত্বের সংকটে নিমজ্জিত করবে। দুর্বল ও ভঙ্গুর অর্থনীতির কারণে যুক্তরাষ্ট্র বেশিদিন এ যুদ্ধের ব্যয়ভার বহনে সক্ষম হবে না। বিবদমান প্রধান স্থানীয় পক্ষদ্বয় ভারত ও চীনের রণপ্রস্তুতি মোটামুটি নিম্নরূপ–

ভারতের রণপ্রস্তুতি

ভারতের সেনাসংখ্যা– ১২ লাখ

www.pathagar.com

অত্যাধুনিক ট্যাংক– ৪ হাজার

জঙ্গি বিমান– ১ হাজারের অধিক এবং সংগ্রহ তালিকায় রয়েছে ১০ বিলিয়ন ডলার মূল্যের ১২৬টি।

পরমাণু সাবমেরিন– ১টি (৬ হাজার টন) সংগ্রহের তালিকায় ৬টি

বিমানবাহী জাহাজ– ১টি

ডেস্ট্রয়ার– ৮টি, ফ্রিগেট– ৪০টি, সাবমেরিন– ১৬টি।

অস্ত্রখাতে ব্যয়

২০০৭ সালে ৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার

২০০৮ সালে ৭.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার

২০০৯ সালে ৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার

২০১০ সালে ৩০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

- চীন-ভারত সীমান্তের দৈর্ঘ্য– ৩৫০০ কিলোমিটার। বর্তমানে ভারতের সীমান্ত চৌকি রয়েছে ১৪০টি। ২৩/১০/২০০৯ তারিখে নয়াদিল্লিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি চিদাম্বরাম আরো ৫০টি সীমান্ত চৌকি বৃদ্ধির ঘোষণা দিয়েছেন।
- ভারত অরুনাচল-চীন সীমান্তে বৃহৎ সড়ক নির্মাণ করছে, ১৯৬২ সালের চীন-ভারত যুদ্ধে পরিত্যক্ত এয়ার স্ট্রিপ বিমান অবতরণ ক্ষেত্র, সংস্কার ও তথায় যুদ্ধ সরঞ্জাম সরবরাহের ব্যবস্থা করছে।
- ভারতের দি টেলিগ্রাফ এবং ডেইলি টাইমসের খবর অনুযায়ী ভারত অরুণাচল সীমান্তে অতিরিক্ত ১৫ থেকে ৩০ হাজার সেনা মোতায়েন করেছে, মিয়ানমার-ভারত সীমান্তের মণিপুরে অতিরিক্ত ১ ডিভিশন সেনা মোতায়েন করেছে। ভারত ইতিমধ্যে চীন সীমান্তে ৩০টি নতুন সংযোগ সড়ক নির্মাণ করেছে এবং সর্বাধুনিক যুদ্ধ বিমান অবতরণ ক্ষেত্র ও গোলন্দাজ বাহিনী চলাচলের উপযোগী করে সীমান্ত সড়ক নির্মাণ করছে।
- তেজপুর বিমান ঘাঁটি, লাদাখ ও কারাকোরাম গিরিপথ সংলগ্ন এলাকায় যুদ্ধ প্রস্তুতি শুরু করেছে।
- দ্য ডেইলি টেলিগ্রাফ জানিয়েছে, ভারতীয় সেনাপ্রধান দীপক কাপুর ১১/০৯/০৯ তারিখে পূর্বাঞ্চলের সেনা কমান্ডারদের সাথে কলকাতায় জরুরি বৈঠক করেছেন।
- ভারত যুক্তরাষ্ট্রের সাথে পরমাণু চুক্তি করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের 'গ্রেট সেন্ট্রাল এশিয়া' পলিসির সাথে একাত্ম হয়ে চীন-রাশিয়ার বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের Anti Ballastic Missile System-এর অংশীদার হয়েছে এবং ভারতের বন্দরে যুক্তরাষ্ট্রের রণতরী অবস্থানের চুক্তির ব্যাপারে অগ্রসর হচ্ছে।

www.pathagar.com

চীনের রণপ্রস্তুতি

- চীনের সেনাসংখ্যা– ২৩ লাখ
- ২০০৯ সালে চীনের প্রতিরক্ষা বাজেট ছিল– ৭১ বিলিয়ন ডলার। চলতি বছর প্রজাতন্ত্র দিবসে চীন তার বিপুল সমরাস্ত্র প্রদর্শন করেছে যা ইতিপূর্বে কখনো জনসমক্ষে আসেনি।
- চীন রাশিয়ার সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলে সকল প্রকার অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র নিজেই নির্মাণ করছে।
- ভারতীয় মিডিয়ার খবর অনুযায়ী চীন লেহ থেকে অরুনাচল ও সিকিম সীমান্তে অতিরিক্ত সেনা সমাবেশ করেছে।
- বঙ্গোপসাগরে স্বীয় কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য চীন বেলুচিস্তানের গোয়াদর বন্দরে শ্রীলঙ্কার বন্দরে ও হাম্বানটোটা হারবারে এবং বার্মার কোকো দ্বীপে নৌঘাঁটি স্থাপন করেছে ও সংশ্লিষ্ট দেশগুলোকে রণসাজে সজ্জিত করেছে।

বার্মার রণপ্রস্তুতি

সেনাসংখ্যা	–	৪,৯২,০০০ জন
আধা সামরিক বাহিনীর সদস্য	–	৭২,০০০ জন
ব্যাটেল ট্যাংক	–	১৫০টি
এলটি ট্যাংক	–	১০৫টি
এপিসি	–	৩২৫টি
টুয়ার্ড আর্টিলারী	–	২৭৮টি
মর্টার	–	৮০টি
এএ গান	–	৪৬টি
কমব্যাট এয়ারক্রাফট	–	১২৫টি
ফাইটার গ্রাউন্ড এটাক	–	২২টি
ফাইটার	–	৫৮টি
পরিবহন বিমান	–	১৫টি
হেলিকপ্টার	–	৬৬টি
করবেটস	–	৪টি
মিসাইল	–	১১টি
টর্পেডো	–	১৩টি
ইনসোর রিভার ইন	–	৪৭টি
ল্যান্ডিং ক্রাফট	–	১১টি।

সূত্র : মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, অন্য এক দিগন্ত, অক্টোবর ২০০৯।

www.pathagar.com

ভারতের করণীয়

ভারত যদি এশিয়ায় শান্তি চায় তবে ভারতকে রাষ্ট্রীয়ভাবে যা করতে হবে তা হলো–

১. ইন্ডিয়া ডকট্রিন নামে খ্যাত পলিসি থেকে এবং প্রতিবেশীদের ঘরে আগুন লাগানো থেকে বিরত থাকতে হবে।

২. ১৯৪৭ সালের স্বীকৃত সীমানার অভ্যন্তরের সকল জনগোষ্ঠীর প্রতি সমান আচরণ করতে হবে।

৩. পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টিকারী আমেরিকা-ইসরাইল-ইইউ'র সাথে অশুভ আঁতাত থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করতে হবে।

৪. সামরিক বাজেট কমিয়ে নিজ দেশের ৭৬% গরিব জনগণের সামাজিক কল্যাণে উক্ত অর্থ ব্যয় করতে হবে।

৫. ভারত যদি আগ্রাসী মনোভাব বর্জন করে, পশ্চিমা অশুভ শক্তিকে সহযোগিতা না করে এশিয়ার উন্নতির লক্ষ্যে কাজ করে তবে বিশ্বের নেতৃত্ব হাতবদল হয়ে পাশ্চাত্য থেকে এশিয়ায় চলে আসবে।

চীনের করণীয়

বিশ্বব্যাপী পশ্চিমা শক্তির সামাজিক, রাজনৈতিক, সামরিক, অর্থনৈতিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে চীন প্রধান শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। চীনের এই অর্জন অন্যের ক্ষতি করা অর্জন নয়। চীন তার পুঁজির কর বাড়ানোর ব্যাপারে আগ্রহী, সাম্রাজ্য কিংবা আধিপত্য বিস্তারে আগ্রহী নয়, চীনের এই উত্থান এবং চীন-রাশিয়া মৈত্রী দ্বিমেরু বিশ্বের আগমনী বার্তা। অথচ পশ্চিমা শক্তি Unipolar বিশ্ব চায়। এ জন্যই চীনের অপরাধ না থাকা সত্ত্বেও চীনকে ধ্বংস করতে চায় এবং রুশ-চীন ঐক্যে ফাটল ধরাতে চায়।

চীনের করণীয় নিম্নরূপ :

১. ভারতের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি করা যাতে ভারত পশ্চিমা শক্তিকে এশিয়ায় ধ্বংসযজ্ঞ করতে সহায়তা না করে।

২. জাপানের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি করা যাতে জাপান যুক্তরাষ্ট্রের বলয় থেকে বেরিয়ে এসে নিজেকে নিরাপদ মনে করে।

৩. চীনের ঘনিষ্ঠ মিত্র উত্তর কোরিয়া ও মিয়ানমারের শাসক গোষ্ঠীকে নিয়ন্ত্রণ করা যাতে উক্ত ২ দেশের হঠকারী কার্যকলাপ চীনকে অন্তহীন সমস্যায় নিপতিত না করে। দক্ষিণ এশিয়া, মধ্য এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার স্বাধীনতাকামী রাষ্ট্র ও গোষ্ঠীকে সহায়তা করা যাতে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এতদাঞ্চলের দিকে চোখ তুলে তাকাতে সাহস না পায়।

www.pathagar.com

৪. আসিয়ানের সাথে আরো ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং সংশ্লিষ্ট দেশসমূহকে শক্তিশালী করা।

৫. জিনঝিয়াং ও তিব্বতের ভিন্ন মতাবলম্বী শক্তিসমূহের সাথে আলাপ-আলোচনা ও ন্যায়বিচারের ব্যবস্থা করা যাতে উক্ত দুই অঞ্চলের জনগণ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির হাতের পুতুলে পরিণত হয়ে চীনের ক্ষতি করতে না পারে।

৬. আধিপত্যবাদী পশ্চিমা শক্তিকে প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং এশিয়ার নেতৃত্বের আসন অলঙ্কৃত করা।

৭. আফগানিস্তান থেকে দখলদার বাহিনী বিতাড়ন, দেশপ্রেমিক ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী তালেবান শক্তির সাথে চীনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলা উচিত। চীন নিশ্চয়ই অবগত আছে যে, যুক্তরাষ্ট্র-ইসরাইল-ভারত-জার্মানি-ফ্রান্স ও ব্রিটেন দখলকৃত আফগান ভূখণ্ডকে জঙ্গি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পরিণত করেছে। উক্ত কেন্দ্র থেকে অস্ত্র-অর্থ-প্রশিক্ষণ নিয়ে ক্ষুব্ধ মুসলিম যুবকেরা চীনে, রাশিয়ায় ও মধ্যএশিয়ায় অশান্তির সৃষ্টি করছে। চীনা সহযোগিতা পেলে তালেবানরা খুব দ্রুত আফগানিস্তান থেকে বিদেশী বাহিনী প্রত্যাহারে পশ্চিমা শক্তিকে বাধ্য করতে পারবে। এতে ভারত ও পশ্চিমা শক্তির জঙ্গী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বিলুপ্ত হবে।

উপসংহার

দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে ধ্বংস করতে মার্কিন টর্নেডো ওবামার নেতৃত্বে আগ্রাসী শক্তি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দিকে প্রচণ্ডবেগে ছুটে আসছে। আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা ও লুণ্ঠন করা উক্ত আগ্রাসী শক্তির প্রধান কর্মসূচি। এমতাবস্থায় স্বাধীনতাকামী ও শান্তিকামী এশীয় নেতৃবৃন্দকে জনগণের সহায়তায় উক্ত ঝড় মোকাবেলায় ঐক্যবদ্ধ প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। আঘাত হানার পূর্বেই উক্ত ঝড়ের কেন্দ্রকে বিক্ষিপ্ত করে দিতে হবে। ভারত যেন পশ্চিমা শক্তির স্বার্থে নিজ দেশ ও এশিয়ার ক্ষতি না করে তার জন্য প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। মনে রাখতে হবে আবহাওয়া বার্তা অনুধাবন না করার পরিণতি সলিল সমাধি।

ঢাকা, ০৪.১১.০৯ইং

www.pathagar.com

'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী মতবাদ মুসলিম বিশ্বের মরণফাঁদ'

বাস্তবে বর্তমান বিশ্বে ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদী চার প্রকার। যথা খ্রিস্টান ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদী, হিন্দু ধর্ম নিরপেক্ষতা-বাদী, বৌদ্ধ ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদী ও মুসলিম ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদী। খ্রিস্টান ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদীরা খ্রিস্টান বিশ্ব বাদ দিয়ে বিশ্বের অন্যান্য ধর্মের অনুসারী জাতিসমূহের সর্বনাশ সাধন করার জন্য সদা সর্বদা তৎপর থাকে। অপর দেশ গ্রাস করার লক্ষ্যে এরা প্রথমে নিজেদের ধর্মযাজকগণকে সংশ্লিষ্ট দেশে ধর্ম প্রচারে পাঠায়। উক্ত যাজকগণ ধর্মনিরপেক্ষ স্বদেশের স্বার্থে ভিন জাতির মধ্যে অনুপ্রবেশ করে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে উক্ত জাতিকে হীনবল করে। এমতাবস্থায় ধর্মনিরপেক্ষতার আলখেল্লাপরা খ্রিস্টান শাসকগণ যাজকদের সহায়তায় অন্য জাতিসমূহের ঘাড় মটকিয়ে রক্ত পান করে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে খ্রিস্টান ধর্মযাজকগণ ভিন জাতির লোকদেরকে সম্মোহিত করে খ্রিস্টান ধর্মনিরপেক্ষ বলে ঘোষিত সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের পাইপলাইন হিসেবে কাজ করে।

বৌদ্ধ ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদীরা সাধারণত অপর ধর্ম ও জাতির ক্ষতি করার চেষ্টা করে না তবে অপর কোনো জাতি বৌদ্ধ বা বৌদ্ধ ধর্মের ক্ষতি করুক এটাও তারা চায় না বরং দৃঢ়ভাবে প্রতিরোধ করে। এ নিয়ম অবলম্বন করার ফলে উত্তর কোরিয়া ও বার্মা অদ্যাবধি নিজেদের স্বাধীন অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছে এবং বামিয়ানের বৌদ্ধ মূর্তি ধ্বংসের জন্য আফগানিস্তানের তালেবান শাসকগণ সমাজতন্ত্রী ও ধর্মনিরপেক্ষ বৌদ্ধ বিশ্বের রক্তচক্ষু হজম করতে বাধ্য হয়েছে।

হিন্দু ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী শুধুমাত্র মুখেই ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলে। বাস্তবে হিন্দু ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী, হিন্দু কম্যুনিস্টরা হিন্দু মৌলবাদী দলসমূহ অন্যান্য ধর্ম ও ধর্মের অনুসারীদের অস্তিত্ব পর্যন্ত সহ্য করতে রাজি নয়। এ জন্য ভারতে মসজিদ, গীর্জা ও প্যাগাডোর ওপর নিয়মিত হামলা করা হয়। ভিন্ন ধর্মের জনগণ ও নিম্নবর্ণের হরিজনদের ভারতে নিয়মিত কচুকাটা করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট অপরাধীরা রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদে অবস্থান করে ধর্মনিরপেক্ষতার অমীয় বাণী প্রচার করতে থাকেন। তদুপরি ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী, কম্যুনিস্ট, সমাজবাদী বা মৌলবাদী নির্বিশেষে সকল হিন্দু ঘটা করে হরেক রকমের মূর্তিপূজায় নিষ্ঠার সাথে অংশগ্রহণ করেন।

www.pathagar.com

উপরোক্ত তিন প্রকারের ধর্মনিরপেক্ষতা-বাদীদের কমন বৈশিষ্ট্য হলো, তারা সবাই দেশপ্রেমিক। তারা নিজেদের ধর্ম বা জাতির ওপর অন্য ধর্ম বা জাতির আগ্রাসন বরদাস্ত করে না, নিজ জাতির স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও আত্মমর্যাদাবোধ রক্ষায় সদা-সর্বদা সচেষ্ট থাকে।

আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষবাদের আজব সৃষ্টি হলো মুসলমান নামধারী ধর্মনিরপেক্ষতা-বাদীরা। তারা নিজেদের ধর্মকে কটাক্ষ করে, ধর্ম নেতাদেরকে বিদ্রূপ করে নিজ ধর্মের লোকজনকে বিশ্বাস না করে অপর সংখ্যালঘু ধর্মবিশ্বাসীদের মাঝে নিজেদের নিরাপত্তা খোঁজে। তারা নিজেদের ধর্মের বিরুদ্ধে, নিজের জাতির বিরুদ্ধে এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পক্ষে অবস্থান করে নিজের জাতীয় স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও আত্মমর্যাদাবোধকে বৈষয়িক স্বার্থের বিনিময়ে বিকিয়ে দেয়। নিজ ধর্মের প্রচার-প্রসারে বাধা দেয়। ধর্মীয় নেতাদের ওপর জুলুম, নির্যাতন চালায়। ধর্মীয় শিক্ষা, সংস্কৃতি ও চেতনাকে ধ্বংস করতে সদা-সর্বদা সচেষ্ট থাকে। বিদেশী প্রভুদের স্বার্থে তারা স্বদেশের উন্নতি, অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করে এবং গণতন্ত্রকে কবর দিয়ে স্বৈরাচারের সাথে, সাম্রাজ্যবাদীদের সাথে আঁতাত করে দেশের সর্বনাশ সাধন করে। সর্বোপরি শুধুমাত্র নিজেদের ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর স্বার্থে তারা সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে ডেকে এনে স্বদেশ দখলে ও লুঠতরাজে সাহায্য করে। লক্ষ কোটি স্বদেশবাসীর লাশ মাড়িয়ে তারা সাম্রাজ্যবাদের পুতুল সরকারে অংশ নিয়ে স্বদেশী হত্যায় অংশ নেয় ও গর্ববোধ করে। তাদের উপরোক্ত অপকর্মের দু'একটি সাম্প্রতিক উদাহরণ নিম্নরূপ :

১. ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী তুর্কী সেনাবাহিনী, আলজেরিয় সেনাবাহিনী, পাকিস্তান সেনাবাহিনী সাম্রাজ্যবাদী (ধর্মনিরপেক্ষ!)-দের স্বার্থে নিজ দেশের গণতন্ত্রকে ধ্বংস করেছে এবং দেশবাসীর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে যুদ্ধ করেছে।
২. তারা ইরাকে, আফগানিস্তানে, সোমালিয়ায় ও সুদানে খ্রিস্টান ধর্মনিরপেক্ষ, সেনাবাহিনী ডেকে এনে তাদেরকে দিয়ে নিজেদের মা-বোনকে ধর্ষণ করাচ্ছে, ভাইবোন, মা-বাপ, আত্মীয়-স্বজনকে জুলুম, নির্যাতন ও হত্যার ব্যবস্থা করেছে এবং নিজ দেশের মূল্যবান সম্পদ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের অভিভাবকদের দেশে পাচার করে দেশকে নিঃস্ব করে দিচ্ছে।

ফিলিস্তিনের দিকে তাকিয়ে দেখুন। সেখানে দু'টি দল। একটি হলো ধর্মীয় দল হামাস অপরটি হলো ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী দল ফাতাহ। নির্বাচনে ধর্মীয় দল হামাস বিজয়ী হলে 'ফাতাহ' তার ধর্মনিরপেক্ষতা-বাদী অভিভাবক আমেরিকা ও ইহুদী ইসরাইলের বরকন্দাজের ভূমিকায় অবস্থান নিয়ে স্বদেশবাসীকে হত্যা করছে এবং স্বদেশের স্বাধীনতার সম্ভাবনাকে নস্যাৎ করছে। অথচ পার্শ্ববর্তী ভারতে যখন ধর্মীয় দল বিজেপি ক্ষমতায় এল তখন কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতা-বাদী হিন্দুরা বিদেশীদের নিজেদের দেশে ডেকে আনেনি। পাকিস্তানের দিকে তাকিয়ে দেখুন। ধর্মনিরপেক্ষ

www.pathagar.com

পারভেজ মোশাররফ স্বীয় দেশের প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্রকে সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে নির্বাসনে পাঠিয়ে দেশে গৃহযুদ্ধ শুরু করেছে, এতদসত্ত্বেও তার পতন আসন্ন হওয়ায় অপর দুর্নীতিবাজ ধর্মনিরপেক্ষ নেত্রী বেনজীর, মোশাররফের সাথে হাত মিলিয়ে নিজ দেশকে সাম্রাজ্যবাদের হাতে সমর্পণের ব্যবস্থা করছে।

মুসলিম ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের বাস্তব অবস্থা অনেকটা ঢাকার এডিস মশার ন্যায়, যে মশা ডেঙ্গু জ্বরের জীবাণু বহন করে মানুষকে রোগগ্রস্ত করে ও মৃত্যু ঘটায়। আর মুসলিম ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা সাম্রাজ্যবাদী জীবাণু বহন করে স্বদেশে ছড়িয়ে দিয়ে জাতিকে ডেঙ্গু রোগীতে পরিণত করে। পাঠকবৃন্দ যদি আমার বক্তব্যের সাথে একমত হন তবে কালবিলম্ব না করে সকল এডিস মশা ও তাদের ভাবশিষ্যদের নির্মূলে এগিয়ে আসুন। অন্যথায় সাম্রাজ্যবাদের জীবাণুবাহী ধর্মনিরপেক্ষ এডিস মশা আপনার দেশকে ইরাক ও আফগানিস্তান বানিয়ে ছাড়বে।

অদূর ভবিষ্যতে (আল্লাহ না করুন) যদি ইরান বা আমার প্রিয় মাতৃভূমিতে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন হয় তবে আমি নিশ্চিত, সংশ্লিষ্ট দেশের ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ও সমাজতন্ত্রীরাই সাম্রাজ্যবাদের বাহন হবে আর স্বদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় প্রাণ দেবে ধর্মের পক্ষের জনগণ। সকলের অবগতির জন্য এ মতবাদের অতীত বর্তমান সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করছি।

তত্ত্বগতভাবে ধর্মীয় প্রবণতাকে মানুষের ব্যক্তিজীবনে সীমাবদ্ধ রেখে সমাজ জীবনের সকল দিক ও বিভাগকে আল্লাহ ও রাসুলের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখার নামই ধর্মনিরপেক্ষতা। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ধর্মকে পরিত্যাগ করাই এর লক্ষ্য।

তাদের মতে, আল্লাহ এ বিশ্বটা শুধু সৃষ্টি করেছেন, বড়জোর তিনি এ জড়জগতের নিয়ম-কানুন (প্রাকৃতিক নিয়ম) রচয়িতা, মানুষকেও না হয় তিনি পয়দা করেছেন। তাঁকে পূজা-আর্চনা করলে মৃত্যুর পর কোনো কাজে লাগলেও লাগতে পারে। কিন্তু দুনিয়ার জীবনে উন্নতি শান্তি ও প্রগতির জন্য আল্লাহ বা রাসূলের কোনো প্রয়োজন নেই। এটাই আল্লাহ সম্পর্কে বিশুদ্ধ ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণা। তাদের মতে, ধর্ম নিতান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার। দুই বা ততোধিক মানুষের সকল প্রকার পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণে ধর্মকে অনধিকার প্রবেশ করতে দেয়া যায় না। কেননা সমাজ জীবনে ধর্মের প্রভাব সম্পূর্ণ প্রগতিবিরোধী এবং প্রতিক্রিয়াশীলতার পরিচায়ক।

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের আর একটি আপাত সুন্দর যুক্তি হলো, একটি দেশে ও পৃথিবীতে বহু ধর্মের লোক বাস করে এছাড়াও রয়েছে বহু উপ-ধর্ম সম্প্রদায় ও নাস্তিক। এমতাবস্থায় ধর্মীয় মতবাদের শাসনে পৃথিবীর দেশে দেশে ধর্মীয় সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় কর্তৃক ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় শোষিত, নির্যাতিত ও

www.pathagar.com

'নিষ্পেষিত হবে। সুতরাং ধর্মনিরপেক্ষতা মতবাদ সকল আস্তিক ও নাস্তিকের প্রতি সমআচরণের ব্যবস্থা করতে পারে।

বাস্তবে ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ হলো, আল্লাহর ইনসাফপূর্ণ বিধানকে দূরে সরিয়ে রেখে ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের লোভ, স্বেচ্ছাচারিতা ও বেআইনি কার্যকলাপের পথে প্রতিবন্ধক কল্যাণকর নীতি-আদর্শ থেকে পলায়নের মনোবৃত্তি। সত্যিকারভাবে কোনো মানুষ কখনো ধর্মনিরপেক্ষ হতে পারে না, কেননা প্রথম মানব হযরত আদম (আ.) থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত মানুষের সাথে, মানব সভ্যতার সাথে কোনো না কোনো ধর্ম ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। এমনকি ইতিহাসে যাদেরকে আমরা কাফের হিসেবে জানি তারাও কোনো না কোনো প্রকার ধর্মকে বা মাবুদকে মান্য করতো। উদাহারণ স্বরূপ ফেরআউন-নমরুদের দরবারেও প্রধান ধর্মীয় পুরোহিত ছিল এবং আবু জেহেল, আবু লাহাবের আরাধ্য দেবতা ছিল লাত, উজজা, হুবল ও মানাত। আর যে বৌদ্ধদের মাঝে আল্লাহর ধারণা নাই তারা গৌতমবুদ্ধকে আল্লাহর আসনে প্রতিষ্ঠা করে পূজা-আর্চনা করছে। বর্তমান পৃথিবীতেও এমন কোনো দেশ-জাতি বা সভ্যতা নাই যারা কোনো না কোনো ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত নয়। এ প্রসঙ্গে স্বনামধন্য মনীষীদের অভিমত নিম্নরূপ :

১. ঐতিহাসিক টয়েনবির মতে, মানুষের ইতিহাস হলো একাধিক সভ্যতার ইতিহাস। এক একটি সভ্যতা গড়ে উঠেছে এক একটি ধর্ম চেতনাকে নির্ভর করে। মিসর ও ব্যাবিলনীয় সভ্যতায় ইহুদি ধর্মের প্রভাব, গ্রিক-রোমান সভ্যতায় খ্রিস্টধর্মের প্রভাব ভারতীয় সভ্যতায় হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, ইসলাম ধর্মের প্রভাব, চৈনিক সভ্যতায় কনফুসিয়াস ও লাও ধর্মের প্রভাব, পারস্য সভ্যতায় যরদুস্তর ধর্মের প্রভাব আর ইসলামী সভ্যতায় ইসলাম ধর্মের প্রভাব অস্বীকার করা মানে ইতিহাসকে অস্বীকার করা। (সূত্র : জাতির উত্থান-পতন, সূত্র : প্রবন্ধকার, পৃ. ১৭২)
২. আইনের ইতিহাসের প্রখ্যাত বিশেষজ্ঞ স্যার হ্যানরি মান লিখেছেন, 'সুষ্ঠুভাবে লিখিত এমন কোনো আইনব্যবস্থা চীন থেকে পেরু পর্যন্ত কোথাও পাওয়া যাবে না, যা তার সূচনাকাল থেকেই ধর্মীয় বিধিব্যবস্থা ও উপাসনারীতির সাথে সম্পৃক্ত নয়। (সূত্র : ঐ, পৃ. ১৭২)।
৩. ড. ফ্রাউডম্যান বলেছেন, 'ন্যায়-বিচারের সত্যিকার মাপকাঠি নির্ধারণের জন্য ধর্মের দিকনির্দেশনা ছাড়া অন্যকিছু পাওয়া যাবে না। আর ন্যায়-বিচারের দৃষ্টান্তমূলক ধারণাকে বাস্তবরূপ দেয়ার জন্য ধর্ম প্রদত্ত ভিত্তিই হচ্ছে সবচেয়ে স্বাভাবিক ও অকৃত্রিম ভিত্তি। (সূত্র : ঐ, পৃ. ১৭২)।

ধর্মনিরপেক্ষতা মতবাদের উদ্ভব ও বিকাশ

এই মতবাদ নতুন আবিষ্কৃত কোনো বিষয় নয়। মানব সভ্যতার শুরু থেকে বিভিন্ন

www.pathagar.com

লোভী, স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তি ও গোষ্ঠী ধর্মীয় আইনের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যথেচ্ছাচার করার মানসে ধর্মনিরপেক্ষ হওয়ার ঘোষণা দিয়েছে। কেননা প্রাচীনকাল থেকে অদ্যাবধি কোনো শক্তিশালী শাসক স্রষ্টাকে অস্বীকার করার দুঃসাহস করেনি। তবে কেউ কেউ নিজেকে খোদা বা খোদার ছায়া দাবি করে নিজের সৃষ্ট ধর্ম জনগণের ওপর চাপিয়ে দিয়েছিল। অপরদিকে বিভিন্ন ধর্মের ধর্মীয় নেতা কর্তৃক ধর্মগ্রন্থসমূহ বিকৃত হয়ে ঐশ্বরিক স্পিরিটশূন্য হওয়ায় চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গ অনেক ক্ষেত্রে উক্ত বিকৃত ও কাল্পনিক ধর্মের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে ধর্মনিরপেক্ষতা বা ধর্মবিরোধী হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। আলোচনার সুবিধার্থে আমরা এই মতবাদের উদ্ভব ও বিকাশের ২টি পর্ব উল্লেখ করছি।

গ্রিক বা হেলেনীয় যুগ

বিকৃত ধর্মগ্রন্থের ফলে অসংখ্য দেবদেবীর উপসনাকারী গ্রীকগণ শতধা বিচ্ছিন্ন হয়ে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হয়। সমগ্র গ্রীসে অসংখ্য ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপিত হয়। কল্পনাবিলাসী গ্রীকগণ চরম ভোগবিলাস ও যৌন উচ্ছৃঙ্খলতায় নিমজ্জিত হয়। এ সময় এথেন্সে জন্ম নেয় পৃথিবীর সেরা তিনজন দার্শনিক এবং উক্ত দর্শন পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে দেন দিগ্বিজয়ী আলেকজান্ডার। নীতি-নৈতিকতাহীন অধঃপতিত গ্রিক সভ্যতার ধ্বংসস্তূপে আবির্ভাব হয় সক্রেটিস, প্লেটো, এরিস্টটল ও আলেকজান্ডারের। বস্তুত উক্ত তিন দার্শনিকের চিন্তাধারাই বর্তমান ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের মূলভিত্তি। উক্ত তিন দার্শনিকের চিন্তাধারা ও মতবাদ সংক্ষেপে নিম্নরূপ :

সক্রেটিস

(ক) তিনি অসংখ্য ঈশ্বরের স্থলে এক ঈশ্বর চিন্তার সূত্রপাত করেন। প্রথমে তিনি ভালো ও মন্দের স্বরূপ নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করেন। তার দৃষ্টিতে ভালো ও মন্দের পার্থক্য একটি দার্শনিক পার্থক্য মাত্র। মানুষ তার সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি ও জ্ঞানের দরুন কোন উচ্চতর অথচ দূরতম মঙ্গলকে নিম্নতর অথচ নিকটতম মঙ্গলের জন্য বিসর্জন দেবে এটিই হচ্ছে মন্দ। তার দৃষ্টিতে ভালো ও মন্দ মানুষের পার্থক্য হচ্ছে প্রথমোক্ত ব্যক্তি তার কাজের শেষ পরিণতির কথা চিন্তা করে আর পরবর্তী ব্যক্তি উপস্থিত লাভ-ক্ষতির বিবেচনায় নিজেকে পরিচালিত করে।

(খ) তার দৃষ্টিতে পুণ্য হচ্ছে জ্ঞান আর পাপ হলো অজ্ঞতা। তার মতে, একটি উত্তম নৈতিকতা সৃষ্টির জন্য মানুষকে তার সামাজিক রীতিনীতি থেকে সরে এসে নিছক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্ত বিষয়-আশয় সম্পর্কে চিন্তা করা উচিত।

www.pathagar.com

প্লেটো

তিনি ভাবজগত বা আধ্যাত্মিক জগৎকে জড়জগৎ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করে এক কঠোর দ্বৈতবাদের সূচনা করেন। প্লেটোর দর্শনে আল্লাহ এবং জড়জগৎ উভয়ই নিজ নিজ স্থানে দুটি স্বতন্ত্র সত্য। প্লেটো ধারণামূলক সত্য বা আল্লাহকে জগৎ থেকে পৃথক বা ভিন্ন সাব্যস্ত করেন। তিনি আত্মার পুনর্জন্মবাদের ধারণা সৃষ্টি করেন। প্লেটো এই দুটি ধারণাকে এতই যুক্তিপূর্ণ ও শক্তিশালীভাবে উপস্থাপন করেন যে, যার ফলে বিভিন্ন ধর্মের দার্শনিকগণ পরবর্তীকালে প্লেটোর দর্শনের বেড়াজালে পতিত হয়ে নিজেদের ঐশী জ্ঞানকে বিকৃত করে ফেলেন।

এরিস্টটল

তার মতে, আল্লাহ জগতের স্রষ্টা নন। কেননা জগৎ-পূর্ব থেকেই বিদ্যমান ছিল। তিনি আল্লাহকে জগতের গতিদানকারী সাব্যস্ত করেন। তবে একবার গতিদানের পর তিনি জগৎ সম্পর্কে নিস্পৃহ এবং বেখবর। এরিস্টটলের দর্শনে জগৎ আল্লাহর সাথে সংযুক্ত ও সম্পর্কিত কিন্তু আল্লাহ জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন ও সম্পর্কহীন।

উক্ত তিন দার্শনিকের চিন্তাধারা ও যুক্তিসমূহ স্রষ্টা কর্তৃক প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত না হয়েও অনুসন্ধিৎসু মানুষকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। ফলে তারা ঐশী ধর্মের বিপরীতে এক শক্তিশালী শিরকপূর্ণ ও বস্তুবাদী মতবাদের প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত মতবাদসমূহের বিষময় ফল হলো :

(১) ধর্ম সাধারণ মানুষের চিন্তার অতীত বিষয়।

(২) আল্লাহ এবং জড়জগৎ যেহেতু স্বতন্ত্র সেহেতু দুনিয়ার জীবনে আল্লাহর প্রয়োজন হবে কেন।

(৩) আল্লাহ যেহেতু জগৎকে একবার গতিদানের পর সম্পূর্ণ বেখবর সুতরাং আল্লাহকে বা ঈশ্বরকে পূজা না করে মানুষ পরবর্তীকালে আল্লাহর ছায়া, প্রতিনিধি, কাল্পনিক মূর্তিকে, দেবতাকে পূজা করা শুরু করে। আর যারা এসবে আকৃষ্ট হননি তারা কেউ পরবর্তী সময়ে বৈরাগ্যবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, সমাজতন্ত্র বা নৈরাজ্যবাদের কবলে পতিত হয়।

আধুনিক যুগ

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের আধুনিক সংস্করণ প্রায় আড়াইশ' বছর পূর্বে ইউরোপে প্রথম প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পনের শতকে এর জন্ম এবং আঠার শতকের শুরুতে তা বিজয়ী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। যে সকল কারণে প্রাচীন গ্রিসে এ মতবাদ চালু হয় প্রায় একই রূপ কারণে ইউরোপে এর উদ্ভব ও বিকাশ হয়। এর উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা পেতে এর জন্মস্থান ইউরোপ, বিশেষ করে ফ্রান্সের সমকালীন

www.pathagar.com

ধর্মীয় অবস্থা, ধর্মযাজক, শাসক সম্প্রদায়, বুদ্ধিজীবী, ব্যবসায়ী ও সাধারণ জনগণের সমকালীন অবস্থা অবহিত হতে হবে।

ধর্মীয় অবস্থা : তৎকালে সমগ্র ইউরোপে বিকৃত খ্রিস্টান ধর্ম চালু ছিল এবং এখনো চালু রয়েছে। হযরত ঈসা (আ.)-এর অন্তর্ধানের পর থেকেই মূলত তাঁর অনুসারীগণ কর্তৃক ধর্ম বিকৃতি শুরু হয়। পবিত্র কুরআন ষষ্ঠ শতাব্দীতেই এই ধর্মের বিকৃতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ঘোষণা প্রদান করেছে। এ সংক্রান্ত ঐতিহাসিক তথ্যাদি সংক্ষেপে নিম্নরূপ :

১. খ্রিস্ট্রীয় গির্জার প্রথম শত বছরে যে মতবাদ লিখিত ও চালু ছিল তা ছিল জুডিও খ্রিস্টান মতবাদসংবলিত রচনা।

২. জুডিও খ্রিস্টানিটি ও পৌলিও খ্রিস্টানিটি নিয়ে দ্বন্দ্ব চলাকালীন সময়ে লিখিত হয়েছিল মার্ক, মথি, লুক, যোহনের সুসমাচারসমূহ।

৩. ৩২৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মিসর ও আলেকজান্দ্রিয়ার গির্জাসমূহে বার্নাবাস লিখিত সুসমাচার আইনসম্মত ধর্মগ্রন্থ হিসেবে চালু ছিল। ৩২৫ সালে Nicen Council আইন করে মূল হিব্রু ভাষার বাইবেল ধ্বংস করে এবং সেসব গ্রন্থের সংরক্ষণকারীদের মৃত্যুদণ্ডের বিধান দেয়। পাশ্চাত্য গির্জাসমূহের ৩৮২ খ্রিস্টাব্দের ডিক্রি বলে পোপ ইনোসেন্ট ৪৬৫ সালে বার্নাবাসের সুসমাচার নিষিদ্ধ করেন। সর্বশেষ Glesian Decree of 496-এর মাধ্যমে অসংখ্য গসপেলের সাথে ইভানজেলিজম বার্নাবিও নিষিদ্ধ করা হয়। এভাবে পৌলিও খ্রিস্টানগণ কর্তৃক মূল ইঞ্জিল কিতাবের পরিবর্তে গ্রিক দর্শন ও রোমান পৌত্তলিকতাসমৃদ্ধ বর্তমান বাইবেলের বিজয় নিশ্চিত করা হয়।

৪. এছাড়াও রয়েছে আলেকজান্দ্রিয়ার ইহুদিগণ কর্তৃক রচিত সেপ্টোজিস্ট (পুরাতন নিয়ম) নামক বাইবেল যার ভিত্তিতে পরবর্তীতে রচিত হয় বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্ট।

৫. এছাড়াও রয়েছে বাইবেলের Codex Vaticanus, Codex Sinaiticus, Vulget ও walton Bibel London (1657) নামক সংস্করণসমূহ।

খ্রিস্টানদের গির্জার যেমন বিভিন্নতা রয়েছে, তেমনি গির্জাভিত্তিক বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে সম্পূর্ণ আলাদা আলাদা বাইবেল। পর্যায়ক্রমে ২ হাজার বছর যাবৎ খ্রিস্টান পাদ্রি-পুরোহিতগণ নিজেদের ভোগবাদী স্বার্থের অনুকূলে ধর্মগ্রন্থকে বারবার পরিবর্তন করে ঐশী স্পিরিট শূন্য করেছে। আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের উদ্ভবের সময় ইউরোপে এবং ফ্রান্সে পাদ্রি-পুরোহিতদের বৈষয়িক স্বার্থে উক্ত বিকৃত ধর্মগ্রন্থগুলো অনুসরণ করা হতো এবং ধর্মের নামে জনগণকে পৈচাশিক শাসন, শোষণ, নিষ্পেষণ করা হতো।

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ফরাসি বিপ্লবের সময়ে ফ্রান্সে ধর্মযাজকদের সংখ্যা ছিল প্রায় ১ লাখ ৩০ হাজার। তন্মধ্যে ১৩৯ জন ছিল বিশপ, বাকিরা ছিল পাদ্রি।

www.pathagar.com

বিশপরা ছিল অভিজাত বংশের, পাদ্রিরা ছিল তৃতীয় শ্রেণীর জনসমাজ থেকে আগত। জনগণ গির্জাকে ধর্মকর, মৃত্যুকর, বিবাহকর ও অন্যান্য পার্বন উপলক্ষে কর দিতে হতো। গির্জার বার্ষিক আয় ছিল প্রায় ১৩ কোটি লিভ্র। এর অধিকাংশই বিশপরা ভোগ করতো। নিম্নশ্রেণীর পাদ্রিরা খুব সামান্য ভাগ পেতো। যা দিয়ে তারা অতি কষ্টে দিনাতিপাত করতো। বিপ্লবের সময় এ সকল পাদ্রি বিপ্লবের পক্ষে ছিল।

অভিজাত শ্রেণী বা শাসক সম্প্রদায় : তখন ফ্রান্সের মোট লোকসংখ্যা ছিল ২৫ লাখ। ফরাসি বিপ্লবের অন্যতম নেতা অ্যাবেসিয়েসের মতে, তখন ফ্রান্সে অভিজাতদের মোট সংখ্যা ছিল ১ লাখ ১০ হাজার। দেশের মোট জমির তিন ভাগের এক অংশ ছিল তাদের মালিকানাধীন। রাজার সভাসদ, সেনাপতি, বিচার বিভাগের উর্ধ্বতন কর্তা, মন্ত্রী, রাজদূত, প্রাদেশিক শাসনকর্তা, প্রশাসক, আইনবিদ, জমিদার ও ইন্টেনডেন্টগণ এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। তারা নামের পূর্বে লর্ড, ব্যারন ও মার্কুইস খেতাব ব্যবহার করতো। দার্শনিক মন্টেস্কুর ভাষায় : 'যারা রাজার সাথে সাক্ষাৎ করতে পারে, মন্ত্রীর সাথে বাক্যালাপ করতে পারে, যাদের বংশ কৌলিন্য আছে, ঋণ ও পেনশন আছে তারাই অভিজাত।'

তৃতীয় শ্রেণী : ব্যবসায়ী, বুদ্ধিজীবী, কৃষক, ভূমিহীন ও ভবঘুরে শ্রেণী ছিল তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এরা ছিল দেশের ৯৩ শতাংশ জনগোষ্ঠী। যাজকশ্রেণী ও অভিজাত শ্রেণীর শাসন, শোষণ, নিপীড়ন এদেরকেই সহ্য করতে হতো। এ শ্রেণীর ব্যবসায়ী ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণীই ছিল ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ফরাসি বিপ্লবের চালিকাশক্তি। এদের আহ্বানে ও নেতৃত্বে কৃষক, ভূমিহীন ও ভবঘুরে শ্রেণী ঐক্যবদ্ধ হয়ে ফরাসি বিপ্লব সংগঠিত করে। ধর্মের নামে চরম অধার্মিক শাসন-শোষণ এদেরকে প্রথমে অভিজাত শ্রেণীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহে অনুপ্রাণিত করে এবং পরবর্তীতে অভিজাত শ্রেণীর ছত্রছায়া দানকারী যাজক ও গির্জার বিরুদ্ধে এবং প্রকারান্তরে ধর্মের বিরুদ্ধে তৃতীয় শ্রেণীর জনগণ বিদ্রোহ করে। গির্জার নেতৃত্বে শাসকশ্রেণী যতোই বিদ্রোহ দমনে সচেষ্ট হয় ততোই জনগণ ধর্মের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে এক পর্যায়ে ধর্মবিরোধী শক্তিতে পরিণত হয়।

গির্জাকেন্দ্রিক যাজক সম্প্রদায় ও অভিজাতদের বিরুদ্ধে ১৭৮৯ সালে ফরাসি বিপ্লব বিজয়ী হওয়ার পর সমগ্র ইউরোপে ধর্মবিরোধী বিপ্লব ছড়িয়ে পড়ে। উভয়পক্ষ প্রচণ্ড সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। অবশেষে আপোষ প্রস্তাব নিয়ে এগিয়ে আসেন মার্টিন লুথার কিং। তার আন্দোলন ইতিহাসে আপোষ আন্দোলন নামে খ্যাত। এ আন্দোলনের প্রস্তাব ছিল, 'ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে সীমাবদ্ধ থাকুক এবং মানুষের ধর্মীয় জীবনের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা থাকবে চার্চের হাতে। কিন্তু সমাজের পার্থিব জীবনে সকল দিকের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব রাষ্ট্রের ওপর ন্যস্ত থাকবে এবং পার্থিব কোনো বিষয়েই চার্চের কোনো কর্তৃত্ব থাকবে না। অবশ্য রাষ্ট্রের

www.pathagar.com

নেতৃবৃন্দকে চার্চের নিকটেই রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের শপথ নিতে হবে। এ প্রস্তাব উভয়পক্ষ মেনে নিলো। ধর্মনেতাদের সান্ত্বনা ছিল, রাষ্ট্র পরিচালকদের চার্চের নিকট শপথ গ্রহণ করার বাধ্যবাধকতায় পাদ্রিদের সম্মান রক্ষা পেল। আর বিদ্রোহীরা চিন্তা করলো পার্থিব জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই যদি ধর্ম ও গির্জা প্রাধান্য না পায় তবে বিষদাঁতহীন এ সাপকে ভয় করার কোনো কারণ নেই। এভাবে ফরাসি বিপ্লবে ভোগবাদী যাজক ও অভিজাত শ্রেণীকে উদীয়মান বুদ্ধিজীবী ও ব্যবসায়ী শ্রেণী ক্ষমতাচ্যুত করে। ঐতিহাসিক লেফেভার বলেন, ফরাসি বিপ্লব শেষ পর্যন্ত প্যাট্রিসিয়ান বা অভিজাত শ্রেণীকে ক্ষমতাচ্যুত করে বুর্জোয়া শ্রেণীর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে।

ফরাসি বিপ্লবের মনস্তাত্ত্বিক কারণ : ফরাসি বিপ্লবের এবং ইউরোপীয় রেনেসাঁর প্রধান কারণগুলো ছিল বিকৃত ধর্মগ্রন্থের মাধ্যমে যাজকতন্ত্রের ধর্মের নামে অধার্মিক শাসন-শোষণ, খ্রিস্টান শাসকদের জনগণের খোদার অবস্থানে আসন গ্রহণ, বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর উত্থান, অবৈজ্ঞানিক ধর্মের বিরুদ্ধে বিজ্ঞানের দ্বন্দ্ব ও নতুন ব্যবসায়ী শ্রেণীর উত্থান। তবে এসবের মধ্যে সর্বপ্রধান কারণ নিঃসন্দেহে সভ্যতার আলোকপ্রাপ্ত বুদ্ধিজীবীগণ। উক্ত বুদ্ধিজীবীদের যুক্তিপূর্ণ মতবাদসমূহই মূলত সর্বস্তরের জনগণকে গির্জাতান্ত্রিক শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে অনুপ্রেরণা দেয়। আমার মতে, ইউরোপীয় মুক্তি সংগ্রাম কখনো ধর্মবিরোধী হতো না যদি তখনকার ইউরোপীয় ধর্ম, যুক্তি ও বিজ্ঞানবিরোধী না হতো।

এখন প্রশ্ন হলো যে মহাদেশের ধর্মযাজকগণ অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত, যে মহাদেশের শাসকগণের নিকট মানবীয় মূল্যবোধ সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল, সে মহাদেশে আলোকিত বুদ্ধিজীবী এলো কোত্থেকে? এ প্রশ্নের সদুত্তরও রয়েছে ইউরোপীয় বুদ্ধিজীবীদের স্বীকারোক্তিতে। উক্ত স্বীকারোক্তির কয়েকটি নিম্নরূপ :

১. প্রখ্যাত ঐতিহাসিক হিট্টি বলেন, 'আরবরাই ৮ম শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে ১৩ শতকের শেষভাগ পর্যন্ত সমগ্র বিশ্বের বুদ্ধিবৃত্তি ও সভ্যতার আলোকবর্তিকাবাহী, যাদের মাধ্যমে প্রাচীন বিজ্ঞান ও দর্শন হয়েছিল পুনরুজ্জীবিত, সংযোজিত ও সম্প্রসারিত।' (History of the Arabs, Page 557)
২. দার্শনিক রজার বেকন তার ছাত্রদেরকে বলেন, 'সত্যিকার অর্থে জ্ঞান আহরণের একমাত্র উপায় হলো, আরবি ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন।' (সূত্র : জর্জ সার্টন, An Introduction to the History of Science, Vol.-1 Baltimore, 1927, Page-17।
৩. During the Darkest Period of European History the Arabs for five hundred years held up the torch of Learning to humanity.

www.pathagar.com

(সূত্র : Revernd Boswath Smith, Mohammad and Mohamedanism)।

৪. 'বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান' শীর্ষক প্রবন্ধে ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশের সাবেক মহাপরিচালক সৈয়দ আশরাফ আলী লিখেছেন, 'পোপ জারাবার্তের (১০৯৯-১১০৩) ন্যায় বিখ্যাত ধর্ম সংস্কারক ও শিক্ষাবিদ কর্ডোভা মাদ্রাসার ছাত্র ছিলেন।'

৫. উক্ত প্রবন্ধে তিনি আরো লিখেন, 'লন্ডনস্থ বিজ্ঞান জাদুঘরে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বিধৃত রয়েছে যে, Were it not for Islam, Greek Learning Might not have Survived the dark age. (অর্থাৎ 'মুসলমান জ্ঞানসাধকরাই গ্রিক জ্ঞান বিজ্ঞানকে অতীতের অন্ধকার থেকে বর্তমানের আলোয় এনেছেন)।'

ইতিপূর্বেকার আলোচনা ও উদ্ধৃতিসমূহ থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, জ্ঞান বিজ্ঞান-ধর্ম-মানবিক মূল্যবোধ, সুশাসন ও জনকল্যাণমূলক চিন্তাভাবনার সাথে অপরিচিত অন্ধকার ইউরোপ মহাদেশের কিছুসংখ্যক জ্ঞানপিপাসু ইউরোপীয় নাগরিক বাগদাদ, কায়রো, কর্ডোভা, স্পেন, সেভিল ও মুসলিম বিশ্বের অন্যান্য স্থানে স্থাপিত মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন শেষে স্বদেশে গিয়ে জ্ঞানের মশাল প্রজ্বলিত করার কাজ শুরু করেন। তাদের সংগ্রাম ও প্রচেষ্টায় ইউরোপের মানুষ সজাগ ও সচেতন হয়ে বিজ্ঞান ও যুক্তিহীন ধর্মের বিরুদ্ধে এবং রক্তলোলুপ স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঝাণ্ডা উত্তোলন করে। কায়েমী স্বার্থবাদী ধর্মযাজকগণ স্বৈরাচারী রাজাদের সহায়তায় বিদ্রোহীদের ওপর চরম দমন-নিপীড়ন চালায়। ফলে বিপ্লবীরা এক পর্যায়ে ধর্ম, যাজকতন্ত্র ও অভিজাত শ্রেণীকে অস্বীকার করে। দীর্ঘ ২শ' বছরের সংগ্রামের পর বুর্জোয়া, বুদ্ধিজীবী ও সাধারণ জনতার বিজয় সূচিত হয়। বিজয়ের শুরুতে প্রথমে ১৬৮৮ সালে ইংল্যান্ডের স্বৈরতন্ত্র ধ্বংস হয়, ১৭৭৬ সালে স্বৈরাচারী ইংল্যান্ডের শাসন থেকে আমেরিকা মুক্ত হয় এবং ১৭৮৯ সালে ফরাসি বিপ্লবের মাধ্যমে ফরাসি অভিজাত শ্রেণী ও যাজকশ্রেণীর স্বৈরতান্ত্রিক জুলুমের অবসান হয় এবং খ্রিস্টানধর্মবিরোধী বুর্জোয়া ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর রাজত্ব কায়েম হয়।

অথচ পরিতাপের বিষয়, এতো ত্যাগ-তিতীক্ষা, সংগ্রাম, রক্তদানের পরও কিন্তু ইউরোপে হানাহানি, যুদ্ধ-বিগ্রহ ও মানবতার ধ্বংসযজ্ঞ অদ্যাবধি বন্ধ হয়নি। জনগণ অত্যাচারী ও স্বৈরাচারী শাসকদের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার পরপরই পুঁজিপতি বুর্জোয়া শ্রেণীর যাঁতাকলে পিষ্ট হতে থাকে। পূর্বে তারা যাজক ও অভিজাতশ্রেণী কর্তৃক নিগৃহীত হয়েছিল, বিপ্লবের পর রক্তশোষক সুদখোর মহাজন, পুঁজিবাদী বুর্জোয়াদের ও স্বৈরাচারী একনায়কদের শাসন-শোষণে নিষ্পেষিত হতে থাকে। সর্ব মানবের কল্যাণোপযোগী কোনো নীতি-আদর্শ বা ধর্ম সকল পক্ষের

www.pathagar.com

নিকটই অজানা বিধায় একশ্রেণীর অপসারণের পর অন্যশ্রেণী ক্ষমতায় এলেও দৃশ্যপটের কোনো পরিবর্তন হয় নাই।

যাজক-অভিজাতশ্রেণীকে অপসারণ করে বুর্জোয়া শ্রেণী ক্ষমতায় আসার পর জনগণের অবস্থা পূর্ববত তিমিরেই থেকে যায়। ক্রমে ক্রমে গণঅসন্তোষ ব্যাপকতা লাভ করে। এহেন অবস্থায় সংকট মোচনে অনেক হাতুড়ে ডাক্তার, কবিরাজ, বৈদ্য, বুদ্ধিজীবীর পরিচয়ে ইউরোপের ভূমিতে আবির্ভূত হতে থাকে। ইউরোপের জনগণ তখন যে কোনো নতুন মতবাদকে নিয়ে মাতামাতি শুরু করে দেয়। এ সময়কার সকল ডাক্তার, কবিরাজের কাহিনী লিখতে গেলে মহাকাব্য হয়ে যাবে। প্রবন্ধের কলেবরে তা সম্ভবও নয়। তাই আমি সংক্ষেপে এরূপ কয়েকজন ইউরোপীয় পণ্ডিত অথবা তথাকথিত দার্শনিকদের দর্শন সম্পর্কে ও এর পরিণতি সম্পর্কে আলোকপাত করবো।

কার্লমার্ক্স ও সমাজতন্ত্র

তিনি দেখলেন, কূপমণ্ডুক যাজকতন্ত্র ও অভিজাতদের রাজতন্ত্র থেকে দেশের শাসনক্ষমতা পুঁজিপতি ও ব্যবসায়ীদের নিকট হস্তান্তর হওয়ায় জনগণের অবস্থা আরো শোচনীয় হয়ে পড়েছে। এমতাবস্থায় তিনি সর্বহারার শাসন কায়েমের আহ্বান করলেন। সংক্ষেপে সমাজতন্ত্র ও তার পরিণাম নিম্নরূপ :

সমাজতন্ত্রের মূলকথা : ভূমি ও শিল্পসম্পর্কিত পুঁজির ক্ষেত্রে সব ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার বিলোপ করে একে সামাজিক ও যৌথ স্বত্বাধিকারের আওতায় বা যৌথ মালিকানায় আনতে হবে। সংক্ষেপে সমাজতন্ত্র হচ্ছে এমন একটি আন্দোলন যা দেশের সকল ভূমি ও শিল্পপুঁজিকে সমাজতান্ত্রিক দলের প্রশাসনের দ্বারা পরিচালনার ব্যবস্থা করবে। এতে কার্যত কিছুসংখ্যক দলীয় ক্যাডার দেশের সকল ভূমি ও পুঁজি ভোগ করার অবাধ অধিকার লাভ করে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ শ্রমদাসে পরিণত হয়।

বাস্তবে সমাজতন্ত্র : মানুষ যখন দরিদ্র থাকে, তখন তারা প্রায়শঃ উৎসাহসহকারে (সমাজতান্ত্রিক) পরিকল্পনা উপস্থাপন করে, কিন্তু অর্থশালী হওয়ার পর স্বয়ংক্রিয় ধারায় এতে তারা আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। তদুপরি ক্ষমতাসীন হওয়ার পর ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার ভয়ে সকল শ্রেণীর টুঁটি চেপে ধরে সমগ্র দেশকে জেলখানায় পরিণত করে ও জনগণকে রোবটে পরিণত হতে বাধ্য করে।

সমালোচকদের মতে, সমাজতন্ত্রের কাজ হচ্ছে "বিফল ও হতাশ মানুষকে সাফল্যের পথ ধরানো আর সফল মানুষকে সর্বস্বান্ত করা।"

মেকিয়াভেলীর (১৪৬৯-১৫২৭) রাজনৈতিক দর্শন

পনেরো শতকের মেকিয়াভেলীর দর্শন থেকে আমরা যা পাই তা হলো :

www.pathagar.com

১. তিনি ধর্ম ও রাজনীতিকে আলাদা বিষয় হিসেবে সাব্যস্ত করেন এবং নীতি নৈতিকতাকে দু'ভাগে ভাগ করেন। একটি হলো সরকারি ও অপরটি হলো ব্যক্তিগত।
২. খ্রীস্ট ধর্মের সম্পর্ক থাকবে কেবল অপার্থিব তথা পারলৌকিক জীবনের সঙ্গে। পার্থিব ও জাগতিক জীবনের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই।
৩. ধর্মভীরু ও সৎ লোকদের কোনো প্রয়োজন রাষ্ট্রের নেই। কেননা ধার্মিকেরা নীতি-নৈতিকতার বাধা অতিক্রম করতে পারে না, অথচ রাজা-বাদশাহ ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের শৃগালের মতো ধূর্ত হতে হয়, রাষ্ট্র রাজনীতি ও স্বার্থের প্রয়োজনে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ, মিথ্যা কথন, ধোঁকা ও প্রতারণা, খেয়ানত ও মুনাফেকীর ন্যায় কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয়।

ডারউইনের বিবর্তনবাদ

১৮৫৯ সালে চার্লস ডারউইন তার চমকসৃষ্টিকারী বই Origin of Species (প্রজাতিসমূহের উৎপত্তি) লিখেন। উক্ত বইতে তিনি প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে, "মানুষ মূলত পশুরই ক্রমবিবর্তিত একটি রূপ মাত্র, যা হাজার হাজার বছরের ক্রমোন্নতি ও ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে জীবাণু বিশেষ (Amoeba) থেকে বানর ও অতঃপর মানবাকৃতিতে রূপান্তরিত হয়েছে। ডারউইনের যুগে ইউরোপে যে কোনো নতুন মতবাদকে লুফে নেয়ার একটি প্রবণতা ছিল। সুতরাং আর যায় কোথায়? সমগ্র ইউরোপবাসী ধরে নিলো যে, তারা নিশ্চয়ই লাল বানরের পরবর্তী রূপ। সুতরাং বানরের ন্যায় সকল বাঁদরামী করা তাদের মৌরসী অধিকার।

ডারউইনের আর একটি ধ্বংসাত্মক মতবাদ ছিল 'Survival of the fittest' অর্থাৎ যোগ্যতমরাই অথবা শক্তিশালীরাই শুধুমাত্র বেঁচে থাকার অধিকারী আর দুর্বলদেরকে অবশ্যই মরতে হবে। মানবের পশুত্বের মতবাদ ও শক্তিশালী হিংস্র পশুরাই শুধু টিকে থাকবে এরূপ মতবাদ ইউরোপীয় চরিত্রের সাথে এমনভাবে মিশে গেল যে, যেরূপ পানিতে চিনি মিশে যায়। এ জন্যই যুদ্ধ-বিগ্রহ, অপর দেশ ও জাতিকে নিশ্চিহ্ন করা, পাশবশক্তিতে অপরের সর্বস্ব কেড়ে নেয়ার কাজটি ইউরোপ সমগ্র দুনিয়ায় অব্যাহত রেখেছে। মানবতা কাকে বলে, মনুষ্যত্ব কাকে বলে, দয়া-মায়া-মমতা কি জিনিস তা সকল যুগে তাদের নিকট অজ্ঞাত রয়েছে।

ইউরোপের বা পাশ্চাত্যের এরূপ অমানবিকতার ও পশুপ্রবৃত্তির ঐতিহাসিক কারণও রয়েছে। প্রথমত, ইউরোপ কখনো কোনো নবী/রাসুলের জন্মস্থান বা কর্মস্থান ছিল না, নবী-রাসুলদের নেতৃত্বাধীন কোনো শাসনব্যবস্থা তারা প্রত্যক্ষ করেনি। নবী/রাসুলের জীবদ্দশায় যে প্রকৃত ধর্ম এশিয়াবাসী সকল যুগে প্রত্যক্ষ করেছে ইউরোপ কখনো তা দেখেনি। কেবলমাত্র আংশিক বা পুরোপুরি বিকৃত

www.pathagar.com

ধর্মসমূহ শ্রুতি পরম্পরায় ইউরোপে প্রবেশ করেছিল। ফলে এশিয়া যেভাবে দাউদ (আ.), সম্রাট দারায়ুস, সোলায়মান (আ.), মুহাম্মদ (সা.), খলিফা উমর (রা.), খলিফা হারুন, খলিফা মামুন, উমর ইবনে আবদুল আজিজ ও আওরঙ্গজেব আলমগীর এর ন্যায় শাসক ও শাসনব্যবস্থা পেয়েছিল ইউরোপ তা কখনো পায়নি। আমি দৃঢ়তার সাথে বলতে চাই– নবী/রাসুল ছাড়াও এশিয়ায় আরো শত শত ন্যায়পরায়ণ শাসক যেরূপ সর্বদা মানবতার কল্যাণ সাধন করেছেন, সমগ্র ইউরোপে এরূপ একজন শাসকও কখনো জন্ম নেয়নি। সমগ্র ইতিহাস খুঁজেও ইউরোপে একজন খলিফা হারুন বা সালাউদ্দীন আইয়ুবীর সন্ধান পাওয়া যাবে না। এ জন্যই অর্থ-বিত্ত-ভোগবিলাসের পক্ষের সকল মতবাদকেই ইউরোপ লুফে নেয়। ডারউইনের মতবাদকেও তারা এভাবে লুফে নিয়েছিল, কোনো প্রকার সত্যাসত্য যাচাই না করে।

ফ্রয়েড/দরখায়েম/কার্ল মার্কসের যৌন মতবাদ

ডারউইন মানুষকে পশু বানিয়েছেন আর ফ্রয়েড মানুষকে পশুর চেয়েও জঘন্য হিসেবে চিত্রিত করেছেন। তিনি বলেছেন, মানুষের সমস্ত কাজের মৌল উৎস হচ্ছে যৌনতা। এ জন্য দার্শনিকটি আরো বলেছেন, 'শিশু মায়ের স্তন চুষে যৌন সুড়সুড়ি লাভের জন্য। একই কারণে শিশু তার বৃদ্ধাঙ্গুল চুষে থাকে।

মানুষ প্রস্রাব-পায়খানা করে যৌন সুখ পায় বলে। তার গ্রন্থিসমূহ নাড়ায় যৌন সুখের আশায়। যৌন সুখের তাড়নায় মানুষ তার মায়ের প্রতি প্রেমবোধ করে। ফ্রয়েডের মতে, মানুষের ধর্ম পালন, নৈতিকতাসহ সকল কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে যৌন-অগ্নির তাপ ও চাপের জন্য। তার মতে, ধর্ম, নৈতিকতা, সমাজ, ঐতিহ্য হচ্ছে মানুষের সাফল্যের পথে প্রতিবন্ধক, তাই এটি বাতিলযোগ্য ও মূল্যহীন। সুতরাং এসবকে অবশ্যই নির্মূল করতে হবে।

দরখায়েম বলেছেন, আইনগত বা নৈতিক নিয়ম-কানুন বলতে কোথাও কিছু নেই। নৈতিকতাবিশারদরা মানুষের নিজের ওপর কর্তব্যসমূহকে নৈতিকতার ভিত্তি সাব্যস্ত করে। আসলে নৈতিকতা স্থিতিশীল কোনো বিষয় নয়– এটি আপেক্ষিক ধারণা মাত্র।

কার্ল মার্কসের মতে, যৌন পবিত্রতা গ্রামীণ সামন্তবাদী সমাজের অবশিষ্ট চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বটে। তার যা কিছু মূল্য, তা সেই সময়কার অর্থনৈতিক স্তরের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল।

সংক্ষেপে পনের শতক থেকে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপীয় দার্শনিকদের চিন্তাধারাসমূহ উল্লেখ করা হলো। এছাড়াও এ সময়ে ইউরোপে আরো শত শত দার্শনিক আবির্ভূত হয়েছিল যাদের দর্শনসমূহ মূলত উপরোক্ত দার্শনিকদের চিন্তাধারাসমূহের অনুরূপ। এসব দার্শনিক ও দর্শনের ফলে ইউরোপে প্রথমে

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠিত হয় Secularism বা ধর্মনিরপেক্ষতা। (ধর্মহীনতা)। তৎপর একনায়কতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ফ্যাসিবাদ, নাজীবাদ এবং সবশেষে তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ পুঁজিবাদী গণতন্ত্র। বস্তুবাদ বা বৈষয়িক ক্ষেত্রে, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ক্ষেত্রে ইউরোপ অনেক এগিয়ে গেল আর ভাববাদের ক্ষেত্রে ইউরোপ অতল অন্ধকারে হারিয়ে গেল। ধর্ম, নীতি-নৈতিকতা, আদর্শ, মূল্যবোধহীন ইউরোপীয় জনগণ মানুষের স্তর অতিক্রম করে হিংস্র-হায়েনাসদৃশ ভোগবাদী কামুক দানবে পরিণত হলো। মূলত ধর্মনিরপেক্ষতা বা Secularism যেদিন থেকে ইউরোপে প্রতিষ্ঠিত হলো সেদিন থেকে রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, পররাষ্ট্রনীতি, নৈতিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল আর নৈতিকতা এর আসল উৎস ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো।

শুধু এখানেই শেষ নয়। এই নৈতিকতাহীন দানবগণ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির অধিকারী হয়ে প্রথমে নিজেদের মধ্যে ও পরবর্তীতে সারাবিশ্বের প্রতিটি জনপদে তাদের হিংস্র আক্রমণ পরিচালনা করে বিশ্বের নিভৃত কোণের বাসিন্দাদেরকেও হত্যা, নির্যাতন ও শোষণ করা শুরু করে। তাদের সীমাহীন লোভ-লালসার শিকার আজ সমগ্র বিশ্বের প্রকৃতি, পরিবেশ ও মানবসন্তানগণ। তাদের হাতে নিষ্পেষিত হচ্ছে, ধর্ষিত হচ্ছে, লাখ লাখ বছরের মানবসভ্যতা, সকল মানবীয় গুণাবলী ও মূল্যবোধ। তারা সত্য কথা বলে যদি এতে তাদের বস্তুগত লাভ হয়, তারা সুন্দর কথা বলে যদি এতে তাদের শোষণের পথ উন্মুক্ত হয়, তারা মানবসেবা করে 'গরু মোটা-তাজাকরণ প্রকল্পের' অংশ হিসেবে, তারা দরিদ্রদেরকে সাহায্য করে তাদের ভবিষ্যৎ শ্রমশোষণ করার জন্য, তারা খাদ্য সাহায্য দেয়– শ্রমদাসের ঘাটতি মোকাবিলার জন্য, তারা চুক্তি করে নিজেরা লাভবান হওয়ার জন্য, পরিবেশ-পরিস্থিতির কারণে লাভ না হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিলে, উক্ত চুক্তির কপি টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে দেয়, তারা ওয়াদা করে ও ভঙ্গ করে নিজেদের লাভের জন্য, তারা যুদ্ধ করে তেল, গ্যাস ও সোনা-রুপার জন্য, শান্তিচুক্তি করে অশান্তিকে দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য, তারা আইন রচনা করে ও তা বাতিল করে বৈষয়িক সুবিধার লক্ষ্যে এবং তাদের বর্তমান ধর্মযাজকগণ যীশুর বাণী প্রচার করে অপর দেশ ও জাতির ঘাড় মটকিয়ে রক্ত পান করার জন্য।

অনেকে হয়তো চমকে উঠবেন এই ভেবে যে, Secularism মতবাদে তো ধর্ম ও রাজনীতি আলাদা বিষয়, সেক্ষেত্রে ধর্মযাজকগণ অপর জাতির ঘাড় মটকাবে কেন? তাদের অবগতির জন্য বলছি, ইউরোপ-আমেরিকার সেক্যুলারিজম মতবাদ বর্তমানে তাদের নিজের জন্য নয়– যাদেরকে তারা গোলাম বানাতে চায় তাদের জন্য। সেক্যুলার ইউরোপের ধর্মযাজকদের কার্যকলাপ সম্পর্কে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ভিজি কিরনান, 'আমেরিকা-নয়া সাম্রাজ্যবাদ' গ্রন্থে লিখেছেন, '১৮৩৮ সালের দিকে নিম্নবার্মা থেকে যেসব মিশনারিকে বের করে দেয়া হয়েছিল তারা ১৮৫১

www.pathagar.com

সালে বার্মা দখলের ব্যাপারে ব্রিটিশদেরকে খুব সহায়তা প্রদান করেছিল। (পৃ. ১৬৫, অনুবাদ : বিনোদ দাশ গুপ্ত)।

উপরোক্ত আলোচনা ও তথ্যাদির আলোকে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, বহু দেব-দেবীর উপাসনাকারী ভোগবাদী ও যৌন উচ্ছৃঙ্খল স্বেচ্ছাচারী গ্রিক ধর্ম ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে খ্রিস্টপূর্ব যুগে সক্রেটিস, প্লেটো, এরিস্টটল যে ধর্মবিরোধী আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন তার আধুনিক সংস্করণ হলো– মেকিয়াভেলী, ডারউন, কার্ল মার্কস, ফ্রয়েড, দরখায়েম নির্দেশিত ইউরোপীয় ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ বা Secularism ও সমাজতন্ত্র-সক্রেটিসের যুক্তিবাদ, প্লেটোর দ্বৈতবাদ ও রাজনৈতিক দর্শন এবং এরিস্টটলের জগৎ নিরপেক্ষ খোদায়ী দর্শনের ভাবধারায় সম্পৃক্ত। উক্ত তিন গ্রিক দার্শনিকের ভাবশিষ্য মেকিয়াভেলীর সেক্যুলারিজম, ডারউইনের বিবর্তনবাদ, কার্ল মার্কসের সমাজতান্ত্রিক মতবাদ, ফ্রয়েড ও দরখায়েমের যৌনতাবাদ, হবস, লক, রুশো, ভলতেয়ার, মন্টেস্কুসহ অসংখ্য বুদ্ধিজীবী ও দার্শনিকের মতবাদসমূহ বর্তমান দানবীয় পাশ্চাত্য সভ্যতার সৃষ্টি করে। পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থা ও সিলেবাসের অনিবার্য ফলশ্রুতিতে সেক্যুলারিজম বর্তমানে প্রাচ্যকে গ্রাস করার পর্যায়ে উপনীত হয়েছে।

পাশ্চাত্য ধর্মনিরপেক্ষতার বর্তমান রূপ

গীর্জাকেন্দ্রিক শাসন, শোষণ, স্বেচ্ছাচার, বিজ্ঞান ও যুক্তি বিরোধিতা ও ভিন্নমতাবলম্বীদের ওপর সীমাহীন জুলুম, অত্যাচারের ফলস্বরূপ পনের শতকে মোকিয়াভেলী সেকুলারিজমের যে তত্ত্ব নিয়ে হাজির হন তা হলো সরকার, সরকারি নীতি-আদর্শ, জাগতিক বিষয়াদিতে ধর্ম ও নৈতিকতার কোনো ভূমিকা থাকা চলবে না, তবে ব্যক্তিগতভাবে কেউ ধর্ম পালন করতে চাইলে, ধর্মীয় মনোভাব পোষণ করলে বা অপার্থিব বিষয়াদির সাথে জড়িত হতে চাইলে রাষ্ট্র কোনো প্রকার বাধা প্রদান করবে না। তদুপরি ধর্মযাজকগণ যেহেতু অভিজাতশ্রেণীর সাহায্যে ধর্মের নামে কুশাসন প্রতিষ্ঠা করেছে, সেহেতু ইউরোপের ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী বিপ্লবীদের প্রধান লক্ষ্য ছিল ধর্মযাজক ও অভিজাতদের নির্মূল করা অথবা নিদেনপক্ষে ধর্মযাজক ও অভিজাতদেরকে ক্ষমতাচ্যুত করে জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠা করা। ১৭৮৯ সালের ফরাসি বিপ্লবের পর সমগ্র ইউরোপে এই বিপ্লব দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে। ইউরোপের অন্যান্য রাজতন্ত্র ও যাজকতন্ত্র ঐক্যবদ্ধ হয়ে বিপ্লবী ফ্রান্সের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। বিপ্লব ও যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর দেখা গেল, ইতোমধ্যে নতুন শাসকশ্রেণী অভিজাত শ্রেণীতে পরিণত হয়েছে আর ধর্মযাজকগণ নতুন শাসকশ্রেণীর সহায়তাকারী অগ্রবর্তী বাহিনীতে পরিণত হয়েছে। পূর্বে পোপের ভাষণে রোমাঞ্চিত হয়ে জনগণ যুদ্ধে যোগদান করত আর বর্তমানে ধর্মনিরপেক্ষ(?)

www.pathagar.com

শাসকের নির্দেশে ও ধর্মগুরুদের গোপন তৎপরতায় জনগণ যুদ্ধে যোগদান করে অপরের সর্বস্ব হরণ করে।

যে লাউ সে কদু

সত্যিই পাঠকবৃন্দ! কি বিচিত্র এই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী খ্রিস্টান বিশ্ব। ১০৯৫ সালে পোপ দ্বিতীয় আরবান ইউরোপের রাজন্যবর্গকে একত্রিত করে ফ্রান্সের ক্লারমাউন্ট্রের উন্মুক্ত প্রান্তরে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্রুসেডের ঘোষণা দিয়েছিলেন আর ৯/১১-এর পর গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশ হোয়াইট হাউসে দাঁড়িয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্রুসেডের ডাক দিয়েছেন। অথচ উপরোক্ত পোপ ছিলেন ধর্মরাজ্যের প্রধান আর বুশ হলেন ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী রাষ্ট্রের প্রধান। দু'জনের বিঘোষিত নীতি সম্পূর্ণ বিপরীত হওয়া সত্ত্বেও দু'জনেই ধর্মের নামে মুসলমান হত্যায়, ভিন্ন জাতির সর্বস্ব হরণে, মানবাধিকার ও সব ধরনের ন্যায়নীতি বিসর্জনে ও মানবীয় মূল্যবোধ ধ্বংসে এক ও অভিন্ন। পোপ আরবান দ্বিতীয় এর ভাষণের শেষ বাক্য কয়টি ছিল– 'জেরুজালেমের পুনরুদ্ধারে অগ্রসরমান ক্রুসেডারদের বর্মে যতক্ষণ থাকিবে ক্রুশচিহ্ন ততক্ষণ তাহাদের জন্য থাকিবে ইহলোকে আর্থিক সকল সুযোগ এবং পরলোকে স্বর্গ লাভের নিশ্চয়তা। উদ্ধার কর জেরুজালেম, ইহাই গড চান।' উপস্থিত শ্রোতাদের গগনবিদারী স্লোগান লক্ষ কণ্ঠে প্রতিধ্বনি হলো– 'গড ইহাই চান'। (সূত্র : The Crusades, Hans Eberhurd Mayer, 1972, P. 9)

ওই গ্রন্থের ৬০ পৃষ্ঠায় জেরুজালেম দখল করার পরবর্তী দৃশ্য সম্পর্কে প্রফেসর মেয়ার লিখেন, 'জেরুজালেমের গভর্নর ও তার অনুচরবর্গ ছিলেন একমাত্র পলাতক মুসলমান। বিজয়ের প্রমত্ততা, ধর্মীয় অন্ধ গোঁড়ামি এবং তিন বছরের অবরুদ্ধ কষ্টের স্মৃতি ফেটে পড়ল ভয়ঙ্কর এক রক্তস্নানের মধ্য দিয়ে, যাতে ক্রুসেডাররা ফালি ফালি করে কেটে ফেলল ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষকে, যারা দুর্ভাগ্যক্রমে এসে পড়ল তাদের তরবারির নাগালের মধ্যে। লাশে ঢাকা রাস্তা দিয়ে পায়ের গোঁড়ালি সমান রক্তধারা পেরিয়ে অতিকষ্টে তারা হেঁটে যেতে লাগল।'

ধর্মান্ধ পোপ ২য় আরবানের নেতৃত্বাধীন ক্রুসেড আর তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ পাশ্চাত্যের নেতা বুশ-ব্লেয়ারের নেতৃত্বাধীন বর্তমান বীভৎসতায় ও চেতনায় কোনো পার্থক্য আছে কি? বসনিয়া, ফিলিস্তিন, ইরাক, আফগানিস্তানে যারা রক্তবন্যা বইয়ে দিচ্ছে তারা কি ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী? না নব্য ক্রুসেডার। ধর্ম ব্যক্তিগত ব্যাপার– জাতীয় নয়, ধর্মের নামে রাজনীতি করা যাবে না, এরূপ বক্তব্যের সাথে বাস্তবের কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যাবে কি?

মার্টিন লুথার কিংয়ের আপস আন্দোলনের ফলে সমগ্র ইউরোপে ধর্ম বনাম ধর্মনিরপেক্ষতা-বাদের লড়াই থেমে যায় এবং ধর্ম-নিরপেক্ষতাবাদীদের নেতৃত্বে বিভিন্ন দেশের সরকারগুলো গঠিত হয়। ধর্ম নিয়ে যুদ্ধ বন্ধ হওয়ার পর যুদ্ধপ্রিয়

www.pathagar.com

শ্বেতাঙ্গরা লিপ্ত হয় দেশ দখল ও লুটতরাজের যুদ্ধে। এ সময়ের মধ্যে তারা এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের প্রায় সব দেশে নিজেদের উপনিবেশ স্থাপন করে এবং সংশ্লিষ্ট দেশের খনিজ সম্পদসহ সব ধরনের সম্পদ লুণ্ঠনের প্রতিযোগিতা শুরু করে। এই প্রতিযোগিতায় তারা এতই উন্মত্ত হয়ে পড়ে যে, লুটের মালের ভাগাভাগি নিয়ে অসংখ্য যুদ্ধের সাথে দু'দুটি বিশ্বযুদ্ধও উপহার দেয় বিশ্ববাসীকে।

খ্রিস্টান ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের আধিপত্যের লড়াইয়ের একপর্যায়ে ১৯১৪ সালে শুরু হয় বিশ্বযুদ্ধ। এ যুদ্ধে জার্মানি, ইতালি ও মুসলিম তুরস্ককে নিয়ে গঠিত হয় অক্ষশক্তি আর ব্রিটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া ও আমেরিকাকে নিয়ে গঠিত হয় মিত্রশক্তি। তখন আরব উপদ্বীপ ছিল তুরস্ক সালতানাতের অংশ। ১৮৬৭ সালে মিশনারি কলেজ হিসেবে চালু হওয়া বৈরুতের আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে এবং খ্রিস্টান বংশোদ্ভূত মাইকেল আফলাফের প্রচেষ্টায় ইতিমধ্যে আরব বিশ্বে ইসলামি জাতীয়তার বিপরীতে আরব জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি হয়েছিল। মিত্রশক্তি ওই আরব জাতীয়তাবাদীদের সাথে এক গোপন অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়। ওই অঙ্গীকারের মূল কথা ছিল, যুদ্ধে মিত্রশক্তি বিজয় লাভ করলে সমগ্র আরব, ফিলিস্তিন ও সিরিয়াকে তুরস্ক সালতানাতের কবল থেকে উদ্ধার করে স্বাধীনতা প্রদান করা হবে। বিশ্ববাসী বিগত ৯০ বছর ধরে দেখছে, মিত্রশক্তি আরবদের সাথে প্রদত্ত ওয়াদা কীভাবে রক্ষা করছে। আমার আলোচ্য বিষয় তা নয়। আমার বক্তব্য হচ্ছে– প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ছিল ইউরোপীয়দের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার লড়াই, ধর্মযুদ্ধ নয়। যুদ্ধে অক্ষশক্তি পরাজিত হলে তুরস্কের খেলাফতকে উচ্ছেদ করা হয় ও ধর্মনিরপেক্ষ (ধর্মবিরোধী) মোস্তফা কামাল পাশাকে তুরস্কের ক্ষমতায় বসানো হয় এবং আরবদের তুরস্কের কবল থেকে উদ্ধার করে নিজেদের গোলামে পরিণত করা হয়। এ যুদ্ধ প্রকাশ্যে ধর্মযুদ্ধ না হলেও খ্রিস্টান ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের অন্তরে ছিল তীব্র মুসলমান বিদ্বেষ। ধর্ম ও রাজনীতির পৃথকীকরণের ব্যাপারে সুস্পষ্ট নীতিমালা থাকা সত্ত্বেও তার চর্চা পাশ্চাত্যে অনুপস্থিত, অমুসলিম বিশ্বেও অনুপস্থিত। কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি সুস্পষ্ট হবে।

১. খ্রিস্টানদের বন্ধু এবং আরব জাতীয়তাবাদী সরকার শরীফ হোসাইনের সহায়তায় ৯ ডিসেম্বর ১৯১৮ সালে মিত্রশক্তি বায়তুল মুকাদ্দাস দখল করে। ১ অক্টোবর ১৯১৮ সালে শরীফ পুত্র আমীর ফয়সাল ও জেনারেল গুরবানী বিজয়ীর বেশে সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কে প্রবেশ করেন। ফরাসি জেনারেল গোর বায়তুল মুকাদ্দাস বিজেতা সুলতান সালাউদ্দীন আইয়ুবীর কবরে পদাঘাত করে বলল, রে সালাউদ্দীন! আমরা এসে পড়েছি। আমরা সিরিয়া জয় করেছি। উঠে দেখ! (সূত্র : ত্রৈমাসিক সাময়িক, ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২৪ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ১৯৮৪)

www.pathagar.com

২. যুদ্ধে একজন সেমিনোল সর্দারের মৃত্যুর পর একজন আমেরিকান অফিসার তার মাথা কেটে নিয়ে পেপার ওয়েট হিসেবে ব্যবহার করছিল। জেনারেল কিচেনার সুদানের প্রতিরোধ আন্দোলনের নেতা মেহেদীর মাথার খুলি দোয়াত হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। (সূত্র : আমেরিকা : নয়া সাম্রাজ্যবাদ, ডিজি, কিরনান, পৃ. ১১৫)।

৩. খ্রিস্টান ধর্মনেতা রেভারেন্ড জোসিয়া স্ট্রং পৃথিবীর অপরাপর জনগোষ্ঠীর নির্মূল করার পক্ষে 'অধিক জনসংখ্যার বিপদ' নামক একটি তত্ত্ব প্রচার করেন। যার সারকথা হলো– 'আমার মনে হয় যে, ঈশ্বর তাঁর অসীম প্রজ্ঞা ও দক্ষতাবলে এংলো-স্যাক্সন জনগোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণ দান করেছেন। এটাই হলো বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে চূড়ান্ত প্রতিযোগিতার মুহূর্ত ...... যদি আমি সঠিকভাবে বুঝে থাকি তাহলে এই মানবগোষ্ঠী (এংলো-স্যাক্সন) মেক্সিকো, সেন্ট্রাল এবং দক্ষিণ আমেরিকা, সমুদ্রে অবস্থিত দ্বীপমালা, আফ্রিকা এবং আরো অনেকদূর পর্যন্ত এগিয়ে যাবে। এটা কাউকে নিশ্চিহ্ন করার যুদ্ধ নয়, নিরীহ এবং দুর্বল মানবগোষ্ঠী ঈশ্বরের নির্দেশে সহজেই বিলীন হয়ে যাবে, তারা উন্নত মানবগোষ্ঠীর পথ রচয়িতা। (সূত্র : ওই, পৃ. ১৪১-৪২)।

৪. মার্কটোয়েন খ্রিস্টান মিশনারি তৎপরতাকে 'সভ্যতা প্রচারের বুলি' বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি লিখেছেন, 'গির্জা এবং রাষ্ট্র একই লক্ষ্যের অভিমুখে চলেছিল। ধর্মপ্রচার তৎপরতাও আমেরিকার মর্যাদার স্বার্থে নিজেকে অন্তর্ভুক্ত করেছিল এবং এভাবে সে নিজেকে সত্যিকার আমেরিকান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করছিল। এই একই পদ্ধতিতে ফ্রান্সের ক্যাথলিক ধর্মযাজকরা তৃতীয় রিপাবলিক দলের মধ্যে নিজেদের সুদৃঢ় করার মাধ্যমে ইন্দোচীন দখলে কার্যকর সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করছিল। একদিন একজন মৌলবাদী যাজক এবং যুদ্ধে ব্যাপৃত জেনারেল কোন এক বড়দিনে ভিয়েতনামের মাটিতে একসঙ্গে দাঁড়িয়ে আগুন জ্বালাবে এবং বিদ্রোহীদের হত্যাযজ্ঞের আয়োজন করবে। (সূত্র : ঐ, পৃ. ১৪৬)।

৫. বিশ্বব্যাংকের একজন প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট (আমেরিকান) পরবর্তী সময়ে বলেছেন, 'যেসব আমেরিকান বিদেশে তৎপরতা চালিয়েছিলেন তাদের অধিকাংশই কোনো না কোনোভাবে মিশনারি কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এর উল্টোটাও সমানভাবে সত্য। আমেরিকান ও অন্য দেশের খ্রিস্টান মিশনারিরা কখনো তাদের জাতীয়তার কথা ভুলেনি এবং স্বর্গের পথকে তারা নিজ দেশের তৈরি রাজপথ বলেই বিবেচনা করে। ... একজন ব্রিটিশ বাণিজ্য মুখপাত্র বলেছিলেন, 'চীনে অবস্থানরত মিশনারি দলগুলোর সদস্যরা শুধু যদি আমাদের কানসালগুলোর সাথে মিলেমিশে সে দেশ শোষণে আমাদের সহায়তা করতেন তবে তারা আমাদের বাণিজ্য স্বার্থের অনুকূলে অশেষ

www.pathagar.com

কল্যাণ সাধন করতে পারতেন।' (সূত্র : ঐ, পৃ. ১৪৬-১৪৭)।

৬. কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক চিন্তার দিক থেকে বলা যায় যে, আমেরিকা চীনকে রক্ষা করেছিল। ১৯২০ সালের মধ্যে এখানে আমেরিকার ১৩টি এবং অন্য দেশের ২৫০০ মিশনারি কেন্দ্র ছিল।

৭. ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী পাশ্চাত্যের ২য় প্রধান নেতা জন মেজরের ২/৫/১৯৯৩ইং তারিখের লেখা একটি পত্র যা ব্রিটিশ পররাষ্ট্র ও কমনওয়েলথ দফতরের প্রতিমন্ত্রী ডগলাস হগকে প্রদান করা হয়েছিল। তার সারকথা ছিল নিম্নরূপ–

ক. ইউরোপের বুকে কোনো সম্ভাব্য ইসলামী রাষ্ট্র সহ্য করা হবে না। তাই বসনিয়া, হারজেগোভিনা খণ্ড-বিখণ্ড না হওয়া পর্যন্ত এবং ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে দেশটি ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত সে দেশের মুসলমানদের কোনো রকম সাহায্য প্রদান না করার নীতি ব্রিটেন অনুসরণ করে যাবে।

খ. বসনিয়ার মুসলমানদের এখন কিংবা ভবিষ্যতে সমরাস্ত্র দিয়ে অস্ত্রসজ্জিত কিংবা প্রশিক্ষণ প্রদান করতে ব্রিটেন কখনই রাজি হবে না। ব্রিটেন সে অঞ্চলে জাতিসংঘের অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা আরোপ ও কার্যকর করতে সাহায্য প্রদান অব্যাহত রাখবে।

গ. ব্রিটেন জানে গ্রিস, রাশিয়া ও বুলগেরিয়া সার্বীয়দের অস্ত্র ও ট্রেনিং দিচ্ছে। জার্মানি-অস্ট্রিয়া, শ্লোভেনিয়া এমনকি ভ্যাটিকান ও সে অঞ্চলে ক্রোশিয়া ও বসনিয়ার ক্রোট বাহিনীকে অনুরূপ সাহায্য দিচ্ছে। এ সত্ত্বেও ব্রিটেনকে নিশ্চিত করতে হবে যাতে কোনো ইসলামী দেশ কিংবা গ্রুপ বসনিয়ার মুসলমানদের এ ধরনের সাহায্য প্রদানের প্রচেষ্টায় সফল না হয়। এটা পশ্চিমাদের জন্য অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ।

ঘ. সাবেক সোভিয়েত বাহিনীর বিরুদ্ধে আফগান মুজাহিদদের ট্রেনিং প্রদান ও অস্ত্র সজ্জিত করা ভুল হয়েছে। এর ফলে সেখানে ইসলামী মুজাহিদ বাহিনী গড়ে উঠেছে। বসনিয়া-হারজেগোভিনার মুসলিম জনগোষ্ঠীর ব্যাপারে একই ভুল করা যায় না।

ঙ. জন মেজর লিখেন, টেকসই রাষ্ট্র হিসেবে বসনিয়া-হারজেগোভিনার অস্তিত্ব লোপ না পাওয়া পর্যন্ত এবং এর মুসলিম জনগোষ্ঠীকে সম্পূর্ণ উৎখাত না করা পর্যন্ত ভ্যান্স-ওয়েন শান্তি আলোচনার অভিনয় চালিয়ে যাওয়া প্রয়োজন।

চ. ভবিষ্যৎ ইউরোপের মূল্যমান পদ্ধতি হবে ও অবশ্যই হতে হবে খ্রিস্টান সভ্যতাভিত্তিক এবং নৈতিকতাভিত্তিক। তার এ অভিমত প্রতিটি ইউরোপীয় ও উত্তর আমেরিকার দেশগুলোরও দৃঢ় মত। তাই পশ্চিমা দেশগুলো বসনিয়ার মুসলিম জনগোষ্ঠীকে রক্ষা করার জন্য সেখানে হস্তক্ষেপ করবে না কিংবা তাদের ওপর থেকে অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা

www.pathagar.com

প্রত্যাহারের পদক্ষেপ নেবে না। (সূত্র : ক্রুসেডের ইতিবৃত্ত, আশকার ইবনে শাইখ, পৃ. ১৩০-১৩২)।

ধর্মনিরপেক্ষতার মুখোশধারী খ্রিস্টান ধর্মান্ধ নেতাদের উপরোক্ত মানসিকতার ও অপকর্মের হাজারো তথ্য উল্লেখ করা যায়। তবে প্রবন্ধের কলেবরে এ বিষয়ে আর কোনো উদাহরণ না দিয়ে আমি দৃঢ়ভাবে বলতে চাই, তথাকথিত খ্রিস্টান ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা সদাসর্বদা ধর্মান্ধ ও লুটেরার দল বৈ নয়। তাদের ধর্মনিরপেক্ষতার আলখেল্লার নিচে সজ্জিত থাকে হিংস্র ধর্মান্ধতা, তাদের সুন্দর সুন্দর কথার আড়ালে লুকিয়ে থাকে হিংস্র-হায়েনার ক্রুর হাসি। তাদের সভ্যতা কেবলমাত্র খ্রিস্টান সভ্যতা– মানব সভ্যতা নয়, ইতিহাসের কোনো একটি যুগেও তারা মানবীয় আচরণ করতে শিখেনি। এজন্য খ্রিস্টানদের ব্যাপারে বলা হয়– প্রথমে মিশনারি, অতঃপর রণতরী, এরপর গৃহযুদ্ধ ও ধ্বংস, সবশেষে শোষণ ও লুণ্ঠন। অপর জাতিগোষ্ঠীর সর্বস্ব হরণের লক্ষ্যেই তাদের ধর্ম, দর্শন, প্রযুক্তি, শিক্ষা ও তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে। এতদসত্ত্বে যেসব অর্বাচীন নামধারী মুসলমান পাশ্চাত্য সভ্যতা ও ধর্মনিরপেক্ষতার অনুসারী হিসেবে নিজেদের দাবি করে তারা হয় আহাম্মক নতুবা সাম্রাজ্যবাদী শোষকদের দালাল ও দাসানুদাস এবং নিজ দেশ-জাতি-ধর্ম-সভ্যতা ও উন্নতির চরম দুশমন।

ফেব্রুয়ারি ২০০৭

www.pathagar.com

নিউটনের তৃতীয় সূত্র এবং ইসরাইলী আগ্রাসন

"Every action. their is an equal and opposite reaction"- অর্থাৎ "প্রত্যেক ক্রিয়ার সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া রয়েছে"। নিউটন এই চিরন্তন সত্য কথাটির বস্তুবাদী ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও প্রমাণ পেশ করেছেন। এই সূত্রটির বস্তুবাদী বিশ্লেষণ ইউরোপ লুফে নেয় এবং এ সূত্র অবলম্বনে অনেক নতুন নতুন প্রযুক্তি ও মারণাস্ত্রের অধিকারী হয় যা আধুনিক বিশ্বের সৃষ্টি ও প্রলয়ে বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

আমার মতে, নিউটন এই সূত্রটির আবিষ্কারক নন। তিনি প্রাচীনকাল থেকে চলে আসা এ সূত্রটির বস্তুবাদী ব্যাখ্যাদাতা মাত্র। পৃথিবীর প্রায় সকল স্বীকৃত ধর্মে এ সূত্রটি উল্লেখিত হয়েছে এবং পৃথিবীর সকল জাতি এই সূত্রটির মনোজাগতিক, ভাববাদী শিক্ষা ও বিশ্লেষণের সাথে প্রাচীনকাল থেকে পরিচিত। উদাহরণস্বরূপ এই সূত্রটির দু'টি রূপ আমি উল্লেখ করছি। যথা, ১. যেমন কর্ম- তেমন ফল, ২. ঢিলটি মারলে পাটকেলটি খেতে হয়। পৃথিবীর সকল উন্নত ধর্মগ্রন্থে ও জাতীয় ইতিহাসে উক্ত দু'টি রূপ বিভিন্নভাবে বর্ণিত আছে। এক্ষেত্রে নিউটনের কৃতিত্ব এই যে, তিনি প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত উক্ত চিরন্তন সত্য কথাটির বস্তুবাদী ব্যাখ্যা প্রদান করে বস্তুবাদী বিপ্লব সাধনে সক্ষম হয়েছেন। বর্তমান পৃথবীতে ৩টি ঐশী ধর্ম সবচেয়ে প্রভাবশালী বলে মনে করা হয়। ধর্ম তিনটি হলো ইহুদী, খ্রিস্টান ও ইসলাম ধর্ম। সূচনাপর্বে নিঃসন্দেহে ইহুদী ও খ্রিষ্টধর্ম ঐশী ধর্ম ছিল কিন্তু ইহুদী ধর্মীয় পণ্ডিতগণ বৈষয়িক স্বার্থে নিজেদের ধর্মগ্রন্থকে খ্রিস্টপূর্ব ১০০ সাল পর্যন্ত মোট ১১ বার পরিবর্তন করে মূল ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়েছে। বৈষয়িক স্বার্থে যে জাতি নিজেদের ঐশী ধর্মগ্রন্থে কাঁচি চালাতে পারে সে জাতির নিকট থেকে উত্তম কিছু আশা করা যায় কি?

দীর্ঘদিন যাবত ঈসা (আঃ)-এর অনুসারীগণকে ইহুদীদের সংস্কারবাদী অংশ মনে করা হতো। ঈসা (আঃ) নিজেই বলেছেন, "আমি মূসার বিধানসমূহ তামিল করার জন্যে এসেছি, বিলোপ করার জন্য নয়।" পরবর্তীতে গ্রীক ইহুদী স্টিফেনের খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ, সেন্টপল এবং এন্তাকিয়ার গ্রীক ও রোমক মুশরিকদের খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণের ফলে খ্রিস্টান ধর্মে বস্তুবাদী ও অংশীবাদী ভাবধারা প্রবল হয় এবং ইহুদী ও খ্রিস্টান ধর্ম স্বতন্ত্র পরিচয়ে পরিচিতি লাভ করে। সর্বশেষ Glessian degree

www.pathagar.com

of 496-এর মাধ্যমে খ্রিস্টানগণ নিজেদের ঐশী ধর্মগ্রন্থের কবর রচনা করে মনগড়া ও বস্তুবাদী বাইবেল চালু করে।

এভাবে ইহুদী ও খ্রিস্টান জগত পরকালের স্থলে ইহকালকে, ভাববাদের পরিবর্তে বস্তুবাদকে, মনুষ্যত্বের পরিবর্তে পশুত্বকে নিজেদের পার্থিব স্বার্থে প্রাধান্য দেয় এবং নিজেদের জীবনের সকল দিক ও বিভাগকে বস্তুবাদ ও ভোগবাদের অনুকূলে বিন্যস্ত করে। পরস্পর-পরস্পরের বন্ধু ও সাহায্যকারীতে পরিণত হয়। এমতাবস্থায় হিরোশিমা-নাগাসাকীতে কি হলো, ভিয়েতনামে কত লাখ লোক আহত-নিহত-পঙ্গু হলো তা এই দুই ধর্মের লোকদের নিকট মুখ্য বিষয় নয়– এদের মুখ্য বিষয় হলো, অন্যদের সর্বনাশ করে বা নিশ্চিহ্ন করে নিজেরা কি পরিমাণ সুবিধা অর্জন করা গেল তার হিসাব-নিকাশে ব্যস্ত থাকা।

ইসরাইলী আগ্রাসন ও যায়নবাদ

ইহুদী জাতির ষড়যন্ত্রপ্রিয়তা, অর্থলোলুপতা, সুবিধাবাদিতা, নিষ্ঠুরতা, বিশ্বময় স্বীকৃত একটি বিষয়। তাদের জাতীয় জীবনের তিন হাজার বছরের মধ্যে ২১০০ বছর তারা যাযাবর অথবা গোলামী জীবন-যাপন করে। দুর্বল ও বিজিত অবস্থায় লাঞ্ছিত, অপদস্ত হওয়া, বিজয়ী প্রভুকে তোষামোদ করা আর শক্তিশালী অবস্থায় দুর্বল জাতিসমূহের সাথে অমানবিক আচরণ, প্রতারণা, শঠতা, সুদী কারবার, মোনাফেকী আচরণ, সত্যের পথে জনগণকে বাধা প্রদান করা তাদের জাতীয় অভ্যাস। শক্তিশালী অবস্থায় ইহুদীদের চেয়ে নিকৃষ্ট, ঘৃণিত, জুলুমবাজ কোনো জাতি পৃথিবীতে দেখা যায়নি। ইহুদীদের এহেন অমানবিক কার্যকলাপের দরুন তারা ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে আসিরীয়, ব্যবিলনীয় ও রোমান সাম্রাজ্য কর্তৃক চরমভাবে নিগৃহীত হয় এবং আরব দেশ, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, চেকোশ্লোভাকিয়া, হল্যান্ড, ইতালী, রাশিয়া ও জার্মানী থেকে বিতাড়িত হয়। চলতি বছর ইরানের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আহমাদিনেজাদ ইহুদীদেরকে আরব ভূমি থেকে বিতাড়নের প্রকাশ্য অঙ্গীকার করেন। নিউটনের তৃতীয় সূত্র মোতাবেক ইসরাইলী অপকর্মের প্রতিক্রিয়ায় এক সময় ইহুদীরা পুনরায় ইসরাইল থেকে উৎখাত হওয়াটা স্বাভাবিক।

লেবানন ও ফিলিস্তিনে পরিচালিত বর্তমান আগ্রাসন কোনো কাকতালীয় ঘটনা নয়। বর্তমান ইসরাইল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাও পরিকল্পিত। ১৮৪৮ সালে অস্ট্রীয়ার ইহুদী সাংবাদিক থিওডর হার্টজেল সর্বপ্রথম ইহুদীদের মধ্যে আজাদীর প্রেরণা সৃষ্টি করেন। এজন্য তাঁকে ইহুদীবাদের জনক বলা হয়। ইহুদীবাদ ও ইহুদী ধর্ম আলাদা বিষয়। ফিলিস্তিনকে ইহুদী রাষ্ট্রে পরিণত করার আন্দোলনকে ইংরেজীতে Zionism (ইহুদীবাদ) বলে। ১৮৪৮ সালেই World Zionism সংগঠনটি নিজেদের জন্য একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করে উক্ত রাষ্ট্রকে ভিত্তি করে সমগ্র বিশ্বকে

www.pathagar.com

শাসন করার গোপন পরিকল্পনা হাতে নেয়। উক্ত পরিকল্পনায় মিসর, তুরস্ক, সৌদি আরব, ইরান, আফগানিস্তানের আংশিক এবং সমগ্র ফিলিস্তিন, সিরিয়া, কুয়েত, জর্দান নিয়ে বৃহত্তর ইসরাইল রাষ্ট্র গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

ইহুদীবাদীরা উক্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছে। ধূর্ত ইহুদীরা বিগত ১৫০ বছরে বিভিন্ন যুদ্ধ বিগ্রহে ইন্ধন প্রদানের মাধ্যমে ইউরোপ, আমেরিকা, এশিয়া, আফ্রিকার অধিকাংশ শাসকগোষ্ঠীকে, রাজনীতিকদেরকে নিজেদের বশংবদ গোলামে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছে এবং সমগ্র বিশ্ব শাসনের সুপার স্ট্রাকচার জাতিসংঘ সৃষ্টি করেছে। নিউইয়র্কের বিখ্যাত ইহুদী আইন ব্যবসায়ী হেনরী ক্লায়েন তাঁর রচিত Zions rule the world, New York 1948-এ লিখেছেন, "The United Nations is Zionism, it is the super government mentioned many times in the protocols of the learned Elders of Zion promulgated between 1897-1905." এমতাবস্থায় যায়নবাদ সৃষ্ট জাতিসংঘ– যায়নবাদী ইসরাইল রাষ্ট্রের পক্ষে সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য।

ইতিমধ্যে যায়নবাদীদের বশংবদ গোলাম বুশ-ব্লেয়ার-মোবারক-আবদুল্লাহ গং নিপীড়িত, নির্যাতিত লেবাননীদেরও হিজবুল্লাহর পরিবর্তে ইসরাইলের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে। জাতিসংঘও ইসরাইলের পক্ষে প্রস্তাব পাস করেছে। কেবলমাত্র ইরান ও সিরিয়া লেবাননে ইসরাইলী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার রয়েছে। এমতাবস্থায় ইরান ও সিরিয়া দখল করলে যায়নবাদ পরিকল্পিত বৃহত্তর ইসরাইল রাষ্ট্র কায়েম হয়ে যাবে। ইতিমধ্যে মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশে বিভিন্ন অজুহাতে ইহুদীবাদীদের বরকন্দাজ আমেরিকান সৈন্যরা পাকাপোক্তভাবে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়েছে। আমেরিকা, বৃটেন, অস্ট্রেলিয়া ও ই.ইউ. মূলত বৃহত্তর ইসরাইলী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় নিরীহ মুসলমান ও খ্রিস্টান আহত, নিহত ও পঙ্গু হচ্ছে।

ইসরাইলী আগ্রাসনে বিশ্বব্যাপী প্রতিক্রিয়া

প্রত্যেক ক্রিয়ার সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া হয়। বিষয়টি চিরন্তন সত্য। শুধুমাত্র বস্তুবাদী ব্যাখ্যা দিয়ে ইসরাইলী আগ্রাসনের প্রতিক্রিয়া পরিমাপ করা সম্ভব নয়। এই আগ্রাসনের মনোজাগতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিক্রিয়া সংক্ষেপে নিম্নরূপ :

ক. মনোজাগতিক : ১৯১৭ সালে ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ব্যালফোর ফিলিস্তিনে ইহুদীদের জাতীয় আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার দাবির প্রতি সমর্থন ঘোষণা করার পরই শুরু হয় ইহুদী কর্তৃক মুসলিম হত্যা ও বিতাড়ন। উক্ত ঘোষণার পর থেকেই ফিলিস্তিনীরা ফিলিস্তিন থেকে বিতাড়িত হয় এবং অবশিষ্টরা প্রতিনিয়ত ইহুদী নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। ১৯১৭-২০০৬ মেয়াদে প্রায় ৮৬ বছরে এমন একটি দিনও ফিলিস্তি

www.pathagar.com

নীদের জীবনে আসেনি যেদিনটিতে তারা আতঙ্কমুক্ত ছিল। বিগত ৮৬ বছরে পৃথিবীর সকল বাসিন্দা প্রত্যক্ষ করছে পশুর চেয়েও অধম ইহুদী জাতিকে ও তার পৃষ্ঠপোষক ইউরোপ আমেরিকাকে। ফলে পৃথিবীর সকল মানুষের মনে ইহুদী জাতির প্রতি ঘৃণার পাহাড় জমছে। এমন একদিন অবশ্যই আসবে, যেদিন এই সম্মিলিত ঘৃণার আগুনে ইহুদীরা জ্বলে-পুড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। পৃথিবীর কোনো ক্ষুদ্র ভূখণ্ড ঘৃণ্য ইহুদীদের গ্রহণ করতে রাজী হবে না। এর সাথে ইহুদীবাদের গোলামদেরকেও নিজ জাতির লোকেরা ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করবে। ইহুদীদের ঘৃণ্য কার্যকলাপের প্রতিক্রিয়ায় পৃথিবীর মানুষ তখন ইহুদীদেরকে শ্যামল পৃথিবীর অভিশাপ বলে সাব্যস্ত করবে।

খ. রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া : ইহুদীদের ঘৃণ্য রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের ফলে বিশ্বের দেশে দেশে অশান্তি স্থায়ী রূপ লাভ করেছে। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের সচেতন নাগরিকগণ দেখতে পাচ্ছে নিজেদের দেশে ইহুদী বরকন্দাজ আমেরিকার ন্যক্কারজনক রাজনৈতিক ভূমিকা। খোদ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের সচেতন নাগরিকগণও উপলব্ধি করছে তাদের নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী ইসরাইলের স্বার্থে নিজ দেশের কিরূপ সর্বনাশ সাধন করছে। এহেন অবস্থা দীর্ঘদিন অব্যাহত থাকলে ইউরোপ আমেরিকার জনগণও এক সময় যায়নবাদের ক্রীড়নকদের প্রত্যাখ্যান করবে।

সম্প্রতি হলিউডের বিখ্যাত নায়ক, প্রযোজক ও পরিচালক মেল গিবসন মাতাল অবস্থায় একটি অতি সত্য কথা উচ্চারণ করেছেন যা হয়তো তিনি স্বাভাবিক অবস্থায় প্রকাশ করতে ভয় পেতেন। তাঁর উক্ত সত্য উচ্চারণটি ছিল– "পৃথিবীর প্রতিটি যুদ্ধের জন্য ইহুদীরা দায়ী।" পৃথিবীর অধিকাংশ সচেতন জনতা মেল গিবসনের বক্তব্যের সাথে একমত বলে আমার মনে হয়। ১৮৪৮ সালে উপস্থাপিত ইহুদী ষড়যন্ত্রের দলিল "Protocol of the elders of the zoin" গ্রন্থে তিনটি বিশ্বযুদ্ধের নীলনকশার উল্লেখ রয়েছে। ইতিমধ্যে দু'টি বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছে এবং আর একটি বিশ্বযুদ্ধ বাকি রয়েছে। ইহুদীবাদীদের বিশ্বাস, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাধ্যমেই তারা কাঙ্ক্ষিত বিজয় লাভ করে বিশ্বের শাসনভার সরাসরি গ্রহণ করবে।

প্রত্যেক ক্রিয়ার যদি সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া না থাকতো তবে ইহুদীবাদীদের পরিকল্পনা সফল হতো। সাম্প্রতিক সময়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি, ইহুদী আগ্রাসনের প্রতিক্রিয়ায় জন্ম নেওয়া তিনটি সংগঠনই ইহুদীবাদ বাস্তবায়নে প্রবল বাধার সৃষ্টি করেছে। উক্ত তিনটি সংগঠন হলো– ১. আল-কায়েদা, ২. হামাস ও ৩. হিজবুল্লাহ।

আশির দশকে জন্ম নেওয়া আল-কায়েদার প্রতিবন্ধকতা যায়নবাদীদেরকে আফগানিস্তান ও ইরাকে সীমানা পিলার স্থাপনের সুযোগ দিচ্ছে না, '৯০-এর দশকে জন্ম নেয়া হামাস ফিলিস্তিন ভূখণ্ডকে হজম করতে প্রবলভাবে বাধা দিচ্ছে

www.pathagar.com

এবং ১৯৮২ সালে লেবাননে ইসরাইলী আগ্রাসন ও নৃশংসতার প্রতিক্রিয়ায় জন্ম নেয়া হিজবুল্লাহ বর্তমানে ইসরাইলী আগ্রাসনকে কার্যকরভাবে বাধা দিচ্ছে। এভাবে ইহুদীবাদীরা স্বীয় মনোবাসনা পূরণ করতে যতই অগ্রসর হবে ততই নিত্য-নতুন প্রতিরোধ বাহিনীর জন্ম হয়ে ইহুদীবাদী আকাঙ্ক্ষাকে চিরতরে নির্মূল করতে এগিয়ে যাবে।

গ. অর্থনৈতিক প্রতিক্রিয়া : বিগত ১৫০ বছর যাবত যায়নবাদী নীলনকশায় সংঘটিত যুদ্ধে পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ নিহত, আহত ও পঙ্গু হয়েছে। পৃথিবীর নিভৃত কোণের বাসিন্দারাও উক্ত যুদ্ধে অসংখ্যবার সর্বস্বান্ত হয়েছে, উদ্বাস্তু হয়েছে, নিজ দেশে পরবাসী হয়েছে। পৃথিবীর জাতিসমূহ অক্লান্ত প্রচেষ্টায় সমৃদ্ধির সৌধ নির্মাণ করেছে, পরক্ষণেই ইহুদী ষড়যন্ত্রে উক্ত সৌধ– সৌধের মালিকের মাথায় ভেঙ্গে পড়েছে। ইতিপূর্বে এসব অপকর্মের খলনায়কেরা লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে কার্যক্রম পরিচালনা করতো। ফলে পৃথিবীর মানুষ সত্যিকারের সর্বনাশকারীকে সুস্পষ্টভাবে শনাক্ত করতে সক্ষম হয়নি। বর্তমানে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা ও আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির বদৌলতে এবং ইহুদীবাদীদের বেপরোয়া ভূমিকার কারণে প্রত্যেকে অভিন্ন ষড়যন্ত্রকারী শত্রুকে শনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছে। এমতাবস্থায়, ইহুদীবাদী ষড়যন্ত্র পূর্বের ন্যায় অবাধ গতিতে এগিয়ে যেতে সক্ষম হবে না।

সাম্প্রতিক বিশ্বের সচেতন মানুষ ইতিমধ্যে অনুভব করছে, ইহুদীবাদ পরিকল্পিত ইরান-ইরাক যুদ্ধ, উপসাগরীয় যুদ্ধ, আফগানিস্তান, ইরাক, ফিলিস্তিন ও লেবাননে আগ্রাসনের ফলশ্রুতিতে জননিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়েছে, তেলের দাম কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে, জনদুর্ভোগ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়ে মানুষের পিঠ যখন দেয়ালে ঠেকবে, মানুষ তখন ঘুরে দাঁড়াবে এবং ঐক্যবদ্ধভাবে জনদুর্ভোগের হোতাদের রুখে দাঁড়াবে।

সাম্প্রতিক ইসরাইলী আগ্রাসনের সম্ভাব্য পরিণতি

আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি, লেবাননে চলমান ইসরাইলী আগ্রাসন বৃহত্তর ইসরাইল প্রতিষ্ঠার সর্বশেষ ও চূড়ান্ত পরিকল্পনার অংশবিশেষ। ইহুদীবাদীদের লাঠিয়াল বুশ-ব্লেয়ার ঘরে-বাইরে কোণঠাসা হয়ে পড়ায় যায়নবাদী ইসরাইল স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। পতনোন্মুখ বুশ-ব্লেয়ারকে রক্ষা করতে, আগ্রাসনের ধারাবাহিকতাকে বজায় রাখতে এবং মধ্যপ্রাচ্যে আগ্রাসনকে ব্যবসা-সফল করতে ইসরাইল এই যুদ্ধ শুরু করেছে। ইসরাইলের লক্ষ্য সম্ভবত এই ছিল যে, মাত্র কয়েকদিনের যুদ্ধে ইসরাইল লেবানন দখল করে সিরিয়া সীমান্তে উপনীত হবে। স্বীয় প্রতিরক্ষার জন্য সিরিয়া যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে, সিরিয়াকে রক্ষায় ইরানও যুদ্ধে লিপ্ত হবে। এমতাবস্থায় যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও ইসরাইল সম্মিলিতভাবে ইরান ও সিরিয়ায় আক্রমণ করে দখল

www.pathagar.com

করে নেবে এবং বৃহত্তর ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে সরাসরি বিশ্বশাসকের আসনে অধিষ্ঠিত হবে।

কিন্তু বিধি বাম। মধ্যপ্রাচ্যের শ্রেষ্ঠ শক্তিধর ইসরাইল মাত্র কয়েক হাজার হিজবুল্লাহ যোদ্ধাদের হাতে নাজেহাল হচ্ছে। তাদের স্থলবাহিনী দৈনিক ১ কিলোমিটারও নির্বিঘ্নে অগ্রসর হতে সক্ষম হচ্ছে না। তদুপরি হিজবুল্লাহর রকেট হামলায় বিগত ৮৬ বছরের মধ্যে এই প্রথম ইহুদীরা নিজেদের ঘরবাড়ি ছেড়ে পালাচ্ছে এবং নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধান করছে। **এই অসম যুদ্ধের মাধ্যমে হিজবুল্লাহ সমগ্র আরব জনগোষ্ঠীর প্রেরণার উৎস হয়েছে। হিজবুল্লাহকে অনুসরণ করে প্রতিটি আরব নাগরিক এখন ইসরাইলকে মোকাবেলায় প্রস্তুতি গ্রহণ করবে। এ যুদ্ধের সুদূরপ্রাসারী ফল এই হতে পারে যে, আরবগণ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রত্যেকে এক একজন হিজবুল্লাহ হবে এবং স্ব-স্ব দেশের ভীরু-কাপুরুষ শাসকগোষ্ঠীকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করে নিজেরা দেশের দায়িত্বভার গ্রহণ করে ইহুদীবাদের সমাধি রচনা করবে।**

হিজবুল্লাহদের এরূপ কৃতিত্বে স্বাভাবিকভাবেই অনুপ্রাণিত হবে সিরিয়া ও ইরান। তারা খুব দ্রুত ইহুদীবাদ মোকাবেলায় প্রস্তুতি গ্রহণ করবে এবং ইহুদী রাষ্ট্রটিকে নিশ্চিহ্ন করার দৃঢ় শপথ গ্রহণ করবে। অপরদিকে ইরাকী প্রতিরোধ যোদ্ধারা এবং আফগান মুজাহিদগণ এ যুদ্ধে অনুপ্রাণিত হয়ে সাম্রাজ্যবাদী ইসরাইল, আমেরিকা ও বৃটেনকে সমুচিত শিক্ষা দেবে এবং নিজ দেশ থেকে বিতাড়িত করবে। এরূপ যুদ্ধের ব্যয় মেটাতে গিয়ে সাম্রাজ্যবাদীরা ভিতর থেকে দুর্বল হয়ে পড়বে এবং ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হবে।

সাদ্দাম, নমরুদ, ফেরাউন, কারুন, চেঙ্গিস খান, হালাকু খান, মুসোলিনী ও হিটলারের যে পরিণতি হয়েছিল, বুশ-ব্লেয়ারের পরিণতিও এর চেয়ে উত্তম হবে না– হতে পারে না। বৃটেন, ইসরাইল ও আমেরিকা অতীতের অত্যাচারী জাতিসমূহের ভাগ্য বরণ করতে বাধ্য হবে। কেননা হাজার হাজার বছরের মানব ইতিহাসের শিক্ষা এই যে, অশুভ শক্তি মানব জাতিকে সাময়িকভাবে পদদলিত করতে সক্ষম হলেও শেষ পর্যন্ত সত্য ও শুভ শক্তির বিজয় অবশ্যম্ভাবী। এরূপ না হলে মানবজাতি বহু পূর্বেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত।

জুলাই, ২০০৬

www.pathagar.com

২০০৬ সালের হারিকেনের নাম 'হামাস'

২০০৫ সাল ছিল হারিকেন, টর্নেডো ও সুনামির বছর। আধুনিক সভ্যতার গর্বে গর্বিত বিশ্ববাসী এ সালে প্রত্যক্ষ করেছে প্রাকৃতিক শক্তির ভয়াবহতা ও ধ্বংসলীলা। যান্ত্রিক (মানবিক নয়) সভ্যতায় বলীয়ান যুক্তরাষ্ট্র এ সালে বার বার নাকানি-চুবানি খেয়েছে বিভিন্ন নামের সামুদ্রিক ঝড়ের নিকট। যুক্তরাষ্ট্রের আবহাওয়া বিজ্ঞানের শব্দসম্ভার ফুরিয়ে গিয়েছিল ধারাবাহিক হারিকেনের আগমনে। কিন্তু ইতোমধ্যে যুক্তরাষ্ট্র, তার অপকর্মের দোসরগণ ও বিশ্ববাসীর সম্মুখে উত্থিত হয়েছে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত রাজনৈতিক হারিকেন 'হামাস'। গণতন্ত্র, মানবাধিকারের সোল এজেন্ট যুক্তরাষ্ট্র ও তার দোসরদের দ্বারা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে প্রচণ্ড শক্তিতে উত্থিত হয়েছে 'হামাস'। ধ্বংসস্তূপের ছাই থেকে জন্ম নেওয়া এই হারিকেন ধ্বংসের ক্ষমতা যুক্তরাষ্ট্রের রয়েছে বলে আমি মনে করি না। নবোত্থিত এই হারিকেন মধ্যপ্রাচ্যের সকল আবর্জনা ভূমধ্যাসাগরে নিক্ষেপ করবে বলে আমার বিশ্বাস।

উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে সৃষ্ট মানবীয় মতবাদ যথা– গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা ছিল যায়নবাদী ইহুদীরা। বিশ্বব্যাপী ইহুদী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে চির অপরাধপ্রবণ এই সম্প্রদায় পৃথিবীর অপরাপর জাতিগোষ্ঠীকে শক্তিহীন করার জন্য উক্ত মতবাদসমূহ সৃষ্টি করে ও প্রচার প্রসারে সচেষ্ট হয়। তাদের ধারণা ছিল উক্ত মতবাদসমূহের মাধ্যমে পৃথিবীব্যাপী বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর অসৎ, অযোগ্য ও মাথামোটা লোকগুলো ক্ষমতাসীন হবে এবং পর্যায়ক্রমে ইহুদী সাম্রাজ্যের নিকট নতি স্বীকার করবে। উক্ত চারটি মতবাদ সৃষ্টিতে ইহুদীবাদীদের উদ্দেশ্য ছিল নিম্নরূপ :

গণতন্ত্র : এটা সর্বজন স্বীকৃত যে, পৃথিবীতে জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান লোকের চেয়ে অজ্ঞ ও বুদ্ধিহীন লোকের সংখ্যা অনেক বেশি। এমতাবস্থায় গণতন্ত্রের মাধ্যমে অজ্ঞ লোকদেরকে চরিত্রহীন, লোভী, ভীরু ও মাথামোটা লোকদের পিছনে ঐক্যবদ্ধ করা হবে এবং বিভিন্ন জাতির নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত করা হবে চরিত্রহীন, লোভী ও ভীরু লোকদেরকে। যারা ব্যক্তিগত লোভে নিজ জাতির ভাগ্যকে ইহুদীবাদের নিকট বিক্রি করবে।

সমাজতন্ত্র : মানুষকে নিষ্ঠুর হত্যা ও নির্যাতনের মাধ্যমে মানুষের দাসে

www.pathagar.com

পরিণত করার প্রক্রিয়া হলো সমাজতন্ত্র। যেখানে ব্যক্তি-স্বাধীনতা, বাক-স্বাধীনতা, সম্পদের মালিকানা লাভের স্বাধীনতা থাকবে না। যে দেশগুলো পরিচালিত হবে চরিত্রহীন, লোভী, নিষ্ঠুর শাসকদের দ্বারা। এমতাবস্থায় তথাকথিত গণতান্ত্রিক বিশ্বে ইহুদীবাদ কায়েম করার পর সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের নিপীড়িত নির্যাতিত মানুষকে স্বাধীনতার লোভনীয় আশ্বাস দেয়া হলে তারা নিজ শাসকদেরকে ছুঁড়ে ফেলে ইহুদীবাদের পতাকাতলে সমবেত হবে।

ধর্মনিরপেক্ষতা : ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ হলো ধর্মের প্রতি নিরপেক্ষ, অন্য কথায় ধর্মের পক্ষে নয়। পৃথিবীর বেশির ভাগ জনগণ কোনো না কোনো ধর্মের পক্ষে অবস্থান করায় সরাসরি ধর্মবিরোধী শব্দ ব্যবহার না করে কৌশলে ধর্মনিরপেক্ষতা নামক মতবাদ সৃষ্টি করা হয়েছে। ইহুদীবাদীরা ভালোভাবেই জানে যে, মানবিক মূল্যবোধ, ন্যায়নীতি, জ্ঞান, আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা এবং অপরাপর সৎগুণাবলীর উৎস হচ্ছে মানুষের ধর্মজ্ঞান। পৃথিবীর মানুষের প্রতিটি ভালো চিন্তার উৎস কোনো না কোনো ধর্মজ্ঞান। এ জন্য ধর্মজ্ঞানসম্পন্ন সভ্যতা হলো মানবিক সভ্যতা আর ধর্মহীন সভ্যতা হলো পাশবিক সভ্যতা। পাশবিক সভ্যতার সৃষ্ট মানুষের দ্বারাই সকল প্রকার অপকর্ম সাধন সম্ভব। ইহুদীবাদীরা কিরূপ পাশবিক চরিত্রের অধিকারী তা বিশ্ববাসী ইতিমধ্যে প্রত্যক্ষ করেছে। সুতরাং ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের মাধ্যমে ইহুদীবাদীরা পাশবিক চরিত্রের মানুষ সৃষ্টিতে তৎপর রয়েছে, যাদেরকে নিজেদের অপকর্মের সহযোগী করা যায়।

ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদ : এই জাতীয়তাবাদী ধারণার প্রবক্তা ইহুদী বংশোদ্ভূত খ্রিস্টান মাইকেল আফলাক। মূলত মুসলমানদের ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের মোকাবেলায় উক্ত সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী মতবাদের পরিকল্পনা করা হয়েছে। হাজার বছরের ক্রুসেডে মুসলিম শক্তিকে নিশ্চিহ্ন করতে সক্ষম না হয়ে ইহুদীরা প্রথমে আরবদেরকে ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদে দীক্ষিত করে। পূর্বে ইন্দোনেশিয়া থেকে মরক্কো পর্যন্ত মুসলমানদের জাতীয়তাবাদ ছিল একটি। ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদী ধারণায় উক্ত একক জাতীয়তাবাদী চেতনা বহুধা বিভক্ত হয়ে পড়ায় মুসলিম শক্তি একে একে খ্রিস্টান ও ইহুদীদের নিকট নিজেদের স্বাধীনতা হারায়। এই জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ জনগোষ্ঠী নিজ রাষ্ট্রের সীমানার বাইরের জাতিসমূহের প্রতি নিষ্ঠুর ও অমানবিক আচরণ করতে, তাদের সর্বস্ব হরণ করতে কুণ্ঠিত হয় না।

ইহুদীবাদ সৃষ্ট উক্ত চারটি মতবাদের কূটকৌশল ইতোমধ্যে পৃথিবীর সচেতন মহল অনুধাবনে সক্ষম হয়েছে। ফলে পৃথিবীর দেশে দেশে উক্ত মতবাদসমূহকে জনগণ মতবাদের স্রষ্টাদের দিকে ছুঁড়ে মারছে। ইতোমধ্যে সমাজতন্ত্রের কবর রচিত হয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী দেশে ধর্মীয় দলগুলো ক্ষমতাসীন হচ্ছে, মানবিকতা ভৌগোলিক সীমারেখা অতিক্রম করে বিশ্বজনীন রূপে প্রভাব বিস্তার

www.pathagar.com

করছে এবং তথাকথিত পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের জনগণ পাশ্চাত্যবিরোধী শিবিরে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে।

গণতন্ত্র শিক্ষা দিতে মধ্যপ্রাচ্যে হামলা করে যুক্তরাষ্ট্র ইতোমধ্যে সচেতন বিশ্বের নিকট পাশবিক শক্তি হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ইতোমধ্যে আফগানিস্থান, ইরাক ও মিশরে যে গণতন্ত্র চালু করেছে তাও বিশ্ববাসীর অজানা নয়। কিন্তু বিধিবাম, সম্প্রতি দক্ষিণ আমেরিকার চিলি, ভেনিজুয়েলা ও বলিভিয়া এবং মধ্যপ্রাচ্যের ইরান ও ফিলিস্তিনের জনগণ যুক্তরাষ্ট্রকে গণতন্ত্র শিক্ষা দিতে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। আরব বিশ্বের অন্যান্য দেশের জনগণ যদি সার্বজনীন ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ পায় তবে সেখানেও যুক্তরাষ্ট্রবিরোধীরাই জয়ী হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি।

বৃহৎ শক্তি হওয়ার অহংকারে যুক্তরাষ্ট্র হয়তো গণতন্ত্রের পাঠ গ্রহণে রাজী না হয়ে ইরাক ও আফগানিস্থানের ন্যায় গণতন্ত্রচর্চায় প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে। তবে সবকিছুর যেমন শেষ আছে তেমনি যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতারও একটি সীমা আছে। উক্ত সীমা লংঘন করলে যুক্তরাষ্ট্রের গণতন্ত্র গণতন্ত্র খেলার শেষ বাঁশি বেজে উঠবে।

পৈচাশিকতা, নিষ্ঠুরতা, অমানবিকতা জাতীয় যত শব্দ অভিধানে রয়েছে সবই বর্তমান যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইলের জাতীয় বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে। আধুনিক গণমাধ্যমের কারণে পৃথিবীর নিভৃত পল্লীর সাধারণ লোকটিও যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইলকে ঘৃণা করতে শিখেছে। এমতাবস্থায় যুক্তরাষ্ট্র ও তার দোসরদের বিরুদ্ধে পৃথিবীর সাধারণ মানুষ জেগে উঠছে। আগামীতে যুক্তরাষ্ট্রের শেখানো গণতন্ত্রের মাধ্যমে পৃথিবীর দেশে দেশে যুক্তরাষ্ট্রবিরোধী জনগণ ঐক্যবদ্ধ হবে। আর এই গণঐক্যের কেন্দ্রে থাকবে ধ্বংসস্তূপ থেকে জেগে ওঠা 'হামাস'। উক্ত গণঐক্যই সুনামির চেয়ে ভয়াবহ রূপ ধারণ করে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রে আঘাত করবে।

ফেব্রুয়ারি ২০০৬

www.pathagar.com

শ্রীমতি ইন্দিরা মায়ের স্মরণে–

আসছে ২৬ মার্চ আমার বয়স ৩৫ বছর পূর্ণ হবে। দুনিয়ার হিসাবে বয়স কিন্তু কম নয়। আমি এখন বুঝতে শিখেছি, সত্য-মিথ্যার পার্থক্য করতে শিখেছি। তাই এতদিন তোমাকে স্মরণ করিনি বলে অনুতপ্ত হয়ে তোমার স্মরণে লিখতে বসেছি। শুনেছি ২৫ মার্চের কাল রাত্রি আমার জন্মক্ষণ। জন্মলগ্নেই পিতা নিখোঁজ। তোমার উদরে আমাকে স্থান দিয়েছ। পিতার অবর্তমানে রুশ প্রেসিডেন্টের সাথে মিলিত হয়ে পিতার অসমাপ্ত কাজ সমাধা করেছ। এ জন্য আজ শ্রদ্ধাভরে তোমায় স্মরণ করছি।

মাগো, কালো রাত্রিতে জন্ম হওয়ায় আমাদের কপাল পোড়া। কারো সম্পর্কে সঠিক তথ্য পাব, এ ভাগ্য নিয়ে আমরা জন্মাইনি। এক লেখক যা বলেন, অন্য লেখক তার বিরুদ্ধে লিখেন। যারা প্রত্যক্ষদর্শী ছিল বলে দাবি করে তাদের কথার মধ্যে, তথ্যের মধ্যে মিল নেই। তাই সত্য জানতে আমাদেরকে বিদেশী লেখকের দ্বারস্থ হতে হয়। এসব তথ্য-বিভ্রাটের কারণে অনেক মুক্তিযোদ্ধাকে বর্তমানে রাজাকার বলা হয়, অনেক রাজাকারকে বলা হয় মুক্তিযোদ্ধা, দেশপ্রেমিক হয়েছে দেশদ্রোহী আর দেশদ্রোহী নিজেকে দাবি করে দেশপ্রেমিক হিসেবে। স্বাধীনতা রক্ষায় যারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তাদেরকে বলা হচ্ছে স্বাধীনতার বিপক্ষশক্তি আর ক্ষমতা ও অর্থের লোভে যারা দেশের স্বাধীন সত্তা বিরোধী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত তাদেরকে বলা হচ্ছে স্বাধীনতার সপক্ষ শক্তি।

মাগো, শুনেছি স্বর্গের দুর্গাদেবীর রয়েছে দশ হাত। এই দশ হাত দিয়ে তিনি দশদিকের হামলা প্রতিহত করেন, দশদিকে হামলা পরিচালনা করেন এবং শত্রুকে নিশ্চিহ্ন করেন, অসুরকে বিনাশ করেন। আরও শুনেছি আপনি ছিলেন মর্ত্যের দুর্গাদেবী, লোকে বলতো ইন্দিরা দেবী। আপনার হাত ছিল দশটিরও অধিক। আমার জন্মলগ্নে আপনি একহাতে পাকিস্তানকে প্রতিরোধ করেছেন, অন্য হাতে চীনকে, অপর হাতে আমেরিকাকে, ভিন্নহাতে জাতিসংঘকে আপনি পরাস্ত করেছেন। আবার একহাতে আপনি মুজিবনগর সরকার গঠন করেছেন, অন্য হাতে ৭ দফার রশি দিয়ে উক্ত সরকারকে বন্দী করেছেন, আমাদের দেশের মুক্তির জন্য একহাতে মুক্তিযোদ্ধা বানিয়েছেন, অন্য হাতে মুক্তিযোদ্ধাদের হত্যা করার জন্য মুজিব বাহিনী গঠন করেছেন। সময়াভাবে মুজিব বাহিনী আপনার টার্গেট পূরণ

www.pathagar.com

করতে না পারায় একই হাতে আপনি রক্ষীবাহিনী গঠন করেছেন। শুধু তাই নয়, এরপর আপনার অন্যান্য হাত দিয়ে শান্তি বাহিনী, ঔরঙ্গ বাহিনী, কাদেরিয়া বাহিনী, বঙ্গসেনা সৃষ্টি করেছেন। আমি না চাইতেই আপনি আমার জন্য এতো প্রকারের বাহিনী সৃষ্টি করেছেন, এজন্য আপনাকে সাধুবাদ জানাই।

আপনার অকাল মহাপ্রয়াণে নতুন বাহিনী সৃষ্টি প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু হঠাৎ অনেক বছর পর নতুন এক বাহিনীর জন্ম হয়েছে, যার নাম জেএমবি। নতুন বাহিনী সৃষ্টির কথা শুনলে আপনাকে মনে পড়ে যায়। তদুপরি ইতোমধ্যে জানা গেছে, যে সংস্থা বিভিন্ন বাহিনী গঠন করে বাংলাদেশে পাঠায় সে সংস্থাই নতুন এ বাহিনীর জন্ম দিয়েছে। আপনার তৈরি 'গোমিয়া' কারখানার বারুদ দিয়ে তারা আমাদেরকে পুড়িয়ে মেরে ইসলাম কায়েম করতে চায়।

আপনিতো পুনর্জন্মবাদী। সে হিসেবে নিশ্চয়ই আপনি এখন অন্য পরিচয়ে জন্মলাভ করেছেন। স্বর্গের দেবতাদের সাথে বিচরণ করে আপনি আগের চেয়ে বেশি সক্ষমতা অর্জন করেছেন। এমতাবস্থায় আপনি যদি আপনার উদরে জন্ম নেয়া সন্তানের ব্যাপারে সদয় না হন তবে আপনার সন্তানের পিঠ দেয়ালে ঠেকে যাবে। বাবার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করে আপনি আমার Parents এ পরিণত হয়েছেন। আপনি স্বর্গ/ মর্ত্য/ নরক যেখানেই থাকুন না কেনো আমি সব সময় আপনাকে স্মরণ করতে বাধ্য।

মার্চ, ২০০৬

www.pathagar.com

মাইনাস ফর্মুলার অতীত-বর্তমান দেশপ্রেমিকদের করণীয়

ভূমিকা : বিশ্ববিখ্যাত মহাজ্ঞানী ঈশপের গল্প দিয়েই শুরু করছি। গল্পটি এরূপ– জঙ্গলে বাস করতো এক দরিদ্র কাঠুরিয়া। তার ছিল অতি সুন্দরী এক মেয়ে। বনের এক বাঘ মেয়েটিকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিলো। কাঠুরিয়া দেখলো, হিংস্র বাঘের দাবি না মানলে রক্ষা নেই। সে বাঘকে কাবু করার ফন্দি আঁটলো। বিনয়ের সহিত বাঘকে বললো, তোমার নিকট আমার মেয়েকে বিয়ে দিতে আপত্তি নেই তবে আমার মেয়ে তোমার ধারালো দাঁত এবং তীক্ষ্ম নখকে খুব ভয় করে। তুমি যদি তোমার দাঁত ও নখ ফেলে দিয়ে আসো, তবে আমার মেয়েকে তোমার হাতে তুলে দেবো। তোমাকে পরমাত্মীয় হিসেবে আমার পরিবারে গ্রহণ করবো। বোকা বাঘ কাঠুরিয়ার ছলনা বুঝতে না পেরে পাহাড়ের পাথরে সজোরে আঘাত করে করে নিজের মহামূল্যবান অস্ত্রদ্বয় অর্থাৎ দাঁত ও নখ ফেলে দিয়ে কাঠুরিয়ার দুয়ারে হাজির হয়ে বললো, আপনার শর্ত আমি পূরণ করেছি। এখন আপনার মেয়েকে আমার সাথে বিয়ে দিন। বাঘের এই বিপর্যস্ত অবস্থা দেখে কাঠুরিয়া কালবিলম্ব না করে কুঠার দিয়ে বাঘের উপর হামলা চালালো, দন্ত-নখরহীন বাঘ উক্ত হামলা থেকে আত্মরক্ষা করতে না পেরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে বোকামির মূল্য দিলো।

প্রিয় পাঠক, উক্ত বোকা বাঘ সভ্য সমাজের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য নিজের অস্ত্র পরিত্যাগ করে নিজের অস্তিত্ব বিলীন করে দিয়েছিল। আমরাও বর্তমানে চতুর কাঠুরিয়ার ছলনায় পড়ে প্রতিনিয়ত আমাদের জাতির প্রতিরোধ শক্তিকে নিজেদের হাতে ধ্বংস করার সর্বনাশা খেলায় মেতেছি। এখুনি এ খেলা বন্ধ করা না গেলে আমাদের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব ও অস্তিত্ব বোকা বাঘের চেয়ে ভিন্ন কিছু হবে না।

ওয়ান-ইলেভেনের পর থেকে বহুল আলোচিত মাইনাস ফর্মুলাকে আমি মাইনাস দাঁত, মাইনাস নখ এবং মাইনাস নেতৃত্বের মতোই মনে করি। কেননা যুগে যুগে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সব সময় দুর্বল প্রতিপক্ষকেই কব্জা করেছে। নিকট অতীতের ইরাকের প্রতি খেয়াল করলে দেখবেন, সাম্রাজ্যবাদী শক্তি প্রথমে তেলসমৃদ্ধ ইরাককে টার্গেট করেছে, তৎপর জাতিসংঘ প্রস্তাবের দোহাই দিয়ে ইরাককে অস্ত্রশূন্য করেছে এবং ইরাক দখল করেছে। এখানেই তারা থেমে

www.pathagar.com

থাকেনি। তাদের প্রয়োজন ইরাকের সম্পদ– মানুষ নয়। তাই তারা নির্বিচারে ইরাকি জনগণকে হত্যা করছে এবং নিজেদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ বাধিয়ে ইরাককে ইরাকিমুক্ত করার কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। ইরাককে নেতৃত্বশূন্য করার জন্য সাদ্দামকে ও তার সহযোগীদের হত্যা করেছে এবং আরও যারা প্রতিরোধ করতে পারে তাদেরকেও নির্বিচারে হত্যা করছে। লক্ষ্য একটাই, আর তাহলো ইরাকের সম্পদ লুণ্ঠন এবং বাঘসদৃশ মুসলমান নিধন।

বাংলাদেশের প্রতিও আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর কুনজর পড়েছে। আঞ্চলিক পরাশক্তিটি '৪৭ সাল থেকেই বাংলাদেশের স্বাধীন অস্তিত্ব মেনে নেয়নি। এজন্য তখন থেকেই তারা ধারাবাহিকভাবে এদেশের স্বাধীন অস্তিত্বের প্রতি গোপনে ও প্রকাশ্যে হামলা করে এসেছে। এতদসত্ত্বেও কাশ্মির, হায়দরাবাদ, সিকিম, ভূটান ও নেপালের ন্যায় বাংলাদেশকে কাবু করতে না পেরে বর্তমানে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সাথে হাত মিলিয়ে তারা এদেশের স্বাধীন অস্তিত্ব মিটিয়ে দেয়ার চূড়ান্ত খেলায় মেতেছে। মুসলমানদেরকে বাংলার এবং ভারতের ক্ষমতা থেকে বিতাড়িত করার জন্য ১৭৫৭ সালেও তারা ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে এদেশের স্বাধীনতাকে বিকিয়ে দিয়েছিল। তাদের বর্তমান চিন্তা-ভাবনা সম্পর্কে নিকট অতীতের দু'একটি তথ্য উপস্থাপন করলে পাঠকদের নিকট তাদের স্বরূপ উন্মোচিত হবে।

১. ২০০৫ সালের মার্চ মাসে যুদ্ধবাজ মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কন্ডোলিসা রাইস ভারত সফরে এসে বাংলাদেশকে মৌলবাদের পক্ষে অগ্রসরমান দেশ বলে মন্তব্য করেন এবং বাংলাদেশের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের অনেক কিছু করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।
২. বাংলাদেশে নিযুক্ত তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রদূত হ্যারি কে টমাস এই মর্মে ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, 'বাংলাদেশের সরকারি ও বিরোধী দল ঐকমত্যে পৌঁছতে ব্যর্থ হলে তৃতীয় শক্তি এদেশের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবে।
৩. ৫ সেপ্টেম্বর ০৬ তারিখে কোলকাতার আনন্দবাজার পত্রিকা একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। যার শিরোনাম ছিল– 'জঙ্গি শিবির ভাঙতে চাপ বাড়ানোর দাবি'। প্রতিবেদনে বলা হয়– বাংলাদেশের জঙ্গি ঘাঁটি নিয়ে অতীতে বারবার সরব হয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্ট। এবার আরও কড়া হয়ে সেই জঙ্গি ঘাঁটি ধ্বংস করতে 'ভুটান মডেল' অনুসরণ করার জন্য প্রধানমন্ত্রী মনমোহনের নিকট দাবি জানান তিনি। (ভুটান মডেল সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হবে)।

উপরোক্ত তিনটি বক্তব্যের সারকথা হলো এই–

১. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, ইসরাইল ও ভারত বর্তমানে মুসলমানদেরকেই তাদের ১ম প্রতিপক্ষ এবং উদীয়মান শক্তি চীনকে ২য়

www.pathagar.com

প্রতিপক্ষ হিসেবে সাব্যস্ত করে যৌথ কার্যক্রম পরিচালিত করছে। বিশ্বের সকল মুসলিম দেশে তারা গৃহযুদ্ধাবস্থা সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করছে। মুসলিম বিশ্বে তাদের মিত্র হলো ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী সুশীল সমাজ, রাজনৈতিক দল, এনজিও এবং অন্য ইসলাম বিদ্বেষী সংস্থাগুলো। তারা বিশ্বের প্রতিটি মুসলিম দেশে তাদের এসব তল্পিবাহকদেরকে ক্ষমতায় দেখতে চায়। বাংলাদেশে ২০০১ সালে চারদলীয় জোটের পুনরায় ক্ষমতাসীন হওয়ায় তাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য বাস্তবায়ন বাধার সম্মুখীন হয়। এজন্যই কন্ডোলিজা রাইস ভারতে এসে যৌথভাবে বাংলাদেশের ব্যাপারে অনেক কিছু করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। এই অনেক কিছু করার ধারাবাহিকতা ছিল নিম্নরূপ–

ক. তারা তাদের গোয়েন্দা সংস্থা ও এদেশীয় এজেন্টদেরকে ব্যবহার করে এদেশের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন অপপ্রচার চালায় এবং দেশকে অকার্যকর রাষ্ট্র প্রমাণে তৎপর হয়।

খ. এদেশের উপর অর্থনৈতিক ও সামরিক হামলা পরিচালনা করার অজুহাত সৃষ্টির লক্ষ্যে তারা এদেশের হতদরিদ্র জনগোষ্ঠী থেকে অর্ধশিক্ষিত ও অল্পবয়স্ক কিছু কাঠমোল্লা সংগ্রহ করে ভারতের ছত্রছায়ায় ট্রেনিং প্রদান করে এবং ভারতীয় অস্ত্রে সজ্জিত করে এদেশে ব্যাপক বোমাবাজি সংঘটিত করে। সরকারের সময়োপযোগী কঠোর পদক্ষেপ উক্ত বোমাবাজ সংগঠন জেএমবিকে দমন করায় তারা আপাতত আর অগ্রসর হতে পারেনি। তাদের এসকল অপকর্মে প্রকাশ্য সমর্থন দিয়েছে তাদের লালিত এদেশের মিডিয়াগুলো।

২. আমার ধারণা মার্কিন রাষ্ট্রদূত হ্যারি কে টমাসই তৃতীয় শক্তিকে ক্ষমতায় আনার মৌলিক কাজগুলো সম্পন্ন করে গেছেন। তিনি সরকারি দল ও বিরোধী দলের কিছু চিহ্নিত ব্যক্তিদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখতেন। ৪ দলীয় জোট এবং ১৪ দলীয় জোট যাতে কখনো সমঝোতায় আসতে না পারে এবং দেশে চরম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় সে ব্যবস্থাটি তিনি পাকাপোক্ত করেছেন। তাকে এ কাজে সক্রিয় সহযোগিতা করেছে 'র', মোসাদ এবং এদেশের সাম্রাজ্যবাদী অনুচরগণ। উল্লেখ্য, ১৭৫৭ সালে মুসলমানদের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে ঠিক একইরূপ ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল। তখন এদেশে বাণিজ্য পরিচালনা করার জন্য ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্য এজেন্ট ছিল ৮৩ জন। তন্মধ্যে ৮১ জন ছিল হিন্দু, ২ জন ছিল মুসলমান। উক্ত ৮১ জন হিন্দু এজেন্টই বাংলার স্বাধীনতা হরণের জন্য ষড়যন্ত্রের নগরী 'কোলকাতা' গড়ে তুলেছিল। উক্ত কোলকাতা এবং দিল্লি অধ্যায়টি আমাদের স্বাধীন সত্তার বিরুদ্ধে অবিরাম ষড়যন্ত্র করছে। ১৭৫৭ সালের বৈদেশিক বাণিজ্য এজেন্টগণ ক্ষমতালোভী-নারীলোলুপ ও বোকা মীরজাফরকে ক্ষমতায় বসিয়েছিল। কিন্তু

www.pathagar.com

ইতিহাস সাক্ষী– মীরজাফর সিংহাসন পেয়েছিলেন কিন্তু রাজ্য শাসন ক্ষমতা কখনো পাননি। নিজের ভুল বুঝতে পেরে ইঙ্গ-হিন্দু শক্তির বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু ইতিমধ্যে জনগণ তাকে বিশ্বাস ঘাতক হিসেবে চিহ্নিত করায় তিনি জনসমর্থন পাননি উপরন্তু জগৎশেঠ গোষ্ঠী তার অভিপ্রায় ইংরেজদের জানিয়ে দেয়। ফলে মীরজাফর ক্ষমতাচ্যুত হন এবং তার জামাতা মীরকাশিম ক্ষমতাসীন হন।

মীর জাফর ও মীর কাশিম ইঙ্গু-হিন্দু ষড়যন্ত্রের ব্যাপকতা অনুধাবন করতে পারেননি। তারা মনে করেছিলেন এটা নিছক ক্ষমতার হাতবদল মাত্র। সিরাজ পরিবারের হাত থেকে মীরজাফর পরিবারে ক্ষমতা হস্তান্তর মাত্র। অল্পদিনের মধ্যেই তারা ষড়যন্ত্রের ব্যাপকতা উপলব্ধি করেন। মীরকাশিম ক্ষমতাসীন হয়ে দ্রুতগতিতে ইংরেজ বিতাড়ন কর্মসূচি গ্রহণ করেন। কিন্তু ইতিমধ্যে অনেক দেরি হয়ে গেছে। ইঙ্গ-হিন্দু শক্তির এজেন্টগণ দেশের গুরুত্বপূর্ণ পদ দখল করে ফেলেছে। দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে। জনগণ সাম্রাজ্যবাদের পুতুল সরকারের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। ফলে অনুতপ্ত মীরকাশিম ইঙ্গ-হিন্দু শক্তির বিরুদ্ধে ৭টি রক্তক্ষয়ী সম্মুখযুদ্ধ করেও পরাজিত হন এবং বাংলার স্বাধীনতার সূর্য ১৯০ বছরের জন্য অস্তমিত হয়। এখানে একটি বিষয় শিক্ষণীয়– তাহলো, দেশপ্রেমিক জনগণ যদি অনুতপ্ত মীরজাফর ও মীরকাশিমকে ক্ষমা করে তাদের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আগ্রাসী শক্তির মোকাবিলা করতো তবে আগ্রাসী শক্তি বাংলার স্বাধীনতা হরণ করতে সক্ষম হতো না। এটা নিছক রাজা গণেশের ক্ষমতা দখলের ন্যায় সাময়িক ব্যাপার হতো।

ভুটান মডেল

৩. সিকিম মডেলের সার কথা হলো– তাবেদার রাজনৈতিক দলকে রাষ্ট্র ক্ষমতায় এনে উক্ত দেশের পার্লামেন্টে বিল পাস করে ভারত ইউনিয়নে যোগ দেয়া। আর ভুটান মডেল হলো– প্রথমে গণবিচ্ছিন্ন সরকারকে ক্ষমতায় বসানো, তৎপর জনগণ এবং সরকারকে আলাদাভাবে উস্কে দিয়ে মুখোমুখি করে গৃহযুদ্ধ বাধিয়ে দেয়া এবং দুর্বল সরকারের সাথে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা চুক্তি সই করে উক্ত গণবিরোধী পুতুল সরকারকে সর্বপ্রকার সহায়তা দিয়ে সরকারবিরোধীদের দমনের নামে সে দেশের ভারতবিরোধী শক্তিকে নিশ্চিহ্ন করা। বলা বাহুল্য এই নিয়মেই ভারত ভুটানকে গ্রাস করতে সক্ষম হয়েছে। আর বুদ্ধদেব বাবু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে 'ভুটান থেরাপি' প্রয়োগ করার আশঙ্কা ব্যক্ত করেছেন।

www.pathagar.com

নেহরু ডকট্রিনই ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতির চালিকাশক্তি

ইতিহাস ও রাজনীতি সচেতন ব্যক্তিমাত্রই মার্কিন প্রেসিডেন্ট মনরোর 'মনরো ডকট্রিন' এবং ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহর লাল নেহরুর 'নেহরু ডকট্রিন' সম্পর্কে অবগত আছেন। নেহরু ডকট্রিনের সরকথা হলো– আফগানিস্তান, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, ভূটান, সিকিম, বার্মাকে ভারতভুক্ত করতে হবে। নিদেনপক্ষে ভারতের তাবেদার রাষ্ট্রে পরিণত করতে হবে। এ লক্ষ্য নিয়েই ভারত উপমহাদেশে তার কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ কার্যক্রমের প্রথম ধাপ হলো সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর প্রতিটি সেক্টরে স্বীয় এজেন্ট সৃষ্টি করা, অর্থনীতি ধ্বংস করা, গৃহযুদ্ধ বাধিয়ে প্রতিরোধ ক্ষমতা চুরমার করে দেয়া এবং ঈশপের গল্পের দন্ত-নখরহীন প্রতিপক্ষকে নিহত করা অথবা নিদেনপক্ষে আহত ও বন্দী করে দাস হিসেবে ব্যবহার করা।

এজন্যই আমরা দেখতে পাই, আফগানিস্তানে সোভিয়েত আগ্রাসনে, মার্কিন আগ্রাসনে, গৃহযুদ্ধের বিস্তৃতিতে ভারত সক্রিয় সহযোগিতা করছে। পাকিস্তানে গোষ্ঠীগত দাঙ্গায় ইন্ধন যোগাচ্ছে, মোহাজের বিহারী নেতা আলতাফ হোসেনকে পাকিস্তানবিরোধী কর্মকাণ্ডে সহায়তা করছে এবং পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পরিচালিত সকল মার্কিন কর্মকাণ্ডে ভারত সক্রিয় সহযোগিতা করছে।

উদীয়মান অর্থনীতির দেশ শ্রীলঙ্কাকে বিপর্যস্ত করার জন্য সংখ্যালঘু তামিল হিন্দুদেরকে অর্থ, অস্ত্র, আশ্রয় ও ট্রেনিং দিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছে। বার্মার সামরিক জান্তাকে মদদ দিয়ে জনগণের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে এবং ঐ দেশের প্রতিরোধ শক্তিকে বিনষ্ট করছে। স্থলবেষ্টিত হওয়ায় সিকিম, নেপাল, ভূটান আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে ভারতের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় দেশত্রয় ১৯৫০ সালেই ভারতের সাথে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা চুক্তি করতে বাধ্য হয়। ইতিমধ্যে ভারত সিকিমকে সম্পূর্ণভাবে, ভূটান ও নেপালকে আংশিকভাবে গ্রাস করেছে।

মাইনাস ফর্মুলা– দেশে দেশে

মাইনাস ফর্মুলা হঠাৎ আবিষ্কৃত কোনো থিওরি নয়। মানব সমাজের প্রাচীনতার ন্যায় এই ফর্মুলাটি প্রাচীন। প্রতিপক্ষ শক্তির সবচেয়ে যোগ্যতম ব্যক্তিটিকে ঘায়েল করতে পারলে প্রতিপক্ষ দুর্বল হয়ে যাবে এ কথাটি বোকা ব্যক্তিটিও বুঝে। প্রাচীনকালের যুদ্ধের ইতিহাসে দেখা যায় প্রতিপক্ষ রাজার মৃত্যু হলে উক্ত রাজ্যের পতন হয়। রানী, রাজকন্যা, রাজপরিবারসহ সমগ্র দেশ বিজয়ীর করতলগত হয়। ঠিক তদ্রুপ অতীতের অনেক যুদ্ধে দেখা গেছে, প্রধান সেনাপতির মৃত্যুতে বা বিশ্বাসঘাতকতায় একটি রাজ্যের রাজা নিরাপত্তাহীন হয়ে রাজ্য ছেড়ে পালিয়েছেন অথবা নিহত হয়েছেন। রাজ্যের জনগণ আগ্রাসী শক্তির দাসত্ববরণ করতে বাধ্য হয়েছে। ১৭৫৭ সালে বাংলার স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হয়েছিল সেনাপতি

www.pathagar.com

মীরজাফর গংদের বিশ্বাসঘাতকতায়। বিশ্বসেরা রাজনীতিক ও সমরবিদ মহীশূরের টিপু সুলতান নিহত হয়েছিলেন স্বীয় প্রধানমন্ত্রী, সভাসদ ও প্রধান সেনাপতি পূর্ণিয়া, কামারউদ্দীন ও মীর সাদিকের বিশ্বাসঘাতকতায়। ষড়যন্ত্রে টিপু নিহত হয়েছেন অথবা টিপু মাইনাস হয়েছেন আর তাই অদ্যাবধি মহীশূরের জনতা বংশানুক্রমিকভাবে গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ হয়েছেন। সাম্প্রতিক ইরাক ও ইরাকিদের দুর্দশার প্রধান কারণ আমেরিকা হলেও দ্বিতীয় প্রধান কারণ হলো সে দেশের পরজীবী বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় এবং তৃতীয় কারণ ছিল সাদ্দামের অনেক জেনারেলের গোপনে মার্কিন প্রলোভনের শিকার হওয়া। পত্রিকান্তরে জেনেছি, সিআইএ সাদ্দামের অনেক জেনারেলকে টাকার বিনিময়ে ক্রয় করতে সমর্থ হয়েছিল, ফলে বিনাযুদ্ধে বাগদাদ নগরীর পতন সম্ভব হয়েছিল। মুষ্টিমেয় ইরাকির বিশ্বাসঘাতকের কারণে ইরাকে আজ কারবালার মাতম, ইতিমধ্যে এক-চতুর্থাংশ ইরাকি উদ্বাস্তু জীবনযাপন করছে। লক্ষ লক্ষ ইরাকি আহত-নিহত-পঙ্গু-বিকলাঙ্গ। পর্দানসীন ইরাকি মহিলাদের অনেকেই এখন ক্ষুধার তাড়নায় বেশ্যাবৃত্তিতে লিপ্ত হতে বাধ্য হয়েছে।

একটি দেশ বা শক্তি হঠাৎ করে আসমান থেকে নাজিল হয় না, মাঠি ফুঁড়েও বের হয় না। একটি দেশ ও জাতি সৃষ্টিতে বহু শত বছর সময় লাগে এবং এই দেশ বা জাতি সৃষ্টিতে যে ব্যক্তি, দল, মতবাদ বা ধর্মপ্রধান ভূমিকা পালন করে সে সত্তাই হয় উক্ত দেশ ও জাতির প্রধান নিউক্লিয়াস। নিউক্লিয়াস ব্যতীত পরমাণু, অনু বা দৃশ্যমান কোনো বস্তু যেমন কল্পনা করা যায় না ঠিক অদ্রুপ জাতি ও দেশ সৃষ্টিতে যে উপাদান বা নেতা মুখ্য ভূমিকা পালন করেন তাকে মাইনাস করলে উক্ত দেশ ও জাতি বিপন্ন হতে বাধ্য। আপনি মৌচাক থেকে রানী মৌমাছিকে মাইনাস করুন তখন দেখবেন নিমিষেই মৌচাক ঘিরে থাকা মৌমাছিরা বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত হয়ে পাখিদের খাদ্যে পরিণত হয়েছে এবং মৌচাক বিলুপ্ত হয়েছে। তর্কের খাতিরে কেউ বলতে পারেন, রানী মৌমাছির বদলে অন্য একটিকে জোর করে রানী বানাবো, আমি বলবো– তা সম্ভব হলেও অস্বাভাবিক নিয়মে স্থাপিত এই রানীকে যদি সাধারণ মৌমাছিরা গ্রহণ না করে তবে ফলাফল একই হবে। এজন্যই সাম্রাজ্যবাদী শক্তি একটি দেশ ও জাতিকে ধ্বংস করার লক্ষ্যে প্রথমে উক্ত জাতির ঐক্যের প্রতীক ব্যক্তি বা দলকে নিশানা করে। তৎপর ঐক্যের প্রতীকটিকে মাইনাস করে বিকল্প ব্যক্তিকে ক্ষমতাসীন করে। কারণ তারা জানে, স্বাভাবিক ধারাবাহিকতায় সৃষ্ট ঐক্যের প্রতীক নেতার স্থলে কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্ট নেতাকে ক্ষমতাসীন করলে প্রতিপক্ষ অনেক দুর্বল হয়ে পড়বে এবং আগ্রাসী শক্তি সবসময় দুর্বল প্রতিপক্ষই কামনা করে। কেননা এতে স্বল্পযুদ্ধে অথবা বিনাযুদ্ধে বিজয় লাভ করা সম্ভব। বিখ্যাত ভারতীয় বুদ্ধিজীব অরুন্ধতী রায় প্রেসিডেন্ট বুশের ইরাকবিরোধী Weapon of must destruction শ্লোগান সম্পর্কে বলেছিলেন, 'চলো দৌড়

www.pathagar.com

প্রতিযোগিতায় অংশ নিই, তবে তার আগে আমাকে তোমার হাঁটু দু'টি ভেঙে ফেলতে দাও।'

মাইনাস ফর্মুলার কবলে পড়ে পৃথিবীর কতো দেশ তাদের সুখ-সমৃদ্ধি-স্বাধীনতা হারিয়েছে তার বিবরণ লিখা আর বিশ্ব ইতিহাস লিখা সমার্থক। প্রবন্ধের কলেবর না বাড়িয়ে আমি মাইনাস ফর্মুলার শিকার কয়েকটি দেশের সাম্প্রতিক উদাহরণ উল্লেখ করছি।

আফগানিস্তান

ভূ-রাজনৈতিক কারণে আফগানিস্তানকে এশিয়ার প্রাণকেন্দ্র বলা হয়। তাই যুগ যুগ ধরে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি আফগানিস্তান দখলের প্রচেষ্টায় লিপ্ত ছিল। এখনো আমেরিকা ও ইউরোপ শুধুমাত্র ভূ-রাজনৈতিক কারণে আফগানিস্তানে স্থায়ীভাবে গেঁড়ে বসার প্রচেষ্টায় রত রয়েছে।

সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেন ১৮৩৯-৪২ খ্রি:, ১৮৭৮-৮১ খ্রি: এবং ১৯১৯ সালে আফগানিস্তান দখলের যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল। কিন্তু ১ম দুই সময়কালে স্বাধীনচেতা আফগান জনগণ ও পরবর্তীতে বাদশাহ আমানুল্লাহর ন্যায় দক্ষ শাসক তখন আফগানিস্তানের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকায় ব্রিটেনের আগ্রাসী ইচ্ছা পূরণ করা সম্ভব হয়নি। ১৯১৯ সালের যুদ্ধে ডা. ব্রেডন ব্যতীত আর কোনো ব্রিটিশ অভিযানকারী আফগানিস্তান থেকে প্রাণ বাঁচিয়ে ফেরত আসতে পারেনি। এরূপ দক্ষ বাদশাহর শাসনামলে আফগানিস্তান দখল করা সম্ভবপর নয় বিবেচনা করে ব্রিটেন মাইনাস আমানুল্লা থিওরি প্রয়োগে পরিকল্পনা করে। ব্রিটেন আমানুল্লাহর সাথে বন্ধুত্বের প্রস্তাব দেয়। বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ ব্রিটেন সফরের আমন্ত্রণ জানায়। আমানুল্লা ব্রিটেন সফরে যান। যথেষ্ট খাতির-যত্ন পান। ব্রিটেনের সাথে কয়েকটি চুক্তিও করেন। সফরকালে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেন গোপনে আমানুল্লাহর বেডরুমের বিভিন্ন অসতর্ক মুহূর্তের ছবি তুলে তার সাথে বিভিন্ন ইউরোপীয় রমণীর উলঙ্গ ছবি একত্র করে অসংখ্য যুগল ছবি নিজস্ব এজেন্টদের মাধ্যমে আফগানিস্তানে পাঠায়। রক্ষণশীল আফগান জনতা বাদশাহর এরূপ অধঃপতনের দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে দেশব্যাপী আমানুল্লাহবিরোধী আন্দোলন শুরু করে। আমানুল্লাহ দেশবাসীর সাথে সংঘাতে লিপ্ত না হয়ে নিকটাত্মীয় নাদির খানের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করে স্বেচ্ছা নির্বাসনে ফ্রান্সে যান। নাদির খান আমানুল্লাহর ন্যায় উপযুক্ত ছিলেন না। তিনি ১৯৩৩ সালে গুপ্তঘাতকের হাতে নিহত হন। তার ছেলে জহির শাহ ক্ষমতাসীন হন। আমানুল্লাহ মাইনাস হওয়ার পর ব্রিটেন পুনরায় আফগানিস্তানে সক্রিয় হস্তক্ষেপ নীতি চালু করতে সক্ষম হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটেন হীনবল হয়ে পড়ে এবং রাশিয়া পরাশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়। রাশিয়া জহির শাহকে মাইনাস করে স্বীয় তল্পিবাহক সরকার স্থাপনে সচেষ্ট হয়। রাশিয়া প্রথমে সে দেশের কিছুসংখ্যক বুদ্ধিজীবীকে নিজ পক্ষে টানে।

www.pathagar.com

বুদ্ধিজীবীরা সংস্কার-প্রগতিশীলতার প্রচার-প্রসার করতে থাকে। তাদের নেতৃত্বে বিভিন্ন নামের প্রগতিশীল দল গঠিত হয়। উক্ত দলগুলো হলো– উইখ-ইকালমায়া, নিদায়ে খালক, ওয়াতন প্রভৃতি। এসব দলের প্ররোচনায় জহির শাহর প্রধান সেনাপতি লে. জেনারেল দাউদ খান অভ্যুত্থান সংঘটিত করেন। জহির শাহকে নামমাত্র রাজা হিসেবে রাখেন, দক্ষ প্রধানমন্ত্রী মাহমুদ খানকে পদচ্যুত করে নিজে প্রধানমন্ত্রী হন। সংস্কারপন্থীদের প্ররোচনায় তিনি বিভিন্ন আইন সৃষ্টি করে ক্ষমতা কুক্ষিগত করেন। রুশপন্থী খালক ও পারচাম দলের প্ররোচনায় ১৯৭৩ সালে জহির শাহকে নির্বাসনে পাঠিয়ে রাজতন্ত্র বিলোপ করেন। নিজে প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী হয়ে জহির শাহের ঘনিষ্ঠজনদেরকে বিচারের নামে ফাঁসিকাষ্ঠে অথবা কারাগারে পাঠান।

সর্বময় ক্ষমতা কুক্ষিগত করে দাউদ খান রুশপন্থী পারচাম দলের ১৬০ জনকে রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ দান করেন। অচিরেই তিনি দেখতে পান রুশপন্থী পারচামগণ তাঁকে মাইনাস করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। তিনি তাদের অনেককে বরখাস্ত করেন ও শাস্তি দেন। বামপন্থী খালক উপদলকে কাছে টানেন। কিন্তু অচিরেই দেখতে পান রুশ এজেন্ডা বাস্তবায়নকারীদের দ্বারা আফগানিস্তানের মঙ্গল সাধন সম্ভব নয়। কিন্তু বুঝতে পারলে কি হবে? ইতিমধ্যে চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনে রাশিয়া তৎপরতা শুরু করেছে। রুশ মধ্যস্থতায় পারচাম ও খালক উপদল একত্রিত হয়ে ১৯৭৮ সালের ২৭ এপ্রিল দাউদ খানকে সপরিবারে মাইনাস করে কর্নেল আসলাম ওয়াতানজার এবং এরপর রুশ তাবেদার নূর মোহাম্মদ তারাকি ক্ষমতা দখল করে। অব্যাহতভাবে চলতে থাকলো মাইনাস ফর্মুলার প্রয়োগ। নূর মোহাম্মদ তারাকিকে মাইনাস করে এলো হাফিজুল্লাহ আমিন, তাকে মাইনাস করে এলো বারবাক কারমাল, তাকে মাইনাস করায় এলো নজিবুল্লাহ ও দশ লক্ষ রুশ সৈন্য। আফগানিস্তান রুশ পদানত হলো তখন থেকে এখনো চলছে সংস্কার ও মাইনাসের নিষ্ঠুর খেলা। দেশ ও জনগণ এই নিষ্ঠুর খেলায় প্রতিনিয়ত মাইনাস হচ্ছে।

সিকিম

সিকিম অর্থ শান্তির উপত্যকা। সত্যিই ভারতীয় চক্রান্তের পূর্বে সিকিম ছিল শান্তির জনপদ। ধর্মরাজা চোগিয়ালের নেতৃত্বে জনগণ পরম সুখে বসবাস করতো। ব্রিটিশ শাসনের অবসানের পরও সিকিম স্বাধীন রাজ্য হিসেবে টিকে ছিল। কাশ্মির, হায়দরাবাদ, গোয়া, দমন, দিউসহ কয়েকশ' দেশীয় রাজ্য জোরপূর্বক দখল করার পর ভারত সিকিমের প্রতি নজর দেয়। ১৯৫০ সালে সিকিম ভারতের সাথে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা চুক্তি করতে বাধ্য হয়। সিকিম গ্রাসের লক্ষ্যে ভারত সে দেশের কিছু রাজনৈতিক নেতাকে ক্রয় করে। কাজী লেন্দুপ দর্জির নেতৃত্বাধীন 'সিকিম এস্টেট কংগ্রেস' ছিল ভারতীয় এজেন্ডা বাস্তবায়নে গঠিত রাজনৈতিক দল। সিকিমের সংসদীয় আসন সংখ্যা ছিল ১৮টি। ১৯৬৭ সালের সংসদ নির্বাচনে সিকিম

www.pathagar.com

ন্যাশনাল কংগ্রেস পায় ৮টি, সিকিম ন্যাশনাল পার্টি ৫টি, সিকিম এস্টেট কংগ্রেস পায় ১টি ও অন্যান্য দল পায় ৩টি আসন। নির্বাচনের এই ফলাফল ভারত মেনে নিতে পারেনি। ভারত সিকিমে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিতে ইন্ধন যোগায়। শুরু হয় দেশের ঐক্য ও স্বাধীনতার প্রতীক রাজা চোগিয়ালকে মাইনাস করার আন্দোলন। গণতন্ত্রের নামে ভারত দেশব্যাপী চোগিয়ালবিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। ১৯৭৪ সালের ২৩ এপ্রিল পুনরায় সিকিমে সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ইতিমধ্যে সিকিমের সংসদীয় আসন সংখ্যা ৩২-এ উন্নীত করা হয়। ভারতপন্থী কাজী লেন্দুপ দর্জির দল ৩২টি আসনের মধ্যে ৩১টি দখল করে। লেন্দুপ দর্জি সরকার গঠন করে। ১৯৭৫ সালের ১০ এপ্রিল জাতীয় পরিষদে আইন পাস করে চোগিয়াল পদ বিলুপ্ত করা হয় এবং ভারতের ২২তম অঙ্গরাজ্য হিসেবে সিকিমকে ভারত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এইভাবে মাইনাস চোগিয়াল ফর্মুলায় ভারত সিকিমকে গ্রাস করে।

নেপাল

অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের আধার, হিমালয় কন্যা নেপাল স্থলবেষ্টিত হওয়ায় ১৯৫০ সালেই ভারতের সাথে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা চুক্তি করতে বাধ্য হয়। উক্ত চুক্তির ১টি শর্ত ছিল নেপাল ৩য় কোনো দেশ থেকে সমরাস্ত্র ক্রয় করতে পারবে না। ১৯৮৯ সালে নেপাল চীন থেকে বিমান বিধ্বংসী অস্ত্র সংগ্রহের চেষ্টা করায় ভারত-নেপালের ১৫টি ট্রানজিট বন্ধ করে দেয়। নেপাল আপাতত মাথা নোয়ায়। কিন্তু নেপালের স্বাধীনচেতা রাজা বীরেন্দ্র ছিলেন নেপালের ঐক্য, সমৃদ্ধি ও স্বাধীনতার প্রতীক। তার শাসনে নেপাল উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করতে থাকে। শুরু হয় মাইনাস রাজা বীরেন্দ্র ফর্মুলার প্রয়োগ। ভারত নেপালে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠী লালন করতে থাকে। নেপালে রাজতন্ত্রবিরোধী আন্দোলন শুরু হয়। ভারত বান্ধব নেপালী কংগ্রেস ও মাওবাদী গেরিলাদেরকে যুগপৎভাবে ভারত সহায়তা শুরু করে। নেপালি কংগ্রেস সরকারও গঠন করে। ভারতের অব্যাহত চাপের মুখেও যখন রাজা বীরেন্দ্র আপোষহীন মনোভাব পোষণ করতে থাকেন তখনই তাকে সপরিবারে নৃশংসভাবে হত্যা করে মাইনাস করা হয়। রাজা হিসেবে বসানো হয় তার জ্ঞাতি ভাই জ্ঞানেন্দ্রকে। কিন্তু জ্ঞানেন্দ্র-বীরেন্দ্র হতে পারেননি, হওয়া সম্ভবও নয়। জনপ্রিয় রাজাকে হত্যা করে ক্ষমতা দখল করায় জনগণ তাকে ঘৃণা করে। তিনি ভারতের পুতুল রাজায় পরিণত হন। কিন্তু অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে– অযথা এই পুতুলকে লালন করতে আগ্রহী নয় ভারত। ইতিমধ্যে রাজার সব ক্ষমতা কেড়ে নেয়া হয়েছে, রাজকীয় গার্ড রেজিমেন্ট ভেঙে দেয়া হয়েছে, রাজার সকল স্থাবর সম্পত্তিও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। খুব শিগগিরই দেখা যাবে সিকিম স্টাইলে নেপালের ভারত ইউনিয়নে যোগদান পর্ব। ইতিমধ্যে নেপালের সচেতন জনগণের সম্মুখে ভারতের আসল উদ্দেশ্য পরিষ্কার হয়েছে। কিন্তু তখন কিছুই করার থাকবে

www.pathagar.com

না। কেননা জাতীয় ঐক্য ও স্বাধীনতার প্রতীক এখন আর নেই, মৌচাকের রানী নিহত। সুতরাং ভারতের গোলামী করা ছাড়া নেপালিদের বিকল্প কোনো পথ আর নেই।

মাইনাস ফর্মুলার আওতায় বাংলাদেশ

১৯৬৫ সালের ভারত পাকিস্তান যুদ্ধে ভারত নাজেহাল হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী সিআইএ ও কেজিবি'র আদলে Research & Analisis wing (Raw) নামক গোয়েন্দা সংস্থা গঠন করে এবং পাকিস্তান ভাঙার টার্গেট নিয়ে অগ্রসর হয়। 'র' বাংলাদেশে স্বীয় অসংখ্য এজেন্ট সৃষ্টি করে। দেশের প্রতিটি সেক্টরে তারা এক বা একাধিক পকেট সৃষ্টি করে তৎপরতা চালায়। তাদের তৎপরতায় এবং সিআইএ কর্তৃক আইয়ুব উৎখাত পরিকল্পনার ফলে দেশে অস্থিতিশীল পরিবেশের সৃষ্টি হয়। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক বাঙালিদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ, 'র'-সিআইএ কর্তৃক প্রজ্জ্বলিত আগুনে ঘি ঢালার কাজ সম্পন্ন করে। বিভিন্ন প্রকার ষড়যন্ত্রমূলক তৎপরতা, পাকিস্তানি, শাসকদের অদূরদর্শিতা ও ক্ষমতার লোভ 'র' পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। ২৫ মার্চ ১৯৭১ পাকিস্তানি সৈন্যরা ঢাকায় হামলা শুরু করার পর পাকিস্তানের ভাঙন চূড়ান্ত রূপ লাভ করে। তৎকালীন 'র' ডিরেক্টর সুব্রামানিয়াম স্বামী ৩০ মার্চ, ৭১, ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব ওয়ার্ল্ড এফেয়ার্স আয়োজিত সিম্পোজিয়ামে বলেন, 'যে বিষয়টি ভারতের উপলব্ধিতে আনতে হবে সেটা হলো– পাকিস্তানের ভাঙন আমাদের স্বার্থেই আসবে। এ জাতীয় সুযোগ আর কখনো আসবে না।' (সূত্র : "বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে 'র' এবং সিআইএ", লেখক- মাসুদুল হক পৃঃ ৬১)

ভারতের আকাঙ্ক্ষা ছিল, সম্মিলিত পাকিস্তানকে গিলে খাওয়া সম্ভব নয় তাই একে দু'টুকরো করে প্রথমে বাংলাদেশকে এবং পরে পাকিস্তানকে গিলে খাওয়ার পর্ব সমাধা করবে। কিন্তু ভারতের এ চিন্তা যে ভুলের উপর প্রতিষ্ঠিত ছল এবং আছে তা সম্ভবত ভারত এখনো উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়নি। আর এজন্যই ভারত বারবার আমাদেরকে গলাধকরণ করার লক্ষ্যে পদক্ষেপ নেয় আর ব্যর্থ হয়। ভারতের ভুল চিন্তা ও ভুল পদক্ষেপসমূহ সংক্ষেপে নিম্নরূপ–

১. ভারত বাংলাদেশের জনগণের রাজনৈতিক ইতিহাস আমলে নেয়নি। তারা মনে করেছিল পাকিস্তান থেকে আলাদা হয়ে গেলে ভেতো বাঙালি সহজেই তাদের খাদ্যে পরিণত হবে। ভারতীয় চিন্তাবিদগণ যদি নিদেনপক্ষে বিংশ শতাব্দী ও একবিংশ শতাব্দীর বাঙালি মুসলমানদের রাজনৈতিক কার্যকলাপ লক্ষ্য করেন তাহলে দেখতে পাবেন, বাংলাদেশ ভূখণ্ডের মানুষ সব সময় ভারতবর্ষের অন্যান্য জাতি অপেক্ষা বেশি রাজনৈতিক সচেতন ছিল এবং সম্ভবত বিশ্বের সবচেয়ে রাজনৈতিক সচেতন নাগরিক সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে

www.pathagar.com

বাংলাদেশকে চিহ্নিত করা ভুল হবে না। এর প্রমাণ নিম্নরূপ–

ক. ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের গঠন ও লালন করেছিল ইংরেজ সরকার আর পাকিস্তান সৃষ্টির রূপকার মুসলিম লীগ গঠিত হয়েছিল বাঙালিদের পরিকল্পনায়, এদেশবাসীর অর্থে ও শ্রমে। ঢাকার বুকে গঠিত মুসলিম লীগই ভারতকে দু'ভাগে ভাগ করেছে এবং নিজেদেরকে হিন্দু-ভারত থেকে আলাদা করেছে ও আলাদা রেখেছে। কারো আধিপত্যের কাছে নতিস্বীকার করা যদি এদেশেবাসীর স্বভাব হতো তবে এদেশবাসী ১৯৪৭ সালে ১০০০ মাইল দূরবর্তী পাকিস্তানের সাথে ঐক্যবদ্ধ হতো না এবং ১৯৭১ সালে বন্ধু ভারতের সাথে মিশে যেতো। আসলে ১৯৪৭ সালে সৃষ্ট পাকিস্তানের আত্মা যে বাংলাদেশে অবস্থিত তা বোধহয় ভারত এখনো অনুধাবন করতে পারেনি।

খ. আমাদের মহান নেতৃবৃন্দ বিপদে পড়ে, ১৯৭১ ও '৭২ সালে ৭ দফা গোলামী চুক্তি ও ২৫ দফা গোলামী চুক্তি সম্পাদন করলেও সময় সুযোগমতো উক্ত গোলামী চুক্তির শেকল ছুড়ে ফেলে দিতে সক্ষম হয়েছেন। উক্ত চুক্তি যে জবরদস্তিমূলক ছিল তার প্রমাণ স্বয়ং অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট সৈয়দ নজরুল ইসলাম, যিনি চুক্তি স্বাক্ষরের পরই মূর্ছা গিয়েছিলেন আর আমাদের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান বন্দীদশা থেকে ফিরে এসে তাৎক্ষণিকভাবে এদেশ থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার করতে বাধ্য করেন এবং ৭ দফা চুক্তি মোতাবেক এদেশে আগত ভারতীয় সিভিল অফিসারদেরকে বের করে দেন।

২. ভারত ১৯৭২-'৭৫ সালে এদেশে চরম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছিল। ভারতের আশা ছিল দুর্ভিক্ষ, গৃহযুদ্ধ ও ভূটান মডেল প্রয়োগ করে এদেশবাসীকে নিস্তেজ করে গলাধকরণ করবে। কিন্তু সিপাহী-জনতার অভ্যুত্থান ভারতের সে আশায় গুড়েবালি দিয়েছে।

৩. এরপর শুরু হলো দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনীকে ভাঙার অক্লান্ত চেষ্টা। ভারতীয় ইন্ধনে এদেশের সেনাবাহিনীতে অসংখ্য অভ্যুত্থান সংগঠিত হলো কিন্তু শেষ পর্যন্ত এদেশের সিপাহী জনতার নয়নমণি প্রেসিডেন্ট জিয়ার দক্ষ পরিচালনায় এদেশ আবার সম্মুখপানে এগিয়ে চলতে শুরু করলো। এরপর এলো মাইনাস ফর্মুলার প্রয়োগ। ভারতীয় চক্রান্তেই নিহত হলেন জিয়াউর রহমান।

৪. এরপর এলেন ভারতীয় আশীর্বাদপুষ্ট প্রেসিডেন্ট এরশাদ। তার আমলে এদেশের দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক দলসমূহকে বিপর্যস্ত করা হলো এবং ভারতপন্থী দলকে পুনরায় ক্ষমতারোহণের উপযুক্ত করে গড়ে তুললো। ভারতের আশা ছিল, সিকিম স্টাইলে এদেশের সংসদ গঠিত হবে এবং ভারত তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌছবে। কিন্তু ১৯৯১ সালের নির্বাচনের ফলাফলে দেখা

www.pathagar.com

গেলো ভারতের আশায় আবারো ছাই। ভারত বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করলো, এদেশের নেতৃবৃন্দ ভুল করলেও জনগণ ভোট দিতে ভুল করে না। সুতরাং সিকিম স্টাইল এখানে অচল।

৫. ১৯৯৬ সালে ভারতীয় সহায়তায় বাংলাদেশের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলো ভারতবান্ধব দল আওয়ামী লীগ। ভারতীয় ইচ্ছা বাস্তবায়িত হওয়া শুরু হলো। ভূটান মডেল প্রয়োগ করে এদেশের প্রতিরোধ শক্তিকে দুর্বল করা হলো। ভারতের আশা ছিল ২০০১ সালে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে আওয়ামী লীগ পুনরায় ক্ষমতাসীন হলে এদেশের গ্যাস সম্পদ, ট্রানজিট, সমুদ্রবন্দরসহ সকল সুবিধা ভারতের হাতের মুঠোয় এসে যাবে। কিন্তু ২০০১ সালের নির্বাচনের ফলাফলে দেখা গেলো এদেশের রাজনৈতিক সচেতন জনগণ ভারতবান্ধব দলসমূহের জোটকে প্রত্যাখ্যান করেছে। পুনরায় ক্ষমতাসীন হয়েছে মুসলিম লীগ মার্কা বিএনপির নেতৃত্বাধীন ৪ দলীয় জোট।

৬. ভারত বার বার এদেশকে গ্রাস করতে ব্যর্থ হয়ে ১৭৫৭ সালের ন্যায় ইউরোপীয় শক্তিকে দলে ভেড়ায় এবং চরম মুসলিম বিদ্বেষী ইসরাইল ও ইসরাইলের তল্পিবাহক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে আঁতাত করে এদেশকে ইরাক, আফগানিস্তান ও সোমালিয়ার ন্যায় অকার্যকর রাষ্ট্র বানানোর প্রচেষ্টা শুরু করে। প্রথমে চেষ্টা করা হয় ৪ দলীয় জোটকে ভাঙার, তৎপর এদেশকে মৌলবাদী রাষ্ট্র প্রমাণের চেষ্টা, জোট সরকারের সাথে তালেবান-আল-কায়েদার যোগসূত্র রয়েছে প্রমাণের চেষ্টা। সকল চেষ্টা বুমেরাং হওয়ার পর চূড়ান্ত খেলায় নামে ভারত। এদেশের সাংবিধানিক পদের বিরুদ্ধে আন্দোলন, সংবিধানের বিরুদ্ধে আন্দোলন, সর্বোচ্চ বিচারালয়ে হামলার মাধ্যমে সংবিধানকে পদদলিত করার ব্যবস্থাসহ যাবতীয় দেশবিরোধী আন্দোলন পরিচালিত হয় ভারতের নির্দেশে। দেশে চরম অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয়।

৭. সর্বশেষে ভারত, ইইউ, যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইলের সম্মিলিত প্রয়াসে ২০০৭ সালের নির্বাচন বানচালের ব্যবস্থা করা হয় এবং উক্ত চার শক্তির সক্রিয় সহযোগিতায় সাংবিধানিক তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে অকার্যকর করে এদেশে অসাংবিধানিক সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠা করা হয়। শক্তি চুতষ্টয়ের আশা ছিল সাম্রাজ্যবাদ বান্ধব ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী রাজনৈতিক সরকারের আমলে যেসকল কাঙ্ক্ষিত সুবিধা লাভ করা সম্ভব হয়নি তা হয়তো অসাংবিধানিক সরকারের আমলে হাসিল করা সম্ভব হবে। কিন্তু অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এবারো বাংলাদেশ চ্যাপ্টারে ফেল করবে। কেননা ইতিমধ্যে বহুল আলোচিত গভীর সমুদ্র বন্দর প্রকল্প, টাটাকে গ্যাস প্রদান প্রকল্প, রেল যোগাযোগ প্রকল্প, ট্রানজিট প্রকল্পের স্লোগান আর শোনা

www.pathagar.com

যাচ্ছে না। বর্তমান সরকারের সতর্ক উপদেষ্টাগণ এবং দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনী ইতিমধ্যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আসল মতলব বুঝে ফেলেছেন বলে মনে হয়।

আগ্রাসী শক্তির পরবর্তী পদক্ষেপ কি হতে পারে?

অভীষ্ট লক্ষ অর্জনে ব্যর্থ হয়ে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।

১. সেনাবাহিনী ও জনগণকে এবং বর্তমান সরকার ও জনগণকে মুখোমুখি করে সংঘর্ষে লিপ্ত করাতে পারে। যাতে সিপাহী-জনতা ভাই ভাইয়ের পরিবর্তে পরস্পর পরস্পরের শত্রুতে পরিণত হয়। এমতাবস্থায় দেশের ঐক্য শৃঙ্খলা নষ্ট হবে এবং আতঙ্কিত শাসক সম্প্রদায় নিজেদের নিরাপত্তা খোঁজ করবে সাম্রাজ্যবাদের পক্ষপুটে আশ্রয় নিয়ে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তার টার্গেট দেশকে পদানত করতে সব সময় জনগণ ও শাসক সম্প্রদায়কে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। ভীতসন্ত্রস্ত শাসক সম্প্রদায় নিজেদের রক্ষায় সাম্রাজ্যবাদের পুতুলে পরিণত হয় এবং সাম্রাজ্যবাদের এজেন্ডা বাস্তবায়নে গণনির্যাতন শুরু করে। ২০-২২ আগস্টে সংঘটিত ঘটনা এরূপ একটি সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত বলে আমি মনে করি। সময়োচিত সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে আমরা এ যাত্রা বেঁচে গেছি। তবে এরূপ ঘটনা আগামীতেও ঘটতে পারে। আর যদি ঘটে তবে তা হবে আরো শক্তিশালী ও সর্বনাশা। এজন্য প্রত্যেক দেশপ্রেমিক নাগরিককে মনে রাখতে হবে, আমাদের শত্রুরা যা চায় আমরা তা কখনো হতে দেবো না।

২. **সেনাবাহিনীতে অস্থিরতা সৃষ্টি**

নিকট অতীতে আমরা দেখেছি, ১৯৭৫-৮১ সময়কালে বাংলাদেশে 'র'-সিআইএ পরিচালিত অসংখ্য সেনা অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়েছে এবং সেনাবাহিনী দুর্বল হয়েছে। এমতাবস্থায় সকল পক্ষের কর্তব্য হবে এ বিষয়ে সজাগ ও সতর্ক থাকা এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কোনো অজুহাত বা কারণ সৃষ্টি না করা।

৩. **গুপ্ত হত্যা ও নাশকতা**

কোনো প্রকাশ্য অপকর্ম করার সুযোগ না থাকলে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদেরকে হত্যা পরিকল্পনা গ্রহণ এবং দেশে বোমাবাজি ও নাশকতা সৃষ্টির অপচেষ্টা চালায়। এরূপ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে আমাদের গোয়েন্দা সংস্থা ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে আরো সজাগ ও শক্তিশালী করতে হবে। দুর্নীতিবাজ নির্মূলের নামে রাজনীতি নির্মূলের সর্বনাশা খেলা বন্ধ করতে হবে।

www.pathagar.com

৪. **দুর্ভিক্ষাবস্থা সৃষ্টি করা**

দেশী-বিদেশী চক্রান্তের মাধ্যমে এদেশের অর্থনীতিকে পর্যায়ক্রমে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেওয়ার প্রচেষ্টা চালানো হবে। জনগণ যদি দুর্ভিক্ষে পতিত হয় তবে কোনো আইনই গণরোষকে দমনে সক্ষম হবে না। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ইতিমধ্যে এদেশের অর্থনীতির অনেক ক্ষতি করেছে। এ অবস্থা থেকে রক্ষা পেতে জনগণের উপর আস্থা স্থাপন করতে হবে এবং বিশ্বব্যাংক-আইএমএফ ও এডিবি'র মতো রক্তশোষক সংস্থা থেকে দূরে থাকতে হবে। বর্তমান শাসক সম্প্রদায় নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন চলমান ভয়াবহ বন্যায় মুসলিম বিশ্ব ও আইডিবি'র সাহায্যের সাথে সাম্রাজ্যবাদী দেশ ও সংস্থার সাহায্যের পরিমাণের তারতম্য কিরূপ। মনে রাখতে হবে, সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হলো সুদখোর অত্যাচারী মহাজন, আর আমরা হলাম ঋণগ্রহীতা গিনিপিগ। একবার ঋণের জালে আটকাতে পারলে ভিটেছাড়া করতে দ্বিধা করবে না।

৫. **দেশের অভ্যন্তরে ও সীমান্তে সংঘর্ষাবস্থা সৃষ্টি করা**

অতীতের সকল সরকারের অসচেতনতা ও অবহেলার কারণে বর্তমান বাংলাদেশ সাম্রাজ্যবাদী এজেন্টদের অভয়ারণ্যে পরিণত হয়েছে। প্রায় প্রতিটি সেক্টরে সাম্রাজ্যবাদ নিজেদের পকেট স্থাপনে সক্ষম হয়েছে। তদুপরি শান্তি বাহিনী, বঙ্গসেনা, জেএমবি ও হরকাতুল জেহাদ জাতীয় সংগঠনসমূহের আশ্রয়, ট্রেনিং, অর্থ, অস্ত্র সবই যোগান দেয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। এমতাবস্থায় সাম্রাজ্যবাদী এজেন্ডা বাস্তবায়নে সরকারকে রাজি করাতে তারা উক্ত গোষ্ঠীসমূহের মাধ্যমে এদেশের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে পারে এবং সীমান্তে যুদ্ধাবস্থা সৃষ্টির মাধ্যমে স্বীয় লক্ষ্য হাসিলের প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে পারে। এমতাবস্থায় বর্তমান সরকারকে আরো গণমুখী হতে হবে এবং সত্যিকারের দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক নেতাদের সক্রিয় সহযোগিতা গ্রহণের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

আমি মাইনাস ফর্মুলার বিপক্ষে

পৃথিবীর যে সকল দেশ অস্বাভাবিক মাইনাস ফর্মুলা থেকে মুক্ত সেসব দেশ বর্তমানে সবচেয়ে উন্নত ও সমৃদ্ধশালী হয়েছে। গণতন্ত্র যেখানে চালু থাকে সেখানে কাউকে প্লাস করবে বা মাইনাস করবে সে দেশের জন রায়। দেশী-বিদেশী অপর কোনো শক্তির মাইনাস করার অধিকার নেই। আপনি আমেরিকার দিকে দেখুন। বিগত ২২৫ বছরের ইতিহাসে সে দেশের অনেক প্রেসিডেন্ট দায়িত্ব পালন করেছেন, অনেকেই অনেক প্রকার অপকর্ম ও দুর্নীতি করেছেন কিন্তু অন্য কোনো সংস্থা নিজেদের গণ্ডি পেরিয়ে উক্ত দুর্নীতিবাজ প্রেসিডেন্টকে মাইনাস করার কথা কল্পনাও করেনি। বর্তমান প্রেসিডেন্ট বুশের কথা ভাবুন। তিনি প্রবল প্রতাপশালী

www.pathagar.com

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কতো ক্ষতিই না করেছেন। তার অপকর্ম, একগুঁয়েমি, দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৈশ্বিক মর্যাদা, অর্থনীতি ও সামাজিক নিরাপত্তাকে বিপন্নপ্রায় করেছে, তবুও শক্তিশালী মার্কিন সেনাবাহিনী রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করেনি। জনগনই আগামী নির্বাচনে বুশের রাষ্ট্রঘাতী কার্যকলাপের জবাব দেবে বলে আমার বিশ্বাস। এতে আমরা যে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি তা হলো স্বাভাবিক নিয়মে গণরায়ের মাধ্যমে প্লাস-মাইনাস করলে দেশের স্থিতিশীলতা অক্ষুণ্ন থাকে, দেশ কোনো নেতার কারণে সাময়িক পিছিয়ে পড়লেও পরবর্তী নেতা দেশকে আবার সম্মুখপানে এগিয়ে নিয়ে যান।

ব্রিটেনের কথা ভাবুন, জাতিসংঘের ৫ স্থায়ী সদস্যের একটি ব্রিটিন। ২য় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্য ছিল ব্রিটেনের। সেই ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার এতোই ব্যক্তিত্বহীন ছিল যে, তাকে বিশ্ববাসী প্রেসিডেন্ট বুশের কাউবয় হিসেবে ডাকতো। এরপরও অস্বাভাবিক কোনো নিয়মে টনি ব্লেয়ারকে মাইনাস করা হয়নি। আপনি যদি বলেন ব্রিটেনের রাজনীতিকরা আমাদের রাজনীতিকদের চেয়ে ভালো তবে পরিসংখ্যান বা জনমত জরিপ কিন্তু তা বলে না। বিশ্বখ্যাত রিডার্স ডাইজেস্ট পত্রিকার জরিপে উল্লেখ করা হয়েছে 'বিশ্বাসযোগ্যতার ক্ষেত্রে ব্রিটেনবাসীর দৃষ্টিতে সবচেয়ে বিশ্বস্ত দমকল বাহিনীর কর্মী, যাদের বিশ্বাসযোগ্যতা ৯৭%, আর রাজনীতিকদের বিশ্বাসযোগ্যতা সর্বনিম্ন, অর্থাৎ মাত্র ৭%। (সূত্র : পিটিআই সূত্রে দৈনিক সংগ্রাম ১০.০৫.০৭) এতদসত্ত্বেও ব্রিটেনবাসী অস্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় কোনো রাজনীতিককে মাইনাস করার কোনো প্রক্রিয়া কখনো গ্রহণ করেনি। এজন্যই ব্রিটেন এখনো বিশ্বশক্তি হিসেবে টিকে আছে।

প্রতিবেশী ভারতের কথা ভাবুন। জওহরলাল নেহরু থেকে মনমোহন সিং পর্যন্ত একজন প্রধানমন্ত্রীও আপনি পাবেন না যিনি ধোয়া তুলসী পাতা ছিলেন। এদের মধ্যে কেউ ছিলেন চরিত্রহীন, কেউ ছিলেন দুর্নীতিবাজ আবার কারো নিকট সকল প্রকারের দোষ বর্তমান ছিল। এদের কেউ ভারতকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন, আর কেউ পেছনের দিকে নিয়ে গেছেন কিন্তু জনগণই এদেরকে স্বাভাবিক নিয়মে প্লাস-মাইনাস করেছেন, অন্য কোনো সংস্থা নয়। এজন্যই ভারত এগিয়ে যাচ্ছে এবং বিশ্বশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে। পক্ষান্তরে একই সাথে স্বাধীন হওয়া পাকিস্তানের কথা ভাবুন। কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর ইন্তেকালের পর থেকে শুরু হয়েছে প্লাস-মাইনাসের অন্তহীন খেলা যেটা আমরা ইতিপূর্বে আফগানিস্তানে লক্ষ করেছি। উক্ত অস্বাভাবিক প্লাস-মাইনাসের পেছনে কিন্তু জনরায়ের প্রতিফলন ছিল না। সে প্লাস-মাইনাসের মূল কারণ ছিল বিদেশী শক্তির চক্রান্ত এবং দাবার ঘুঁটি ছিল ক্ষমতালিপ্সু সেনানায়কগণ। পাকিস্তানের বর্তমান অবস্থা দেখুন। নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফকে জোরপূর্বক সরিয়ে সেনাপ্রধান জেনারেল পারভেজ মুশাররফ ক্ষমতাসীন হয়ে পাকিস্তানকে ধ্বংসের

www.pathagar.com

চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে গেছেন। পাকিস্তানের শান্তি-স্থিতিশীলতা, সমৃদ্ধি এখন বিপন্ন। **বিপর্যয়ের সর্বশেষ সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আছে পাকিস্তান। দীর্ঘ সেনাশাসন পাকিস্তানের জাতীয় নিরাপত্তাকে করেছে বিপন্ন। জনরোষ থেকে বাঁচতে মুশাররফকে ইহুদি-মার্কিন লবির খেলনা পুতুলে পরিণত হতে হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করতে গিয়ে তিনি নিজেও বন্দীপ্রায় জীবনযাপন করছেন এবং দেশকে গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে দিয়েছেন। সকল প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তাকে ফিলিপাইনের প্রেসিডেন্ট ফার্ডিনান্ড মার্কোস অথবা ইরানের সেনাশাসক রেজা শাহ পাহলভির ভাগ্যবরণ করতে হবে অথবা আরো করুণ কোনো পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে। একবার ভেবে দেখুন, ১৯৪৭ সালে একই সময়ে জন্ম নেয়া দু'টি দেশের মধ্যে একটি অস্বাভাবিক মাইনাস ফর্মুলা অনুসরণ না করে বিশ্বশক্তিতে পরিণত হয়েছে, আর অপরটি অস্বাভাবিক মাইনাস ফর্মুলার ঘূর্ণিপাকে পতিত হয়ে মৃত্যুর প্রহর গুণছে।**

এ বিষয়ে আরো অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু বুদ্ধিমানদের জন্য এটুকুই যথেষ্ট বলে আমি মনে করি। আমার উপরোক্ত বক্তব্যের আলোকে কেউ হয়তো বলবেন, আমেরিকা, ব্রিটেন বা ভারতের রাজনৈতিক দলগুলো জ্বালাও-পোড়াও-ধর্মঘট করে দেশকে অচল করে না। পক্ষান্তরে বাংলাদেশের রাজনীতিকরা এরূপ অপকর্মে লিপ্ত থাকে। এ প্রশ্নের উত্তরে আমি বলবো, সাম্রাজ্যবাদীরা সব সময় তার টার্গেটকৃত দেশকে হীনবল করার জন্য সংশ্লিষ্ট দেশে তাদের পোষা এজেন্টদের মাধ্যমে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে এটাই তাদের আধুনিক রণকৌশল। আমরা যারা দেশের ঐক্য-সংহতি, সমৃদ্ধি ও স্বাধীনতাকে অটুট রাখতে চাই তাদের দায়িত্ব হলো সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দেশীয় এজেন্টদেরকে নিহ্নিত করে কঠোর বিচারের সম্মুখীন করা এবং সাম্রাজ্যবাদ সৃষ্ট বিশৃঙ্খলা কঠোরহস্তে দমন করা।

কিন্তু ২০০৭ সালের শুরুতে আমরা দেখলাম, একটি জোট দেশকে সাংবিধানিক পথে এগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে আর অপর একটি জোট দেশকে সংবিধানচ্যুত করার জন্য দেশব্যাপী জ্বালাও-পোড়াও, ধর্মঘট, নাশকতা চালাচ্ছে। আমাদের দেশরক্ষা বাহিনী ও অন্যান্য বাহিনী নিরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে। যারা আমার এই বক্তব্যের বিরোধিতা করবেন তাদের নিকট আমার জিজ্ঞাসা হলো ২৮ অক্টোবর থেকে ১০ জানুয়ারি পর্যন্ত এ দেশে প্রেসিডেন্ট ও সেনাপ্রধান যারা ছিলেন ১১ জানুয়ারি থেকে অদ্যাবধি উক্ত দুই ব্যক্তিত্ব একই পদে বহাল রয়েছেন। ১০ জানুয়ারি পর্যন্ত বিশৃঙ্খলা দমন করা গেলো না। অথচ ১১ জানুয়ারি থেকে হঠাৎ করে বিশৃঙ্খলা বন্ধ করার শক্তি কোত্থেকে এলো? ২০-২০ আগস্টের সহিংসতা যেভাবে দমন করা হয়েছে সেভাবে ২৮ অক্টোবর থেকে ১০ জানুয়ারির সহিংসতাও দমন করা অসম্ভব ছিল না। সুতরাং উক্ত বিশৃঙ্খলা সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনার অংশ কিনা পাঠক মহল ভেবে দেখবেন।

www.pathagar.com

মাইনাস ফর্মুলা আগ্রাসী শক্তির এজেন্ডা

ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি আফগানিস্তান দখল করার জন্যই আফগান বাদশাহ আমানুল্লাহকে মাইনাস করা হয়েছিল, মহীশূর দখল করার জন্য টিপু সুলতানকে মাইনাস করা হয়েছিল, বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা দখল করার জন্য নবাব সিরাজকে মাইনাস করা হয়েছিল, সিকিম দখল করার জন্য রাজা চোগিয়ালকে মাইনাস করা হয়েছিল এবং নেপাল দখল করার জন্য রাজা বীরেন্দ্রকে মাইনাস করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ দখলের লক্ষ্যে বাংলাদেশের দুই নেত্রীকে মাইনাস করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত দুই নেত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশের সর্বস্তরের জনগণ ঐক্যবদ্ধ আছে। এমতাবস্থায় উক্ত দুই নেত্রীকে মাইনাস করা হলে ঐক্যের প্রধান দুইটি সূত্রকে কর্তন করা হবে। এমতাবস্থায় অসংখ্য ছোট ছোট নেতার আবির্ভাব ঘটবে। উক্ত ছোট নেতাদেরকে উদরস্থ করা বা তল্পিবাহক করা সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষে সহজ হবে। এজন্য সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের টার্গেটকৃত দেশকে দুর্বল নেতৃত্বের হাতে তুলে দিতে চায় এবং উক্ত দুর্বল নেতৃত্বের মাধ্যমেই নিজেদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করতে চায়। এজন্য আমি দৃঢ়ভাবে বলতে চাই, সাম্রাজ্যবাদীদের চাওয়া ও আমাদের চাওয়া কখনো এক হতে পারে না। অর্থাৎ আমাদের শত্রুরা যা চাইবে আমরা কখনো তাদেরকে তা দেবো না, দিতে পারি না।

সাম্রাজ্যবাদী এজেন্টদের চিহ্নিত করার এখনি সময়

ইতিমধ্যে আমরা বিভিন্ন দলে ও গোষ্ঠীতে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে থাকা সাম্রাজ্যবাদী এজেন্টদের প্রায় প্রত্যেকের চেহারা মোবারক দেখতে সক্ষম হয়েছি। মূলত সাম্রাজ্যবাদী এজেন্ডা বাস্তবায়নের শ্লোগান যাদের মুখ থেকে উচ্চারিত হচ্ছে তাদেরকে জনগণ ইতিমধ্যে চিনে ফেলেছে। সময় হলে এদেশের রাজনীতি সচেতন জনতা কড়ায়-গণ্ডায় তাদের পাওনা পরিশোধ করতে ভুল করবে না। এদেশের জনগণ অতীতেও জেনে-বুঝে কখনো ভুল করেনি।

প্রিয় দেশবাসী,

বিশ্বের সকল সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এবং ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারত মুসলিম বিশ্বের প্রতিটি দেশে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি ও সর্বনাশ সাধনে তৎপর রয়েছে। কেননা তারা তাদের দূরদৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছে, আগামী দিনের বিশ্বশক্তি হবে মুসলিম বিশ্ব। এজন্য পৃথিবীর প্রতিটি মুসলিম দেশে তারা একদল ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী সৃষ্টি করেছে এবং তাদের মাধ্যমে নিজেদের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করছে। অথচ একটু লক্ষ করলে দেখবেন, জন্মসূত্রে যে মুসলিম সেই সাম্রাজ্যবাদীদের টার্গেট। উদাহরণস্বরূপ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী হওয়া সত্ত্বেও তারা ইয়াসির আরাফাতকে কার্যত গৃহবন্দী করে রেখেছিল, সাদ্দাম হোসেনকে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়েছিল। সুতরাং, আমাদের মনে রাখতে হবে, সাম্রাজ্যবাদীরা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের হাত ধরে মুসলিম

www.pathagar.com

বিশ্বে অনুপ্রবেশ করার পর কাউকে রেহাই দেবে না। কেননা তারা চায় আমাদের সম্পদ ও ভূখণ্ড, আমাদেরকে নয়। আর একবার ইরাকের দিকে চোখ ফিরান। তবে দেখবেন, সেখানে সাম্রাজ্যবাদী মিসাইল ধার্মিক-অধার্মিক আর ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী নির্বিশেষে সবাইকে নৃশংসভাবে হত্যা করছে।

আমাদের করণীয়

দেশপ্রেমিক বন্ধুগণ,

আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির এখন চরম সংকটকাল। আমাদের দেশ বর্তমানে সংবিধানচ্যুত হয়েছে। সেনাপ্রধানের ভাষায় দেশনামক ট্রেনটি এখন লাইনচ্যুত হয়েছে। একে টেনে আবার লাইনে তুলে সম্মুখপানে এগিয়ে যেতে হবে। কার দোষে ট্রেন লাইনচ্যুত হয়েছে সে বিতর্কের সময় এখন নয়। এখন সময় কিভাবে সম্মিলিতভাবে দেশকে দ্রুত সংবিধান মোতাবেক লাইনে আনার।

ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, সচেতনভাবে হোক, অসচেতনতার কারণে হোক, নিজেদের দোষে হোক, সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তে হোক আমরা ওয়ান-ইলেভেনের মাধ্যমে বর্তমানে সাম্রাজ্যবাদের কঠিন জালে আটকা পড়েছি। সুতরাং, এখন বিতর্ক না করে আমাদের উচিত দল-মত-ধর্ম-বর্ণ-গোষ্ঠী নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আটকেপড়া অবস্থা থেকে মুক্ত হওয়া। কোনো একক দল, সংস্থা বা শক্তির সাধ্য নেই এই জাল ছিঁড়ে দেশকে মুক্ত করার। এমতাবস্থায় আমরা সকল মান-অভিমান ভুলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের মোকাবেলা করতে হবে, আমাদের প্রিয় দেশকে সাম্রাজ্যবাদী শৃঙ্খলমুক্ত করতে হবে। এ লক্ষ্য অর্জনে আমার প্রস্তাবনা নিম্নরূপ–

১. দেশপ্রেমিক রাজনীতিক, বুদ্ধিজীবী, অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা ও অবসরপ্রাপ্ত সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তা সমন্বয়ে একটি 'জাতীয় সংহতি ও সমন্বয় কমিটি' গঠন করা।
২. বর্তমান সরকার ও সেনাবাহিনীর সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা ও মতবিনিময় করা।
৩. সরকারের কার্যক্রম ও জনআকাঙ্ক্ষার মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং দ্রুত সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানে সহায়তা করা।
৪. সরকারের ইতিবাচক কাজে সহায়তা করা এবং নেতিবাচক কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য সরকারকে পরামর্শ প্রদান।
৫. দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিরোধী ব্যক্তি-গোষ্ঠী চিহ্নিত করা ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।
৬. দেশের স্বার্থবিরোধী প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াকে বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে মোকাবিলা করা।

www.pathagar.com

৭. বর্তমান বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শক্তিসমূহের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করা।

৮. ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেওয়ার লক্ষ্যে অতীত ঘটনাবলির উপর আলোচনা অনুষ্ঠান, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, টকশোর ব্যবস্থা করা ও জাতিকে সচেতন করা।

৯. দুর্নীতিমুক্ত করতে গিয়ে দেশ যেন রাজনীতি মুক্ত না হয় তার প্রতি লক্ষ্য রাখা।

নিজের কথা অনেক বললাম। প্রবন্ধের উপসংহারে সাম্রাজ্যবাদী ফাঁসির কাষ্ঠে জীবনদানকারী ইরাকের বীর প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের জীবনের সর্বশেষ সাক্ষাতকারের কিছু অংশ উল্লেখ করছি। বাগদাদ পতনের কিছুদিন পূর্বে প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন একজন জার্মান সাংবাদিককে সাক্ষাতকারটি প্রদান করেছিলেন। (দুঃখিত, নামটি এখন মনে পড়ছে না, তবে সাদ্দামের বাণীটি আমি পত্রিকান্তরে দেখে নোট করে রেখেছিলাম) উক্ত সাক্ষাতকারে তিনি বলেছিলেন–

"ভিনদেশে কারো ভাগ্য নির্ধারিত হয় না। আমরা আল্লাহকে বিশ্বাস করি এবং আল্লাহই ভাগ্য নির্ধারণে করেন। একটি দেশ যতো শক্তিশালী হোক, যতো ক্ষমতাবান হোক, তারা অন্য দেশের মানুষের অভিপ্রায় বদলাতে বা ধ্বংস করতে পারে না। আমি যেখানে আছি সেখান থেকে আমাদের স্বাধীনতা রক্ষা করবো। আমাদের জনগণ, তাদের স্বাধীনতা, ধর্ম, মর্যাদা এবং দেশকে রক্ষা করবে। আমাদের জনগণ তাদের বিশ্বাস ও অভিপ্রায় অনুযায়ী আমাদের নিজস্ব পন্থায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।"

ঢাকা, ০৭.০৯.২০০৭

www.pathagar.com

অশান্ত কাশ্মীর—নীরব বিশ্ব বিবেক

কাশ্মীর সমস্যা ও ফিলিস্তিন সমস্যার ধরন প্রায় একই রকমের। কাশ্মীরি মুসলমানগণ যথাক্রমে শিখ, ইংরেজ ও হিন্দু শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক নির্যাতিত, নিপীড়িত হচ্ছেন ১৮১৯ সাল থেকে, যখন পাঞ্জাবের শিখ রাজা রণবীর সিং কাশ্মীর দখল করে নেয়। অপরদিকে ফিলিস্তিনিরা নির্যাতিত হচ্ছেন ১৯১৭ সাল থেকে। অর্থাৎ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে। উভয়ের ধরন এক হওয়ার মর্ম এই যে, কাশ্মীরের মুসলমানরা ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের সাথে যোগ দেওয়ার সুযোগ পেয়েও যোগ না দিয়ে বর্তমানে করুণ পরিণতি ভোগ করছে। অপরদিকে ফিলিস্তিনি জনগণ স্বীয় মুসলিম ভাই তুর্কীদেরকে সহযোগিতা না করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইউরোপীয় খ্রিস্টানদেরকে বিশ্বাস করে ইউরোপীয় সেনাবাহিনীকে নিজ দেশে ডেকে এনে আগুনের টুপি মাথায় পরেছে। কাশ্মীরিরাও ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের সাথে একাত্ম না হয়ে ভারতীয় বাহিনীকে নিজ দেশে স্বাগত জানিয়ে অদ্যাবধি আগুনের টুপি মাথায় ধারণ করতে বাধ্য হচ্ছেন। উভয় ক্ষেত্রেই সেক্যুলার মুসলমান নামধারী ব্যক্তিরাই শুধুমাত্র ক্ষমতার লোভে বিজাতীয়দেরকে নিজ দেশে ডেকে এনে খাল কেটে কুমির এনেছে এবং বর্তমানে কুমিরের ছোবলে আহত-নিহত ও পঙ্গু হচ্ছে। সমগ্র মুসলিম বিশ্বের বর্তমান দুরবস্থার কারণ হলো– নিজ ধর্ম ও জাতিকে বাদ দিয়ে পাশ্চাত্যকে অনুসরণ করা ও বিজাতীয়দের বন্ধুত্বের ফাঁদে পা দেয়া বা বিজাতীয়দেরকে বন্ধু মনে করা। কাশ্মীরের রক্তক্ষয়ী ইতিহাসেও আমরা একই চিত্র দেখতে পাই।

ইতিহাস : কাশ্মীরে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন সীমান্ত প্রদেশের আমীর শাহ মীর্জা ১৩৩১ খ্রিস্টাব্দ থেকে। এর পূর্বে হিন্দু রাজার অধীনে কাশ্মীর শাসিত হতো। ১৩৪৬ সালে শাহ মীর্জা শামসুদ্দীন শাহ নাম ধারণ করেন এবং কাশ্মীরের স্বাধীন শাসক হিসেবে তিনি এবং তার বংশ ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কাশ্মীর শাসন করেন। এ বংশের অন্য দু'জন বিখ্যাত শাসক ছিলেন যথাক্রমে সিকান্দার শাহ ও তৎপুত্র জয়নুল আবেদীন শাহ। সিকান্দার শাহ কাশ্মীরে ইসলাম ও মুসলমানদের দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তৈমুর লংয়ের পারস্য, ইরাক ও সিরিয়া অভিযানের সময় বাস্তুচ্যুত অসংখ্য জ্ঞানী-গুণী মুসলমানদেরকে কাশ্মীরে পুনর্বাসিত করেন। অপরদিকে জয়নুল আবেদীন কাশ্মীরে ব্রাহ্মণদেরকে পুনর্বাসিত করেন। জিজিয়া

www.pathagar.com

কর রহিত করেন এবং বহু আরবি ও ফার্সি গ্রন্থ স্থানীয় ভাষায় অনুবাদ করান। ফার্সি ভাষায় মহাভারত ও রাজতরঙ্গিনী অনুবাদ করান। ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দ সম্রাট হুমায়ুনের আত্মীয় ও সেনাপতি মীর্জা হায়দার কাশ্মীর দখল করেন। সম্রাট আকবরের সময় থেকে কাশ্মীর সরাসরি মোগল শাসনাধীন হয়। সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর দিল্লির কেন্দ্রীয় সরকার দুর্বল হলে কাশ্মীরিরা স্বাধীন হয়ে যায় এবং ১৭৫৮ সাল থেকে ১৮১৯ সাল পর্যন্ত আহমদ শাহ্ আবদালীর প্রতিনিধি ও কাবুলের প্রতিনিধি দ্বারা কাশ্মীর শাসিত হতো। ব্রিটিশ শাসনের শুরুতে ১৮১৯ সালে কাশ্মীর পাঞ্জাবের শিখ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবিস্তারের সময় শিখ রাষ্ট্র পাঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশকে ভারতভুক্ত করাকালীন কাশ্মীরকে রাজপুত দলপতি গোলাব সিং ডোগরার নিকট ৮০ লাখ টাকার বিনিময়ে বিক্রয় করা হয় ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি শিখদের নিকট থেকে পাঞ্জাব অধিকার করার সময় উক্ত গোলাব সিং গোপনে ইংরেজদের সাহায্য করার পুরস্কার হিসেবে ডোগরার নিকট কাশ্মীর বিক্রয় করা হয়। এ ব্যাপারে যে চুক্তি হয় তার নাম অমৃতসর সন্ধি। এর ফলে কাশ্মীরবাসীদের ওপর নেমে আসে অবর্ণনীয় জুলুম-নিপীড়ন। ভারতের তৎকালীন গভর্নর জেনারেল লর্ড লরেন্স পরবর্তীতে আক্ষেপ করে লিখেছেন– by a questionable stroke of policy which had been arranged before hand and which has brought woes innumerable on the happy Kashmiries ever since, we handed it over to the Dogra Rajput, Gulab Sing, who paid up down at once in the hard cash which he had stolen from the Lahore darbar. (Un security council official records, Third year, Nos. 1-15, P. 337)

লর্ড লরেন্সের স্বীকারোক্তিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি কত অনৈতিকভাবে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী ভারতে রাজ্য বিস্তার করেছে এবং অর্থ উপার্জনই ছিল তাদের মূল লক্ষ্য। অপরদিকে দেশীয় বিশ্বাসঘাতক ডোগরা পাঞ্জাবে ব্রিটিশ অভিযানের সময় লাহোর দরবার থেকে চুরি করা অর্থে কাশ্মীর ক্রয় করেছিল।

কাশ্মীর ভারতভুক্তিকরণে গান্ধীর ভূমিকা

ভারত বিভাগের প্রাক্কালে গৃহীত Indian Independence Act. 1947 অনুযায়ী দেশীয় রাজ্যসমূহকে স্বেচ্ছায় ভারত বা পাকিস্তানে যোগদানের অথবা স্বাধীন থাকার বিধান করা হয়। এমতাবস্থায় কাশ্মীরের তৎকালীন মহারাজা হরিকিষেণ সিং সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছিলেন। তার প্রধানমন্ত্রী কাশ্মীরি পণ্ডিত মি. রামচন্দ্র কাক মহারাজাকে পাকিস্তানের সাথে যোগ দেওয়ার পরামর্শ দেন। এমতাবস্থায় তথাকথিত অহিংসার পূজারী মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী সশরীরে কাশ্মীর গিয়ে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে এ উদ্যোগ ভণ্ডুল করে দেন পাঞ্জাবের কাংড়া এলাকার মেয়ে

www.pathagar.com

মহারানীর মাধ্যমে। মহারানীর চাপে মি. কাককে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে অপসারণ করে পাঞ্জাবের অধিবাসী বিচারপতি মেহেরচাঁদ মহাজনকে প্রধানমন্ত্রী পদে নিয়োগ দিতে বাধ্য হন মহারাজা হরিকিষেণ সিং। গান্ধী ও মেহেরচাঁদ মহাজনের প্রচেষ্টায় মহারাজা কাশ্মীরের ভারতভূক্তির পক্ষে পদক্ষেপ গ্রহণে রাজি হন। এমতাবস্থায় কাশ্মীরের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনতা দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলে। শেখ আবদুল্লাহ ছিল এ আন্দোলনের অন্যতম নেতা। কাশ্মীরের স্বৈরশাসক হিন্দু মহারাজা রাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম অধিবাসীদের প্রতি যে অন্যায়, অত্যাচার ও নির্যাতন চালাতেন তার প্রতিবাদের মধ্য দিয়েই ১৯২০-এর দশকে শেখ আবদুল্লাহ কাশ্মীরের জননেতা হয়ে উঠেন এবং ডোগরা রাজার জেল-জুলুমের শিকার হন। জনগণ তাদের প্রিয় নেতাকে শের-ই-কাশ্মীর উপাধি দেয়। উদীয়মান শেখ আবদুল্লাহকে ভবিষ্যতে ব্যবহার করার লক্ষ্যে পণ্ডিত নেহরু শেখ আবদুল্লাহকে বন্ধু সম্বোধন করতেন। এই বন্ধু সম্বোধনের মূল্য দিতে হয়েছে শেখ আবদুল্লাহকে এবং মূল্য দিতে হচ্ছে কাশ্মীরের মুসলমানদের।

শেখ আবদুল্লাহর রাজনৈতিক উত্থান-পতন

১৯২০-এর দশকে শেখ আবদুল্লাহ আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন শেষ করে সরকারি চাকরিতে প্রবেশের চেষ্টা করেন। কিন্তু মুসলমান হওয়ার কারণে তার কপালে চাকরি না জোটায় তিনি কাশ্মীরে ফিরে যান এবং কাশ্মীরি মুসলমানদের

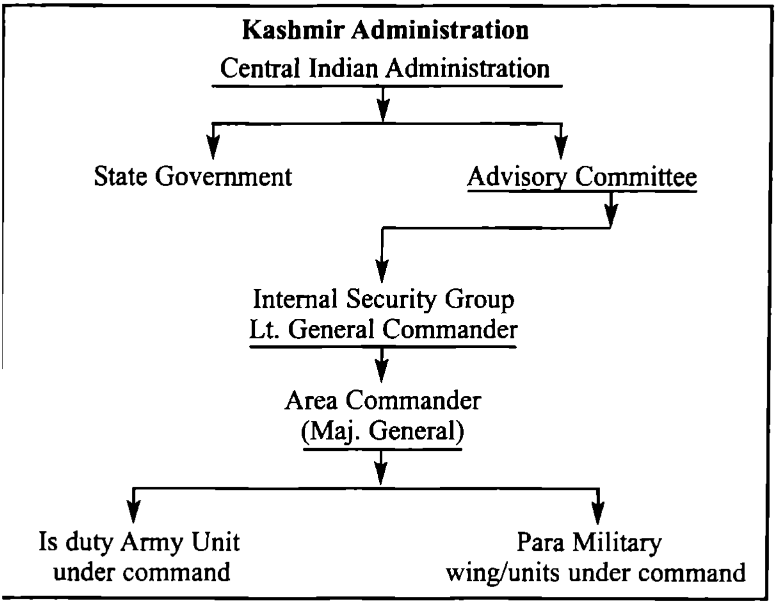

www.pathagar.com

সংগঠন **'রিডিং রুম পার্টি'**তে যোগ দেন। স্যার মোহাম্মদ ইকবালের নেপথ্য সহযোগিতায় কাশ্মীরি মুসলমানদের রাজনৈতিক দল মুসলিম কনফারেন্স গঠিত হলে তিনি এর প্রথম সভাপতি হন। রাজনীতিতে সক্রিয় হওয়ায় তিনি ডোগরা রাজার কোপানলে পড়ে জেল-জুলুমের শিকার হন। ভবিষ্যৎ কাশ্মীরের এ উদীয়মান নেতার সাথে পণ্ডিত নেহরু সখ্যতা গড়ে তোলেন এবং বন্ধু সম্বোধন করে চিঠিপত্র লিখেন। ভারতবর্ষের বিখ্যাত নেতা নেহরুর বন্ধু সম্বোধনে শেখ আবদুল্লাহ বিগলিত হন এবং নেহরুর পরামর্শে মুসলিম কনফারেন্সের নাম পরিবর্তন করে দলকে সেক্যুলার করে নাম রাখেন ন্যাশনাল কনফারেন্স। ফলে তিনি এতদিনকার মুসলিম নেতার পরিবর্তে হিন্দু-মুসলিম-শিখের নেতা হিসেবে পুলকিত হন। সেক্যুলার হয়ে তিনি দ্বিজাতিতত্ত্ব ও জিন্নাহ এবং পাকিস্তান দাবির প্রবল বিরোধী হয়ে ওঠেন। ১৯৩৯ সাল থেকে তিনি নেহরু তথা কংগ্রেসের পুরোপুরি সমর্থকে পরিণত হন এবং দলের নাম পুনরায় পরিবর্তন করে রাখেন "All India Jammu & Kashmir National Conference." নেহরুর বন্ধু সম্বোধনে এবং মিথ্যা আশ্বাসে তিনি সম্পূর্ণভাবে দিক পরিবর্তন করেন। তার নতুন দলের আনুষ্ঠানিক অধিবেশনে নেহরু যে বার্তা পাঠান তার শেষ বাক্যটি ছিল– I hope that the conference will view all these events that are happening in true perspective so that the People of Kashmir may attain their freedom in the larger freedom of India. (সূত্র : M. J Akbar, Kashmir Behind the vale. P-77) নেহরুর পত্রে স্বাধীন বৃহত্তর ভারতের মধ্যে স্বাধীন কাশ্মীরের আশ্বাস পেয়ে শেখ আবদুল্লাহ জিন্নাহ ও মুসলিম লীগের এবং সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিরুদ্ধে বিষোদগার শুরু করেন এবং নিজেকে ভবিষ্যৎ স্বাধীন ভারতের মধ্যে স্বাধীন কাশ্মীরের শাসক হিসাবে ভেবে অলীক স্বপ্নে বিভোর করে রাখেন। ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত তার এ স্বপ্ন ভঙ্গ হয়নি। স্বপ্ন ভঙ্গ হওয়ার পর তিনি নিজেকে বন্ধু নেহরুর জালে আটক অবস্থায় দেখতে পান। ইতিমধ্যে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা তার দলে ভাঙন ধরায় এবং তার সহযোগীদের হাত করে ফেলে। নেহরু শেখ আবদুল্লাহকে বশে এনে কাশ্মীরকে ভারতভুক্ত করতে যে পদক্ষেপসমূহ নেন সংক্ষেপে তা নিম্নরূপ :

১. নেহরু শেখ আবদুল্লাহকে বেস্ট ফ্রেন্ড সম্বোধন করতেন এবং প্রায় চিঠি লিখতেন, বাণী পাঠাতেন।

২. ১৯৪৭ সালে মহারাজার বিরুদ্ধে আন্দোলনে গ্রেফতার হলে নেহরু কাশ্মীর যান এবং লর্ড মাউন্ট ব্যাটেনের সহযোগিতায় শেখ আবদুল্লাহর মুক্তির ব্যবস্থা করেন।

৩. মহারাজার কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে শেখ আবদুল্লাহ এক বিরাট জনসভায় ভাষণ দেন। সেখানে তিনি বলেন, "I never beleived in Pakistan

www.pathagar.com

Slogun. Pandit Neheru is my best friend & I hold Gandhiji in real reverence." (সূত্র : ঐ, পৃষ্ঠা. ১০৫)। এরপর তিনি দিল্লি এসে তার বেস্ট ফ্রেন্ড নেহরুর সরকারি বাসভবনে আতিথ্য গ্রহণ করেন। নেহরু কন্যা ইন্দিরা গান্ধী সে সময়ে লক্ষ্ণৌতে ছিলেন। নেহরু ইন্দিরা গান্ধীকে লক্ষ্ণৌ থেকে ডেকে পাঠান এবং বেস্ট ফ্রেন্ডের সেবায় নিয়োজিত করেন।

৪. নেহরু কন্যা ইন্দিরা গান্ধী ভারতের তৎকালীন গভর্নর জেনারেল লর্ড মাউন্ট ব্যাটেনের সেবাযত্নও করতেন গভীরভাবে। মাউন্ট ব্যাটেনের এই দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে নেহরু সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে পাঞ্জাবের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলা গুরুদাসপুরকে ভারতভুক্তির ব্যবস্থা করেন যাতে ভবিষ্যতে ভারত থেকে কাশ্মীর যেতে কোনো সমস্যা না হয়। পাঞ্জাবের ও বাংলার বিভক্তি, আসামের করিমগঞ্জ, শিলিগুঁড়ি নেহরু-লেডি মাউন্ট ব্যাটেন-ইন্দিরা-মাউন্ট ব্যাটেন সংখ্যতার অবৈধ ফসল।

৫. ভারতের অধীনে কাশ্মীরি মুসলমানদের দুর্দশা প্রত্যক্ষ করে শেখ আবদুল্লাহ ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলে নেহরু কংগেসের বশংবদ দালাল শ্রেণীর মুসলিম নামধারী নেতা মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, রফি আহমদ কিদওয়াই, এম সি ছাগলা ও আবদুল গাফফার খানকে দিয়ে শেখ আবদুল্লাহকে বশে আনার

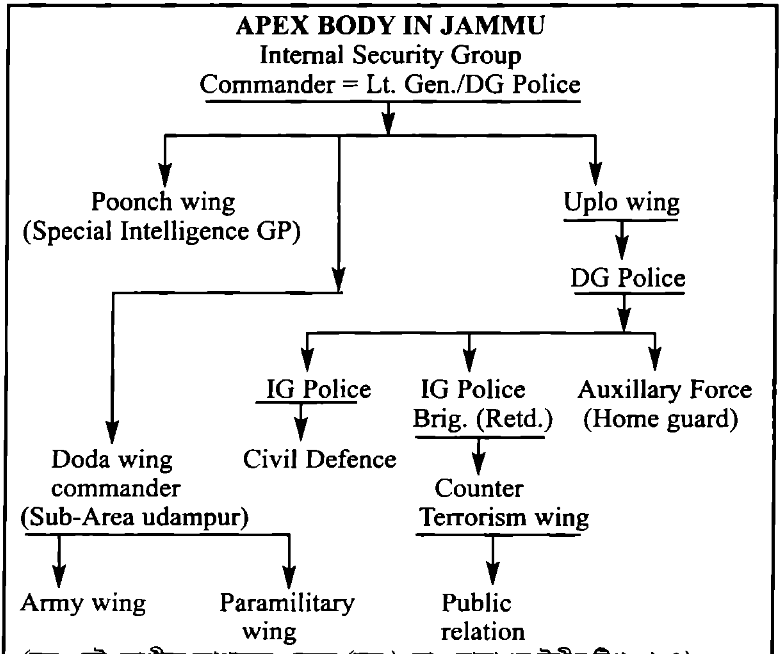

(সূত্র : বই, কাশ্মীরে রণপ্রান্তরে, মেজর (অব.) মোঃ মোজাহের উদ্দীন টিপু, পৃ. ৪)

www.pathagar.com

চেষ্টা করেন এবং ব্যর্থ হয়ে ১৯৫৩ সালের আগস্ট মাসে পাকিস্তানের সাথে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে বেস্ট ফ্রেন্ড শেখ আবদুল্লাহকে কারারুদ্ধ করেন। কোনো প্রমাণ উপস্থাপন করতে না পেরে অবশেষে ১৯৬৪ সালের ৮ এপ্রিল মুক্তি দিতে বাধ্য হন।

মূলত অদূরদর্শী শেখ আবদুল্লাহ নেহরু-ইন্দিরা-মাউন্ট ব্যাটেনের ফাঁদে পড়েন এবং কৃষ্ণ মেনন, বিনোবাভাবে, জয় প্রকাশ নারায়ণ, চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারীর প্রতারণায় ও গাদ্দার মুসলিম নেতা মৌলানা আজাদ, এম সি ছাগলা, রফি আহমেদ কিদওয়াই ও আবদুল গাফফার খানের প্ররোচনায় নিজ দেশ ও জাতিকে ভারতের অবর্ণনীয় নির্যাতনের শিকার করেছেন। এরূপ অদূরদর্শী মুসলিম নেতারাই নিজেদেরকে অসাম্প্রদায়িক প্রমাণ করার জন্য বিজাতীয়দের সুন্দর আশ্বাসের ফাঁদে পা দিয়ে নিজ ধর্ম, দেশ ও স্বজাতিকে বিশ্বব্যাপী বিপদগ্রস্ত করছে। শেখ আবদুল্লাহর এই অবিমৃষ্যকারিতাই কাশ্মীরের জনগণের দুর্দশার কারণ ও তিনটি পাক-ভারত যুদ্ধের প্রধান কারণ। অদূর ভবিষ্যতেও কাশ্মীর নিয়ে পাক-ভারত যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী।

কাশ্মীরে ভারতীয় শাসন ও গণহত্যা

কাশ্মীরের প্রশাসনিক বিন্যাস : কাশ্মীরের বাস্তব অবস্থা অনুধাবন করার জন্য এর প্রশাসনিক কাঠামো ও বিন্যাস লক্ষ্য করাই যথেষ্ট। এর মাধ্যমে যে কোনো সাধারণ মানুষ বুঝতে পারবে পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে ঘোষিত ও কথিত ভারত কাশ্মীরে কিরূপ গণতান্ত্রিক শাসন কায়েম করেছে। নিম্নে কাশ্মীরের প্রশাসনিক কাঠামো ও বিশেষ বাহিনীসমূহের বিবরণ প্রদান করা হলো :

উপরোক্ত প্রশাসনিক বিন্যাস দেখলেই বুঝা যায় কাশ্মীরে কিরূপ শাসন চলছে। কাশ্মীরের সাক্ষী গোপাল মুখ্যমন্ত্রী ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের মাউথপিচ ও তথাকথিত গণতন্ত্রের চিহ্নস্বরূপ অবস্থান করছে। মূলতঃ প্রশাসনিক কাঠামো ও বিদ্যমান কার্যক্রম দ্বারা ভারত কাশ্মীরিদের নিকট ও সচেতন বিশ্ববাসীর নিকট একটি আগ্রাসী-দখলদার উপনিবেশিক শক্তি ছাড়া অন্য কিছু নয়। কাশ্মীরিদের আজাদির আকাঙ্ক্ষা ও মানবাধিকার দলনে যেসব বাহিনী নিয়োজিত রয়েছে সেগুলো হলো–

১. নিয়মিত সেনাবাহিনী– পাঁচ লাখ (২০০৮ সালের হিসাব অনুযায়ী)
২. প্যারামিলিশিয়া– অজ্ঞাত
৩. SBK (Special Branch Kashmir) সদস্য সংখ্যা অজ্ঞাত
৪. CIk (Counter Intelligence Kashmir) সদস্য সংখ্যা অজ্ঞাত
৫. CRPF (Central Reserve Police Force) সদস্য সংখ্যা অজ্ঞাত
৬. SOG (Special Operation Group) সদস্য সংখ্যা অজ্ঞাত।

www.pathagar.com

৭. নিয়মিত পুলিশ বাহিনী (সদস্য সংখ্যা অজ্ঞাত) উপরোক্ত সেনা সদস্য, পুলিশ বাহিনী ও বিশেষ বাহিনীসমূহ যে সকল কালো আইন দ্বারা কাশ্মীর শাসন করে তা হলো–

১. Armed forces special power Act-1958

২. Disturbed areas Act-1976

কাশ্মীরের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে The International Peoples Tribunal on Human rights & Justice-এর তদন্ত ও ফলাফল

২০০৮ সালের শুরুতে ভারত জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য পদ প্রাপ্তির জন্য জোর তৎপরতা শুরু করলে যুক্তরাষ্ট্র ভারতের পক্ষে ইতিবাচক মন্তব্য প্রদান করে। স্থায়ী সদস্য হওয়ার জন্য একটি দেশকে কয়েকটি শর্ত পূরণ করতে হয়। উক্ত শর্তসমূহ হলো :

১. নিজ দেশে শান্তি, স্থিতিশীলতা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা,

২. আন্তর্জাতিক কনভেনশন ও আইনসমূহের অনুসরণ,

৩. গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা,

৪. মানবাধিকার সংরক্ষণ।

ভারত উক্ত শর্তসমূহ পালনের অঙ্গীকার করায় ক্যালিফোর্নিয়া ইন্সটিটিউট অব ইনটেগরাল স্টাডিজ-এর সহযোগী অধ্যাপক ও Peoples Tribunal-এর যুগ্ম আহ্বায়ক ভারতীয় বংশোদ্ভূদ যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক ড. অঞ্জনা চ্যাটার্জি ভারতীয় কাশ্মীরের মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন। উক্ত তদন্ত কমিটির গঠন ছিল নিম্নরূপ–

ক. আহ্বায়ক– এডভোকেট ইমরোজ (কাশ্মীরের প্রখ্যাত মানবাধিকার আইনজীবী)

খ. যুগ্ম আহ্বায়ক – ড. অঞ্জনা চ্যাটার্জী

গ. সদস্য– খুররম পারভেজ।

ঘ. সহযোগী সদস্য-১. মিহির দেশাই, ২. গৌতম নবলক্ষ্যা, ৩. জহির উদ্দীন।

এপ্রিল-২০০৮ সালে উক্ত তদন্ত কমিটি গঠিত হয় এবং ১৮ থেকে ২০ জুন কাশ্মীরের বারামুল্লা ও কুপওয়ারা জেলায় তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করেন। এ সময়কালীন তার অভিজ্ঞতা, সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত, ভারতীয় শাসক গোষ্ঠির তৎপরতা ও তদন্ত কমিটির ভারতীয় সদস্যদের পরিণতি সম্পর্কে তিনি একটি প্রবন্ধ লিখেন যা LISA (London Institute of South Asia) জার্নালের অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৮ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। পাঠকদের জ্ঞাতার্থে উক্ত প্রবন্ধের কিছু অংশের বর্ণনা নিম্নে তুলে ধরা হলো –

www.pathagar.com

গণকবরের বিবরণ : তিনি লিখেছেন, বারামুল্লাহ জেলার কাদার মধ্যে, পাথরের স্তূপের নিচে, ঘন ঘাসের মাঠে, পাহাড়ের পাদদেশে ও সমতল ভূমিতে ভারতীয় সামরিক ও আধা সামরিক বাহিনীর নির্যাতনে নিহত কাশ্মীরীদের ৯৪০টি গণকবরের সন্ধান পাওয়া গেছে। বেশির ভাগ কবরেই একাধিক ব্যক্তির লাশ রয়েছে। পুলিশ ও অন্যান্য বাহিনীর নির্দেশে বাধ্য হয়ে জনগণ নিজেদের আপনজনের কবর খুঁড়তে বাধ্য হয়। টার্গেটিকৃত ব্যক্তিকে বিদেশী জঙ্গী আখ্যা দিয়ে দিনের পর দিন নির্যাতন করে ও তথাকথিত ক্রসফায়ারে নিহত হয়েছে বলে প্রচার করা হয়। এ জন্য কোনো প্রমাণ বা তদন্তের প্রয়োজন হয় না। তিনি বারামুল্লা জেলার উরি ও রাজামহল্লায় ১৯৯৬-৯৭ সালের ২২টি গণকবর, কাজীপুরায় ১৯৯১ সালের ৭টি গণকবর (যেখানে ১৩ জনকে কবরস্থ করা হয়েছে), মীরমহল্লা, কিছামা, শিরী জনপদে ১৫০টি গণকবরের সন্ধান পান যেখানে ১৯৯৪-২০০৩ সাল নাগাদ ২২৫ থেকে ২৫০টি লাশকে সমাহিত করা হয় এবং আদর্শ গ্রাম সংলগ্ন ৯টি গণকবরের সন্ধান পান।

কুপওয়ারা জেলার ট্রেহগাম গ্রামে তিনি ১০০টি গণকবরের সন্ধান পান যার মধ্যে ২৪টি গণকবরের লাশসমূহের পরিচয় এলাকাবাসী সনাক্ত করেছে। এখানে শায়িত আছেন শেখ আবদুল্লাহ গঠিত ধর্মনিরপেক্ষ দলের প্রধান নেতা মকবুল বাট। তার অপরাধ ছিল তিনি সেকুলার, স্বাধীন গণতান্ত্রিক কাশ্মীরের দাবি করেছিলেন। দীর্ঘদিন ভারতের কুখ্যাত তিহার জেলে আটক রাখার পর ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪ সালে ভারতীয় সুপ্রিম কোর্ট মকবুল বাট-এর ফাঁসির রায় প্রদান করে। মকবুল বাট এর ভাইপো পারভেজ আহমদ ভাট তদন্তদলকে জানায়, ১৯৮৯ সালে শুরু হওয়া স্বাধীনতা আন্দোলনের পূর্বেই মকবুল বাটের ভাই হাবিবুল্লাহ ভাটকে ভারতীয় বাহিনী অপহরণ ও গুম করে।

এরপর তদন্ত দল রেজিপুরায় যান এবং ১৯৯৫ সালে প্রতিষ্ঠিত শহীদী গোরস্থানে যান। সেখানে ২৫৮টি গণকবর রয়েছে। উক্ত কবরসমূহের নম্বর ও পরিচিতি বিদ্যমান। এরপর তারা সাদীপুরা ও কান্ডিতে যান। স্থানীয়রা সেখানে ২০ জনের গণকবরের সন্ধান দেন যেগুলো বুনোফুলের জঙ্গলের মধ্যে অবস্থিত। সাদীপুরায় কাশ্মীরীদের নেতা রিয়াজ আহমেদ ভাট এর কবর রয়েছে যাঁকে ২৯/০৪/২০০৭ সালে তথাকথিত ক্রসফায়ারে হত্যা করা হয়েছে বলে স্থানীয়রা জানান। ভারতীয় বিভিন্ন বাহিনীর বাধার মুখে তদন্ত দল তাদের তদন্ত অসমাপ্ত রাখতে বাধ্য হয় এবং ড. অঞ্জনা নিজ কর্মস্থলে ফিরে যান।

ড. অঞ্চনা তাঁর প্রবন্ধে কাশ্মীর উপত্যকার যে ভয়ঙ্কর বর্ণনা দেন তা হলো দুই দশকের সহিংসতা ও নৃশংসতায় ৭০,০০০+ (সত্তর হাজার)+ কাশ্মীরিকে হত্যা করা হয়েছে, ৮০০০+কে গুম করা হয়েছে, ৬০,০০০+কে অমানুষিক নির্যাতন করা হয়েছে, ৫০০০০+ এতিম শিশু রয়েছে, অগণিত নারী ও বালককে ধর্ষণ করা

www.pathagar.com

হয়েছে, সেখানকার মানুষের আত্মহত্যার প্রবণতা খুব বেশি। ২০০৭ সালে কাশ্মীরের একমাত্র হাসপাতালে মানসিক রোগীর সংখ্যা ছিল ৬৮০০০। সেখানে মাইলের পর মাইল নিরাপত্তা বাহিনী কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরাও করে রেখেছে। আইন-কানুন, মানবাধিকার, মৌলিক অধিকার, রাজনীতি করার অধিকার দানবিক শক্তি দিয়ে পদদলিত করা হচ্ছে। কাশ্মীরের প্রতিটি নাগরিকই ভুক্তভোগী। তাদের প্রত্যেকের মনে প্রতিশোধের আগুনজ্বলছে, প্রত্যেকের মনে রয়েছে অনেক না বলা কথা, ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনেতিকভাবে তারা বিপর্যস্ত। বাস্তুচ্যুত অগণিত মানুষের হাহাকার কাশ্মীর উপত্যকায় ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

তদন্ত দলের সদস্যদের পরিণতি : এডভোকেট ইমরোজ ও ড. অঞ্জনার নেতৃত্বাধীন তদন্ত কমিটির সদস্যদের তদন্তকালীন ও পরবর্তী পরিণতি সম্পর্কে তিনি লিখেছেন–

তদন্তকালীন সময়ে তদন্ত দলকে বিভিন্ন ভারতীয় বাহিনী পদে পদে বাধা দিয়েছে। তাদের গাড়িকে বিভিন্ন বাহিনী অনুসরণ করেছে, সাধারণ নাগরিকদের সাথে কথা বলতে বাধা দিয়েছে। তদন্ত কমিটির সদস্যদের টেলিফোনে জান-মালের হুমকি দিয়েছে। তদন্ত কমিটির সদস্যদের উপর সংক্ষিপ্ত সময়ে যে নির্যাতন নেমে এসেছে তা হলো–

১. ড. অঞ্জনাকে ইমিগ্রেশন বিভাগ হয়রানি করেছে, ফিরতি পথে বিমানে টেলিফোন করে প্রাণনাশ ও ধর্ষণের হুমকি দেয়া হয়েছে।
২. এডভোকেট ইমরোজকে তিনবার হত্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে, তাঁর পাসপোর্ট জব্দ করা হয়েছে। তিনি বর্তমানে নিজ গৃহে বাস করেন না।
৩. খুররম পারভেজ তাঁর পা হারিয়েছেন।

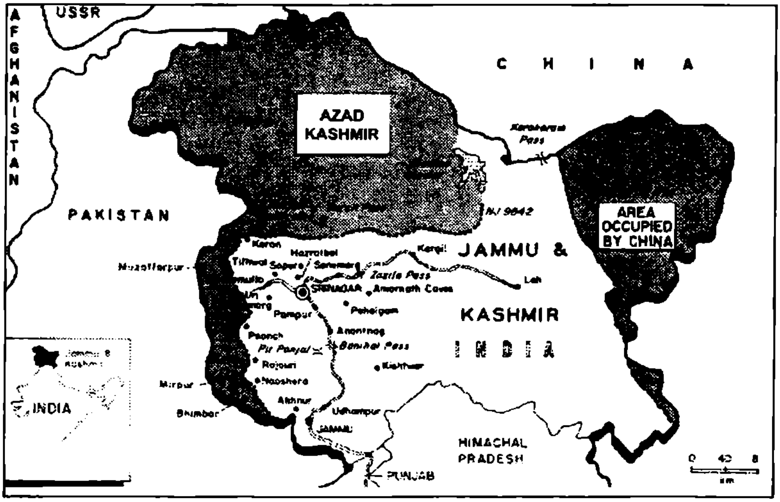

www.pathagar.com

৪. গৌতম নবলক্ষ্যা ও জহির উদ্দীনকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করা হয়েছে এবং চরম ভীতি প্রদর্শন করেছে।
সরকারের সাথে সাথে উগ্র হিন্দুদের দল তদন্ত কমিটির সদস্যদেরকে প্রাণে মারার ও তাদের পরিবারকে ধর্ষণের হুমকি দিয়েছে।

ভারতীয় বাহিনীর নির্যাতনের পন্থাসমূহ

তদন্তকালে ড. অঞ্জনা ভারতীয় বিশেষ বাহিনীসমূহ ও পুলিশী নির্যাতনের যে সাক্ষ্য প্রমাণ পেয়েছেন তা নিম্নরূপ :

ক. আটক করার পর একজন লোককে মাথা নিচের দিকে দিয়ে পা উপর দিয়ে ঝুলানো হয়, অতঃপর তার মলদ্বারে সিরিঞ্জ দিয়ে পেট্রোল প্রবেশ করানো হয়। পরবর্তীতে মুখে কাপড় বেঁধে পানি ঢালা, পানিতে চুবানো, ক্ষুধার্ত রাখা, অঙ্গহানি করা এবং নারী ও শিশুকে ধর্ষণ ও বলাৎকার করা।

খ. অনেক কাশ্মীরি বালক শৈশবে নিজের বাহুতে ঈগলের ছবি বা উল্কি আঁকে। ভারতীয় বাহিনী এরূপ উল্কিকে আজাদীর চিহ্ন হিসেবে চিহ্নিত করে এবং সংশ্লিষ্ট স্থান জ্বালিয়ে দেয়।

গ. সেনা সদস্যরা একজন তরুণীকে তাঁর মায়ের সামনে ধর্ষণ করছিল। উক্ত মা অনুনয় বিনয় ও কান্নাকাটি করছিল মেয়ের মুক্তির জন্য। সেনা সদস্যরা গান পয়েন্টে উক্ত মাকে মেয়ের ধর্ষিত অবস্থা দেখতে বাধ্য করে এবং পরে গুলি করে হত্যা করে।

ঘ. তদন্ত টীম শ্রীনগরের দুটি পরিবারের সাক্ষ্য গ্রহণ করে। সাক্ষ্যে তারা বলে, পুলিশ শ্রীনগরের পুরাতন শহরে তাদের সন্তানদের গুলি করে হত্যা করে ফেলে যায়। রাতে পরিবারের সদস্যরা লাশ তুলে এনে কবর দেয়ার বন্দোবস্ত করলে পুলিশ পুনরায় ফিরে আসে পরিবারের সহায়-সম্পদ বিনষ্ট করে এবং নারীদেরকে নির্যাতন করে।

ঙ. তদন্ত দল উত্তরাঞ্চলীয় জেলা কুপওয়ারা সফরের সময় ১৯৭৯ সালে স্থাপিত ৬টি বিশাল আর্মি ক্যাম্প দেখেন যেখানে আর্মী ও প্যারামিলিশিয়া ক্যাম্পের পরিচালনাধীন সাতটি ইন্টারোগেশন সেল প্রত্যক্ষ করেন, কাছাকাছি স্থানে স্থাপিত পুলিশ পরিচালিত অনুরূপ সেল আরও ছিল।

চ. কাশ্মীরে ভারতীয় সেনাবাহিনীর নির্যাতন সম্পর্কে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন লেখিকা মরিয়ম ছাকিনা তাঁর প্রবন্ধ "The sentiment in the streets of srinagar." প্রবন্ধের শুরু করেছেন এভাবে–
Kashmir burn's... It has been, since the Maharaja's fateful manoeuvrign in 1947 that sealed Kashmir's miserable plight, however not perhaps with so much passion and fervour of the

www.pathagar.com

mass-man on the streets in the face if indiscriminate brutality perpatrated by the Army of one of the world's biggest democracies.

ছ. ভারতের বিখ্যাত সমাজ বিজ্ঞানী ও লেখিকা অরুন্ধতী রায় কাশ্মীরের বর্তমান অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে– It is the only thing Kashmir wants. Denial is delusion;... Day after day hundreds of thousands of people swarm around places that hold terrible memories for them. They demolish bunkers, break through cordons of concertina wire and stare siraight down the barrels of soldiers, machine gun's, saying what very few in India want to hear. (সূত্র : মরিয়ম ছাকিনার প্রবন্ধ, যা LISA journal Oct-Dec-2008-এর প্রকাশিত হয়েছে।

জ. কাশ্মীরে ভারতীয় নির্যাতন সম্পর্কে কাশ্মীরী নেতা সৈয়দ আলী শাহ্ গিলানী লিখেছেন– Today, the numbers of Kashmiri prisoners languishing in Indian Jails suffering torture and abuse that is obscured by India's Propaganda machinery is appallingly high. Kashmiries refuse to forget the father's, brothers and sons killed or 'disapperaed' the mother's, sisters and daughters raped... Leaders of Kashmir's freedom fighting movement Labour in prisons.

(সূত্র : Authentic voice of south Asia, syed Ali Geelani, p-155)

কাশ্মীরীদের শ্লোগানসমূহ

১৯৪৭ সালের পূর্বেই চানক্যবাদী চক্রান্তে কাশ্মীরীরা ২ ভাগে বিভক্ত হয়েছিল। এক পক্ষ কাশ্মীরের পাকিস্তানভুক্তি চেয়েছিল, অপরপক্ষ অর্থাৎ সেকুলার! অংশ ভারতভুক্তি চেয়েছিল। গভর্নর জেনারেল মাউন্ট ব্যাটেনের সহায়তায়, নেহেরুর চক্রান্তে ও শেখ আবদুল্লাহর অদূরদর্শিতায় ভারত সেনা পাঠিয়ে কাশ্মীরকে ভারতভুক্ত করে নেয়। দীর্ঘ অত্যাচার-নির্যাতনের পর বর্তমানে সেক্যুলারগণ ভারত থেকে পৃথক স্বাধীন সার্বভৌম গণতান্ত্রিক কাশ্মীর চায় অন্যদিকে ইসলাম পন্থীরা পূর্বের ন্যায় কাশ্মীরের পাকিস্তানভুক্তির মাধ্যমে নিজেদের আজাদী সংরক্ষণ করতে চায়। কাশ্মীরিদের বর্তমানে উচ্চারিত শ্লোগানসমূহ তাদের বর্তমান আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন। শ্লোগানসমূহ হলো–

১. হুম কেয়া চাহতে-আজাদী/আজাদী।
২. জীভি– জীভি পাকিস্তান (পাকিস্তান দীর্ঘজীবী হউক)

www.pathagar.com

৩. পাকিস্তান চে রিশ্‌তা কিয়া– লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ
৪. আজাদী কা মতলব কিয়া- লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ
৫. খুনী লাকীর টড দো-আর পার জড দো
(রক্তাক্ত সীমান্তরেখা ভেঙে দাও– দুই কাশ্মীর এক হও।
৬. আয়ি জাবিরন আয়ী জালিমন-কাশ্মীর হামারা ছোড় দো
(ওহে আগ্রাসী ওহে জালিম– আমাদের কাশ্মীর ছেড়ে দাও।)
৭. জিছ কাশ্মীরকো খুন চে চিনছা-ওহ কাশ্মীর হামারা হায়।
(আমাদের ঘাম ও রক্তে আবাদ করা কাশ্মীরের মালিক আমরা)
৮. নাঙ্গা-ভূখা হিন্দুস্থান-জানছে পিয়ারা পাকিস্তান
(উলঙ্গ-ক্ষুধার্ত হিন্দুস্থান– প্রাণের চেয়ে প্রিয় পাকিস্তান)

নীরব বিশ্ববিবেক

বিশ্বের সকল কর্ণারে বর্তমানে আহত নিহত পঙ্গু হচ্ছে মুসলিম জাতি। এর প্রথম কারণ বিশ্ব-ভূগোলের গুরুত্বর্পূ অংশে মুসলমানদের দেশ, বিশ্ব অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ উপাদানসমূহ রয়েছে মুসলিম ভূখণ্ডে। সুতরাং কবি কাহ্নপার ভাষায় বলতে হয়–

আপনা মাঁসে হরিণা বৈরী
ক্ষণহ-ন-ছাড়ই ভূসুক অহেরী

অর্থাৎ কারো শত্রু হওয়ার মতো আচরণ হরিণ করে না তবুও শিকারী ভূসুক হরিণের পিছু ছাড়ে না। হরিণের সুদৃশ্য ও সুস্বাদু মাংসই হরিণের প্রধান শত্রু। মুসলিম বিশ্বে বর্তমানে চলমান অভিযান ও অমানবিক সহিংসতার কারণ অন্বেষণ করলে দেখা যাবে কেবলমাত্র সম্পদ লুণ্ঠন ও এ লুণ্ঠনকে চিরস্থায়ী করার অভিপ্রায়ে যায়নবাদী ইহুদীদের নেতৃত্বে আমেরিকা, ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া ও ভারত জোট বেঁধেছে। ভারত যেহেতু সব সময় আগ্রাসী ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের দোসর হিসেবে ভূমিকা রাখে সেহেতু গণতন্ত্র, মানবাধিকার, সুশাসন ও প্রগতিশীলতার সোল এজেন্ট দেশসমূহ ভারত কর্তৃক কাশ্মীরে গণহত্যা, মানবাধিকার দলন, জবর দখল, নারী ও শিশু নির্যাতন-ধর্ষণ ইত্যাদির ব্যাপারে সাম্রাজ্যবাদীদের নীরব থাকাটা স্বাভাবিক। ভারত কাশ্মীরে যা করছে ইহুদীবাদ নিয়ন্ত্রিত পাশ্চাত্য শক্তি বিশ্বব্যাপী তাই করছে। তদুপরি মানবাধিকার রক্ষায় সক্ষম জাতিসংঘ, এর অঙ্গ সংগঠনসমূহ এবং পাশ্চাত্য পরিচালিত এমনেস্টি ইন্টারন্যাশনালসহ অন্যান্য সংস্থাগুলোও কাশ্মীরের ব্যাপারে নীরব ভূমিকা পালন করছে। ফিলিস্তিন, ইরাক ও আফগানিস্তানের ব্যাপারে বিশ্ব মিডিয়ায় অনেক খবর প্রচারিত হলেও কাশ্মীরের ব্যাপারে তা হয় না। এর কারণ সম্ভবত ভূগুরুত্বের জন্য ফিলিস্তিনের খবর প্রাধান্য পায়, সামরিক গুরুত্বের জন্য আফগান যুদ্ধের খবর কমবেশি প্রচারিত হয় এবং অর্থনৈতিক গুরুত্বের নিরিখে ইরাকের ঘটনাবলী

www.pathagar.com

প্রচারিত হয়। মানবিক কারণ ও মানবাধিকার রক্ষা যদি গুরুত্বপূর্ণ হতো তবে কাশ্মীরের খবরাখবর ও বিশ্ব মিডিয়ায় গুরুত্ব পেত। নীরব বিশ্ব বিবেক জাগ্রত ও সরব হতো।

এ বিষয়ে আর একটি বিষয় সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তা হলো কাতারভিত্তিক আল জাজিরা চ্যানেল ব্যতিত বিশ্ব মুসলমানদের আর কোনো আন্তর্জাতিক মিডিয়া নেই। মুসলমানদের মধ্যে যোগ্য নেতার অভাব এবং বিশ্বব্যাপী প্রভাব বিস্তারকারী মুসলিম নেতা, রাষ্ট্রনায়ক বর্তমানে মুসলিম বিশ্বে অনুপস্থিত। তদুপরি অনেক মুসলিম দেশের রাষ্ট্রনায়কগণ পাশ্চাত্যের হাতের পুতুল হিসেবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ায় যেসব মুসলিম দেশ রয়েছে তারা বর্তমানে পাশ্চাত্য সৃষ্ট ও পাশ্চাত্য আরোপিত বিশৃঙ্খলায় নিমজ্জিত রয়েছে। পাকিস্তান কাশ্মীরের ব্যাপারে ভারতের সাথে তিনটি যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে পাকিস্তান ভারত ও পাশ্চাত্যের ষড়যন্ত্রে অস্তিত্বহীনতার সঙ্কটে নিমজ্জিত। কাশ্মীরের প্রতিবেশী আফগানিস্তান পাশ্চাত্য আরোপিত যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে দীর্ঘ ৩২ বছর। ফলে নিপীড়িত, নির্যাতিত কাশ্মীরিদের জন্য স্বজাতিদের বিবেক কাঁদলেও সেটা নিষ্ফল কান্না, স্বপ্নের কান্নার মতোই শব্দহীন। কোনো স্বার্থের ব্যাপার না থাকলে বিজাতীয়রা মুসলমানদের জন্য কাঁদতে পারে না। তাদের বন্ধুত্ব নেহেরু-শেখ আবদুল্লাহর বন্ধুত্বের মতো। তাদের সখ্যতা ইন্দিরা-শেখ আবদুল্লাহর সখ্যতার ন্যায়।

কাশ্মীরের ইতিহাস বাংলাদেশের জন্য শিক্ষা

এ দেশের একশ্রেণীর জ্ঞান পাপী ও রাজনৈতিক দল আমাদের ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতাকে ভুল আখ্যা দেয় অথবা ইগনোর করে। অথচ কাশ্মীরের ন্যায় ১৯৪৭ সালে যদি বর্তমান বাংলাদেশ ভূখণ্ড ভারতীয় সাম্রাজ্যের অংশ হতো তবে বাংলাদেশের অবস্থা আরও খারাপ হতো। কেননা ভারতীয় আগ্রাসন-অত্যাচার-নির্যাতনের মুখে কাশ্মীরীরা প্রতিবেশী মুসলমানদের সাহায্যের আশা করতে পারে এবং সীমিত হলেও সাহায্য পায়। কিন্তু বাংলাদেশের পাশে কোনো মুসলিম দেশ না থাকায় এ দেশের মানুষকে ভারতীয় আগ্রাসন ও নির্যাতনের মুখে বঙ্গোপসাগরে আত্মাহুতি দেয়া ছাড়া বিকল্প কোনো পথ খোলা নাই। ১৯৪৭-৭১ সাল নাগাদ এদেশবাসী যা অর্জন করেছিল তা নিঃশেষ না হওয়ায় আমাদের অনেকে এখন ও আগ্রাসী ভারতের সত্যিকার স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারেনি। সেক্যুলার শেখ আবদুল্লাহার উত্থান পতন থেকে এ দেশের সেক্যুলারগণ শিক্ষা নিবেন কি?

ভারত সরকারের হিসাব অনুযায়ী কাশ্মীরে সশস্ত্র গেরিলার সংখ্যা ৪৫০ জন। এ ৪৫০ জন গেরিলা দমনের অজুহাতে ভারত কাশ্মীরে পাঁচ লক্ষাধিক সেনা মোতায়েন করেছে, অন্যান্য বাহিনীর সংখ্যা প্রায় দুই লক্ষাধিক। প্রতি পাঁচজন

www.pathagar.com

কাশ্মীরি মুসলমানের পাহারায় রয়েছে কমপক্ষে একজন ভারতীয় সরকারি সদস্য। এতদসত্ত্বেও কাশ্মীর আবার পুর্ণোদ্যমে জেগেছে। ফিলিস্তিনীদের ইন্তিফাদা আন্দোলনের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কাশ্মীরিদের বর্তমান আন্দোলন ঠেকানোর সাধ্য ভারতীয়দের আছে বলে মনে হয় না। হামাসের ন্যায় শক্তির অধিকারী হতে পারলে অদূরভবিষ্যতে কাশ্মীর স্বাধীন হবে এবং ভারতের অপরাপর স্বাধীনতাকামীরা এতে পথ নির্দেশ পাবে।

তথ্যসূত্র :

১. উপমহাদেশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস-রুস্তম আলী

২. কাশ্মীরে রণপ্রান্তরে- মেজর (অব.) মোঃ মোজাহার উদ্দীন টিপু

৩. লিসা জার্নাল অক্টোবর ডিসেম্বর-২০০৮

৪. Authentic voices of south Asia/Sayed Ali shah Gilani

৫. The India Doctrine, M.B. I Munshi, 2nd edition.

অক্টোবর ২০১০

www.pathagar.com

সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্তে সুদান ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বিপর্যয়

এই লেখা প্রকাশ হওয়ার আগেই বিশ্ব মানচিত্রে নতুন একটি দেশের অভ্যুত্থান ঘটবে। যার নাম দক্ষিণ সুদান। বিশ্বের প্রধান প্রধান গণমাধ্যমে এখন সুদানের গণভোট এবং দক্ষিণ সুদানের জনগণের দুর্দশার চিত্র ফলাওভাবে প্রচার করা হচ্ছে। কিন্তু বিশ্বের অনেক সচেতন মানুষও জানে না কেন দক্ষিণ সুদানে গণভোট অনুষ্ঠানে বাধ্য করা হয়েছে এবং দক্ষিণ সুদানে কেন উন্নয়নের ছোঁয়া লাগেনি। উভয় প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর এই যে, ১৮২১ খ্রিস্টাব্দ থেকে বৃটেন এবং পরবর্তীতে অপরাপর পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহ সুদানকে উত্তর-দক্ষিণে ভাগ করার বীজ বপণ ও পরিচর্যা করেছে এবং সাম্রাজ্যবাদের সরাসরি ইন্ধনে দক্ষিণ সুদানে কোনো উন্নয়ন কার্য বাস্তবায়ন করতে দেয়া হয়নি। কোনো দেশের উন্নয়ন সাম্রাজ্যবাদের জন্য প্রয়োজনীয় নয়– সাম্রাজ্যবাদের জন্য প্রয়োজন ভূগুরুত্বসম্পন্ন ভূখণ্ড ও এর সম্পদ। গৃহযুদ্ধের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত ভূখণ্ড জনশূন্য হলে, অনুন্নত হলে, আন্তঃকোন্দলে লিপ্ত হয়ে দুর্বল হলে সাম্রাজ্যবাদীরা অতি সহজেই নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনে সাফল্য লাভ করে। দক্ষিণ সুদানকে মূল ভূখণ্ড থেকে আলাদা করার জন্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ ১৮২১ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে একই পদক্ষেপসমূহ ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দ থেকে গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে আমাদের পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষেত্রে। আমাদের একশ্রেণীর রাজনীতিক ও সুশীল বাবুদের সহায়তায় পার্বত্য চট্টগ্রামের অবস্থাও পূর্ব তিমুর ও দক্ষিণ সুদানের মতো হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা বিদ্যমান।

সুদান : দেশ পরিচিতি

উত্তর-পূর্ব আফ্রিকার দেশ সুদান। এর আয়তন ২৫০৫৮১৩ বর্গকিলোমিটার, যা বিশ্বে দশম বৃহত্তম আয়তনের দেশ। ২০০৯ সালের গণনা অনুযায়ী এর লোকসংখ্যা ৪,৩৯,৩৯,৫৯৮ জন। মাথাপিছু আয় ২৪৬৪ ডলার। সুদানের উত্তরে মিসর, উত্তর পূর্বে লোহিত সাগর, পূর্বে ইরিত্রিয়া ও ইথিওপিয়া, দক্ষিণ পূর্বে কেনিয়া ও উগান্ডা, দক্ষিণ-পশ্চিমে কঙ্গো এবং মধ্য আফ্রিকা, পশ্চিমে শাদ, উত্তর-পশ্চিমে লিবিয়া। নীলনদ সুদানকে পূর্ব-পশ্চিমে ভাগ করেছে। প্রশাসনিকভাবে

www.pathagar.com

উত্তর সুদানে ২৫টি রাজ্য ও ৮৭টি জেলা এবং দক্ষিণ সুদানে ১০টি রাজ্য ও ৮৪টি কাউন্টি। উত্তরে সংখ্যাগরিষ্ঠ সুন্নী মুসলমান। মুসলমানরা ২ ভাগে বিভক্ত। স্থানীয় (নুবিয়ান) মুসলমান ও আরব বংশোদ্ভুদ মুসলমান। দক্ষিণে খ্রিস্টান ও প্রকৃতিপূজারী। সুদান পেট্রোলিয়াম ও খনিজ তেল সমৃদ্ধ বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুতগামী অর্থনীতির দেশ। চীন এবং জাপান সুদানী জ্বালানির বৃহত্তম ক্রেতা। সুদানে লোহা, ম্যাঙ্গানিজ, ম্যাগনেসাইড, স্বর্ণ, রৌপ্য, ক্রোমিয়াম, জিপসাম, মাইকা, দস্তা, টাংস্টেন এবং তামার খনি আছে।

খ্রিস্টপূর্ব আমলের সুদান : সুদানের ইতিহাস ও সভ্যতা মিসরীয় সভ্যতার ইতিহাসের চেয়ে অনেক প্রাচীন। খ্রিস্টপূর্ব আমালের বেশিরভাগ সময় মিসর সুদানের অংশ হিসেবে শাসিত হয়েছে। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন মোতাবেক ৭০ হাজার বছর পূর্বে সুদানে সাম্রাজ্যের পত্তন হয়। খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ সন থেকে সুদানকেন্দ্রীক নুবিয়া সাম্রাজ্যের পত্তন হয়। মিসর, সিরিয়া ও থীবস এ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। নাবাতীয়দের পর মেরাবীয় বংশ খ্রিস্টপূর্ব ৭৫০ থেকে ৩৫০ পর্যন্ত সুদান শাসন করে। ৩৫০ খ্রিস্টপূর্ব সনে আবিসিনিয়া (বর্তমান ইথিওপিয়া) সুদানি সাম্রাজ্য ধ্বংস করে এবং দখল করে। সুদান সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপ থেকে পরবর্তীতে ৫০টি রাজ্যের জন্ম হয়। উক্ত ৫০টি রাজ্যের তিনটি ছিল যথাক্রমে নাবাতিয়া (বর্তমান মিসর) মাকুরিয়া ও আলাওয়া (বর্তমান খার্তুমের নিকটে এ রাজ্যের রাজধানী ছিল।)

সুদানে খ্রিস্টানিটি ও ইসলাম

বাইজান্টাইন সম্রাজ্ঞী থিওডর স্বয়ং মিশনারীসহ আফ্রিকার উপকূলে উপস্থিত হন। তাঁদের প্রচারণায় অনেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হয়। তন্মধ্যে নাবাতিয়া, মাকুরিয়া ও আলাওয়াল শাসকত্রয় খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে। তখন থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত আলাওয়া খ্রিস্টধর্মাবলম্বীদের শাসনাধীন ছিল। হযরত উমর (রা.) খেলাফতের শুরুতে ৬৩৬ খ্রিস্টাব্দে মিসর বিজিত হয় এবং ইসলামী শাসন কায়েম হয়। পর্যায়ক্রমে উত্তর আফ্রিকার জনগণ ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করে ও উত্তর আফ্রিকায় মুসলিম জনগোষ্ঠী সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। দীর্ঘ ৬১৪ বছর পর অর্থাৎ ১২৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে সুদানে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সেন্নার ও ফুঞ্জ নামক ২টি মুসলিম রাজবংশ ১৮২০ সাল পর্যন্ত সুদান শাসন করে।

সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তে সুদানের স্বাধীনতার উত্থান-পতন (১৮২১-১৯৫৬)

ওসমানীয় তুর্কী সালতানাতের প্রতিনিধি হিসেবে মিসরে দায়িত্ব পালনরত মুহাম্মদ আলী পাশা ১৮২০ সালে তাঁর ছেলে ইসমাইলকে পাঠিয়ে সুদান দখল করেন এবং সুদান তুর্কী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ইতোমধ্যে মিসর-ফ্রান্স সুয়েজখাল খনন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। গুরুত্বপূর্ণ সুয়েজখালের নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী

www.pathagar.com

দেশসমূহ সুয়েজের দুই পাড়ে অবস্থান নেয় এবং ১৮৮২ সালে মিসরে বৃটেনের শাসন শুরু হয়। ১৮৭৯ সালে ইউরোপীয় শক্তি ইসমাইলকে সুদানের শাসন কর্তৃত্ব থেকে অপসারণ করে তদস্থলে তার পুত্র তাওফীককে ক্ষমতাসীন করে। তাওফীকের দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনায় ওরাবী বিদ্রোহ শুরু হয়। দুর্বলচিত্তের তাওফীক শুধুমাত্র নিজের সিংহাসন রক্ষায় বৃটেনের সাহায্য প্রার্থনা করেন। বৃটেন তাওফীককে নামমাত্র ক্ষমতায় রেখে সুদানে নিজেদের একজন গভর্নর নিয়োগ করে। এভাবে পিতা-পুত্রের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত সৃষ্টি করে। উত্তম শাসককে সরিয়ে অদক্ষ ও দুর্নীতিবাজ শাসককে ক্ষমতাসীন করে ইউরোপীয় শক্তি সুদানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে এবং উক্ত বিশৃঙ্খলা থেকে সুদানকে রক্ষার অজুহাতে সুদানের শাসক হিসেবে ইংরেজ গভর্নরের শাসন শুরু হয়। দেশপ্রেমিক সুদানীরা আহমদ ইবনে আবদুল্লা (মাহদী)র নেতৃত্বে দখলদার বৃটিশবিরোধী সশস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু করে। এ যুদ্ধে সুদানে নিযুক্ত বৃটিশ গভর্নর জেনারেল গর্ডন নিহত হয় এবং মাহদী ক্ষমতাসীন হন। টাইফয়েড রোগে পরবর্তী ৬ মাসের মধ্যে মাহদী মৃত্যুবরণ করলে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ক্ষমতাসীন হন। তিনি নিজেকে খলীফা ঘোষণা করেন যদিও তিনি ইসলামী শাসন অনুসরণ করেননি।

আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ (মাহদী)র শাসনকাল (১৮৫৫-১৮৯৯)

সুদান পুনরায় স্বাধীন হলে ইতোমধ্যে আফ্রিকায় জেঁকেবসা সকল ইউরোপীয় শক্তি সুদানের স্বাধীনতা হরণে তৎপরতা শুরু করে। তখন মিসর ছিল বৃটেনের দখলে। ইকুইটোরিয়াল ঘানা ছিল বেলজিয়ামের দখলে। ইথিওপিয়ায় ছিল খ্রিস্টান রাজা ইউহান্নার শাসন। সুদান চতুর্দিক থেকে আক্রান্ত হয় তবুও সুদান শক্তিশালী ইথিওপিয়া দখল করতে সক্ষম হয় কিন্তু ১৮৯৩ সালে ইতালীর আক্রমণে সুদানী সেনারা ইথিওপিয়া ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। ১৮৯৯ সালে বৃটেনের তাবেদার রাষ্ট্র মিসরের সহযোগিতায় ওমদুরমান যুদ্ধে সুদান পরাজিত হয়ে বৃটেনের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। চুক্তি মোতাবেক মিসর কর্তৃক বৃটেনের পছন্দসই ব্যক্তিকে সুদানের গভর্নর নিয়োগ দেয়া হলে সুদান বৃটিশ কলোনীতে পরিণত হয়।

সুদানে অনুসৃত বৃটিশ পলিসি

বৃটিশ শাসকগোষ্ঠীর চিরাচরিত Divide & Role পলিসির শিকার হয়ে সুদানের ঐক্য বিনষ্ট হয়। ১৯২৪ সাল থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী সুদানকে উত্তর-দক্ষিণ সুদানে বিভক্ত করে শাসন করে তদুপরি উত্তর সুদানের অংশ দারফুরকে আলাদা প্রশাসনিক ইউনিটে বিভক্ত করে শাসন করে। বৃটিশ শাসনের সময়ে উত্তর-দক্ষিণ বিভেদের বীজ বপন করা হয়। উক্ত বিভেদের স্বরূপ ছিল (১) দক্ষিণ সুদানের ৮০০ বৃটিশ কর্মচারীর মধ্যে দক্ষিণ সুদানী ছিল ৪ জন বাকিরা ছিল

www.pathagar.com

উত্তর সুদানী। (২) ম্যালেরিয়া রোগের বিস্তার রোধের অজুহাতে উত্তর সুদানীদেরকে দক্ষিণ সুদানে এবং দক্ষিণ সুদানীদেরকে উত্তর সুদানে বসবাসের অনুমতি না দেয়া। (৩) উত্তর সুদানী দাস ব্যবসায়ীদের দ্বারা দক্ষিণ সুদানী জনগণকে বহির্বিশ্বের দেশসমূহে দাস হিসেবে বিক্রির ব্যবস্থা করা। (৪) উত্তর সুদানে উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা এবং দক্ষিণকে অনুন্নত রাখা। (৫) দক্ষিণ সুদানের প্রকৃতিপূজারী কালো লোকদেরকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করা। (৬) উত্তর-দক্ষিণ বিভেদের কাল্পনিক ইতিহাস রচনা করা ইত্যাদি। খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ দক্ষিণ সুদানকে আলাদা করার বৃটিশ পলিসিসমূহ টাইমবোমার ন্যায় কাজ করেছে, যা বর্তমানে বৃটেনের সহযোগী অপরাপর পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের যোগসাজশে বাস্তবরূপ লাভ করে। দক্ষিণ সুদান সম্ভবত চলতি ২০১১ সালে তথাকথিত স্বাধীনতা লাভ করে আফ্রিকার হৃদপিণ্ডে ইসরাইল ও পাশ্চাত্যের নতুন বাণিজ্যিক ও সামরিক ঘাঁটি স্থাপনের সুযোগ করে দেবে। উত্তর সুদানের দারফুরে ও বৃটিশ রোপিত টাইমবোমা সদৃশ্য বিষবৃক্ষ দ্রুত ডালপালা বিস্তার করছে। দারফুরের জনগণের ধর্মীয় ও ভাষাগত পার্থক্যকে কাজে লাগিয়ে ইতোমধ্যে দারুফুরকে পূর্ব-পশ্চিমে বিভক্ত করার চক্রান্ত বাস্তবায়িত হয়েছে। দক্ষিণ সুদান তথাকথিত স্বাধীন হওয়ার পর দারফুরেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটবে।

সর্বশেষ স্বাধীনতা (১৯৫৬ ইং)-এর প্রাক্কালে সুদান

দীর্ঘদিনের ইতিহাসের আলোকে দেখা গেছে মিসর ও সুদান ঐক্যবদ্ধ থাকলে উভয়ের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন থাকে। অপরদিকে বিচ্ছিন্ন হলে উভয়ের স্বাধীনতা বিপন্ন হয়। এ জন্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তি উভয়কে পৃথক রাখার জন্য কার্যক্রম পরিচালনা করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বৃটিশ শক্তি হীনবল হওয়ায় বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় মিসর ও সুদানেও স্বাধীনতার সংগ্রাম শুরু হয়। তখন এক পক্ষ অর্থাৎ যারা পূর্বেও সুদানের পৃথক স্বাধীনতার প্রশ্নে বৃটেনের পক্ষে কাজ করেছিল সে মাহদী বংশের নেতৃত্বে সুদানে উম্মাহ পার্টি শক্তিশালী হয়ে উঠে। অপরদিকে সৈয়দ ইসমাইল আজহারীর নেতৃত্বে জাতীয় ঐক্য পার্টিও যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করে। তখন (১৮৫৪-৫৫) সালে সুদানী রাজনীতির প্রধান ইস্যু ছিল মিসরের সাথে ঐক্যবদ্ধ অথবা পৃথক স্বাধীনতা। ইতোমধ্যে ১৯৫২ সালে বৃটিশবিরোধী বিপ্লব ও সফল অভ্যুত্থানে মিসর স্বাধীনতা লাভ করে কিন্তু সুদানে বৃটিশ শাসন বলবত থাকে। স্বাধীনতার পর মিসরে রাজতন্ত্র কায়েম হয় কিন্তু বৃটেনের চক্রান্তে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটে এবং একনায়কতন্ত্রের যুগ শুরু হয়। মিসরের তৎকালীন শাসক নাগীব মাহফুজ ঐক্যবদ্ধ মিসর ও সুদানের পক্ষে কাজ করেন কেননা এতেই তিনি স্বাধীনতার রক্ষাকবচ খুঁজে পান। এমতাবস্থায় সাম্রাজ্যবাদী বৃটেন সুদানের পূর্ববর্তী মাহদী রাজবংশের সাইয়্যিদ আবদুর রহমানকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক

www.pathagar.com

সহায়তা দিয়ে মিসরবিরোধী আন্দালনে লিপ্ত করে। সদ্য স্বাধীন মিসর এতে দমে যায় এবং ১৯৫৪ সালে মিসর ও বৃটিশ সরকার ১ জানুয়ারি ১৯৫৬ সালে সুদানকে স্বাধীনতা প্রদানের চুক্তিতে উপনীত হয়। চুক্তি মোতাবেক অনুষ্ঠিত গণভোটে বৃটেনের আকাঙ্ক্ষা বিরোধী জাতীয় ঐক্য পার্টি বিজয় লাভ করে এবং ইসমাইল আজহারী সুদানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ক্ষমতাসীন হন।

গণভোটের ফলাফল সাম্রাজ্যবাদী বৃটেনের চাহিদামাফিক না হওয়ায় ১৯৫৫ সাল থেকে শুরু হয় গৃহযুদ্ধ। সাম্রাজ্যবাদী মদদে খ্রিস্টান সংখ্যাগরিষ্ঠ দক্ষিণ সুদান উত্তরের সাথে গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হয়। পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করে প্রধানমন্ত্রী আজহারী জুলাই, ১৯৫৬ সালে পদত্যাগ করেন এবং উম্মাহ পার্টির মহাসচিব আবদুল্লাহ খলিল প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। এতদসত্ত্বেও উক্ত গৃহযুদ্ধ ১৯৭২ সাল পর্যন্ত স্থায়ী হয়। ১৯৭২ সালে World Council of Church-এর মধ্যস্থতায় আদ্দিস আবাবা চুক্তির মাধ্যমে গৃহযুদ্ধ বন্ধ হয়। চুক্তির শর্ত মোতাবেক দক্ষিণ সুদান স্বায়ত্তশাসন লাভ করে। দক্ষিণ সুদানের জন্য একটি স্থায়ী উচ্চতর নির্বাহী পরিষদ (উনিপ) গঠন করা হয়। ১৯৮২ সালের জুলাই মাসে উনিপের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট যোশেফ লাগুকে সুদানের ভাইস প্রেসিডেন্ট নিয়োগ করা হয়।

সুদানের (সামরিক জান্তা) প্রেসিডেন্ট জাফর নিমেরী ক্ষমতায় এসে 'সুদান সমাজতান্ত্রিক ইউনিয়ন' নামে একদলীয় শাসন চালু করার সময় দক্ষিণ নিশ্চুপ ছিল। কিন্তু ১৯৮৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে নিমেরী সুদানে ফেডারেল সরকার ও ইসলামী আইন চালু করতে উদ্যোগী হলে দক্ষিণ আবার বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। সেনাবাহিনীর প্রাক্তন কর্নেল এবং যুক্তরাষ্ট্রে প্রশিক্ষিত অর্থনীতিবিদ জন গ্যারাং-এর নেতৃত্বে সুদানী জনগণের মুক্তি আন্দোলন (সজমা) ব্যাপক সশস্ত্র হামলার মাধ্যমে দক্ষিণ সুদানের অর্থনৈতিক, অবকাঠামোগত ও যোগাযোগ ব্যবস্থা অচল করে দেয়। উক্ত গৃহযুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষে প্রায় ২০ লাখ লোক নিহত হয়। ১৯৮৫ সাল নাগাদ দক্ষিণের ২টি প্রদেশে সজমার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশব্যাপী খরা ও দুর্ভিক্ষে নিমেরী সরকারের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন শুরু হলে ৬ এপ্রিল ১৯৮৫ সালে এক রক্তপাতহীন সামরিক অভ্যুত্থানে নিমেরী ক্ষমাচ্যুত হন। সেনাবাহিনী প্রধান ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী জেনারেল আবদুর রহমান সুয়ারেদ ক্ষমতা দখল করেন। তিনি অন্তর্বর্তীকালীন সামরিক পরিষদ গঠন করেন ও বিভিন্ন গ্রুপের সাথে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ১৯৮৬ সালের ১-২ এপ্রিল সুদানে গণভোটের আয়োজন করেন। ২৬ এপ্রিল ১৯৮৬ সালে নতুন সংসদ অধিবেশন শুরু হলে জেনারেল রহমান বেসামরিক সরকারের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। উম্মাহ পার্টির সাদিক আল মাহদী এ সরকারের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। গণভোট উপলক্ষে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের মধ্যস্থতায় দক্ষিণ সুদানে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়। গনভোটের ফলাফল সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা ও তাদের এজেন্ট সুদানী গেরিলাদের

www.pathagar.com

অনুকূলে না আসায় Sudan Peoples Liberation Army (SPLA) জন গ্যারাংয়ের নেতৃত্বে পুনরায় উত্তরের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ শুরু করে। জন গ্যারাং সাদিক আল মাহদীর সরকারকে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করে ও বিদ্রোহ করে।

সুদানের গণতান্ত্রিক সরকার উক্ত বিদ্রোহ দমনে ব্যর্থ হয়। দেশব্যাপী অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা, নিরাপত্তাহীনতা দেখা দেয়। এরূপ পরিস্থিতিতে জুন ১৯৮৯ সালে কর্নেল উমর আল বশীর এক রক্তপাতহীন সামরিক অভ্যুত্থানে সাদিক আল মাহদীর সরকারকে অপসারণ করে ক্ষমতা দখল করেন। তিনি বিপ্লবী কমান্ড কাউন্সিল গঠন করে একনায়কসুলভ সরকার গঠন করেন। উত্তর সুদানে শরীয়া আইন চালুর শর্তে ন্যাশনাল ইসলামী ফ্রন্ট (NIF) নেতা হাসান-আল-তুরাবী ওমর আল বশীরের সরকারে যোগ দেন। দক্ষিণ সুদানের বিদ্রোহী নেতা রিয়েক মাশার ও বশীরের সঙ্গে যোগ দেন। এতে সুদানে শক্তিশালী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। রিয়েক মাশার এর সহযোগিতায় প্রেসিডেন্ট বশীর সমগ্র দক্ষিণ সুদানে স্বীয় কর্তৃত্ব সংহত করেন। বিদ্রোহী ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের শক্ত হাতে দমন করার পর প্রেসিডেন্ট বশীর অতিরিক্ত আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে চরম ভুল পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি দেশের সর্বময় ক্ষমতা গ্রহণ করেন। সকল দল ও গ্রুপ নিষিদ্ধ করে দেন এবং দেশের একমাত্র দল হিসাবে ন্যাশনাল কংগ্রেস পার্টি (NCP) গঠন করেন। প্রেসিডেন্ট বশীরের এরূপ স্বেচ্ছাচারী পদক্ষেপের ফলে NIF সরকার থেকে বেরিয়ে যায় এবং SPLA-এর সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে ২০০০ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন বয়কট করার আহ্বান জানান। এতে আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন গ্রহণযোগ্যতা হারায়। ক্ষিপ্ত বশীর দেশব্যাপী জরুরি অবস্থা জারি করে এবং বিরোধী নেতৃবৃন্দকে আটক করেন। নিজ দেশে জনপ্রিয়তা হারানোর পর পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ প্রেসিডেন্ট বশীরকে ও সুদানকে দুর্বল করার জন্য মিসরের ইসলামী জিহাদ ও ওসামা বিন লাদেনের আল-কায়েদার সাথে সুদানের সম্পর্ক আবিষ্কার করে এবং এ অজুহাতে বাণিজ্য অবরোধ আরোপ করে। জন গ্যারাং এর নেতৃত্বে গেরিলা যুদ্ধকে আরও বিস্তৃত করা হয়।

চতুর্মুখী চাপে প্রেসিডেন্ট বশির ও সুদান দুর্বল হয়ে পড়লে ২০০৩ সাল নাগাদ পুনরায় শান্তি আলোচনা শুরু হয় এবং ৯/১/২০০৫ সালে 'নাইরোবী কমপ্রিহেনসিভ শান্তিচুক্তি' স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তির শর্ত মোতাবেক ১. প্রেসিডেন্ট বশীরের নেতৃত্বে সুদানে কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়। উক্ত সরকারের গঠন হলো ন্যাশনাল কংগ্রেস পার্টি (NCP)র প্রেসিডেন্ট বশীর, SPLM-এর সালভাকির মায়ারভিট ভাইস প্রেসিডেন্ট, NCP-এর আলী ওসমান তাহা ভাইস প্রেসিডেন্ট, সুদান লিবারেশন আর্মি (SLA)র মিন্নী মিন্নাউবি সাংবিধানিক উপদেষ্টা এবং দুই কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা। ২. ২০১১ সালে দক্ষিণ সুদানে গণভোট অনুষ্ঠানের সময় ধার্য করা হয়, যা এখন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ৩. জাতিসংঘ নিরাপত্তা

www.pathagar.com

পরিষদ চুক্তি বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করবে। ৪. উত্তর ও দক্ষিণ সুদান সমানভাবে তেলসম্পদের উপর অধিকার লাভ করে। চুক্তি স্বাক্ষরের ৭ মাসের মধ্যে অর্থাৎ ০১/০৮/২০০৫ সালে বিমান দুর্ঘটনায় জন গ্যারাং নিহত হলে পুনরায় গৃহযুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে। এ যুদ্ধ দারফুর, লোহিত সাগর উপকূল ও ইক্যুইটোরিয়াল ঘানার সীমানা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। উত্তরের জানজাবিদ মিলিশিয়ার সাথে দক্ষিণের গেরিলা দল SPLA, SLA ও JEM-এর মধ্যে এ যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। দক্ষিণ সুদানের গেরিলা দলসমূহ যেহেতু সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দাবার ঘুঁটি সেহেতু ২০১১ সালের গণভোটের স্বার্থে উক্ত যুদ্ধ বন্ধ হয়। নির্বাচনের পর দেখা যাবে উক্ত গেরিলা দলসমূহ পারস্পরিক যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের বলির পাঠা হবে।

সুদান ও সামরিক বাহিনী

সুদানের জনগণ বাংলাদেশের জনগণের মতোই গণতন্ত্রপ্রিয়। যখনই তারা ভোট দেওয়ার সুযোগ পেয়েছে তখনই তারা দেশপ্রেমিকদেরকে নির্বাচিত করেছে। সাম্রাজ্যবাদীরা দেশপ্রেমিকদের সরকার ও শাসনকে কখনও পছন্দ করে না। কেননা সৎ, জ্ঞানী ও দেশপ্রেমিক ব্যক্তি ও দল ক্ষমতাসীন হলে সাম্রাজ্যবাদী সুযোগ-সুবিধা সীমিত হয়ে পড়ে এবং সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন পরিকল্পনা থেমে যেতে বাধ্য হয়। এ জন্যই দেখা যায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সামরিক অভ্যুত্থানের পিছনে এক বা একাধিক সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কালো হাত সক্রিয় থাকে। গণতন্ত্রের ফেরিওয়ালা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এ ব্যাপারে সবচেয়ে অগ্রগামী ভূমিকা পালন করে। সুদানের প্রতিটি সামরিক অভ্যুত্থানে বৃটেন ও আমেরিকা জড়িত ছিল। তারা গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রায় বারবার সুদানকে বাধা দিয়েছে এবং সামরিক শাসকদেরকে পৃষ্ঠপোষকতা করেছে। একই সাথে তারা সামরিক সরকারকে চাপে রেখে নিজেদের স্বার্থ আদায়ে ও চক্রান্ত বাস্তবায়নে বিরোধী দলকে সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে উস্কে দিয়েছে এবং বিভিন্ন গেরিলা দল সৃষ্টি করে উক্ত গেরিলা দলকে অর্থ, অস্ত্র, প্রশিক্ষণ দিয়ে দেশে নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। তাদের কাজ ফুরানোর পর তারা নিজেদের সৃষ্ট ফ্রাংকেস্টাইনকে নিশ্চিহ্ন করেছে অথবা দৃশ্যপট থেকে বিদায় দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র-বৃটেনের মদদপুষ্ট পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকের শেষ পরিণতি, ইরাকী প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের পরিণতি এবং জন গ্যারাংয়ের পরিণতি একই সূত্রে বাঁধা। দক্ষিণ সুদানের জনগণের স্বাধীনতা, স্বচ্ছলতা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কাম্য নয়। তারা চায় খনিজ সম্পদে বিপুলভাবে সমৃদ্ধ এবং আফ্রিকার হৃদপিণ্ডে অবস্থিত দক্ষিণ সুদানের ভূখণ্ডে নিজেদের অবাধ লুণ্ঠন ও বিচরণ। জন গ্যারাংয়ের ন্যায় অভিজ্ঞ ব্যক্তি দক্ষিণ সুদানের সরকার প্রধান হলে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অবাধ লুণ্ঠন বাধাগ্রস্ত হবে ভেবেই তাঁকে বিজয়ের পূর্বক্ষণে দৃশ্যপট থেকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে। গণতান্ত্রিক দেশপ্রেমিক সরকার

www.pathagar.com

কোনো দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া শুরু করলে সেখানে দেশের স্বার্থবিরোধী সরকার অথবা সামরিক শাসক চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। সামরিক শাসক কোনো দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা নিলে সেখানে একনায়ককে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে, রাজতন্ত্র দেশকে সম্মুখপানে এগিয়ে নেয়ার চেষ্টা করলে সেখানে গণতান্ত্রিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে সামরিক সরকার চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। এভাবে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি পৃথিবীর প্রতিটি উন্নয়নশীল দেশে প্রধানত মুসলমান দেশে অশান্তি সৃষ্টি করে মুসলমানদের অগ্রগতিতে বাধা দিয়েছে এবং পুতুল সরকারকে ক্ষমতাসীন করে নিজেদের অন্যায়, অন্যায্য ও অবৈধ লালসা চরিতার্থ করেছে। **সোভিয়েত ইউনিয়ন পতনের পর থেকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রধান টার্গেটে পরিণত হয়েছে উদীয়মান মুসলিম শক্তি। এ লক্ষ্যেই তারা মুসলিম দেশসমূহকে ভেঙে টুকরা করে শক্তিহীন করে নিজেদের লুণ্ঠনকর্ম সম্পাদনের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। ইতোমধ্যে ইন্দোনেশিয়াকে ভেঙে পূর্ব তিমুরকে আলাদা করা হয়েছে। সুদানকে ভেঙে উত্তর-দক্ষিণ সুদানে পরিণত করার কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে। পাকিস্তান ভেঙে তিন টুকরা করার (বালুচিস্তান, পাখতুনিস্তান ও পাকিস্তান) কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ইরাককে ভেঙে শিয়া-সুন্নী-কুর্দিস্থানে পরিণত করার সিংহভাগ অপকর্ম সম্পাদন করেছে। সৌদি আরবকে ভেঙে ৬ টুকরা করার গোপন মানচিত্র প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাদেশ ভেঙে পার্বত্য চট্টগ্রামকে আলাদা করার কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। অথচ জাতিসংঘ প্রস্তাব থাকা সত্ত্বেও কাশ্মীরের গণভোট অনুষ্ঠানে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি আগ্রহী নয়। ভারত যদি মুসলিম শাসিত দেশ হতো তবে অনেক বছর পূর্বেই ভারত ভেঙে কাশ্মীরকে ও সেভেন সিস্টার আলাদা করা হতো। এই হলো মুসলিম বিদ্বেষী বর্তমান সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সত্যিকার পরিচয়।**

গণভোট-পরবর্তী সুদান

সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ দক্ষিণ সুদানের গণভোটের ফলাফল সম্পর্কে শতভাগ নিশ্চিত হয়ে গণভোটের আয়োজন করেছে। উত্তর সুদান যাতে এতে হস্তক্ষেপ করতে না পারে তার জন্য উত্তর সুদানের উপর বাণিজ্য অবরোধ আরোপ করেছে। সুদানী প্রেসিডেন্ট ওমর আল বশীরকে যুদ্ধাপরাধী আখ্যায়িত করে আইসিসি কর্তৃক গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে। সুদানকে জঙ্গীদের আশ্রয়স্থল হিসেবে অপবাদ দিয়ে কালো তালিকাভুক্ত করেছে। ফলে দক্ষিণ সুদানের স্বাধীনতা বর্তমানে একটি বাস্তব সত্য। তবে সাম্রাজ্যবাদী কর্মকাণ্ড সম্পর্কে ওয়াকেবহাল মহল নিশ্চিতভাবে জানেন, বাংলাদেশীরা যেভাবে ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি শাসকদের হাত থেকে বেরিয়ে এসে ভারতীয়দের হাতে জিম্মী হয়েছে, লুণ্ঠিত হয়েছে, দক্ষিণ সুদানীরাও তদ্রূপ উত্তর সুদানীদের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে ইসরাইল, যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও ফ্রান্সের কঠিন শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে লুণ্ঠিত হবে।

www.pathagar.com

সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করে নিঃশেষ হবে। নিজেদের পৈতৃক ভিটেমাটি ত্যাগ করতে বাধ্য হবে অথবা নিজেদের রক্ত-মাংস দিয়ে সুদানের মাটিকে উর্বর করে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আকাঙ্ক্ষা পূরণ করবে। অদূরভবিষ্যতে উত্তর সুদান থেকে পুনরায় দারফুরকে আলাদা করার চক্রান্ত বেগবান হবে এবং তেল নিয়ে উত্তর-দক্ষিণ লড়াই শুরু হবে। সমগ্র উত্তর সুদান অস্থিতিশীল হয়ে অস্তিত্বের সঙ্কটে নিমজ্জিত হবে।

সুদানের ভাঙন এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম পলিসি

উপরোক্ত আলোচনায় আমরা দেখেছি, ১৯২৪ থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত সুদানে বৃটিশ শাসনের সময় সুদানকে উত্তর-দক্ষিণ ভাগ (প্রশাসনিক) করা হয়। উত্তর-দক্ষিণ বিভেদের কাল্পনিক ইতিহাস, কিংবদন্তী রচনা করা হয়, ম্যালেরিয়া বিস্তারের অজুহাতে উত্তরের লোককে দক্ষিণ এবং দক্ষিণের লোককে উত্তরে বসবাসের সুযোগ বন্ধ করা হয়। গেরিলা হামলা দ্বারা দক্ষিণ থেকে উত্তর সুদানীদের বহিষ্কার করা হয়। দক্ষিণ সুদানকে অনুন্নত রাখা হয়, দক্ষিণ সুদানের প্রকৃতিপূজারী কালো লোকদেরকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করে স্থায়ী বিভেদের দেয়াল রচনা করা হয়। ঠিক একইভাবে বৃটিশ শাসক মহল ১৮৬০ সালে অখণ্ড চট্টগ্রামকে ভেঙে পার্বত্য চট্টগ্রাম নামক আলাদা প্রশাসনিক জেলা সৃষ্টি করা হয়। ১৮৮১ সালে পুলিশ Act প্রণয়নের মাধ্যমে উপজাতীয় পুলিশ বাহিনী করা হয়। উক্ত পুলিশ বাহিনী জোরপূর্বক বাংলা ভাষীদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে বিতাড়িত করে। ১৯০০ সালে প্রণীত রেজুলেশনের মাধ্যমে বাঙালীদের পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসের অধিকার হরণ করা হয়। ভূমি ক্রয়ের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। মিজোরাম, ত্রিপুরা, অরুনাচল ও আরাকান থেকে উপজাতিদের এনে পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসন করা হয়। অউপজাতীয়দেরকে জোরপূর্বক পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে বহিষ্কার করার ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৩৫ সালে প্রণীত Government of India Act-এর মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামকে কেন্দ্রীয় শাসনের অধীনে করদরাজ্যে পরিণত করা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদেরকে বিপুল হারে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করা হয় এবং বাংলাদেশের তাবেদার সরকার কর্তৃক সাম্রাজ্যবাদের কাঙ্ক্ষিত শান্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর করানো হয়। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ ২০০৫ সালের চুক্তির মাধ্যমে দক্ষিণ সুদানে যে গণভোটের আয়োজন করেছে পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র উক্ত কাজটি বাকি রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের বাঙালি সংখ্যাগরিষ্ঠতা আর কিছুটা কমাতে সক্ষম হলে অথবা প্রতিবেশী দেশসমূহ থেকে উপজাতীয় লোকজন এনে লোকসংখ্যা আর কিছুটা বাড়াতে সক্ষম হলে এখানেও গণভোটের আয়োজন করা হবে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামকে আলাদা করে সমগ্র বাংলাদেশের স্বাধীনতা নস্যাতে টাইম বোমা স্থাপনের কাজ সমাধা করা হবে।

www.pathagar.com

আমাদের করণীয়

১. সাম্রাজ্যবাদের পুতুল সরকার ও এজেন্টদের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করা।

২. আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা, সাহিত্য, নাটক এবং সিনেমার মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে শিক্ষা দেয়া এবং দেশপ্রেমিক নাগরিক সৃষ্টির কর্মসূচি গ্রহণ।

৩. জাতীয় ঐক্যের মূলমন্ত্র ধর্ম, ধর্মীয় শিক্ষা ও মূল্যবোধকে জাতীয়ভাবে প্রতিষ্ঠা করা। সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত প্রতিহত করার যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৪. বিদেশী সাংস্কৃতিক আগ্রাসন থেকে জাতিকে রক্ষা করা এবং নিজস্ব সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার। মানসম্মত স্বদেশপন্থী পত্রিকা ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সংখ্যা বৃদ্ধি।

৫. কাঙ্ক্ষিত, মানসম্মত দেশপ্রেমিক নাগরিক সৃষ্টিকে দেশের অর্থনীতি ও প্রতিরক্ষার চেয়ে অধিক গুরুত্ব দেয়া।

তথ্যসূত্র :

১. মুসলিম জাহান, সোহরাব উদ্দীন আহমেদ

২. উইকিপিডিয়া

ফেব্রুয়ারি ২০১১

www.pathagar.com

ঠেকাও করিডোর—বাঁচাও দেশ
আবহাওয়া বার্তার নির্দেশ

২৩ জানুয়ারি ২০১০ সালে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারত সফরকালীন ৫০ দফা চুক্তি/সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেছেন। তাঁর সরকার উক্ত চুক্তি/সমঝোতা স্মারক জনসমক্ষে এমনকি সংসদেও জানায়নি। তাঁর স্বাক্ষরিত চুক্তিসমূহ যদি বাংলাদেশের জনগণের ও দেশের পক্ষে হতো তাহলে নিশ্চয়ই তিনি তা জনগণকে জানাতেন। তদুপরি ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক জাতি-টু-জাতি নয়, সরকার-টু-সরকার নয় বরং পার্টি-টু-পার্টি সম্পর্ক। দিল্লি যখন দেখে ঢাকায় তাদের পছন্দের পরিবারের নেতৃত্বাধীন দল ক্ষমতায় তখনই শুরু হয় চুক্তির বন্যা। ৭ দফা গোলামী চুক্তি, ২৫ সালা মৈত্রী ও সহযোগিতা চুক্তি, পানিবিহীন পানিচুক্তি, পার্বত্য চট্টগ্রাম গ্রাস করার তথাকথিত শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হয়েছে মুজিব পরিবারের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন থাকার সময়ে। সব সময় দেখা গেছে মুজিব পরিবারবিহীন আওয়ামী লীগও ভারতের পছন্দের দল নয়। এ জন্য বাংলাদেশের মানুষ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, জাতির সাথে প্রতারণা করে লুকোচুরির চুক্তি ভারতের স্বার্থে, মুজিব পরিবারের স্বার্থে, কিন্তু বাংলাদেশ ও এর জনগণের বিরুদ্ধে স্বাক্ষরিত হয়েছে। কেননা ভারত কখনো তার কোনো প্রতিবেশীর সাথে সৎ-প্রতিবেশীসুলভ আচরণ করেনি, করতে শিখেনি। সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবাপন্ন প্রতিবেশী, সবসময় প্রতিবেশী ক্ষুদ্র স্বাধীন দেশের বন্ধু হয় না। বরং প্রাণঘাতী শত্রু হয়। বিগত ৪০ বছরে ভারতীয় আচরণ ভারতকে বাংলাদেশের বন্ধুতে পরিণত না করে শত্রুতে পরিণত করেছে।

বিগত চার দশকে ভারত গোপনে বাংলাদেশকে কি দিয়েছে তা আমার জানা নেই, তবে প্রকাশ্যে যা দিয়েছে তা হলো– আমাদেরকে বন্দি করার জন্য সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া, ভয় দেখানোর জন্য প্রতি চারদিনে একজন সীমান্তবাসী বাংলাদেশীর লাশ। আমাদের অর্থনীতি ধ্বংসে জাল টাকা ও চোরাই পণ্য, আমাদের যুবসমাজ ধ্বংসে হেরোইন, ইয়াবা, ভায়াগ্রা, ফেনসিডিল ও গাঁজা। বস্ত্রমিল ধ্বংসে সূতা ও কাপড়। কৃষি ও মৎস্য শিল্প ধ্বংসে ভেজাল বীজ, সার, কীটনাশক, পোনা ও বর্ষার সময় পানি। পোল্ট্রি শিল্প ধ্বংসে বার্ড ফ্লু, আমাদের আইনশৃঙ্খলা ধ্বংসে ভারত আমাদের দেশের সন্ত্রাসীদের অস্ত্র দেয়, অন্যায়ভাবে

www.pathagar.com

প্রশ্রয় দেয়, দেশকে অস্থিতিশীল করার জন্যে ইন্ডিয়ান এক্সপ্লোসিভ ও ঝাড়খণ্ডের কারখানায় প্রস্তুত অস্ত্র ও বিস্ফোরক দেয়, শান্তিবাহিনী ও বঙ্গসেনা দেয়, বিশ্বের দরবারে আমাদেরকে সন্ত্রাসী হিসেবে চিহ্নিত করার জন্য ভারতে প্রশিক্ষিত জেএমবি/লস্কর-ই-তাইয়েবা ও দাউদ ইব্রাহিমের সহযোগীদের পাঠিয়ে দেয় কাঁটাতারের বেড়ার ফাঁক দিয়ে। বিগত চার দশকে ভারত আমাদের নিকট থেকে প্রকাশ্যে যা নিয়েছে তা হলো '৭১-এর ১৬ ডিসেম্বরের পর পাকিস্তানি বাহিনীর সকল অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ, ট্যাংক, মূল্যবান গাড়ি, সকল রেল ইঞ্জিন, মূল্যবান ধাতব পদার্থ এমনকি বাথরুমের ফিটিংসও। তাদের নেয়ার তালিকায় আরো রয়েছে– বাণিজ্য সুবিধা, বৈদেশিক মুদ্রায় আমদানিকৃত জ্বালানি তেল, স্বর্ণ ও লোহা। আমাদের গ্যাস, প্রত্নসম্পদ, সীমানা পিলার, পাট ও চামড়া।

উপরোক্ত কার্যকলাপের মাধ্যমে ভারত বাংলাদেশের শত্রুস্থানীয় দেশ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছে। শত্রুর অবস্থান থেকে বন্ধুর অবস্থানে আসতে হলে ভারত-বাংলাদেশ সমতার ভিত্তিতে জাতি-টু-জাতি সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে এবং উভয় দেশের সাধারণ স্বার্থে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। বর্তমান সরকার ভারতের সকল চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে কাজ করছে বাংলাদেশের স্বার্থকে উপেক্ষা করে ও জলাঞ্জলি দিয়ে। বাংলাদেশের স্বার্থের বিষয় চিন্তা করলে আলোচ্যসূচিতে ও চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে– তালপট্টি দ্বীপ থেকে দখলদার ভারতীয় সেনা প্রত্যাহার, একতরফা কাঁটাতারের বেড়া প্রত্যাহার, মাদক ও সন্ত্রাসী পাচার বন্ধ করা, জেএমবি-বঙ্গসেনা ও শান্তিবাহিনীকে মদদদান বন্ধ করা, উলফার বিনিময়ে চিত্তসূতার, কালিদাস বৈদ্যসহ ভারতের মাটিতে অবস্থানরত দেশবিরোধীদেরকে বাংলাদেশের নিকট হস্তান্তর করা, বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় ভারতের অযাচিত হস্তক্ষেপ বন্ধ করা, বাণিজ্য ঘাটতি কমানো, বাংলাদেশে অবৈধভাবে অবস্থানরত লক্ষ লক্ষ ভারতীয়দেরকে ফিরিয়ে নেয়া, বাংলাদেশের টিভি চ্যানেলসমূহকে ভারতে সম্প্রচারের বাধা দূর করা, ভারত কর্তৃক বাংলাদেশের জলবায়ু ও পরিবেশ ধ্বংসের ক্ষতিপূরণ নির্ণয় ও আদায় করা, অভিন্ন নদীতে বাঁধ দিয়ে পানি আটকানো বন্ধ করা, ভারতের আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প বাস্তবায়ন বন্ধ করা। ভারত যদি শাসকদলের বা বাংলাদেশের বন্ধুরাষ্ট্র হয় তবে ভারতকে অবশ্যই ভারত সৃষ্ট সমস্যাসমূহ সমাধান করতে হবে। উক্ত সমস্যার সমাধান ব্যতীত ভারতের সাথে কোনো চুক্তি করা দেশপ্রেমিকদের নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না।

দেশের অস্তিত্ববিরোধী করিডোর চুক্তি কেন ঠেকাতে হবে

বিগত চার দশকের ভারতীয় কর্মকাণ্ডে দেখা গেছে, ভারত আমাদের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব-সমৃদ্ধি ও অগ্রগতির বিরোধী শক্তি। এমতাবস্থায় বাংলাদেশের বুক চিরে ১৫টি রুটে ভারতকে করিডোর দিলে আমরা জাতীয়ভাবে অস্তিত্ব সংকটে

www.pathagar.com

নিমজ্জিত হবো। এবং আন্তর্জাতিকভাবে ভারতের গ্লোবাল শত্রুদের লক্ষ্যে পরিণত হবো। প্রধান প্রধান জাতীয় ক্ষতিসমূহ হবে–

১. আমাদের জাতীয় নিরাপত্তা বিপর্যস্ত হবে।
২. বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা, ব্যবসা-বাণিজ্য ধ্বংস হবে।
৩. বাংলাদেশের আমদানি-রফতানি বিপর্যস্ত হবে। বন্দরসমূহ অতিরিক্ত চাপ সহ্য করতে না পেরে অচল হয়ে যাবে।
৪. হরতাল-ধর্মঘট-অবরোধে ভারতীয় যানবাহন আটকা পড়লে বা ক্ষতিগ্রস্ত হলে বাংলাদেশকে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। উক্ত যানবাহনের ও সড়কের নিরাপত্তার অজুহাতে ভারতীয় বাহিনী বাংলাদেশে প্রবেশ করে অবস্থান নেয়ার সুযোগ পাবে। এতে আমাদের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব বিলীন হয়ে যাবে।

করিডোর প্রদানের আন্তর্জাতিক ক্ষয়ক্ষতি

কাশ্মীর, জুনাগড়, হায়দারাবাদ যেভাবে ভারত ১৯৪৭-এর পর বেআইনিভাবে জবর-দখল করেছে ঠিক অদ্রুপ সেভেন সিস্টার নামে খ্যাত রাজ্যসমূহ ভারত জোরপূর্বক জবর-দখল করেছে। ফলে ১৯৪৭ এর পর থেকেই ভারতের বিভিন্ন জবরদখলকৃত রাজ্যগুলোতে সশস্ত্র স্বাধীনতা আন্দোলন অব্যাহত রয়েছে। ভারতের দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষা বাংলাদেশের উপর দিয়ে উক্ত সেভেন সিস্টারের বিদ্রোহ দমন করা। এমতাবস্থায় উক্ত রাজ্যের গেরিলা গ্রুপসমূহ বাংলাদেশের শত্রুতে পরিণত হবে। উক্ত গেরিলারা স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশে প্রতিশোধমূলক হামলা পরিচালনা করবে এবং বাংলাদেশ অবর্ণনীয় দূরাবস্থার মধ্যে পতিত হবে।

আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও বাংলাদেশ এবং করিডোর

সাম্রাজ্যবাদী যুক্তরাষ্ট্র, ইসরাইল, ইইউ'র বর্তমান প্রতিপক্ষ উদীয়মান মুসলিম বিশ্ব ও চীন। ভারত উক্ত সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের এশীয় দোসর। পূর্ব এশিয়ার সাম্রাজ্যবাদীদের প্রধান টার্গেট চীনকে দমন করা। এমতাবস্থায় ভূরাজনৈতিক কারণে ভারতকে করিডোর দিলে চীন বাংলাদেশকে প্রতিপক্ষ হিসেবে বিবেচনা করবে এবং বাংলাদেশ চীন-ভারত দ্বন্দ্বের শিকারে পরিণত হয়ে অস্তিত্বহীনতার সংকটে পতিত হবে। বৈশ্বিক রাজনীতির বর্তমান আবহাওয়া বার্তা হলো :

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে বিশ্বের প্রধান অর্থনৈতিক অঞ্চল মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকাকে শাসন-শোষণ করার জন্য এবং সুয়েজখালের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার জন্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ইসরাইল নামক অবৈধ ইহুদি রাষ্ট্র স্থাপন করেছে। এতদিন উক্ত ইসরাইল রাষ্ট্রটি সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থে মধ্যপ্রাচ্যকে দমিয়ে রেখেছিল। ইতিমধ্যে মধ্যপ্রাচ্যে ক্ষমতার ভারসাম্যে পরিবর্তন এসেছে। ফিলিস্তিনে অপ্রতিরোধ্য হামাস ও হিজবুল্লাহর উত্থান, লেবাননে হিজবুল্লাহর কোয়ালিশন

www.pathagar.com

সরকার গঠন, মিসরে সাম্রাজ্যবাদের দালাল হোসনি মোবারকের পতন ও মুসলিম ব্রাদারহুডের উত্থানের সম্ভাবনা, ইরানের অপ্রতিরোধ্য উত্থান ও শক্তি সঞ্চয় বর্তমান সাম্রাজ্যবাদী পাশ্চাত্যের পতনের আলামত সুস্পষ্ট। এমতাবস্থায় নিশ্চিত পতন ঠেকাতে ও নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে মধ্যপ্রাচ্যে ভয়াবহ যুদ্ধের দাবানল ছড়িয়ে পড়বে। মিসরের দালাল-শাসকগোষ্ঠীই প্রধানত ইসরাইলের সুরক্ষা করতো। গণতান্ত্রিক নির্বাচনের মাধ্যমে মিসরে মুসলিম ব্রাদারহুড ক্ষমতাসীন হলে ইসরাইল রাষ্ট্রটি বিশ্ব মানচিত্র থেকে মুছে যেতে পারে।

এমতাবস্থায় ইসরাইল রাষ্ট্রের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে মিসরের নির্বাচন বানচাল করতে ইসরাইল অথবা আমেরিকা, সিরিয়া বা ইরান আক্রমণের মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ শুরু করবে। এ যুদ্ধে হামাস, হিজবুল্লাহ, মিসর, ইরান, সিরিয়া যুক্ত হলে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বে। পাশ্চাত্যের এশীয় দোসর ভারত বন্ধুহীন হয়ে পড়বে অথবা ভারতের বিপদে সাড়া দেওয়ার মতো শক্তি পাশ্চাত্যে অবশিষ্ট থাকবে না। এ সুযোগে চীন ও পাকিস্তান যৌথভাবে ভারতের উপর সরাসরি হামলা করতে পারে অথবা ভারতের স্বাধীনতাকামী গোষ্ঠীগুলোকে সরাসরি মদদ দিয়ে ভারতকে অস্থিতিশীল ও টুকরো টুকরো করার কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে। ভারতকে করিডোর দেওয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশ যদি চীনের রোষানলে পতিত হয় তবে বাংলাদেশও চীনের আগ্রাসন থেকে রেহাই পাবে না।

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক আবহাওয়া যেরূপ বাংলাদেশের ৫৫ হাজার বর্গমাইলের মধ্যে সৃষ্ট নয় বরং সীমানার বাইরে সাগর-মহাসাগর বা পর্বতমালা থেকে সৃষ্ট, ঠিক তদ্রুপ বাংলাদেশের রাজনৈতিক আবহাওয়াও একটি গ্লোবাল বিষয়। এমতাবস্থায় বৈশ্বিক রাজনৈতিক আবহাওয়া বিবেচনায় এনে এদেশের সকল দেশপ্রেমিকদের উচিত হবে স্বীয় দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব, অস্তিত্ব ও সমৃদ্ধি সংরক্ষণে ঐক্যবদ্ধ হওয়া এবং পাশ্চাত্যের স্বার্থে এশিয়ায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী ভারতের হাতে নিজেদের দেশকে তুলে দেয়ার আত্মঘাতী পথ থেকে সরকারকে নিবৃত্ত করা। এখন সকল দেশপ্রেমিক বাংলাদেশীদের স্লোগান হবে একটি–

"ঠেকাও করিডোর– বাঁচাও দেশ
আবহাওয়া বার্তার নির্দেশ।"

ঢাকা, ২৪ আগস্ট ২০১১

[প্রবন্ধটি বাংলাদেশ লেবার পার্টির ৪ সেপ্টেম্বর ২০১১ তারিখে জাতীয় প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠিত সেমিনারে পঠিত হয়]

www.pathagar.com

সৌদি কূটনীতিক খালাফ আল আলী হত্যাকাণ্ড এবং বাংলাদেশে ন্যায় বিচার প্রাপ্তির সম্ভাবনা

৫ মার্চ সোমবার দিবাগত রাত ১.১৩ থেকে ১.১৫ মিনিটের মধ্যে ঢাকাস্থ রাজকীয় সৌদি দূতাবাসের সিটিজেন্স্ এফেয়ার্স বিষয়ক কূটনীতিক খালাফ-আল-আলী নিজ বাস ভবনের ৫০ গজ অদূরে গুলিবিদ্ধ হন। প্রত্যক্ষদর্শী পর্তুগাল দূতাবাসের নিরাপত্তাকর্মী জুলফিকার আলী বলেন, তিনি রাত ১.১৫ মিনিটের সময় গুলির শব্দ শুনতে পান। শব্দ শুনে তিনি এবং অপর নিরাপত্তাকর্মী তালেব শব্দের দিকে এগিয়ে যান। তখন তারা দু'ব্যক্তিকে একটি সাদা প্রাইভেটকারযোগে ঘটনাস্থল ত্যাগ করতে দেখেন। জুলফিকার আলী তৎক্ষণাৎ থানায় খবর দিলে কিছুক্ষণের মধ্যে পুলিশ এসে আহত ও অচেতন কূটনীতিককে নিয়ে যায়। পুলিশের মতে, কূটনীতিককে সাথে সাথে ইউনাইটেড হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তখন তাঁর বুকের বামপাশে গুলিবিদ্ধ ছিল। ভোর সাড়ে পাঁচটার মধ্যে ইউনাইটেড হাসপাতালের ডাক্তার খালাফ-আল-আলীকে মৃত ঘোষণা করেন।

উল্লেখ্য, খালাফ-আল-আলীর ফ্ল্যাটের নিরাপত্তাকর্মী তাপস রেমা জানান, আলী প্রতি রাতে জগিং করতে বের হতেন। প্রায় সময়ই তিনি সাইকেল নিয়ে বের হতেন। ঘটনার দিন তিনি ফ্ল্যাট থেকে নিচে নেমে তার সাইকেলটি নষ্ট দেখতে পান। এজন্য তিনি নিচের নিরাপত্তাকর্মী ও কর্মচারীদেরকে বকাঝকা করে হেঁটে বেরিয়ে যান। তাঁর সাথে শুধু একটি মাম পানির বোতল ছিল। ব্যায়ামের পোশাক পরে বের হওয়ায় তিনি সাথে সেলফোন নেননি।

খালাফ-আল-আলীর মৃত্যুর ব্যাপারে পুলিশ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বক্তব্য ভিন্ন। পুলিশ বলছে তাঁরা ঘটনার পরপরই হাসপাতালে নিয়ে যায়, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বলছে তারা রাত সাড়ে তিনটায় খালাফ-আল-আলীকে গ্রহণ করেন। পুলিশ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের ভিন্ন ভিন্ন বক্তব্য কিছু বাস্তব প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। যথা—

১. পুলিশের বক্তব্য সত্য হলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ রাত দেড়টা থেকে ভোর সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত কেন খালাফ-আল-আলীর দেহ থেকে গুলি বের করেনি। এই দীর্ঘ সময়ে তারা আহতকে কি কি চিকিৎসা দিয়েছিল। অপরদিকে হাসপাতাল

www.pathagar.com

কর্তৃপক্ষের বক্তব্য সত্য হলে পুলিশ রাত সোয়া একটা থেকে সাড়ে তিনটা পর্যন্ত খালাফ-আল-আলীকে কোথায় রেখেছিল? তদন্তকারীরা কি এজন্য পুলিশ বা হাসপাতালকে জবাবদিহি করেছিল। এরূপ দায়িত্বজ্ঞানহীন অমানবিক কাজের জন্য পুলিশ বা কোনো ডাক্তারের বিরুদ্ধে কি কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে? ব্যবস্থা নেয়া না হলে কি বুঝতে হবে সরিষার মধ্যে ভূত ছিল– নাকি এদেশের সাধারণ নাগরিকদের মতো খালাফ-আল-আলী পুলিশ ও ডাক্তারদের অবহেলা ও অবজ্ঞার শিকার হয়েছিল?

২. খালাফ-আল-আলী ফ্ল্যাট থেকে নিচে নেমে তাঁর সাইকেল নষ্ট হওয়ার কারণ জানতে কর্মচারীদেরকে বকাঝকা করেছিল। এতে বুঝা যায় তাঁর জানামতে তাঁর সাইকেলটি ভালো অবস্থায় ছিল কিন্তু কেউ না কেউ তাঁর সাইকেলটি অসাবধানতাবশত অথবা পরিকল্পিতভাবে নষ্ট করে দিয়েছিল। এ বিষয়টি তদন্ত হয়েছে কিনা?

৩. তদন্তকারীরা তাপস রেমা সম্পর্কে খোঁজ খবর নিয়েছে কি? যেমন তার জাতীয়তা, বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা, তার সাথে কোন কোন মহলের যোগাযোগ রয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি।

৪. গুলিবিদ্ধের ঘটনা রাত সোয়া একটা হলেও সিআইডির ক্রাইম সিনের কর্মকর্তারা পরদিন দুপুরে ঘটনার আলামত সংগ্রহে ঘটনাস্থলে যায়। এই বিষয়ে সিআইডির ক্রাইম সিনের কর্মকর্তা জানান, পুলিশ আমাদেরকে ঘটনার কথা সাথে সাথে জানালে আমরা তাৎক্ষণাৎ আসতাম। কিন্তু আমাদেরকে আজকে জানিয়েছে বিধায় আমরা আজকে আলামত সংগ্রহে এসেছি। দীর্ঘ ১১ ঘণ্টা পর ঘটনাস্থলে আসায় অনেক আলামত নষ্ট হয়ে গেছে। সিআইডি ঘটনাস্থলে রক্তের দাগ বা গুলির খোসা পায়নি। বিষয়টি সন্দেহজনক নাকি রহস্যজনক তদন্ত করে দেখা দরকার। কেননা দীর্ঘ ১১ ঘণ্টায় কেউ আলামত সরিয়ে ফেলেনি এর নিশ্চয়তা কোথায়?

৫. খালাফ হত্যার আগে গোয়েন্দা সংস্থা কূটনৈতিক জোন নিয়ে বিভিন্ন আশঙ্কা প্রকাশ করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন জমা দিয়েছিল। উক্ত প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল– "একটি মহল সরকারকে বেকাদায় ফেলতে কূটনীতিক এলাকাকে টার্গেট করতে পারে।" ঘটনার তদন্তকারীরা উক্ত বিশেষ মহলকে তদন্তের অন্তর্ভুক্ত করেছে কিনা?

৬. কূটনীতিক এলাকার নিরাপত্তাহীনতার কথা আগেই জানিয়েছিল ৪২টি দূতাবাস। সরকার বা আইনশৃঙ্খলা বাহিনী তবুও এ বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়নি কেন? পুলিশের মতে, গুলশান এলাকায় সন্ত্রাসী সংখ্যা ৯২ জন; তন্মধ্যে ১২ জন বর্তমানে কারাগারে রয়েছে। বাকি ৮০ জন সন্ত্রাসীর ব্যাপারে পুলিশ কোনো ব্যবস্থা নেয়নি কেন? উক্ত ৮০ জন কি সরকারি দলের প্রভাবশালী সন্ত্রাসী?

www.pathagar.com

খালাফ-আল-আলী হত্যার সম্ভাব্য কারণ—

তদন্তকারীরা সম্ভাব্য কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছে—ছিনতাইকারী, নিজেদের মধ্যে মতবিরোধ ও জনশক্তি রফতানিতে বাধা সৃষ্টির লক্ষ্যে সৌদি-বাংলাদেশ বিরোধ সৃষ্টি এবং বাংলাদেশের অর্থনীতিকে ধ্বংস করা। বিষয়গুলো পর্যালোচনা করে দেখা যায়।

(ক) **ছিনতাইকারী** : ব্যায়ামের ড্রেস পরা ও মাম পানির বোতল হাতে পায়চারীরত ব্যক্তির নিকট যে কিছু পাওয়া যাবে না এটা একজন বোকা ব্যক্তিও বুঝে। সুতরাং এরূপ একজন কপর্দকশূন্য ব্যক্তিকে কোন ছিনতাইকারী টার্গেট করতে পারে না।

(খ) **নিজেদের মধ্যে বিরোধ** : খালাফ-আল-আলীর ভাই ও সৌদি নাগরিকদের মতে, খালাফ-আল-আলীর কোনো শত্রু ছিল না। তিনি যদি সৌদি সরকারের নিকট বিতর্কিত ব্যক্তি হতেন তবে তাঁর অতীত ক্যারিয়ারে তার ছাপ থাকত এবং তাঁর চাকরি অব্যাহত থাকত না। পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে আমরা জানতে পেরেছি চলতি মাসেই তিনি রাজকীয় সৌদি দূতাবাস জর্দানে যোগ দেয়ার কথা চূড়ান্ত হয়েছিল। এমতাবস্থায় কারো সাথে ব্যক্তিগত বিরোধ থাকলে সে বিদায়ী ব্যক্তির ভালোয় ভালোয় প্রস্থানই কামনা করবে।

(গ) **জনশক্তি রফতানিতে বাধা সৃষ্টি করা** : হত্যাকাণ্ডের মাত্র কয়েকদিন পূর্বে আমাদের প্রবাসী কল্যাণমন্ত্রী সৌদি আরব সফরে গিয়ে ফিরে এসে আশান্বিত ফলাফল জানিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, খুব শীঘ্রই একটি সৌদি প্রতিনিধি দল জনশক্তি রপ্তানী বিষয়ক বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করতে বাংলাদেশ সফরে আসবেন। এ খবরে সরকার এবং দেশের জনগণ আশান্বিত হয়েছিল দীর্ঘদিন পর বাংলাদেশীদের জন্য সৌদি শ্রমবাজারের দরজা উন্মুক্ত হবে। এরূপ প্রেক্ষাপটে কূটনীতিক খুন বাংলাদেশের বৃহত্তম শ্রমবাজার ধ্বংসের একটি নীলনকশা হওয়াটা অমূলক নয়।

উল্লেখ্য, ১/১১-এর অবৈধ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমল থেকে রাজনৈতিক কারণে সৌদি আরবের সাথে বাংলাদেশের দূরত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং পরবর্তীতে ১/১১-এর ফসল বর্তমান সরকারের ইসলাম ও মুসলিমবিরোধী কার্যকলাপ, আলেম-উলামাবিরোধী দমনাভিযানের কারণে সৌদি আরবের শ্রমবাজার দীর্ঘদিন বাংলাদেশের জন্যে বন্ধ রয়েছে। এ সুযোগে প্রতিবেশী ভারত বাংলাদেশী শ্রমিকদের শূন্যস্থান পূরণে আশাতীত সাফল্য অর্জন করেছে। ৫ বছর পূর্বে মক্কার বৃহত্তম শ্রমিক কলোনীর প্রায় ৬ হাজার অধিবাসীর সবাই ছিল বাংলাদেশী, কিন্তু বর্তমানে উক্ত শ্রমিক কলোনীর অর্ধেক বাসিন্দাই হলো ভারতীয়। এতদসত্ত্বেও উক্ত কলোনী সংশ্লিষ্ট দোকানপাট ব্যবসা-বাণিজ্য এখনও বাংলাদেশীদের নিয়ন্ত্রণে। খালাফ-আল-আলী হত্যাকাণ্ডের পর উক্ত কলোনীর ভারতীয়রা তুচ্ছ কারণে

www.pathagar.com

বাংলাদেশীদের উপর হামলা করে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করে। আমি নিজে গত নভেম্বর মাস মক্কায় অবস্থানে করে বাংলাদেশীদের নিকট শুনেছি কিভাবে ভারতীয়রা নিজেদের অপকর্ম বাংলাদেশীদের ঘাড়ে চাপিয়ে বাংলাদেশীদেরকে সৌদি আরব ত্যাগে বাধ্য করছে। এমতাবস্থায় খালাফ আলী হত্যাকাণ্ডকে বাংলাদেশের শ্রমবাজার ধ্বংসের ভারতীয় চক্রান্ত মনে করাটা অমূলক নয়। এতদসত্ত্বে বিষয়টির ব্যাপারে আরও বৃহত্তর পর্যালোচনা দাবি রাখে। ঘটনাটির আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট আরও ব্যাপক হওয়াটা বিচিত্র নয়।

সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্বব্যাপী কূটনৈতিক হত্যাপ্রচেষ্টা ও দোষারোপ

১. ২০১১ সালের মে মাসে পাকিস্তানের করাচী শহরে ২ জন বন্দুকধারী একজন সৌদি কূটনীতিককে হত্যা করেছিল।
২. ২০১১ সালে যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত সৌদি রাষ্ট্রদূতকে হত্যার ব্যর্থ চেষ্টার দায়ে যুক্তরাষ্ট্র ইরানকে অভিযুক্ত করেছে।
৩. চলতি বছর ভারত, থাইল্যান্ড ও জর্জিয়ায় কর্মরত ইসরাইলী কূটনীতিকদের উপর হামলার চেষ্টা চালানোর জন্য ইসরাইল ইরানকে অভিযুক্ত করেছে। অথচ ইসরাইল অনেক ইরানী বিজ্ঞানীকে ইতোমধ্যে হত্যা করেছে।
৪. মার্চ-২০১২তে ঢাকায় সৌদি কূটনীতিক খালাফ-আল-আলীকে হত্যা করা হয়।

উপরোক্ত ৪টি তথ্যকে আন্তর্জাতিকভাবে বিশ্লেষণ করতে হলে আমাদেরকে আমেরিকা ও ইসরাইলের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং তাদের দোসর ইইউ ও ভারতের লক্ষ্য উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে হবে। যায়নবাদী ইসরাইলের নেতৃত্বাধীন উক্ত সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর থেকে মুসলিম বিশ্বকে টুকরো করা, গ্রাস করা ও লুণ্ঠন করাকে নিজেদের প্রধান কর্মসূচিতে পরিণত করেছে। এ লক্ষ্য অর্জনে তারা মুসলিম বিশ্বের দেশে দেশে বিবাদ-বিসংবাদ, যুদ্ধ ছড়িয়ে দিতে তৎপর রয়েছে। মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সংখ্যাগুরু সংখ্যালঘু দ্বন্দ্ব-সংঘাত, শাসক-শাসিতের দ্বন্দ্ব-সংঘাত লাগিয়ে গৃহযুদ্ধ লাগানোর চেষ্টা করছে। যাতে আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে ও পারস্পরিক দ্বন্দ্বে মুসলিম বিশ্ব শক্তিহীন হয়ে সাম্রাজ্যবাদী শকুনের খাদ্যে পরিণত হয়। এ সংক্রান্ত কয়েকটি তথ্য নিম্নরূপ—

১. মার্কিন সরকারের পরামর্শদাতা রিচার্ড পার্ল, ডগলাস ফেইথ, ডেভিড ওরমসহ কয়েকজন ১৯৯৬ সালে "A clean break : A New strategy for securing the Realms" শিরোনামে একটি প্ল্যান প্রস্তুত করেন, যাতে ইরাক, সিরিয়া, লেবানন ও ইরানের সরকার পরিবর্তনের নীলনকশা উপস্থাপন করা হয়।
২. মার্কিন সামরিক জার্নালে প্রকাশিত মার্কিন কর্নেল রাল্‌ফ পিটার অংকিত

www.pathagar.com

Broader Middle East প্ল্যান-এ দেখা যায় যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা কিভাবে সৌদি আরবসহ প্রায় প্রতিটি মুসলিম দেশকে টুকরো করে শক্তিহীন করে গ্রাস করবে। সাম্রাজ্যবাদীরা বাংলাদেশকেও আপাতত তিন টুকরো করার প্ল্যান গ্রহণ করেছে। এ প্লানের সারকথা হলো—(১) তিন পার্বত্য জেলা, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারকে বাংলাদেশ থেকে আলাদা করে একটি খ্রিস্টান রাজ্য বানানো। (২) খুলনাসহ সাবেক ৬টি জেলা নিয়ে হিন্দুরাষ্ট্র বঙ্গভূমি। (৩) ঢাকা কেন্দ্রীক অবশিষ্ট অংশ নিয়ে বাংলাদেশ।

কূটনৈতিক হত্যার উক্ত ৪টি ঘটনাকে বিশ্লেষণ করলে আমরা হত্যাকাণ্ডের মোটিভ ও হত্যাকারীদের সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা লাভ করতে পারি।

১. **করাচী হত্যাকাণ্ড :** ২ জন আঁততায়ী এ হত্যাকাণ্ডে অংশ নেয়। সৌদি আরবের সাথে পাকিস্তানে দূরত্ব বৃদ্ধি পেলে লাভবান হবে তাদের শত্রুরা। কেননা সৌদি আরব পাকিস্তানের ঘনিষ্ঠ ও পরীক্ষিত বন্ধু। সৌদি আরবে রয়েছে পাকিস্তানের বিশাল শ্রমবাজার। উক্ত শ্রমবাজার থেকে পাকিস্তান বঞ্চিত হলে পাকিস্তানের ভঙ্গুর অর্থনীতি ধ্বংস হবে এবং সাম্রাজ্যবাদীরা পাকিস্তানের উপর নিজেদের ইচ্ছা চাপিয়ে দিতে পারবে। পাকিস্তানের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ভারতকে দক্ষিণ এশিয়ার অপ্রতিদ্বন্দ্বী দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা সহজ হবে।

২. **যুক্তরাষ্ট্রে হত্যা প্রচেষ্টা :** রিচার্ড পার্লের উক্ত প্ল্যানে আমরা দেখতে পেয়েছি ইরান যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের টার্গেটকৃত দেশ। যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা ইরানে হামলার প্রকাশ্য প্রস্তুতি নিচ্ছে ও হুমকি দিচ্ছে। ইরানকে পরাজিত করতে হলে সৌদি আরবের সাহায্য অতীব প্রয়োজন। এমতাবস্থায় সৌদি কূটনীতিক হত্যা চেষ্টায় ইরানের ঘাড়ে দোষ চাপালে ইরান-সৌদি বিরোধ আরও তীব্র হবে যা সাম্রাজ্যবাদীদের কাম্য।

৩. **ইসরাইলী কূটনীতিক হত্যাপ্রচেষ্টা :** যেসব দেশের সাথে ইসরাইলের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে সেসব দেশেই ঘটনাগুলো সংঘটিত হওয়ার কথা বলা হচ্ছে। আর ঘটনার পরই ইরানকে দোষারোপ করা হচ্ছে। যায়নবাদী ইসরাইলের অপকৌশল সম্পর্কে যারা ওয়াকিবহাল। তাদের মতে, ইসরাইল ঘটনাস্থলের বন্ধুরাষ্ট্রের দ্বারা তদন্ত করে ইরানের বিরুদ্ধে দলিল প্রস্তুত করে ইরানে হামলার একটি যুৎসই অজুহাত খুঁজে পাবে এবং ইরানী বিজ্ঞানী হত্যার দায় থেকে নিজেকে মুক্ত করবে।

৪. **ঢাকার হত্যাকাণ্ড :** খালাফ-আল-আলীর হত্যাকাণ্ডকে আমি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বাংলাদেশবিরোধী ষড়যন্ত্রের অংশ বলে মনে করি। কেননা এই হত্যাকাণ্ড বাংলাদেশের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে বাংলাদেশ-সৌদি আরব সম্পর্ককে ক্ষতিগ্রস্ত করা হবে। সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলো থেকে বাংলাদেশী শ্রমিকদের বিতাড়ন করা গেলে বাংলাদেশের ভঙ্গুর অর্থনীতি ধ্বংস

www.pathagar.com

হয়ে যাবে। অভাব, দুর্ভিক্ষ ও রাজনৈতিক হানাহানি দেশকে গৃহযুদ্ধের দিকে নিয়ে যাবে এবং উক্ত গৃহযুদ্ধ বন্ধে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি শান্তিরক্ষী নিয়ে সদলবলে হাজির হবে। ভবিষ্যতে চীন-ভারত-মার্কিন যুদ্ধে বাংলাদেশের ভূখণ্ড ব্যবহার করা সহজ হবে।

বাংলাদেশে ন্যায় বিচার প্রাপ্তির সম্ভাবনা

বাংলাদেশে এখন মৎস্য ন্যায় অবস্থা। এখানে এখন রাষ্ট্র-সরকার ও সরকারি দল একাকার। দেশের সকল সুযোগ-সুবিধা আইন বিভাগ, বিচার বিভাগ, শাসন বিভাগ কেবল মাত্র সরকারি দলের সেবায় নিয়োজিত। সরকার জনকল্যাণের পরিবর্তে প্রভুরাষ্ট্রের কল্যাণে সদা-সর্বদা সজাগ ও সতর্ক। কেননা প্রভুরাষ্ট্রসমূহ ১/১১-এর ধারাবাহিকতায় বর্তমান সরকারকে ক্ষমতায় বসিয়েছে। সরকার প্রধানকে বিপদ থেকে বাঁচাতে সামরিক হেলিকপ্টার পাঠানোসহ সম্ভাব্য সকল সাহায্য প্রদানের প্রকাশ্য ঘোষণা দিচ্ছে। ফলে সরকার দেশ-জনগণের কল্যাণের চিন্তা বাদ দিয়ে নিজ দল ও প্রভুরাষ্ট্রের কল্যাণ কামনাকে নিজের পরবর্তী মেয়াদের ক্ষমতাসীন হওয়ার প্রধান অবলম্বন মনে করছে। এমতাবস্থায় রাষ্ট্রের সকল বিভাগ এখন বিশৃঙ্খল ও বেসামাল হয়ে রাষ্ট্রকে অস্তিত্বের সংকটে নিমজ্জিত করেছে। নিজ দল, সরকারের মন্ত্রী-এমপি অথবা প্রভুরাষ্ট্রের স্বার্থ পরিপন্থী কোনো তদন্ত কার্যক্রম এদেশে বাধাহীনভাবে চলতে পারে না, তদন্ত প্রতিবেদন আলোর মুখ দেখে না। কয়েকটি তদন্ত ও তদন্ত প্রতিবেদন সম্পর্কে আলোচনা করলে বিষয়টি সুস্পষ্ট হবে।

১. **বিডিআর বিদ্রোহ ও সেনা হত্যাকাণ্ড :** ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে ঢাকার পিলখানার বিডিআর হেডকোয়ার্টারে সংঘটিত এ ঘটনায় ৫৭ জন সেনাকর্মকর্তাসহ ৭৩ ব্যক্তি নিহত হন। বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী ও সেনাবাহিনীর অপূরণীয় ক্ষতি সাধন হয়। সমকালীন পত্র-পত্রিকায় এতদসংক্রান্ত যে সব তথ্য প্রকাশিত হয়েছে তা ছিল নিম্নরূপ :

   ক. বিডিআর বিদ্রোহের উস্কানিদাতা ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সাথে বর্তমান সরকারের ৮ জন মন্ত্রী এমপি জড়িত ছিল। যাদের মধ্যে তিনজন প্রধানমন্ত্রীর নিকটাত্মীয়।

   খ. মুখোশ পরিহিত বহিরাগতরা নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করে যারা বিডিআরের সদস্য ছিল না। (The Daily Star, Dhaka, 5 March, 2009)

   গ. ১২ জন ভারতীয় ব্ল্যাক ক্যাট কমান্ডো হত্যাকাণ্ডে অংশ নেয় এবং কাজ শেষে নিরাপদে ভারত প্রত্যাবর্তন করে। (দৈনিক সংগ্রাম, ঢাকা, ১৬ মার্চ, ২০০৯)।

www.pathagar.com

ঘ. ২ মার্চ ২০০৯ তারিখের হিন্দুস্থান টাইমস লিখেছে, "বাংলাদেশ সরকারকে সাহায্য করার জন্য ভারত আসামের জোড়াহাট বিমানঘাঁটিতে জঙ্গীবিমান মোতায়েন রেখেছিল এবং কলিকাতার নিকটস্থ কালাইকুন্ডায় এক ব্রিগেড প্যারাসুট বাহিনী প্রস্তুত রেখেছিল।

উক্ত দেশবিরোধী হত্যাকাণ্ডের তদন্তের জন্য তিনটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছিল। প্রথমটি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক, দ্বিতীয়টি সেনাবাহিনী কর্তৃক, তৃতীয়টি সিআইডি কর্তৃক গঠিত তদন্ত কমিটি। পত্রিকান্তরে আমরা জানতে পেরেছি, সরকার তদন্ত কমিটির ক্ষমতার সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছিল যাতে ঘটনার মদদদাতা, উস্কানিদাতা ও বহিঃশক্তির হস্তক্ষেপের ব্যাপারে তদন্ত করা না যায়। সেনা তদন্ত দলের সদস্যরা সরকারি শর্তাবলী মান্য করার ব্যাপারে ১০-০৫-২০০৯ তারিখে একটি হলফনামায় স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়। এতদসত্ত্বেও সেনা তদন্তদলের তদন্ত রিপোর্ট, সিআইডির তদন্ত রিপোর্ট আলোর মুখ দেখেনি। শুধুমাত্র স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত তদন্ত কমিটির ৩০৯ পৃষ্ঠার তদন্ত প্রতিবেদনের ৭টি পৃষ্ঠা প্রকাশ করা হয়েছে।

২. **শেয়ার বাজার কেলেঙ্কারি :** ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদের আওয়ামী লীগ সরকার শেয়ার বাজার লুট করেছিল। তখনকার তথ্য যা পাওয়া গিয়েছিল তা হলো– সরকারের শীর্ষ ব্যক্তির ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ও ৩ জন মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী উক্ত শেয়ার কেলেঙ্কারির হোতা ছিল। ২০১১ সালের শেয়ার কেলেঙ্কারিতে ৩৩ লাখ বিনিয়োগকারী সর্বস্বান্ত হয় এবং ২ জন ইতোমধ্যে আত্মহত্যা করেছে। এ ঘটনার তদন্ত রিপোর্ট ও আলোর মুখ দেখেনি। তদন্ত রিপোর্টে মূল অপরাধীদের চিহ্নিত করা হলেও তারা সরকারের নিজস্ব লোক হওয়ায় তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।

৩. **সাগর-রুনী হত্যাকাণ্ড :** মাছরাঙ্গা টেলিভিশনের বার্তা সম্পাদক সাগর সরোয়ার ও এটিএন বাংলার সিনিয়র রিপোর্টার মেহেরুন রুনী নিজেদের বাসায় খুন হলেও এ খুনের ঘটনার তদন্তে কোনো অগ্রগতি নেই। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী ও বিচার বিভাগ অযাচিতভাবে এ ঘটনায় নাক গলিয়েছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, সরকার প্রধানের স্বার্থ অথবা সরকারের প্রভু রাষ্ট্রের স্বার্থ এখানে জড়িত আছে। এ ঘটনার ব্যাপারে ২ জন রাজনীতিকের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য—

(ক) ২৭-২-২০১২ তারিখে লালমনিরহাটের বিশাল জনসভায় বিএনপি সভানেত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেছেন, "সাগর-রুনীর নিকট সরকারের দুর্নীতির গোপন তথ্য থাকায় উক্ত তথ্য আদায়ে সাগর-রুনীকে খুন করা হয়। হত্যার পর তাদের বাসা থেকে ল্যাপটপ ও মোবাইল ছাড়া আর কোনো বস্তু চুরি হয়নি। খুনীরা সরকারের ঘনিষ্ঠ লোক হওয়ায় তাদেরকে

www.pathagar.com

বিদেশে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দেয়া হয়েছে।"

(খ) বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী প্রেসক্লাবের সেমিনারে বলেছেন, সাগর-রুনী হত্যাকারীরা প্রধানমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠজন হওয়ায় তদন্তের কোনো অগ্রগতি হচ্ছে না।

৪. **১২ ও ১৪ মার্চ ২০১২-এর জনসভা :** ৪ দলীয় জোট ঘোষিত ১২ মার্চের জনসভাকে বানচাল করতে সরকার তার সকল প্রশাসনিক ক্ষমতা ও বাহিনীসমূহকে ব্যবহার করেছে। সারাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা অঘোষিতভাবে তিন দিন বন্ধ করা হয়েছিল। আবাসিক হোটেল, মোটেল, কমিউনিটি সেন্টার ও রেস্টুরেন্টগুলো বন্ধ রাখতে বাধ্য করা হয়। সরকারের নিকট ন্যায় বিচার চেয়ে লাভ হয়নি এবং নাগরিক অধিকার রক্ষায় হাইকোর্টে রিট করেও কোনো প্রতিকার পাওয়া যায়নি।

পক্ষান্তরে ১৪ মার্চের সরকারি জোটের জনসভা সফল করার জন্য সরকার প্রশাসন ও পুলিশকে প্রকাশ্যে ব্যবহার করেছে। সরকারি কর্মচারীরা প্রকাশ্যে ব্যানার নিয়ে উক্ত জনসভায় যোগদান করেছে। এ প্রসঙ্গে ১৫ মার্চের দৈনিক নয়া দিগন্ত শিরোনাম করেছে—

"বিরোধী দলের জন্যে রায়টকার-জলকামান সরকারি দলের জন্য বিশুদ্ধ পানি আর মোবাইল টয়লেট।" এতে আরও বলা হয়েছে, সরকারি দলের জনসভায় যোগ দিতে আসা কর্মীদের বাস-ট্রেনের ভাড়া দিতে হয়নি, পেট্রোল পাম্প ও সিএনজি স্টেশনের তেল-গ্যাস ছিল ফ্রী।

বর্তমান সরকারের এরূপ অপকর্ম-অবিচারের কথা লিখে শেষ করা যাবে না। এরূপ অন্যায়-অবিচার ও জুলুমের দেশে সৌদি কূটনীতিক খালাফ-আল-আলী হত্যাকাণ্ডের তদন্ত যে আলোর মুখ দেখবে না, খুনীরা যে চিহ্নিত হবে না, শাস্তি পাবে না তা নিশ্চিত করে বলা যায়। কেননা খালাফ হত্যাকাণ্ডে সরকারি দল, সরকারের কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি অথবা সরকারের কোনো প্রভুদেশ জড়িত থাকলে হত্যাকাণ্ডের তদন্ত কোনোদিন আলোর মুখ দেখবে না। আমার মনে হচ্ছে সাগর-রুনী হত্যাকাণ্ডের মতোই খালাফ-আল-আলীর হত্যাকাণ্ডের তদন্ত প্রথমে পুলিশ করবে, পুলিশ ব্যর্থ হবে এবং তা ডিবিতে হস্তান্তরিত হবে, কিছুদিন পর ডিবি ব্যর্থ হবে এবং তদন্তভার সিআইডির কাছে ন্যস্ত হবে অতঃপর হিমাগারে চলে যাবে নতুবা কিছু টোকাইকে আসামী বানিয়ে সাজা দেবে।

বাংলাদেশের করণীয়

বাংলাদেশ সরকার যদি নিজ দেশের স্বার্থকে প্রাধান্য দেয় তবে তাকে অবশ্যই দেশি-বিদেশি গোয়েন্দা সংস্থার সাহায্য নিয়ে দ্রুততম সময়ে বন্ধুপ্রতিম সৌদি কূটনীতিক হত্যারহস্যের সমাধান করতে হবে। হত্যাকারী চিহ্নিত করতে হবে।

www.pathagar.com

বিদেশি প্রভুদের নাম উচ্চারণ করতে ভয় পেলে প্রকৃত সত্যটি গোপনে সৌদি আরবকে জানিয়ে দিতে হবে। যাতে সৌদি আরব যথাযথ ব্যবস্থা নিতে পারে। সরকারকে মনে রাখতে হবে, সরকারের ভ্রান্তনীতির কবলে পতিত হয়ে দেশের অর্থনীতি ইতোমধ্যে ধ্বংস হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় যদি সৌদি আরব ও মধ্যপ্রাচ্যের রেমিটেন্সের উৎস বন্ধ হয়ে যায় তবে দেশের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। পাঠকদের জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি যে, বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাব মতে গত অর্থবছরে বাংলাদেশে আগত রেমিটেন্সের পরিমাণ ছিল ১১৬০ কোটি ডলার, তন্মধ্যে সৌদি আরব থেকে এসেছে ৩৬০ কোটি ডলার, মধ্যপ্রাচ্যের জিসিসি দেশগুলো থেকে এসেছে ৩৮৬ কোটি ডলার এবং বাকি বিশ্ব থেকে এসেছে মাত্র ৪১৪ কোটি ডলার। উল্লেখ্য, ১৯৯০ সালে থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককে রাজকীয় সৌদি দূতাবাসের একজন কর্মচারী নিহত হওয়ার প্রতিক্রিয়ায় সৌদি আরব সকল থাই শ্রমিককে থাইল্যান্ডে ফেরত পাঠিয়েছিল।

সৌদি আরবের করণীয়

যে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে সৌদি আরবকে নিম্নের কয়েকটি বিষয় বিবেচনায় আনতে অনুরোধ করব।

১. বাংলাদেশের বেশির ভাগ মানুষ সৌদি আরবকে নিজেদের পুণ্যভূমি মনে করে এবং সৌদি আরবের ভালো খবরে খুশি হয়, মন্দ খবরে দুঃখ পায়। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীদের চক্রান্তে বর্তমান বাংলাদেশে ইসলামপ্রিয়—সৌদি আরবপ্রিয় জনগণ শক্তিহীন ও অসহায়। সুতরাং থাইল্যান্ডের ন্যায় আচরণ করলে এদেশবাসী অতিশয় দুঃখকষ্টে নিমজ্জিত হবে।

২. বাংলাদেশের বর্তমান সরকার সংবিধান থেকে আল্লাহর উপর আস্থা ও বিশ্বাস মুছে দিয়েছে, তারা সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ইহুদী-নাছারা ও মুশরিকদেরকে নিজেদের বন্ধু ও আত্মীয় হিসেবে গ্রহণ করেছে। জনগণ নয়—ইসলামবিরোধী শক্তিই বর্তমান সরকারের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। এমতাবস্থায় এই সরকারের সদিচ্ছার উপর ভরসা না করে সৌদি আরবকে নিজেদের গোয়েন্দা সংস্থা দ্বারা অথবা বন্ধুপ্রতীম গোয়েন্দা সংস্থা দ্বারা প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটন করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। প্রকৃত দোষীদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৩. আমার ব্যক্তিগত ধারণা হলো—বাংলাদেশের বর্তমান সরকার বা সরকারি দল এই অপকর্মের সাথে জড়িত নয়। কিন্তু তারা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সহযোগিতায় ক্ষমতাসীন হওয়ায় প্রভুদেশের বিরুদ্ধে কোনো কিছু করার ব্যাপারে ক্ষমতাহীন ও ভীত।

৪. কূটনীতিক খালাফ-আল-আলী হত্যাকাণ্ডকে বিচ্ছিন্নভাবে চিন্তা না করে

www.pathagar.com

পাকিস্তানে সৌদি কূটনীতিক হত্যা, যুক্তরাষ্ট্রে সৌদি কূটনীতিক হত্যাপ্রচেষ্টা ও দোষারোপ, ভারত-থাইল্যান্ড ও জর্জিয়ায় ইসরাইলী কূটনীতিক হত্যাপ্রচেষ্টা ও দোষারোপের আলোকে বিচার করলে বিশ্বরাজনীতির আলোকে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সহজ হবে। এর মাধ্যমে দোষী ব্যক্তি বা শক্তিকে চিহ্নিত করে ভবিষ্যত করণীয় নির্ধারণ করা সহজ হবে।

৫. প্রাপ্ত তথ্যমতে খালাফ-আল-আলী চলতি মাসেই তাঁর নতুন কর্মস্থল জর্ডানের রাজধানী আম্মানে যোগ দেয়ার কথা ছিল। তাঁর জর্ডানে যোগ দেয়ার ব্যাপারে ইসরাইল বা অন্য কোনো শক্তির স্বার্থ জড়িয়ে আছে কিনা তাও খতিয়ে দেখতে হবে।

৬. **বাংলাদেশ এখন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অভয়ারণ্য। তাঁবেদার সরকার রক্ষার নামে, দূতাবাস পাহারার অজুহাতে এবং প্রশিক্ষণ প্রদানের বাহানায় একাধিক সাম্রাজ্যবাদী দেশের সৈন্য ও বিশেষ বাহিনী এদেশে অবস্থান করার কথা পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে জানা গেছে। এমতাবস্থায় সাম্রাজ্যবাদী শক্তির স্বার্থে যে কেউ হত্যাকাণ্ডের শিকার হতে পারে।**

পরিশেষে মরহুম খালাফ-আল-আলীর রুহের মাগফিরাত কামনা করছি এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

এপ্রিল ২০১২

www.pathagar.com

রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সাফল্যগাথা : বিশ্ববাসীর প্রত্যাশা

অন্যায়-অত্যাচার, জুলুম-নির্যাতন, আগ্রাসন ব্যক্তি প্রতিভা ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি অর্জনের স্বাধীনতা না থাকায় এবং কমিউনিস্ট আদর্শের দেউলিয়াপনায় ১৯৯০ সালে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম শক্তি সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে পড়লে সমগ্র পূর্ব ইউরোপ অস্থিতিশীল হয়ে পড়ে। এতদিন কমিউনিস্ট বিশ্বের জনগণ সম্পর্কে মুক্তবিশ্ব খুব কমই জানতো। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার পর বিশ্ববাসী অবাক বিস্ময়ে দেখল—কমিউনিস্টরা প্রগতিশীলতার নামে সমগ্র পূর্ব ইউরোপকে অশেষ দুর্গতির মধ্যে নিক্ষেপ করেছে। মুষ্টিমেয় কিছু পার্টি কমরেড ব্যতীত সমগ্র জনগোষ্ঠী তখন ভিখারী ও শ্রমদাস মাত্র। বন্ধ দুয়ার খোলার পর দেখা গেল রুশ তরুণীরা শুধুমাত্র পেটের দায়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গিয়ে দেহব্যবসায় লিপ্ত হয়েছে। পূর্ব ইউরোপ ও রাশিয়ার সাধারণ লোকজন দারিদ্র্য থেকে বাঁচতে সংশ্লিষ্ট দেশের মেশিনারী পার্টস, হরেক রকমের অস্ত্রশস্ত্র এমনকি পারমাণবিক জ্বালানিও চুরি করে বিক্রি করছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভাঙার নেপথ্য চক্রান্তকারী পাশ্চাত্য শক্তি তখন মনের আনন্দে পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোর অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলছে এবং রাশিয়া যাতে আর কখনো বিশ্বের বুকে মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে তার জন্য চক্রান্ত-ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। তীব্র বেকারত্ব, মূল্যস্ফীতি, সামাজিক-রাজনৈতিক অরাজকতা, রাশিয়াকে তখন পতনের চূড়ান্ত পর্বে উপনীত করেছে। এরূপ অবস্থা প্রেসিডেন্ট পুতিনের ক্ষমতাগ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। ভ্লাদিমির পুতিনের সফলতা ও কৃতিত্বের আলোচনা সম্পন্ন করতে হলে তাই পাঠককে পুতিন-পূর্ব রাশিয়ার অবস্থা ও পুতিন-পরবর্তী রাশিয়ার তুলনামূলক অবস্থা পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে। উভয়দিক পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে পুতিন বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে জ্ঞানী ও যোগ্য প্রেসিডেন্ট। তাঁর পাশে আর যাদের নাম আসতে পারে তাঁরা হলেন মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মোহাম্মদ, ইরানের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আহমেদিনেজাদ ও তুর্কী প্রধানমন্ত্রী রজব তাইয়েব এরদোগান। এতদসত্ত্বেও আন্তর্জাতিক জ্ঞান ও কার্যক্রম বিচার করলে প্রেসিডেন্ট পুতিনই বর্তমান বিশ্বের শ্রেষ্ঠ প্রেসিডেন্ট ও দেশনায়ক হিসেবে বিবেচিত হবেন। প্রেসিডেন্ট পুতিন সম্পর্কে সম্যক অবহিত

www.pathagar.com

হওয়ার জন্য তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবন-বৃত্তান্ত উল্লেখ করা হলো—

ভ্লাদিমির ভ্লাদিমিরোভিচ পুতিন

জন্ম : ৭-১০-১৯৫২, স্থান-লেলিনগ্রাদ (বর্তমান সেন্ট পিটার্সবার্গ) পিতা-U.S.S.R নেভীর সাবমেরিন ইউনিটের চাকুরে, মা কারখানা শ্রমিক। দাদা–লেলিন, লেনিনের স্ত্রী ও স্টালিনের বাবুর্চি ছিলেন। পুতিনের বংশ মধ্যযুগের রাজকীয় Tverskov family'র সাথে সংযুক্ত। Putin বংশীয় খেতাব।

শিক্ষা : ১৯৭৫ সালে লেনিনগ্রাদ এস্টেট ইউনিভার্সিটির আন্তর্জাতিক আইন শাখা থেকে গ্রাজুয়েট। তাঁর ডক্টরেট থিসিস ছিল The Strategic planning of Regional Resources Under the formation of Market relations. তাঁর ব্যবসায়ীক আইনের শিক্ষক আনাতোলী Sobchak তাঁর ক্যারিয়ার গঠনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন।

রাজনীতি : বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে তিনি U.S.S.R এর একমাত্র দল কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হন। ১৯৯১ সাল উক্ত পাটি বিলুপ্ত হওয়া পর্যন্ত সদস্য ছিলেন। ১৯৯৭ সালে সরকারপন্থী রাজনৈতিক দল Our home is Russia পার্টিতে যোগ দেন এবং Saint Petersburg শাখার নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর তিনি The United Russia পার্টি গঠন করে বর্তমানে এর নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

কৃতিত্ব : রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, অর্থনৈতিক অগ্রগতি, ১৯৯০-এর সমস্যা সামলে নেয়া, প্রথম প্রেসিডেন্সির সময় GDP প্রবৃদ্ধি ছিল ৭৩%, ম্যাক্রো ইকোনমিক ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন, পুঁজিপ্রবাহ বৃদ্ধি, বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণ, নতুন তেল-গ্যাস পাইপলাইন স্থাপন। তাঁর জ্বালানি নীতি রাশিয়াকে জ্বালানী সুপারপাওয়ার করেছে, স্যাটেলাইট নেভিগেশন System স্থাপন, আন্তর্জাতিকমানের অবকাঠামো নির্মাণ।

সংস্কার : সেনা ও পুলিশ বাহিনী, জ্বালানিনীতি, উচ্চ প্রযুক্তির শিল্প স্থাপন, আধুনিক নিউক্লিয়ার Plant, প্রতিরক্ষা শিল্প।

চাকরি : গ্রাজুয়েশনের পর তিনি কেজিবিতে ভর্তি হন। ট্রেনিঙের পর প্রথমে তিনি Counter Intellignce-এ এবং পরে বিদেশীদের Monitoring শাখায় কাজ করেন। ১৯৮৫ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত তিনি পূর্ব জার্মানিতে KGB'র দায়িত্ব পালন করেন। June 1990 থেকে তিনি লেনিনগ্রাদ State Universityর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক শাখায় যোগ দেন এবং ২০ আগস্ট ১৯৯১ তিনি লে. কর্নেল অবস্থায় কেজিবির চাকরিতে ইস্তফা দেন।

পিটারসবার্গ প্রশাসনে পুতিন

১. পিটারসবার্গ মেয়রের আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টা (১৯৯০-৯১)

২. মেয়র অফিসের বহিঃসম্পর্ক বিভাগের প্রধান (১৯৯১-৯৬)

www.pathagar.com

৩. সিটি প্রশাসনের উপপ্রধান।
৪. JSC News Paper-এর উপদেষ্টা পরিষদ প্রধান।
৫. সরকারপন্থী Our home is Russia পার্টির পিটার্সবার্গ শাখার প্রধান।

মস্কোয় পুতিন

১. ১৯৯৬-৯৮ সময়কালে প্রেসিডেন্ট বরিস ইয়েলেৎসিনের সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা বিভাগের ডেপুটি চিফ হন। এ সময় তিনি দেশে-বিদেশে থাকা সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্পদ ও কমিউনিস্ট পার্টির সম্পদ রুশ ফেডারেশনে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করেন।
২. ২৬-০৩-১৯৯৭ থেকে মে ১৯৯৮ পর্যন্ত ইয়েলিৎসিনের প্রেসিডেন্সিয়াল স্টাফ উপপ্রধান পদে কাজ করেন। তিনি ১৯৯৮ পর্যন্ত এর প্রেসিডেন্টের সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রধান ছিলেন।
৩. ২৫-৫-১৯৯৮ তারিখে তিনি প্রেসিডেন্সিয়াল স্টাফ-এর প্রথম ডেপুটি প্রধান পদে নিযুক্ত হন এবং দেশকে অনেক অপ্রয়োজনীয় ও অবাঞ্ছিত চুক্তি থেকে রক্ষা করেন।
৪. ২৫-৭-১৯৯৮ থেকে আগস্ট ১৯৯৯ পর্যন্ত তিনি KGB সংশ্লিষ্ট এজেন্সী FSB-এর প্রধান নিযুক্ত হন। ০১-১০-১৯৯৮ তারিখে তাঁকে রুশ ফেডারেশনের নিরাপত্তা কাউন্সিলের স্থায়ী সদস্য নিয়োগ করা হয়। মার্চ ১৯৯৯ সালে তিনি এ কাউন্সিলের সেক্রেটারী নির্বাচিত হন।

প্রথম প্রধানমন্ত্রিত্ব

১. ৯-৮-১৯৯৯ সালে তাঁকে তিনজন উপ-প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে প্রথম উপ-প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করা হয়। একইদিন সংসদের (ডুমা) ভোটে তাঁকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করা হয়।
২. চেচনিয়াভিত্তিক আন্তর্জাতিক ইসলামী ব্রিগেড দাগেস্তান আক্রমন করলে পুতিন তা যথাযথভাবে সামাল দেন, ফলে দেশব্যাপী তাঁর জনপ্রিয় ভাবমূর্তি তৈরি হয়।
৩. ডিসেম্বর ১৯৯৯-এ অনুষ্ঠিত সংসদ (ডুমা) নির্বাচনের পূর্বে নতুনভাবে গঠিত Unity Partyকে পুতিন সমর্থন দেন। তাঁর এই সমর্থন ডুমা নির্বাচনে ২৩.৩% ভোট সংগ্রহে সমর্থ হয়।

ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট পুতিন

১. ৩১/১২/১৯৯৯ তারিখে প্রেসিডেন্ট ইয়েলৎসিন অপ্রত্যাশিতভাবে পদত্যাগ করলে পুতিন সংবিধান মোতাবেক রুশ ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্টের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন।

www.pathagar.com

প্রেসিডেন্ট পুতিন (১ম মেয়াদ) ২০০০-২০০৪

২৬-০৩-২০০০ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে পুতিন ১ম রাউন্ডের নির্বাচনে ৫৩% ভোট পেয়ে বিজয়ী হন এবং ০৭-০৫-২০০০ তারিখে প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেন। দায়িত্ব গ্রহণের পরই তিনি কমিউনিস্ট আমলের ভূমি আইন, আয়কর আইন, শ্রম, প্রশাসন, বাণিজ্যিক, সিভিল ও ক্রিমিনাল আইনকে সংস্কার করে যুগোপযোগী করেন। তিনি জাতীয় সংগীত পরিবর্তন করেন, চেচেন সমস্যার সমাধান করেন।

দ্বিতীয় মেয়াদ (২০০৪-২০০৮)

১৪-০৩-২০০৪ তারিখে তিনি ৭১% ভোট পেয়ে ২য় মেয়াদে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। এই মেয়াদে তিনি স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, আবাসন ও কৃষিকে অগ্রাধিকার প্রকল্পের আওতায় আনেন, জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে উৎসাহ ও সহযোগিতা প্রদান করেন। তিনি রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নষ্টের দায়ে রাশিয়ার সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি মিখাইল Khodorkvoskyকে গ্রেফতার করে শাস্তির ব্যবস্থা করেন এবং পশ্চিমা মদদপুষ্ট ব্যক্তি ও গোষ্ঠীকে কঠোরভাবে দমন করেন। শিল্পোন্নয়নে তিনি ইতিবাচক সরকারি হস্তক্ষেপ প্রথা চালু করেন।

০৮-০২-২০০৮ তারিখে পুতিন State council-এর বর্ধিত সভায় "On the strategy of Russia's Development unitil 2020" শিরোনামে ভাষণ দেন। উক্ত ভাষণে ২০২০ সালের মধ্যে রাশিয়াকে উন্নতির শিখরে নেয়ার পথ, পন্থা ও প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

২য় প্রধানমন্ত্রিত্ব (২০০৮-২০১২)

৮-৫-২০০৮ পুতিনকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেন প্রেসিডেন্ট মেদভেদেভ।

১. ২০০৮-এর দ. ওসেটিয়া যুদ্ধে পুতিনের রাশিয়া ই-ইউ এবং মার্কিন মিত্র জর্জিয়াকে হারিয়ে দেয়।
২. ইউরোপ-আমেরিকায় মন্দা শুরু হলে রাশিয়ার পূর্ববর্তী সরকারের বিপুল আর্থিক রিজার্ভ এবং শক্তিশালী ব্যবস্থাপনা রাশিয়াকে মন্দার হাত থেকে রক্ষা করে শক্তিশালী ও স্থিতিশীল অর্থনীতির দেশে পরিণত করে।

তৃতীয় প্রেসিডেন্সী

৪-৩-২০১২ প্রথম রাউন্ডের ভোটে ৬৩.৬% ভোট পেয়ে পুতিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ৭-৫-২০১২ তারিখে পুতিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেন।

www.pathagar.com

পুতিনের কৃতিত্ব

তাঁর ৮ বছরে প্রেসিডেন্সীর সময় শিল্পে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৭৬%, বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়েছে ১২৫%, কৃষি উৎপাদন ও নির্মাণ শিল্প বৃদ্ধি পেয়েছে দ্বিগুণ, গড়ে মাথাপিছু মাসিক বেতন বৃদ্ধি পেয়েছে ৮০ ডলার থেকে ৬৪০ ডলারে। ২০০০ সাল থেকে ২০০৬ সালের মধ্যে মধ্য আয়ের জনসংখ্যা ৮ মিলিয়ন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৫৫ মিলিয়নে উপনীত হয়েছে। ২০০৮ সালনাগাদ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করা জনগণের হার ৩০% শতাংশ থেকে কমে ১৪% হয়েছে।

শিল্পোন্নয়ন

তাঁর শাসনামলে পৃথিবীর সব বড় বড় অটোমেটিভ শিল্পোদ্যোক্তারা রাশিয়ায় নিজেদের কারখানা স্থাপন করেছে। এর মধ্যে রয়েছে Ford motor company, Toyota, General motors, Nissan, Hyundai motor, Suzuki, Magna International, Scania and MAN SE. প্রভৃতি।

এনার্জি পলিসি

পুতিনের গৃহীত Energy policy রাশিয়াকে ২০০৫ সালনাগাদ এনার্জি সুপারপাওয়ারে পরিণত করেছে। তিনি কৃষ্ণসাগরের তলদেশ দিয়ে 'ব্লু স্ট্রিম' নামক রাশিয়া-তুরস্ক গ্যাস পাইপলাইন স্থাপন করেছেন, তিনি বাল্টিক সাগরের তলদেশ দিয়ে পৃথিবীর এযাবতকালের বৃহত্তম পাইপলাইন স্থাপন করেছেন যার নাম 'নর্ড স্ট্রিম' যা রাশিয়ার সাথে জার্মানিকে সংযুক্ত করেছে। তিনি কৃষ্ণসাগরের তলদেশ দিয়ে বলকানের রাজ্যসমূহ ও ইতালীর সাথে 'সাউদার্ন স্ট্রিম' নামক পাইপলাইন স্থাপনের কার্যক্রম হাতে নিয়েছেন। তিনি তুর্কমেনিস্থানের গ্যাস ক্রয় করে রুশ পাইপলাইনের সাথে সংযুক্ত করার জন্য 'Nabucco' নামক প্রকল্পের ব্যাপারে কার্যক্রম শুরু করেছেন। এভাবে সমগ্র ইউরোপ ও মধ্য এশিয়া পর্যন্ত রাশিয়ার জ্বালানি আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

অন্যদিকে চীন, জাপান ও কোরিয়ায় তেল সরবরাহের জন্য পুতিন Trans Siberian oil pipeline প্রকল্প গ্রহণ করেছেন। রাশিয়ার দূরপ্রাচ্যে (Far East) গ্যাস সরবরাহের জন্য শাখালীন-খবরোভস্ক-ভ্লাডিভস্টক গ্যাস পাইপলাইন প্রকল্প গ্রহণ করেছেন। আন্তর্জাতিক বাজারে সরবরাহের জন্য শাখালীনে LNG প্লান্ট স্থাপন করেছেন। বাল্টিক পাইপলাইন-২-এর সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্য ফিনল্যান্ড উপসাগরে Ust-Luga পোর্ট নির্মাণ করা হয়েছে। তাতারস্থানসহ রাশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলে বড় বড় তেল রিফাইনারি স্থাপন করা হয়েছে। ২০১৫ সালের মধ্যে পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন ও শিল্পোন্নয়নের লক্ষ্যে ফেডারেল বাজেটে

www.pathagar.com

৪২.৭ বিলিয়ন ডলার বরাদ্দ রাখা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় Rosatom কর্পোরেশন বর্তমানে দেশে-বিদেশে অনেকগুলো পরমাণু বিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপন করছে।

জাতীয় ধর্মনীতি : অর্থডক্স খ্রিস্টানিটি, ইসলাম, বৌদ্ধধর্ম ও ইহুদীধর্মকে পুতিনের রাশিয়া নিজেদের ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। চার্চ, মসজিদ, ইহুদী উপাসনালয় নির্মাণ, প্যাগোডা নির্মাণ এবং ধর্মচর্চা ও ধর্মীয় শিক্ষাগ্রহণকে আইনানুগ বৈধতা দিয়ে সহযোগিতা করা হচ্ছে। উত্তর ককেসাস ও অন্যান্য মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে পুতিনের United Russia পার্টি বিপুল সমর্থন পেয়েছে। রাশিয়ার ইহুদী কমিউনিটি পুতিনকে ও তার দলকে স্থিতিশীল রাশিয়ার অপরিহার্য শক্তি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

সামরিক সংস্কার : ২০০০ সাল থেকে রাশিয়া সামরিক খাতে অধিকতর ব্যয় করা শুরু করেছে। ২০০৮ সাল থেকে পূর্ণ মাত্রায় সামরিক বাহিনীর আধুনিকায়ন শুরু করা হয়েছে। সামরিক বাহিনীকে বড় না করে গুণগত মান বৃদ্ধি করে অধিকতর কার্যকর করার লক্ষ্যে এর সদস্য সংখ্যা ১০ লাখে নামিয়ে আনা হয়েছে। অফিসারের সংখ্যা কমানো হয়েছে। সেন্ট্রাল কমান্ডের আকার ছোট করা হয়েছে। সামরিক প্রশিক্ষণের জন্য ইতিপূর্বেকার ৬৫টি স্কুলের পরিবর্তে বর্তমানে ১০টি কৌশলগত সামরিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। সামরিক বাহিনীর পরিবহন ও অন্যান্য বেসামরিক কাজে বেসামরিক ব্যক্তিদের নিয়োগ বৃদ্ধি করা হয়েছে। রিজার্ভ বাহিনী পুনর্গঠন করা হয়েছে। পূর্বের পদ্ধতি বাদ দিয়ে আর্মিকে ব্রিগেড System-এ পুনর্গঠিত করা হয়েছে। বিমানবাহিনীর রেজিমেন্ট পদ্ধতি পরিবর্তন করে Air base System-এ পুনর্গঠিত করা হয়েছে। মিলিটারি ডিস্ট্রিক্ট-এর সংখ্যা কমিয়ে চারটি করা হয়েছে। অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র, বিমান ও যুদ্ধজাহাজ দিয়ে সেনাবাহিনীকে সাজানো হয়েছে। ১ ডিসেম্বর ২০১১ থেকে রাশিয়ান স্পেস ফোর্সেসকে পরিবর্তন করে Russian Aerospace Defence Sytem করা হয়েছে।

পুতিনের কৃতিত্বের স্বীকৃতি

১. সেপ্টেম্বর ২০০৬ সালে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট জ্যাঁক শিরাক পুতিনকে ফ্রান্সের সর্বোচ্চ খেতাব 'Grand Cross' প্রদান করেন। উভয় দেশের মধ্যে স্থাপিত বন্ধুত্বের নিদর্শনস্বরূপ এই পদক প্রদান করা হয়।
২. বিশ্বখ্যাত টাইম ম্যাগাজিন ২০০৭ সালে পুতিনকে Person of the year নির্বাচিত করে সম্মানিত করেন।
৩. ১২ ফেব্রুয়ারি ২০০৭ সালে সৌদি বাদশাহ আবদুল্লাহ পুতিনকে সে দেশের সর্বোচ্চ বেসামরিক পদক King Abdul Aziz Award প্রদান করেন।
৪. ১০ সেপ্টেম্বর ২০০৭ সালে সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রেসিডেন্ট খলিফা বিন

www.pathagar.com

যায়েদ আল-নাহিয়ান সে দেশের সর্বোচ্চ বেসামরিক পদ Order of Zayed প্রদান করেন।

৫. রাশিয়ার Business weekly 'এক্সপার্ট ম্যাগাজিন' ডিসেম্বর ২০০৭ সালে পুতিনকে Person of the year নির্বাচিত করে সম্মানিত করেন।

৬. চেচেন প্রেসিডেন্ট রমজান কাদিরভ চেচনিয়ার রাজধানী গ্রোজনীর কেন্দ্রীয় সড়ক Victory Avenue-এর নাম পরিবর্তন করে Vladimir Putin Avenue নামকরণ করেন।

৭. ফেব্রুয়ারি ২০১১ সালে কিরগিজিস্থানের পার্লামেন্ট সে দেশের তিয়ানসান পর্বতের চূড়ার নাম রাখেন Vladimir Putin Peak.

৮. ১৫ নভেম্বর ২০১১ সালে চীনের International Peace research center পুতিনকে Confucius Peace Prize প্রদান করে।

৯. ২০১১ সালে সার্বিয়ার University of Belgrade পুতিনকে অনারারী ডক্টরেট ডিগ্রী দিয়ে সম্মানিত করেন।

১০. ২৫-০৬-২০১২ তারিখে প্রেসিডেন্ট পুতিনের জেরুজালেম সফরকালে ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস যীশুখ্রিস্টের জন্মস্থান বেথলেহেমের একটি সড়ক প্রেসিডেন্ট পুতিনের নামে নামকরণ করার আদেশ প্রদান করেন।

উপরোক্ত তথ্য-উপাত্তের মাধ্যমে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, ব্যক্তি প্রতিভা অস্বীকারকারী বা দমনকারী সোভিয়েত ইউনিয়ন ও কমিউনিস্ট সরকার বিলুপ্ত না হলে আমরা ভ্লাদিমির পুতিনের ন্যায় বিশ্বমানের প্রতিভা কখনও খুঁজে পেতাম না। **তাঁর শিক্ষাজীবন, চাকরিজীবন ও রাজনৈতিকজীবন পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই, তিনি একজন মেধাবী অর্থনীতিবিদ ও আন্তর্জাতিক আইন বিশেষজ্ঞ, চাকরিজীবন থেকে তিনি শিখেছেন, কিভাবে জায়নিজম প্রতিহত করতে হয় এবং শত্রুর ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করতে হয়। রাজনৈতিকজীবনে তিনি শিখেছেন কিভাবে দেশপ্রেমিক হতে হয়, দেশপ্রেমিক সৃষ্টি করা যায়, কিভাবে একটি দেশ ও জাতিকে ঐক্যবদ্ধ ও সমৃদ্ধ করতে হয়। শিক্ষা-অভিজ্ঞতা ও সৃষ্টিশীলতা তাঁকে একজন প্রথমশ্রেণীর রাষ্ট্রনায়ক ও জাতীয় নেতায় পরিণত করেছে। তাঁর এই যোগ্যতা কাজে লাগিয়ে তিনি আন্তর্জাতিক বিশ্বকে বর্তমান ইউনিপোলার Sytem-এর জুলুম-অত্যাচার ও স্বেচ্ছাচারিতা থেকে রক্ষা করে Multipolar বিশ্বে পরিণত করতে সক্ষম হবেন।**

বিশ্ববাসীর প্রত্যাশা : মাল্টিপোলার বিশ্বব্যবস্থা

রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সাক্ষাৎকার, বক্তৃতা, রচিত প্রবন্ধ ও কার্যক্রমে এককেন্দ্রিক বিশ্বমোড়লের স্বেচ্ছাচারিতা ও অত্যাচার থেকে রক্ষা পেতে বিশ্বের

www.pathagar.com

নির্যাতিত মানবগোষ্ঠী আশাবাদী হয়ে উঠেছে। তাদের এই প্রত্যাশার কারণসমূহ নিম্নরূপ—

১. জানুয়ারি ২০০৭ সালে এক সাক্ষাৎকারে পুতিন বলেছেন, "রাশিয়া গণতান্ত্রিক Multipolar বিশ্ব দেখতে চায় এবং শক্তিশালী আন্তর্জাতিক আইন ও এর প্রয়োগ দেখতে চায়।

২. ১৬ অক্টোবর ২০০৭ সালে ইরান ভ্রমণের সময় তিনি সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, "সকল কাস্পিয়ান রাষ্ট্রসমূহের অধিকার রয়েছে বিনা প্রতিবন্ধকতায় শান্তিপূর্ণ পরমাণু কর্মসূচি পরিচালনা করার।"

৩. ১০ ফেব্রুয়ারি ২০০৭ সালে জার্মানির মিউনিখে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল—"Munich Conferrence on Security policy". উক্ত সম্মেলনে তিনি যে ভাষণ দেন তাকে পর্যবেক্ষকগণ ও গণমাধ্যমসমূহ "The turning point of the Russian forcign policy" হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তাঁর মিউনিখ ভাষণের মূল কথা ছিল—

   ক. তিনি যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটো নেতৃত্বাধীন এককেন্দ্রিক বিশ্বের নৈতিকতাহীন আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সমালোচনা করে বলেন, "Security for everyone is Security for all".

   খ. তিনি পশ্চিমাবিশ্ব কর্তৃক রাশিয়াকে গণতন্ত্র শিক্ষাদানের প্রচেষ্টাকে হিপোক্রেসি হিসেবে আখ্যায়িত করেন।

   গ. তিনি আন্তর্জাতিক আইন ও জাতিসংঘকে পাশ কাটিয়ে অথবা উপেক্ষা করে ন্যাটো ও ইইউ'র বিভিন্ন দেশে অতিরিক্ত বলপ্রয়োগকে বেআইনি সাব্যস্ত করেন।

   ঘ. তিনি ইউরোপে যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক মিসাইল ডিফেন্স সিস্টেম গড়ে তোলাকে নতুন অস্ত্র প্রতিযোগিতায় উস্কানি প্রদান সাব্যস্ত করেন।

   ঙ. তিনি যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটো কর্তৃক রাশিয়াকে সামরিকভাবে ঘিরে ফেলার দায়ে অভিযুক্ত করেন।

পুতিন রচিত প্রবন্ধ : ২০১২ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পূর্বে ভ্লাদিমির পুতিন রুশ সংবাদপত্রে কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তন্মধ্যে একটির শিরোনাম ছিল— "New Integration Project of Euroasia- A future that is Being Born Tody" এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি আন্তর্জাতিক বিষয়ক প্রবন্ধ যা পরের আলোচনায় বুঝা যাবে।

চ. **G-20 সম্মেলন উপলক্ষে ওবামার প্রতি পুতিনের মন্তব্য—**

জুন-২০১২ সালে অনুষ্ঠিত G-20 সম্মেলনের অবকাশে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ওবামার সাথে রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিনের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

www.pathagar.com

বৈঠকে পুতিন ওবামাকে এই মর্মে সতর্ক করেন যে, কোনো দেশকে কে শাসন করবে তা নির্ধারণের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট দেশের জনগণের বাইরের কোনো শক্তির নয়।"

ছ. ২৫-০৬-২০১২ তারিখে তেল আবিব সফরকালে ইসরাইলি প্রেসিডেন্ট শিমন পেরেজকে এই মর্মে হুঁশিয়ারি প্রদান করেন যে, 'ইরানে হামলা চালালে ইসরাইলকে অনুতপ্ত হতে হবে। কারোরই খামখেয়ালিপূর্ণ কিছু করা উচিত হবে না।'

Multipolar world গঠনের প্রত্যাশা পূরণে বাধাসমূহ

১. **জায়নবাদ**—জায়নবাদী ইহুদীরা বিশ্বশাসন করতে চায়। তাদের লক্ষ্য পূরণে তারা ইতোমধ্যে অনেকদূর অগ্রসর হয়েছে। তাদের মূল কথা হলো- একজন ইহুদী বাদশাহ সমগ্র পৃথিবী শাসন করবে। এজন্য তারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়ে, পরিবারপ্রথা ভেঙে, মানুষের চরিত্র নষ্ট করে, জাতিসমূহকে নিস্তেজ করে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে চায়। আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, বর্তমান আমেরিকা ও ন্যাটো নিজ দেশ ও জনগণের ক্ষতি করে জায়নবাদীদের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করছে। পর্যবেক্ষকদের দৃঢ় সিদ্ধান্ত এই যে, প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী লীগ অব নেশন্স্ ও জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা জায়নবাদীদের বিশ্বশাসনের প্রাথমিক মডেল। আমার দৃঢ়বিশ্বাস সোভিয়েত আমলে কেজিবিতে চাকরি করার সুবাদে মি. পুতিন জায়নবাদ সম্পর্কে, এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে পরিপূর্ণ ওয়াকেবহাল। এমতাবস্থায় জায়নবাদ প্রভাবিত Unipolar বিশ্বকে Multipolar বিশ্বে পরিণত করার জন্য মি. পুতিনই সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি।

২. **The Great game plan**- উনবিংশ শতাব্দীতে রচিত এ Planটি কার্যকরের মাধ্যমে ব্রিটেন এবং পরবর্তীতে যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বশক্তি হিসেবে টিকে আছে। Multipolar বিশ্ব গড়তে হলে এই প্লানকে অবশ্যই অকার্যকর করতে হবে। সংক্ষেপে এই Planটি নিম্নরূপ—

ক. ইউরোয়েশিয়ান হার্টল্যান্ড (উত্তরে রাশিয়া, দক্ষিণে ইরান, পূর্বে চীন ও পশ্চিমে পূর্ব ইউরোপ ও উত্তর আফ্রিকা এলাকাকে ইউরোয়েশিয়ান হার্টল্যান্ড বলে) হিসেবে পরিচিত ভূভাগের ঐক্যকে যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের ন্যায় সমুদ্রে আধিপত্য বিস্তারকারী শক্তিসমূহ একটি ব্যাপক হুমকি হিসেবে দেখে থাকে। এ জন্য এ এলাকার দেশগুলোকে ছিন্নভিন্ন করা, ভেঙে দেয়া ও টুকরো করা আমেরিকা ব্রিটেন ও ফ্রান্সের স্থায়ী অনুসৃত নীতি। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন যৌথভাবে এ এলাকার দেশগুলোকে টুকরা করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

www.pathagar.com

পূর্ব ইউরোপকে রাশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করা, ভারত ও মধ্যপ্রাচ্যকে রাশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন রাখা ব্রিটেনের দীর্ঘস্থায়ী নীতি। বিংশ শতকের শুরুতে দার্শনিক Mackinder ব্রিটেনকে এই মর্মে সতর্ক করেন যে, "অদূর বা সুদূর ভবিষ্যতে রাশিয়া-চীন-ইরান ও ভারত যদি একটি একক অবস্থানে উন্নীত হয় তবে সাগরের কর্তৃত্ব যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও জাপানের হাত থেকে চলে যাবে। ম্যাকাইন্ডার আরো সতর্ক করেন যে, "সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব জনসংখ্যার আধিক্যের উপর নির্ভরশীল। সেক্ষেত্রে অধিক জনসংখ্যা অধ্যুষিত ইউরোয়েশিয়াকে বিভক্তকরণ, গ্রাসকরণ ও শাসন করার নীতি অবলম্বন না করলে কম জনসংখ্যা অধ্যুষিত পশ্চিম ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে দীর্ঘদিন আধিপত্য বজায় রাখা সম্ভব হবে না। ম্যাকাইন্ডার এবং অন্যান্য পশ্চিমা চিন্তাবিদরা আরো লক্ষ্য করেছেন যে, ইউরোয়েশিয়ান হার্ট ল্যান্ডে অবস্থিত দেশগুলোতে প্রায়ই ঐক্যের প্রবণতা দেখা যায়। এই স্বাভাবিক প্রবণতাকে প্রতিহত না করলে বিশ্ব আধিপত্য বজায় রাখা যাবে না। এ জন্যই ১ম ও ২য় বিশ্বযুদ্ধের পর যুক্তরাষ্ট্র-ব্রিটেন জোট মধ্যপ্রাচ্য, মধ্যএশিয়া, পূর্ব ইউরোপ, ভারত ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় অনেকগুলো জাতিসত্ত্বাকে স্বাধীন হওয়ার সুযোগ দিয়ে বিভক্ত করেছে।

৩. Rimland theory– নিকোলাস স্পাইক্স্ম্যানের রিমল্যান্ড থিওরি হার্বার্ট স্পেন্সার মতবাদ এবং হেনরি পাইরেনির থিওরি প্রায় একই কথার পুনরাবৃত্তি করেছে। স্নায়ুযুদ্ধের (Cold war) অবসানের পর Huntington সভ্যতার সংঘাতের যে তত্ত্ব হাজির করেছেন তাও মূলত ইউরোয়েশিয়ান হার্টল্যান্ডভিত্তিক পশ্চিমাদের দীর্ঘদিনের ভাবনার ফসল। তিনি মূল ধারণাকে আড়াল করার জন্য সভ্যতার সংঘাতের আবরণ পরিয়েছেন মাত্র। Huntington তত্ত্বের মূলকথা হলো– ইউরোয়েশিয়ান হার্টল্যান্ডে নয়টি ভিন্ন ভিন্ন সভ্যতা অবস্থান করছে। এদের পরস্পরের মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি করে এদের নিয়ন্ত্রণ ও গ্রাস করার জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ন্যাশন স্টেট স্থাপন করলে পশ্চিমা আধিপত্য অক্ষুণ্ন থাকবে।

৪. **গুরুত্বপূর্ণ করিডোর ও প্রণালী সংলগ্ন দেশের পাশ্চাত্যপন্থী সরকার—**

ক. ওয়াখান Corridoor—চীন, আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও মধ্যএশিয়ার সংযোগস্থল Wakhan corridoor দখলে রাখার প্রচেষ্টা সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষা। এ লক্ষেই আধিপত্যবাদী ব্রিটেন, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও আমেরিকা বারবার আফগানিস্তানে প্রবেশ করেছে এবং পরাজিত হয়ে ফিরে গেছে। এমতাবস্থায় আফগানিস্তান দখল না করে তথায় যুক্তরাষ্ট্র-ন্যাটো বিরোধী সরকার প্রতিষ্ঠাই এ সমস্যা

www.pathagar.com

সমাধানে সহায়ক হবে।

খ. প্রণালীসমূহ সংলগ্ন দেশ—বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক প্রণালীসমূহ হলো– সুয়েজ খাল, জিব্রাল্টার প্রণালী, এডেন উপসাগর, হরমুজ প্রণালী ও মালাক্কা প্রণালী। পশ্চিমা শক্তি সুয়েজ খাল নিয়ন্ত্রণে ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছে এবং মিসরে সবসময় তাঁবেদার শক্তি প্রতিষ্ঠা করেছে। জিব্রাল্টার প্রণালীর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার জন্য স্পেন ও মরক্কোয় মিত্রশক্তি বা তাঁবেদার সরকারকে ক্ষমতাসীন রেখেছে। এডেন উপসাগরকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সোভিয়েত আমলে ইয়েমেনকে দুইভাগে বিভক্ত করেছিল, সোভিয়েত পতনের পর ইয়েমেনকে একীভূত করা হয়েছে এবং ইয়েমেনে তাঁবেদার সরকার প্রতিষ্ঠা ও রক্ষায় সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে এবং সোমালিয়াকে অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত করেছে। হরমুজ প্রণালীর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার জন্য দীর্ঘদিন যাবৎ তৎসংলগ্ন ওমান ও ইরানে তাঁবেদার সরকার প্রতিষ্ঠা করেছিল। বর্তমানে ইরানে পাশ্চাত্যবিরোধী শক্তি প্রতিষ্ঠিত থাকায় পশ্চিমা শক্তি ইরানকে ধ্বংস করার জন্যে সকল প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে এবং বেলুচিস্তানকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করার কার্যক্রম পরিচালনা করছে। মালাক্কা প্রণালীর উপর পশ্চিমা আধিপত্য বজায় রাখার জন্য প্রথমে ইন্দোনেশিয়া থেকে মালয়েশিয়াকে বিচ্ছিন্ন করে স্বাধীন করেছে। পরবর্তীতে সিঙ্গাপুরকে মালয়েশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে স্বাধীন করেছে এবং পূর্বতিমুরকে ইন্দোনেশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে তাঁবেদার সরকার প্রতিষ্ঠা করেছে।

প্রত্যাশা পূরণে করণীয়

উপরোক্ত আলোচনা তথ্য-উপাত্ত ও থিওরির মাধ্যমে আমরা এই সত্যটি উপলব্ধি করেছি যে, Unipolar বিশ্বকে Multipolar বিশ্বে পরিণত করতে হলে বেশকিছু বাধা অপসারণ করতে হবে। তবে বর্তমান রুশ প্রেসিডেন্ট মি. পুতিনের ন্যায় যোগ্য ও বিজ্ঞ নেতৃত্ব এই বাধাসমূহ অপসারণে সক্ষম হবেন বলে আমরা আশাবাদী। প্রত্যাশা পূরণে করণীয় নিম্নরূপ—

১. **ঐতিহাসিক শত্রু-মিত্র চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নেয়া**—যেহেতু রাশিয়া এ কাজে নেতৃত্বের ভূমিকায় থাকবে, সেহেতু সর্বপ্রথম রাশিয়ার ঐতিহাসিক শত্রু-মিত্র চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নিতে হবে। ইউরোপে রাশিয়ার প্রধান ঐতিহাসিক শত্রু হলো ব্রিটেন। জার্মানি সাময়িক শত্রু কিন্তু জার্মানি থেকে বন্ধুত্ব আশা করা যেতে পারে।

২. **Zionism প্রতিহত করা**—যেসব দেশ ও দেশের জনগণ এককেন্দ্রিক বিশ্বের

www.pathagar.com

স্বেচ্ছাচারিতা ও জুলুম থেকে মুক্তি চায় তাদের অবশ্য কর্তব্য হবে জায়নীজম সম্পর্কে জানা ও বুঝা এবং বিজ্ঞ ও দেশপ্রেমিক ব্যক্তিদেরকে নিজ নিজ দেশ পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান।

৩. **ইউরোয়েশিয়ান হার্টল্যান্ডের ঐক্য প্রতিষ্ঠা**—SCO, Euroasian Union, Euroasian Trade জোন গঠনের মাধ্যমে ইতোমধ্যে এ কাজটি শুরু করা হয়েছে। তবে তুরস্ক ও ভারতকে এ প্রচেষ্টায় সামিল করা গেলে প্রচেষ্টাটি পরিপূর্ণতা পাবে। তবে ভারতে যতদিন পর্যন্ত বর্ণবাদী-ব্রাহ্মণ্যবাদী শাসকবৃন্দ ক্ষমতায় থাকবে, ততোদিন পর্যন্ত ভারত বর্ণবাদী ইসরাইল থেকে আলাদা হবে না। এ জন্য ভারতের শাসনক্ষমতা থেকে সংখ্যালঘু উগ্র বর্ণবাদী ও সাম্প্রদায়িক শাসকগোষ্ঠীকে অপসারণ করে সংখ্যাগরিষ্ঠ হরিজন, দলিত, মুসলিম ও অনার্য গোষ্ঠীকে ক্ষমতাসীন করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে এবং ১৯৪৭-পরবর্তী ভারত কর্তৃক জবরদখলকৃত দেশীয় রাজ্যসমূহের স্বাধীনতা আন্দোলনকে সমর্থন ও বেগবান করতে হবে। মূলত ভারতের বর্ণবাদী সংখ্যালঘু (৯%) উচ্চবর্ণের হিন্দুরা (৯১%) সংখ্যাগুরু ভারতীয়দের উপর নিজেদের আধিপত্য অব্যাহত রাখার জন্য বর্ণবাদী ইসরাইলের নেতৃত্বাধীন সাম্রাজ্যবাদীদের সাথে জোটবদ্ধ হয়েছে। সঠিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করলে তুরস্ককে ইউরোয়েশিয়ান হার্টল্যান্ডের ঐক্যপ্রতিষ্ঠায় কাজে লাগানো সহজ হবে। মধ্যএশিয়ার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী জাতিগতভাবে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তুর্কী জাতির সাথে সম্পর্কিত।

৪. Wakhan corridorকে কাজে লাগাতে হলে বর্তমান মার্কিন দখলদারিত্বের দ্রুত অবসান ঘটাতে হবে এবং আফগানিস্তানে পাশ্চাত্যবিরোধী শক্তিকে ক্ষমতাসীন করতে হবে। সুয়েজ খালের কর্তৃত্ব থেকে পশ্চিমা শক্তিকে সরাতে হলে মিসরের ব্রাদারহুডকে শক্তিশালী করতে হবে, সহযোগিতা করতে হবে যাতে তাঁবেদার কোনো শক্তি পুনরায় মিসরে ক্ষমতাসীন হতে না পারে এবং ইসরাইলের ব্যাপারে যথাযথ ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। জিব্রাল্টার প্রণালীর কর্তৃত্ব গ্রহণের জন্য মরক্কো এবং স্পেনে শক্তিশালী ও স্বাধীনচেতা সরকার প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করতে হবে। এডেন উপসাগরে যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃত্ব খর্ব করার জন্য ইয়েমেনের জনগণের সরকার গঠনে সহায়তা করতে হবে এবং সোমালিয়ায় স্বাধীনচেতা ও শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করতে হবে। হরমুজ প্রণালীকে আধিপত্যবাদীদের হাত থেকে নিরাপদ করতে হলে শক্তিশালী ইরানকে সর্বশক্তি দিয়ে রক্ষা করতে হবে এবং পাকিস্তানের স্থিতিশীলতা আনয়নে সহায়তা করতে হবে, মধ্যপ্রাচ্যের রাজতান্ত্রিক শাসকদের সাথে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি করে তাদেরকে মার্কিনবলয় থেকে বের করে আনার ব্যবস্থা করতে হবে। মালাক্কা প্রণালীর উপর পাশ্চাত্য শক্তির

www.pathagar.com

একাধিপত্য খর্ব করার জন্য বঙ্গোপসাগরে পাশ্চাত্যের আধিপত্য কমানোর ব্যবস্থা করতে হবে। বার্মা ও বাংলাদেশে শক্তিশালী ও আধিপত্যবাদবিরোধী সরকার প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা করতে হবে।

উপরোক্ত আলোচনা ও তথ্য-উপাত্তের মাধ্যমে আমরা দেখতে পাই, একাকেন্দ্রিক বিশ্বের অবসান করে Multipolar বিশ্ব গড়তে হলে যে কাজগুলো করা দরকার তার জন্য মুসলিম বিশ্বের সহায়তা প্রয়োজন। Cold war-এর সময় সোভিয়েত ইউনিয়ন মুসলিম বিশ্বের বিপরীতে অবস্থান করেছিল। ফলে অনেক মুসলিম দেশ হয়তো সোভিয়েত ইউনিয়ন ও রুশ ফেডারেশনকে একই চরিত্রের মনে করতে পারে। এই ভ্রান্তি নিরসনের জন্য প্রেসিডেন্ট পুতিনের আশু কর্তব্য হচ্ছে মুসলিম বিশ্বের বাছাই করা কিছুসংখ্যক বুদ্ধিজীবী নিয়ে একটি Think Tank গঠন করা। যে Think Tank মুসলমানদের মন থেকে ভুল ধারণা দূর করবে এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে মুসলমানদের শত্রু-মিত্র চিহ্নিত করে জাতিকে জানাবে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

জুলাই ২০১২

www.pathagar.com

সাম্রাজ্যবাদের তাবেদার সরকার এবং গৃহযুদ্ধ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে শক্তিশালী রাজা-বাদশাহ-একনায়ক কর্তৃক দুর্বল প্রতিবেশী দেশ দখল ছিল স্বাভাবিক বিষয়। তখন 'জোর যার মুল্লুক তার' নীতিই কার্যকর ছিল। সে সময় বিশাল আকারের ভূমির মালিক রাজশক্তি দূরবর্তী এলাকায় দখলিকৃত ভূখণ্ডে আশ্রিত রাজ্য ও করদ রাজ্য স্থাপন করত। ১ম ও ২য় বিশ্বযুদ্ধের পর সাম্রাজ্যবাদী দেশ দখল প্রক্রিয়া আধুনিকতার মুখোশ পরে এবং দখলে রাখার চেয়ে বিভিন্ন কৌশলে টার্গেটিরত দেশের সম্পদ লুণ্ঠন করার নীতি গ্রহণ করে। এ নীতিকে বৈধতা দেয় সাম্রাজ্যবাদ সৃষ্ট জাতিসংঘ। এভাবে আধুনিক সাম্রাজ্যবাদ প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। প্রাচীনকালে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি দখলিকৃত দেশের জনগণের ভালো-মন্দ, সুখ-দুঃখের ব্যাপারে কম-বেশি যত্নবান ছিল কিন্তু তথাকথিত আধুনিক সাম্রাজ্যবাদী শক্তি টার্গেটকৃত দেশের জনগণের সুখ-দুঃখ ভালো-মন্দ বা জীবন-মৃত্যু নিয়ে মাথা ঘামায় না। তাদের লক্ষ্যের কেন্দ্র বিন্দু হলো সংশ্লিষ্ট দেশকে লুণ্ঠন করা, গৃহযুদ্ধ লাগিয়ে দেশের জনগণকে নিশ্চিহ্ন বা ভূমিদাসে পরিণত করে ভূখণ্ডটি অবাধে ব্যবহার করার অধিকার লাভ করা। এ জন্য বর্তমান সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সংশ্লিষ্ট দেশে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে অথবা জোরপূর্বক তাবেদার শক্তি প্রতিষ্ঠা করে উক্ত তাবেদারকে দিয়ে দেশপ্রেমিকদের নিশ্চিহ্ন করার লক্ষ্যে গৃহযুদ্ধ বাধায় এবং গৃহযুদ্ধ বন্ধের অজুহাতে সংশ্লিষ্ট দেশে বহুজাতিক বাহিনী অথবা জাতিসংঘ বাহিনী প্রেরণ করে। উক্ত বাহিনীর কাজ হলো তাবেদার পুতুল সরকারকে রক্ষা করা এবং সাম্রাজ্যবাদী লুটপাট নির্বিঘ্ন করা। শোষণ-লুণ্ঠন নির্বিঘ্নে করার স্বার্থে তাবেদার সরকারের অনুষঙ্গ হিসেবে সংশ্লিষ্ট দেশে গৃহযুদ্ধ অনিবার্যভাবে সংগঠিত হয়। কেননা সংশ্লিষ্ট জাতির আত্মমর্যাদাসম্পন্ন স্বাধীনচেতা জনগণ তাবেদার সরকার ও তার প্রভুর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়।

বর্তমান সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মানসিকতা

বর্তমান সাম্রাজ্যবাদী শক্তির গডফাদার হলো যায়নবাদী ইসরাইল, গডফাদারের বরকন্দাজরা হলো—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ফ্রান্স, জার্মানি ও বর্ণবাদী ভারত। বর্ণবাদী ইহুদী ও বর্ণবাদী ব্রাহ্মণ্যবাদের মানসিকতা প্রায় একই অর্থাৎ "ভিন্ন বর্ণের জনগণের সর্বস্ব কেড়ে নেওয়াতে কোনো পাপ নেই, কেননা তাদের বিধাতার নিয়ম হলো- নিম্নবর্ণের জনগণের কোনো সম্পদ থাকা অপরাধ।" যুক্তরাষ্ট্র ও সাদা

www.pathagar.com

চামড়ার ইউরোপীয়দের মানসিকতা বোঝার জন্য নিম্নে তাদের কয়েকটি বিখ্যাত উক্তি উল্লেখ করা হলো :

১. "মৃত ইন্ডিয়ানদের চেয়ে ভালো ইন্ডিয়ান আমি আর কখনও দেখিনি" (আমেরিকার মাটি থেকে রেড ইন্ডিয়ানদের নিশ্চিহ্ন করার যুদ্ধে নিয়োজিত জেনারেল শেরিডানের উক্তি। এটা বর্তমানে আমেরিকানদের জনপ্রিয় প্রবচন)। (সূত্র : বই, আমারে কবর দিও হাঁটুভাঙ্গার বাঁকে, মূল : ডি ব্রাউন, অনুবাদ : দাউদ হোসেন, পৃ-১৪৮), ১ম সংস্করণ-১৯৯৭।

২. মার্কিন সেনাপতি, শিল্পপতি ও কংগ্রেসম্যান নিজেদের অস্ত্র ব্যবসার স্বার্থে বিশ্বে যুদ্ধ জিইয়ে রাখবে। (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মার্কিন সেনাপতি ও পরবর্তীতে প্রেসিডেন্ট জেনারেল আইসেন হাওয়ার)।

৩. আগামীকাল যদি সোভিয়েত ইউনিয়ন মহাসাগরে ডুবে বিলীন হয়ে যায় তবুও মার্কিন সামরিক শিল্প টিকে থাকা চাই আগের মতো, যে পর্যন্ত না অন্য কোনো প্রতিপক্ষ আবিষ্কার করা যায়। (উল্লেখ্য, বর্তমানে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি প্রতিপক্ষ হিসেবে নির্ধারণ করেছে উদীয়মান মুসলিম বিশ্ব ও চীনকে।) (জন কেনান, স্নায়ুযুদ্ধের রণকৌশলবিদ)

৪. আমরা বোমা বানাতে চাই—তাই আগে শত্রু বানাই। (স্যার সাইমন জেন্‌কিন্‌স, দি টাইমস এবং লন্ডন ইভিনিং-এর সাবেক সম্পাদক।)

৫. শান্তি দুর্বলের জন্য, প্রকৃত মানুষেরা বোমা কেনে আর সেগুলো উপর থেকে ফেলে। (মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রবার্ট গেটস এর বিদায়ী ভাষণ থেকে)

উল্লেখ্য, সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন যতদিন কম্যুনিস্ট শাসনাধীন ছিল ততদিন তারাও সাম্রাজ্যবাদী ছিল। সমাজতন্ত্রের তাত্ত্বিক কার্ল মার্কস থেকে শুরু করে রুশ কম্যুনিস্টদের প্রায় সকল নেতাই ছিল যায়নবাদী ইহুদী।

উপরোক্ত ৩ ও ৪নং উক্তির অনুষঙ্গ হিসেবে মার্কিন বুদ্ধিজীবী হান্টিংটন রচনা করে "সভ্যতার সংঘাত" থিওরী। সোভিয়েত ইউনিয়নের সলিল সমাধির পর হান্টিংটনের নির্দেশনা মোতাবেক উদীয়মান মুসলিম বিশ্ব ও চীন হয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তির নতুন প্রতিপক্ষ। তখন থেকে বোমা বানিয়ে উপর থেকে নিক্ষেপ করা হচ্ছে মুসলিম বিশ্বের উপর এবং একশ্রেণীর নামধারী মুসলিম, (যারা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী, ধর্ম ব্যবসায়ী ও কম্যুনিস্ট হিসেবে পরিচিত) সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দোসর ও তাবেদার হিসেবে নিজ দেশ ও জনগণকে সীমাহীন দুর্দশায় নিমজ্জিত করেছে ও করার চেষ্টা করছে। পাশাপাশি চীনকেও চতুর্দিক থেকে ঘেরাও করার কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

বর্তমান সাম্রাজ্যবাদীদের মুসলিম দেশ দখল প্রক্রিয়া

যায়নবাদী ইহুদীগণ কর্তৃক রচিত উনবিংশ শতাব্দীর বিভিন্ন মতবাদ যথা—

www.pathagar.com

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী মতবাদ, সমাজতান্ত্রিক মতবাদ, ডারউইনিজম, ভৌগোলিক, আঞ্চলিক, ভাষাগত জাতীয়তাবাদী মতবাদসমূহ এবং বস্তুবাদী ও ভোগবাদী সভ্যতা উন্নত তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। এতে বিশ্বের প্রতিটি দেশে নীতি-নৈতিকতাহীন পাশ্চাত্যপন্থী অসংখ্য তাবেদার সৃষ্টি হয়। চরিত্রহীন, লম্পট, মদ, নারী ও নেশায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত এসব মেরুদণ্ডহীন লোভী ব্যক্তিদেরকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি দেশে বিদেশে গুরুত্বপূর্ণ পদে পদায়ন করে প্রতিষ্ঠিত করে। সময় সুযোগ মতো এদেরকে অর্থ-বিত্ত ক্ষমতার লোভ দেখিয়ে নিজ দেশ ও জনগণের সর্বনাশ সাধনে কাজে লাগায় এবং এদেরকে দিয়ে তাবেদার সরকার ও দল গঠন করে। যে সকল সেক্টর থেকে সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের এজেন্ট রিক্রুট করে তা হলো :

নৈরাজ্যবাদী কম্যুনিস্ট, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী দল ও গোষ্ঠী, জাতিসংঘ-বিশ্বব্যাংক-আইএমএফ-আমেরিকান সিটি ব্যাংক-এর সংশ্লিষ্ট দেশের কর্মচারী, সাম্রাজ্যবাদী দেশ কর্তৃক পরিচালিত বহুজাতিক কোম্পানি ও এনজিওর কর্মচারী, গোত্রীয় জাতিগত ধর্মীয় সংখ্যালঘু গোষ্ঠী, পাশ্চাত্যপন্থী বুদ্ধিজীবী, চরিত্রহীন-লম্পট-অর্থ আত্মসাৎকারী ব্যক্তি, পলাতক সন্ত্রাসী, নেশাখোর ব্যক্তি, দুর্নীতিপরায়ণ ও লোভী রাজনীতিক-সামরিক কর্মকর্তা-আমলা ও ব্যবসায়ী, যায়নবাদী ইহুদীগণ কর্তৃক পরিচালিত লায়ন ও রোটারী ক্লাব সদস্য, কাদিয়ানী ও বাহাই সম্প্রদায়, ইসকন ধর্ম ব্যবসায়ী মোল্লাহ, সংখ্যালঘু ফেরকার লোকজন যথা—বিদেশী মদদপুষ্ট পীর-ফকির-কবর পূজারী-মাযার পূজারী ইত্যাদি সেক্টরের স্বদেশী ব্যক্তিবর্গ। বর্তমান বিশ্বের সকল তাবেদার দল ও সরকারের শ্রেণীচরিত্র একই। সাম্রাজ্যবাদীরা সব সময় সংখ্যালঘু ও চরিত্রহীনদের নিয়ে তাবেদার দল ও সরকার গঠন করে। যাতে সংখ্যালঘুদের নিয়ে গঠিত সরকার সংখ্যাগুরুদের ভয়ে সাম্রাজ্যবাদের পক্ষপুটে আশ্রয় নিয়ে করদ রাজ্যে বা আশ্রিত রাষ্ট্রে পরিণত হয়। কয়েকটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি প্রমাণিত হবে—

১. আমাদের ফখরুদ্দীন, ভারতের মনমোহন সিং, আফগানিস্তানের হামিদ কারজাই ও ইরাকের নূরী আল মালিকী বিশ্বব্যাংক ও বহুজাতিক কোম্পানি কর্মকর্তা ছিলেন।

২. ভারত ত্যাগের প্রাক্কালে সাম্রাজ্যবাদী বৃটেন ভারতের সংখ্যালঘু ব্রাহ্মণদের নিকট (যারা তখন ছিল ৭% এবং বর্তমানে ৯%) ভারতের শাসনভার হস্তান্তর করে। এই সংখ্যালঘুরা ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ ৯১% লোকের ভয়ে সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা-ইসরাইল ও বৃটেনের সাথে গাঁটছড়া বেঁধে ক্ষমতা চিরস্থায়ী করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত।

৩. ২য় বিশ্বযুদ্ধের পর সাম্রাজ্যবাদী শক্তি বিভিন্ন দেশে যাদেরকে ক্ষমতাসীন করে তারা ছিল সংখ্যালঘু। যথা—

ক. সিরিয়ায় যে হাফেজ-আল আসাদ সরকার প্রতিষ্ঠা করা হয় সে সরকারের

www.pathagar.com

শাসক সম্প্রদায়, বড় ব্যবসায়ী ও সামরিক কর্মকর্তারা আলভী শিয়া (মাত্র ৭%) অথচ সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ সুন্নী মতাবলম্বী।

খ. বাহরাইনের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ শিয়া কিন্তু শাসক সম্প্রদায় সুন্নী।

গ. মিসরের চলমান নির্বাচনের ফলাফলে দেখা যাচ্ছে- সে দেশের ৬৫% জনগণ ইসলামপন্থী; এমতাবস্থায় মিসরে যাতে ইসলামপন্থীরা ক্ষমতাসীন হতে না পারে সে লক্ষ্যে কাজ করছে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। ফিলিস্তিন ও আলজেরিয়ার ইতিহাসও একইরূপ।

তাবেদার সরকারের দেশে গৃহযুদ্ধ বাধানোর নিয়ম

পূর্বেই বলা হয়েছে কিরূপ শ্রেণীচরিত্রের লোকজন দিয়ে টার্গেটকৃত দেশে তাবেদার দল, জোট ও সরকার গঠন করা হয়। **যেহেতু ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে সংখ্যালঘুদেরকে দিয়ে তাবেদার সরকার গঠন করা হয় সেহেতু সংখ্যাগুরু দেশপ্রেমিক জনগণ তাবেদার সরকার ও তার প্রভুর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। এমতাবস্থায় তাবেদার সরকার ক্ষমতা হারানোর ভয়ে সাম্রাজ্যবাদের সাথে দেশবিরোধী গোলামী চুক্তি করে, দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ও মর্যাদাকে সাম্রাজ্যবাদের পদতলে বিসর্জন দেয়। এমতাবস্থায় সংখ্যাগুরু-সংখ্যালঘু দ্বন্দ্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ সময় প্রভু রাষ্ট্রের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী তাবেদার সরকার এমন সব পদক্ষেপ গ্রহণ করে, যা দেশকে গৃহযুদ্ধে নিমজ্জিত করে।** পদক্ষেপসমূহ হলো—

১. দেশপ্রেমিক জনগণের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দকে বিভিন্ন অজুহাতে আটক করে এবং বিচারের নামে তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

২. সংখ্যাগুরু দেশপ্রেমিক শক্তিকে শক্তিহীন করার জন্য দেশব্যাপী গুপ্তহত্যা, গুম, হামলা-মামলা ও অরাজকতা সৃষ্টি করে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে।

৩. পারিবারিকীকরণ, গোত্রীয়করণ, আত্মীয়করণ ও দলীয়করণের মাধ্যমে দেশের সামর্থ, সম্ভাবনা, বিশ্বাসযোগ্যতা, সুশাসন সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে আসে এবং দেশ দুর্বল ও পঙ্গু হয়ে সাম্রাজ্যবাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে বাধ্য হয়।

৪. সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সাথে অধীনতামূলক মিত্রতা চুক্তি করে ক্ষমতাকে দীর্ঘস্থায়ী করার প্রচেষ্টা নেয়া হয়। প্রতিবাদীদেরকে কঠোরহস্তে দমন করা হয়, মানবাধিকার ও নাগরিক অধিকার ভূলুণ্ঠিত হয়, দেশপ্রেমিকদের পিঠ দেয়ালে ঠেকে যায় এবং মরণপণ প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু হয়।

৫. প্রতিরোধ আন্দোলন নস্যাত করার জন্য বিভিন্ন কৌশলে মধ্যবিত্তের কোমর ভেঙে দেয়া হয়, লুটপাট ও অর্থপাচারের মাধ্যমে দেশকে তলাবিহীন ঝুড়িতে পরিণত করা হয় যাতে দেশে দুর্ভিক্ষ, অস্থিতিশীলতা ও গৃহযুদ্ধ শুরু হয়।

৬. আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগকে সাম্রাজ্যবাদের অনুকূলে সাজানো হয়, যাতে দেশপ্রেমিক সুনাগরিকরা কোথাও আশ্রয় বা বিচার না পায়।

www.pathagar.com

দুষ্টের লালন ও শিষ্টের দমন তাবেদার সরকারের স্থায়ী নীতিতে পরিণত হয়।

৭. সাম্রাজ্যবাদের আশীর্বাদপুষ্ট তাবেদার সরকারটির জনপ্রিয়তা তলানীতে এসে পৌঁছলে অস্বাভাবিকভাবে প্রধান তাবেদারকে সরিয়ে অধিকতর খারাপ ও নৃশংস অপর তাবেদারকে ক্ষমতাসীন করে সরকার গঠন করা হয়। এমতাবস্থায় গৃহযুদ্ধ চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়।

টার্গেটকৃত দেশকে কেন গৃহযুদ্ধে নিক্ষেপ করা হয়

১. টার্গেটকৃত দেশকে ভিতর থেকে ধ্বংস করা এবং দেশের প্রতিরোধ শক্তিকে ধ্বংস করাই এর প্রধান লক্ষ্য।

২. সাম্রাজ্যবাদীদের দরকার দেশটির সম্পদ ও ভূরাজনৈতিক অবস্থান। দেশটির জনগণ কতজন আহত-নিহত-পঙ্গু-বিধবা ও উদ্বাস্তু হলো তা দেখার দায়িত্ব সাম্রাজ্যবাদীদের নয়।

৩. নিরাপত্তাহীনতায় নিমজ্জিত ও ভবিষ্যতে বিচারের সন্মুখীন হওয়ার ভয়ে ভীত দুর্বল তাবেদার সরকারের উপর অনবরত চাপ সৃষ্টি করে বেশি বেশি স্বার্থ হাসিল করা।

৪. গৃহযুদ্ধ থামানোর নামে জাতিসংঘ বাহিনী বা আঞ্চলিক বাহিনী নিয়ে টার্গেটকৃত দেশের গুরুত্বপূর্ণ ভূরাজনৈতিক অবস্থান দখল করা ও সর্বাত্মক লুণ্ঠনকে স্থায়ী করা।

তাবেদার সরকারের বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ

১. যে সরকার দেশের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দেয় এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তির এজেন্ডা বাস্তবায়ন ও চাহিদা পূরণকে অগ্রাধিকার দেয়।

২. এ সরকারের বিদেশনীতি ও বাণিজ্যনীতি প্রণীত হয় সাম্রাজ্যবাদী আকাঙ্ক্ষার অনুকূলে এবং দেশ ও জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা, লাভ-ক্ষতি, ইতিহাস-ঐতিহ্যের প্রতিকূলে। তাবেদার সরকারের প্রধান শিখণ্ডী, তার পরিবার ও দলের অনুকূলে এবং দেশপ্রেমিক জনগণের প্রতিকূলে।।

৩. এ সরকার নিজেদের ব্যক্তি স্বার্থ, গোষ্ঠী স্বার্থ ও দলীয় স্বার্থ চাপিয়ে দেয় রাষ্ট্রের ঘাড়ে।

৪. সৎ, দক্ষ, অভিজ্ঞ ও দেশপ্রেমিক নাগরিকরা এ সরকার কর্তৃক নির্মম-নিষ্ঠুর নিপীড়নের শিকার হয় এবং লোভী, অসৎ, চোর-ডাকাত সমাজ ও দেশবিরোধীরা হয় পুরস্কৃত।

৫. এ সরকার সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সাথে বিভিন্ন গোলামী চুক্তিতে দেশকে আবদ্ধ করে। তন্মধ্যে অন্যতম হলো তাবেদার সরকারের গদিরক্ষা চুক্তি।

৬. জনগণের মৌলিক অধিকার, মানবিক অধিকার ও নাগরিক অধিকারকে পদদলিত করে।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত মুসলিম বিশ্ব
স্থিতিশীল সরকারের শর্তাবলী

তিউনিসিয়ায় শিক্ষিত বেকার যুবক কর্মসংস্থান ও ন্যায়বিচার না পেয়ে আত্মাহুতি প্রদানের মাধ্যমে যে ভয়াবহ রাজনৈতিক ভূমিকম্প জন্ম দিয়েছে তাই বর্তমানে সুনামির রূপ ধরে সমগ্র উত্তর আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের সব তাঁবেদার সরকারদের ভাসিয়ে নিয়ে যেতে শুরু করেছে। আধুনিক প্রযুক্তির কল্যাণে এ সুনামির প্রতিক্রিয়া বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়াটা অস্বাভাবিক নয়। সেক্ষেত্রে বিশ্বের তাবৎ তাঁবেদার সরকার, অত্যাচারী সরকার, জনবিরোধী সরকারসমূহের পায়ের তলার মাটি সরে যাবে নিঃসন্দেহে। ফরাসী বিপ্লবের জোয়ারে সমগ্র ইউরোপ ভেসে গিয়ে যেরূপ নবউদ্যমে, নবশক্তিতে বলীয়ান হয়ে বিশ্বব্যাপী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল ঠিক তদ্রূপ তিউনিসিয়ায় উত্থিত রাজনৈতিক ভূমিকম্পও মুসলিম বিশ্বের দেশে দেশে প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যবাদের গোলাম শাসকদেরকে নিকটস্থ সাগরে নিক্ষেপ করবে এবং মুসলমানদের হারানো গৌরব আবার ফিরে আসবে যদি আমাদের চিন্তাশীল নেতৃবৃন্দ এ অপার শক্তি ও সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে পারেন।

বিশ্বের বর্তমান সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের পাপের বোঝা কানায় কানায় পূর্ণ হয়েছে, তাদের সহযাগী তাঁবেদার সরকারসমূহ, একনায়ক স্বৈরাচারী শাসকসমূহকে অচিরেই নিজেদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। তাদের আচরিত জোর যার মুল্লুক তার নীতি, অমানবিক বস্তুবাদী সভ্যতা ও রক্তশোষক পুঁজিবাদী ব্যবস্থা অচিরেই বিলুপ্তির পথে এগিয়ে যাবে। কেননা অন্যায়, জুলুম ও মানবতাবিরোধী কার্যকলাপ দীর্ঘদিন অপ্রতিহত গতিতে চলতে পারে না, চলার ইতিহাস নেই। প্রত্যেক ক্রিয়ার যেমন সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া রয়েছে ঠিক তদ্রূপ ঢিলটি মারলে পাটকেল খেতে হয়।

উত্তর আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের যেসব দেশ পর্যায়ক্রমে সুনামিতে আক্রান্ত হচ্ছে তাদের মধ্যে তিন শ্রেণীর দেশ রয়েছে। প্রথম শ্রেণী হিসেবে আমরা চিহ্নিত করতে পারি সৌদি আরব, বাহরাইন ও মরক্কোকে। এই তিন দেশের শাসকশ্রেণী সাম্রাজ্যবাদের আশীর্বাদে ক্ষমতার মসনদ দখল করেনি বরং নিজেদের পূর্বপুরুষদের যোগ্যতায় স্ব-স্ব দেশে ক্ষমতাসীন হয়েছিল। দ্বিতীয় শ্রেণীতে যারা রয়েছে তাদের বেশির ভাগই যথা—আলজেরিয়া, মিসর, তিউনিসিয়া, ইয়েমেন,

www.pathagar.com

লিবিয়ার বর্তমানে বিতাড়িত শাসকগণ শুধুমাত্র ক্ষমতাসীন হওয়ার জন্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ইন্ধনে জনপ্রিয় সরকারকে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে উৎখাত করে ক্ষমতাসীন হয় এবং সাম্রাজ্যবাদের তাঁবেদার হিসেবে দেশ, জাতি ও ধর্মবিরোধী ভূমিকায় লিপ্ত হয়। তৃতীয় শ্রেণীর বর্তমান শাসক হিসেবে আমি তাদেরকে চিহ্নিত করব যারা নিজ জাতি ও ধর্মের বিরুদ্ধে গিয়ে ১ম ও ২য় বিশ্বযুদ্ধে তুর্কী সালতানাতের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে মুসলিম খেলাফত ধ্বংসে সাহায্য করার বিনিময়স্বরূপ সাম্রাজ্যবাদের আশীর্বাদে এক একটি দেশের শাসক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে স্বীয় দেশ-জাতি ও মুসলিম উম্মাহর অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করেছে। এরূপ দেশের শাসকরা হলো—বর্তমান কুয়েত, কাতার, জর্দান ও ইরাকের বর্তমান ও প্রাক্তন শাসকগণ। উক্ত তিন শ্রেণীর তাঁবেদার শাসকগণের কারণেই বিশ্বের সবচেয়ে সমৃদ্ধশালী ভূখণ্ড, বিশাল জনগোষ্ঠী ও ভূরাজনৈতিক গুরুত্বের অধিকারী ভূখণ্ডের মালিক হওয়া সত্ত্বেও মুসলিম উম্মাহ আজও পরাজিত, হতদরিদ্র, দ্বিধাবিভক্ত ও লাঞ্ছিত। এসব তাঁবেদার শাসকবৃন্দের কারণেই ওআইসি, আরব লীগ ও ওপেক বিশ্বমঞ্চে কোনো শক্তি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি। এসব তাঁবেদার শাসকদের গোপন সহযোগিতা ও সম্মতি পেয়েই ফিলিস্তিনি মা-বোনেরা দীর্ঘ ৬০ বছর যাবত নিজ দেশে পরবাসী, ঘৃণ্য ইহুদীদের অমানবিক নৃশংস অত্যাচারে লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, অত্যাচারিত, ধর্ষিত ও বাস্তুচ্যুত। এসব তাঁবেদার শাসকদের কারণেই মুসলমান দেশ ইরাক, আফগানিস্তান, বসনিয়া, চেচনিয়া সাম্রাজ্যবাদী দানবের হিংস্র হামলায়, আহত নিহত বাস্তুচ্যুত ও বিধ্বস্ত। এসব গোলাম ও ক্ষমতালোভী শাসকরাই বিশ্বের তাবৎ মুসলমানদের বর্তমান দুর্দশার জন্য প্রধানত দায়ী।

বর্তমান রাজনৈতিক সুনামির আবির্ভাবের কারণসমূহ

এ সুনামির দৃশ্যমান কারণ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, তীব্র বেকারত্ব, অর্থনৈতিক, সামাজিক বিশৃঙ্খলা শোষণ ও বৈষম্য এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতা না থাকা হলেও এর অন্তর্নিহিত আরও অনেক কারণ রয়েছে। এ কারণসমূহের অন্যতম হলো—

ফিলিস্তিনিদের উপর ইসরায়েলের জুলুম : বিগত প্রায় ৬০ বছর যাবত সাম্রাজ্যবাদী শক্তি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সন্ত্রাসী রাষ্ট্র ইসরাইল নিরস্ত্র, নিরপরাধ ফিলিস্তিনীদের উপর যে অত্যাচার-নিপীড়ন পরিচালনা করছে তা মিডিয়ার কল্যাণে প্রত্যেক মুসলমানের হৃদয়ে প্রতিনিয়ত রক্তক্ষরণ হচ্ছে। দীর্ঘদিনের এ রক্তক্ষরণ মুসলমানদের মনে ইহুদীবাদী ইসরাইল, ইসরাইলের আশীর্বাদপুষ্ট সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ এবং সাম্রাজ্যবাদের তাঁবেদার মুসলিম শাসকদের প্রতি পুঞ্জীভূত ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে। আগ্নেয়গিরির লাভা যেভাবে দীর্ঘদিন উত্তপ্ত হয়ে এক সময় সবকিছু ধ্বংস করার লক্ষ্যে জেগে ওঠে, ঠিক তেমনি তিউনিসিয়ায় উত্থিত রাজনৈতিক

www.pathagar.com

আগ্নেয়গিরির লাভা প্রথমত সাম্রাজ্যবাদের তল্পীবাহক দেশের শাসকদের দিকেই ধাবিত হবে।

মিথ্যা অজুহাতে ইরাক-আফগানিস্তান দখল : মধ্যপ্রাচ্যের তেলসম্পদ লুণ্ঠন, ইসরাইলকে নিরাপদ করা এবং ইরাকী আরবদেরকে চরিত্রহীন, মদ্যপ ও ধর্মচ্যুত করে সমগ্র আরব বিশ্বে বেলেল্লাপনা, মাদকাসক্তি ছড়িয়ে দেয়ার মাধ্যমে আরব চরিত্র ও সংস্কৃতি ধ্বংস করার লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে ইরাক দখল করা হয়। সাদ্দামের নিকট নিষিদ্ধ অস্ত্র আছে এই অজুহাতেই ইরাক দখল করা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে দেখা গেল ইরাক দখলের অজুহাত সর্বৈব মিথ্যা। অথচ এই মিথ্যা অজুহাতের আক্রমণে লাখ লাখ ইরাকী আহত নিহত ও পঙ্গু হয়েছে। ইরাকী মা-বোনেরা অব্যাহতভাবে ধর্ষিত হয়েছে, ক্ষুধার অন্ন মেটাতে বেশ্যাবৃত্তিকে পেশা হিসেবে বেছে নিতে বাধ্য হয়েছে এবং ৫০ লক্ষাধিক ইরাকী বাস্তুচ্যুত ও বিতাড়িত হয়েছে। ধর্ম ও সভ্যতার পীঠস্থান বিধ্বস্ত হয়েছে। এতদসত্ত্বেও সাম্রাজ্যবাদের তল্পীবাহক শাসকবৃন্দ কোনোরূপ প্রতিবাদ, প্রতিরোধের চেষ্টা করেনি। অপরদিকে ওসামা বিন লাদেন কর্তৃক যুক্তরাষ্ট্রের টুইন টাওয়ারে হামলা করার অজুহাতে গরীব দেশ আফগানিস্তানে হামলা করে আফগানিস্তানকে বিধ্বস্ত করা হয়েছে। অথচ পরবর্তীতে বিশ্ব গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবরে জানা গেছে, পাকিস্তানকে আণবিক অস্ত্রমুক্ত করা, মুসলিম যুবকদেরকে অস্ত্র প্রশিক্ষণ দিয়ে মুসলমানদেরকে সন্ত্রাসী হিসেবে চিহ্নিত করে মুসলিম দেশসমূহ একে একে দখল করা এবং মধ্য এশিয়ার তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ লুণ্ঠন করার জন্যই যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পশ্চিমা বিশ্ব আফগানিস্তানে হামলা করে দেশটিকে বিধ্বস্ত করেছে। শিক্ষিত সচেতন মুসলিম যুবকরা এ জন্য স্ব-স্ব দেশের পদলেহী শাসকদেরকে উৎখাতের কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। ইতিমধ্যে বিশ্ববাসী জানতে পেরেছে যে, যায়নবাদী ইসরাইলের নেপথ্য পরিকল্পনায় টুইন টাওয়ার বিধ্বস্ত করা হয়েছিল।

যুক্তরাষ্ট্রের দু'মুখো নীতি : যুক্তরাষ্ট্র মুখে যা বলে কার্যত তার বিপরীত কাজ করে। সে সমানাধিকার, মানবাধিকার ও গণতন্ত্রের পক্ষে কথা বলে। অথচ বিশ্বের দেশে দেশে অত্যাচারী স্বৈরশাসকদেরকে ক্ষমতাসীন করে, মদদ দেয়। মানবাধিকারের কথা বলে কিন্তু অসংখ্য আফগান, ইরাকী, পাকিস্তানি, ফিলিস্তিনিসহ বিশ্বের প্রায় সব দেশের মেধাবী যুবকদেরকে নিজ দেশ থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে গোপন নির্যাতন কেন্দ্রে অমানবিকভাবে অকথ্য অত্যাচার-নির্যাতন চালাচ্ছে এবং বিনা বিচারে আটক রেখেছে। নিজ নিজ দেশের তাঁবেদার সরকারসমূহ এহেন অপকর্মের সহযোগী হিসেবে ভূমিকা রাখছে। আধুনিক শিক্ষিত মুসলিম যুবকরা এরূপ তাঁবেদার সরকার উৎখাতে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। গণতন্ত্রের ব্যাপারেও যুক্তরাষ্ট্র দু'মুখো নীতি অনুসরণ করে। এর চারটি উদাহরণ হলো—

১. আলজেরিয়ার সাধারণ নির্বাচনে ইসলামীক সালভেশন ফ্রন্ট জয়ী হলে

www.pathagar.com

পাশ্চাত্যের মদদে সে দেশের সেনাপ্রধান ক্ষমতা দখল করে এবং বিজয়ী দলকে নিষিদ্ধ করে। পাশ্চাত্য এখনও উক্ত জান্তাকে আশ্রয় প্রশ্রয় দিচ্ছে।

২. পাশ্চাত্য কর্তৃক আয়োজিত নির্বাচনে ফিলিস্তিনে হামাস জয়ী হলে যুক্তরাষ্ট্র, ইসরাইলসহ পশ্চিমা বিশ্ব হামাসের ক্ষমতাসীন হওয়াকে প্রতিরোধ করে এবং গণতন্ত্রের বুলি ভুলে যায়।

৩. একটানা ১৫ বছরের গণতান্ত্রিক শাসনের অভিজ্ঞতায় বাংলাদেশ সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে চলার সময় যুক্তরাষ্ট্র, পাশ্চাত্য ও ভারত বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রা নস্যাত করার লক্ষ্যে এ দেশের সেনাপ্রধানকে ব্যবহার করে গণতন্ত্র ধ্বংস করে।

৪. ইরানের গণতান্ত্রিক ইসলামী সরকারকে উৎখাতের লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্র অব্যাহতভাবে ইরানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কার্যক্রম পরিচালনা করছে, গণতন্ত্রবিরোধী শক্তিকে অস্ত্র অর্থ সম্পদ দিচ্ছে।

বিপ্লব সংরক্ষণে সতর্কতা

সাম্রাজ্যবাদের তাঁবেদার সরকার উৎখাত এবং তদস্থলে দেশপ্রেমিক সরকারকে ক্ষমতাসীন করার পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি, যায়নবাদী ইহুদী ও তাদের তল্পীবাহক সরকার, ভাবশিষ্য ও এজেন্টগণ সর্বশক্তি নিয়ে প্রতিরোধের চেষ্টা করবে। এ প্রতিরোধে যে সব পন্থা অবলম্বন করতে পারে তা হলো—

১. **আন্দোলনকারীদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করা :** সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ জাতিগত, গোত্রীয় ও ধর্মীয় বিদ্বেষ ছড়িয়ে, মতাদর্শগত বিরোধ উস্কে দিয়ে, মৌলবাদের ভয় দেখিয়ে ঘুষ প্রদানের মাধ্যমে অথবা চরিত্রহীন ক্ষমতালোভীদের ক্ষমতাসীন করার প্রলোভন দিয়ে আন্দোলনকারীদের মধ্যে অনৈক্য, বিশৃঙ্খলা, সংঘাত-সংঘর্ষের আয়োজন করতে পারে।

২. উৎখাত হওয়া পতিত স্বৈরাচারী শাসকের প্রাক্তন সহযোগীরা আপাতত আন্দোলনকারীদের বন্ধু সেজে বিভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে পারে। বন্ধুত্বের ভান করে পিছন থেকে ছুরিকাঘাত করতে পারে। সাম্রাজ্যবাদের সাথে দীর্ঘদিন সহায়তাকারী সেনাবাহিনী দেশ রক্ষার অজুহাতে পুনরায় ক্ষমতা দখল করতে পারে।

৩. সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ আন্দোলনের সপক্ষের বিভিন্ন গোত্র ও গোষ্ঠীকে আলাদাভাবে মদদ দিয়ে গৃহযুদ্ধে লিপ্ত করাতে পারে। যাতে গৃহযুদ্ধে লিপ্ত জাতি নিজেরা শক্তিহীন হয়ে সাম্রাজ্যবাদী জালে ধরা দিতে বাধ্য হয়। এ বিষয়ে ইরাকের চলমান ঘটনাবলী আমাদের জন্য শিক্ষণীয় হতে পারে। আমেরিকা বেসরকারি ইরাকী শিয়া-সুন্নী ও কুর্দিদেরকে আলাদাভাবে অস্ত্রসজ্জিত করে এক পক্ষকে দিয়ে অপর পক্ষের উপর হামলা করাচ্ছে। প্রথম

www.pathagar.com

কয়েক বছর ইরাকীরা বিষয়টি সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল। ফলে তখন শিয়াদের মিছিলে হামলা হলে শিয়ারা সুন্নীদের উপর প্রতিশোধ নিতো। কিন্তু বর্তমানে সব পক্ষ মার্কিন চালাকী ধরতে পারায় যাচাই বাছাই না করে কেউ কারো উপর হামলা করে না। ফলে বর্তমানে আমেরিকা এরূপ হামলার কাজে বেসরকারি সিকিউরিটি গ্রুপের খুনিদের ব্যবহার করে। পাকিস্তান-আফগানিস্তানেও আমেরিকান গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ এরূপ অপকর্ম পরিচালনা করছে।

৪. যেহেতু সাম্রাজ্যবাদীরা বিশ্ব অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম সেহেতু তারা তাদের অপছন্দের নতুন শাসকের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করতে পারে। সংশ্লিষ্ট দেশের অর্থনীতি ধ্বংসে কার্যকলাপ পরিচালনা করতে পারে। এমতাবস্থায় নতুন সরকারকে অবশ্যই জনগণের সাথে প্রতিনিয়ত সুখ, দুঃখ শেয়ার করতে হবে, সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তসমূহ দেশবাসীকে অবহিত করতে হবে যাতে দেশবাসী সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তপ্রসূত দুর্ভোগ মোকাবেলায় মানসিকভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে। এছাড়াও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শক্তি ইরান, সিরিয়া, তুরস্ক, চীনসহ অন্যান্য দেশের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে।

৫. **সাম্রাজ্যবাদী শক্তির এজেন্টদেরকে চিহ্নিত করা :** ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী, সমাজতন্ত্রী, নৈরাজ্যবাদী, লায়ন-রোটারী ক্লাবের মতো সাম্রাজ্যবাদ পরিচালিত বিভিন্ন সামাজিক সংস্থা, সাম্রাজ্যবাদী অর্থে পরিচালিত এনজিও কর্মী, বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, আমেরিকান সিটি ব্যাংক, বহুজাতিক সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেশির ভাগই ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে কাজ করে। এ জন্য নতুন সরকারকে অবশ্যই এ শ্রেণীর সংস্থার লোকদের প্রতি সজাগ থাকতে হবে, এরূপ সংগঠনকে দেশ থেকে বিতাড়িত করতে হবে। তদুপরি ধর্ম ব্যবসায়ী-বিদ্‌আতী পীরসাহেবগণও মূলত সাম্রাজ্যবাদী এজেন্ডা বাস্তবায়ন করে থাকেন। এ জন্য এসব মতলবাজ-ফেরকাবাজ বিদআতী ধর্ম ব্যবসায়ীদের ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সংশ্লিষ্ট দেশে বসবাসরত ইহুদীদের প্রতিও সজাগ থাকতে হবে।

স্থিতিশীল সরকার প্রতিষ্ঠার শর্তাবলী

বিগত ৩০০ বছর যাবত বিশ্ববাসী বহু প্রকারের শাসক প্রত্যক্ষ করেছে। বহু মতবাদের অনুসারী শাসক দেখেছে, বহু প্রকারের শাসন পদ্ধতি দেখেছে। কিন্তু স্থিতিশীল, দক্ষ ও ন্যায়পরায়ণ কল্যাণ রাষ্ট্র দেখেনি। ন্যায়পরায়ণ ও কল্যাণ রাষ্ট্রই যদি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব না হয় তবে বর্তমান শাসকগোষ্ঠীকে অপসারণ করার কোনো হেতু আছে কি? ন্যায়পরায়ণ শাসক ও কল্যাণ রাষ্ট্র প্রত্যক্ষ করতে হলে

www.pathagar.com

আমাদেরকে ইতিহাসের আরো পিছনে যেতে হবে। আমাদের বিগত ১৪০০ বছরের ইতিহাস খুঁজে দেখতে হবে ইতিহাসের কোন সময়ে আমাদের ন্যায়পরায়ণ শাসক ছিল, কল্যাণ রাষ্ট্র ছিল। উক্ত শাসকের বৈশিষ্ট কি ছিল, উক্ত শাসন ব্যবস্থার স্বরূপ কি ছিল? এরূপ পর্যালোচনায় আমরা দেখতে পাব। ইসলামের সূচনালগ্নে আমাদের শাসকের চারিত্রিক গুণাবলী ও শাসন পদ্ধতি কি ছিল। উক্ত শাসক ও শাসন প্রণালী থেকে আমরা পর্যায়ক্রমে দূরে সরে এলাম কেন, এ দূরে সরে যাওয়ায় আমরা লাভবান হয়েছি—না ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি, সুখী হয়েছি না দুখী হয়েছি। সমৃদ্ধ হয়েছি না পতিত হয়েছি। এরূপ বিশ্লেষণের পরেই আমরা সিদ্ধান্ত নেব আমাদের কাঙ্ক্ষিত স্থিতিশীল সরকারের ও শাসকের বৈশিষ্ট্য কিরূপ হবে?

ইসলামের প্রারম্ভে রাসুল (সা.)-এর নেতৃত্বে মদীনা রাষ্ট্র কায়েম হয়েছিল। সেখানে রাষ্ট্রের প্রধান ছিলেন একজন। তিনি অন্যদের সাথে পরামর্শ করে রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন। আল্লাহর আইনে বিচার ফয়সালা করেছেন। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেছেন এবং এভাবে একটি কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর অনুকরণে হযরত আবু বকর, ওমর, ওসমান ও আলী (রা.) একইভাবে কল্যাণ রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন। শেষোক্ত দুইজনের সময়ে দেশব্যাপী বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছিল। বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কারণ ছিল ইহুদী থেকে মুসলমান হওয়া আবদুল্লাহ বিন সাবাহর সাবাই আন্দোলন। এই সাবাই আন্দোলনে খেলাফত বিলুপ্ত হয়ে আমীর মুয়াবিয়া (রা.)-এর নেতৃত্বে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁর চরিত্রহীন ছেলে ইয়াজীদের নেতৃত্বে স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর উমাইয়া ও আব্বাসীয় রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে মিসর, তুরস্কে, ভারতে রাজতন্ত্র স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্রের ক্ষেত্রেও দেখা গেছে, রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদাধিকারী ব্যক্তি যখন সৎ ও অভিজ্ঞ হয় তখন রাজতন্ত্রের অধীনেও কল্যাণ রাষ্ট্র কায়েম হয়েছে, জনগণ সুখে শান্তিতে সমৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে জীবন যাপন করতে সক্ষম হয়েছে। এরূপ রাজতান্ত্রিক সময়েও আমরা অনেক যোগ্য শাসক পেয়েছিলাম, যারা জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে প্রজাহিতৈষী শাসক হিসেবে ইতিহাসে অমর অক্ষয় হয়ে আছেন। রাজতান্ত্রিক শাসক হয়েও তাদের বেশির ভাগ ব্যক্তি বিচার ফয়সালা করতেন ইসলামী আইনে ফলে জনগণ ন্যায় বিচার পেত। চার খলিফার পরে ওমর ইবনে আবদুল আজিজ, হারুনুর রশীদ, মামুনুর রশীদ, সুলতান সালাউদ্দীন আইয়ুবী, তুর্কী সুলতানগণ, আকবর ব্যতিত ভারতবর্ষের সুলতানী আমল ও মোগল আমলের শাসকগণ কল্যাণ রাষ্ট্র কায়েম করেছিলেন। আমি নির্দ্বিধায় বলতে পারি, পৃথিবীর ইতিহাসে অপর কোনো ধর্মের কোনো শাসক আমাদের খলিফা হারুন, সালাউদ্দীন আইয়ুবী বা আওরঙ্গজেব আলমগীরের ন্যায় কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি।

এমতাবস্থায় বর্তমানে আমরা কেমন শাসককে ক্ষমতাসীন করব এবং কেমন

www.pathagar.com

সরকার গঠন করব তা ঠিক করার জন্য অন্য জাতির মুখাপেক্ষী হব কেন? যায়নবাদী ইহুদীদের রচিত সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্রের বই পড়তে হবে কেন, তাদের উদ্দেশ্যমূলক গণতন্ত্র-সমাজতন্ত্রের পথে যাব কেন? বিগত ৩০০ বছর যাবত আমাদের শাসকগণ যায়নবাদীদের রচিত এসব তন্ত্র-মন্ত্রের শাসন দ্বারা কোনো কল্যাণ রাষ্ট্র স্থাপন করতে পেরেছে কি? যদি না পারে তাহলে আবার ওমুখো হবো কেন?

আমি মনে করি, প্রত্যেক দেশ জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বর্তমানে আমাদের প্রয়োজন একদল ধার্মিক, সৎ, অভিজ্ঞ ও সাহসী ব্যক্তিবর্গ, যারা নিজেদের মধ্য থেকে সবচেয়ে যোগ্যতম ব্যক্তিটিকে রাষ্ট্র প্রধান করে দেশ পরিচালনা করবে এবং স্ব-স্ব দেশকে কল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত করবে। রাষ্ট্রের প্রকৃতি খেলাফত, রাজতান্ত্রিক বা গণতান্ত্রিক হওয়া শর্ত নয়। শর্ত হলো রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারক ও নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী হবেন একজন মাত্র ব্যক্তি, যিনি নিজে পরিকল্পনা প্রণয়ন করবেন ও বাস্তবায়নে দিক নির্দেশনা দিবেন। যিনি হবেন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রভাবমুক্ত ও স্বাধীন। যিনি হবেন নির্লোভ, চরিত্রবান ও ধর্মীয় মূল্যবোধের ধারক ও বাহক। তাঁকে আলেম হওয়ার দরকার নেই, ইরানী প্রেসিডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার আহমদিনেজাদের মতো সৎ ও জ্ঞানী হলেও চলবে।

এক্ষেত্রে বর্তমানে প্রধান বাধা হবে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত, দ্বিতীয় বাধা হবে সাম্রাজ্যবাদের স্বদেশী এজেন্টগণ, তৃতীয় বাধা হবে সার্বজনীন ভোটাধিকারের নির্বাচন। অজ্ঞ, মূর্খ, অসচেতন জনগণ বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তার ভোটাধিকার দ্বারা ভাল লোক বাদ দিয়ে খারাপ লোককে নির্বাচিত করে। এমতাবস্থায় জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে এবং সার্বজনীন সুশিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী শাসক ও শাসক দল এবং নীতি ও মূল্যবোধের ব্যাপারে আপোসহীন দেশপ্রেমিক জনগণই স্থিতিশীল সরকার ও সমৃদ্ধ দেশ গড়তে সক্ষম।

মার্চ ২০১১

www.pathagar.com

মুসলিম বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন এবং করণীয়

মুসলিম খেলাফত যখন প্রকৃত ইসলাম থেকে দূরে সরে গিয়ে রাজতন্ত্রী-স্বৈরতন্ত্রীতে পরিণত হয় এবং মুসলিম শাসকশ্রেণী ও অভিজাত শ্রেণী কর্তব্যকর্ম ভুলে গিয়ে যখন ভোগ-বিলাস আর শান-শওকতের চোরাবালিতে আটকে পড়ে শক্তিহীন-লক্ষ্যহীন অবস্থায় উপনীত হয় তখনই ইউরোপীয় খ্রিস্টান বাহিনী ১০৯৫ সালে মুসলিম অধিকার থেকে জেরুজালেম উদ্ধারের বাহানায় বিভিন্ন মুসলিম শক্তি কেন্দ্রের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে চরম দানবীয় আক্রোশে। খ্রিস্টান ঐতিহাসিক হিট্টির ভাষায়, "ক্রুসেড ছিল মুসলিম প্রাচ্যের বিরুদ্ধে খ্রিস্টান প্রতীচ্যের তীব্র প্রতিক্রিয়া ও ঘৃণার প্রকাশ।" ঐতিহাসিক গীবনের ভাষায়, "খ্রিস্টান ইউরোপের অর্বাচীন, বর্বর ও অশিক্ষিত লোকেরাই ক্রুসেডে যোগদান করে।"

বস্তুত ইসলামের আবির্ভাব পৌত্তলিক ও ভোগবাদী গ্রীক ও রোমান সভ্যতার প্রতি ছিল এক প্রচণ্ড হুমকি। তাওহীদবাদী ইসলামের আবির্ভাব ও তৎসংশ্লিষ্ট সভ্যতা ও সংস্কৃতির বাস্তব অবদান বহু ঈশ্বরবাদী গ্রীক-রোমান সভ্যতার ধারা ও প্রভাবকে ব্যাহত করেছে দেখে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে সমগ্র ইউরোপ। এই আতঙ্কের ফলশ্রুতিতে এবং নিজেদের মধ্যকার তীব্র দ্বন্দ্ব-সংঘাতকে ভিন্ন দিকে প্রবাহিত করে জাতিকে উজ্জীবিত করতে ১০৯৫ সালের নভেম্বরে পোপ দ্বিতীয় আরবান ফ্রান্সের ক্লারমাউন্টে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধের আহ্বান করেন। উক্ত ভাষণের মূল কথাগুলো ছিল নিম্নরূপ—

১. "হে ফ্রাংক জাতির সন্তানেরা! এই মহান জাতি ঈশ্বর নির্বাচিত তাঁর এক প্রিয় জাতি।... জেরুজালেমের চৌহদ্দি থেকে এবং কনস্টান্টিনোপলের আশপাশ থেকে প্রাপ্ত নিদারুণ দুঃসংবাদ এই যে, সেখানে অভিশপ্ত এবং পুরোপুরি ঈশ্বরবিরোধী একজাতি খ্রিস্টানদের জনপদসমূহে হিংস্র আক্রমণ চালিয়ে আসছে আর লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগের মাধ্যমে জনশূন্য করে দিচ্ছে সেসব জনপদকে। খ্রিস্টান বন্দীদের একাংশকে তারা নিয়ে যাচ্ছে নিজ দেশে, অন্যদেরকে নির্মম অত্যাচারের মাধ্যমে হত্যা করছে। তারা তাদের অশুচি নোংরামী দিয়ে কলুষিত করে দিচ্ছে গীর্জাগুলোর পূজাবেদী। গ্রীক সাম্রাজ্য এখন তাদের দ্বারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। এর মধ্যেই গ্রীকদেরকে তারা বঞ্চিত করেছে এমন এক ভূখণ্ড থেকে যার বিশালতা দুই মাসেও পাড়ি দেয়া সম্ভব

www.pathagar.com

নয়।

২. আমাদের প্রভু ও পরিত্রাতা যীশুর পবিত্র কবরভূমি আজ ওই অশূচি জাতির অধিকারে—এই অপ্রিয় সত্য আপনাদেরকে জাগ্রত করুক। আপনাদের সহায়-সম্পত্তি যেন আপনাদেরকে পেছনে না টানে, পেছনে না টানে যেন আপনাদের পরিবার চিন্তা। যে জনপদে আপনারা বসবাস করছেন তা চারিদিক থেকে সমুদ্র আর পাহাড় বেষ্টিত। এত বিশাল জনগোষ্ঠীর জন্য খুবই সংকীর্ণ ও আপনাদের সবাইকে খাদ্যের যোগান দিতে অসমর্থ। এ জন্যই আপনারা নিজেদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হন এবং অনেকেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হন।

৩. জেরুজালেম হচ্ছে আমাদের সকলের আনন্দের এক স্বর্গভূমি। পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত সেই রাজকীয় নগরী আজ উদ্ধারের জন্য আপনাদের নিকট মিনতি জানাচ্ছে। সর্বপাপ মোচনের জন্য আপনারা সাগ্রহে তার পথে অগ্রসর হোন, আর স্বর্গরাজ্যে অক্ষয় বসবাসের গৌরব ও পুরস্কারের নিশ্চয়তা লাভ করুন।

৪. জেরুজালেম পুনরুদ্ধারকল্পে অগ্রসরমান ক্রুসেডারদের বর্মে যতদিন থাকবে ক্রুশচিহ্ন, ততক্ষণ তাদের জন্য থাকবে ইহলোকে সকল আর্থিক সুযোগ এবং পরকালে স্বর্গলাভের নিশ্চয়তা। উদ্ধার কর জেরুজালেম!! God wills it- ঈশ্বর ইহাই চান।

(তথ্যসূত্র : ক্রুসেদের ইতিবৃত্ত, আশকার ইবনে শাইখ, পৃ. ৩১-৩২। তৎসূত্র : Alfred Dugun, The Story of the Crusseds, Page-42).

উল্লেখ্য তৎকালীন ইউরোপে শক্তিশালী এমন কোনো শাসক ছিল না, যিনি মুসলমানদের বিরুদ্ধে হামলা করতে সক্ষম। কিন্তু তখন খ্রিস্টান বিশ্বের ঐক্যের প্রতীক ছিলেন তাদের ধর্মনেতা পোপ। উক্ত পোপই খ্রিস্টান বিশ্বকে একত্রিত করে মিথ্যা ভাষণে অজ্ঞ-মূর্খ ইউরোপীয়দেরকে ধর্মের নামে, সম্পদের নামে, স্বর্গের লোভ দেখিয়ে ধর্মযুদ্ধে লিপ্ত করেছিল।

বর্তমান সাম্রাজ্যবাদীরা কি ধর্মনিরপেক্ষ? নাকি ধর্মযোদ্ধা?

মূলতঃ ১০৯৫ খ্রিস্টাব্দের পোপ দ্বিতীয় আরবান ঘোষিত প্রথম ধর্মযুদ্ধের মেয়াদকাল ছিল ১০৯৫ থেকে ১২৯১ সাল পর্যন্ত প্রায় ২০০ বছর। উক্ত সময়ে প্রথমে ২টি পর্যায়ে মুসলমানরা পরাজিত হলেও পরবর্তীতে ক্রুসেডাররা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। কিন্তু তারা তাদের পরাজয় থেকে শিক্ষা নিয়ে পরবর্তীতে বিজয়ীর বেশে আবির্ভূত হয়ে অদ্যাবধি মুসলিম নিধনে ব্যাপৃত রয়েছে। পক্ষান্তরে মুসলমানরা নিজেদের বিজয় থেকে শিক্ষা নেয়নি এবং সমকালীন শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের বিষয়ে গাফেল ছিল দীর্ঘদিন। ইত্যবসরে প্রাচীন ক্রুসেডাররা সমকালীন শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে বিশ্বব্যাপী মুসলিম দেশ দখল, মুসলমান হত্যা ও সম্পদ লুণ্ঠনে

www.pathagar.com

নিজেদেরকে নিয়োজিত রেখেছে। পূর্বে তারা মুসলমানদের দেশ দখল করেছিল পোপের ভাষণে অনুপ্রাণিত হয়ে, আর বর্তমানে তারা দেশ দখল করছে যায়নবাদী ইসরাইলের গোপন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে।

যায়নবাদী ইহুদীদের রচিত ষড়যন্ত্রের দলিল "Protocol of the Elders of the Zion" বইতে ইহুদীদের যে লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে তা হলো– "ইহুদী ছাড়া অপর সকল ধর্মমতকে পৃথিবী থেকে নির্মূল করা হবে। ইহুদীরা যেহেতু (তাদের মতে) খোদার প্রিয় ও শ্রেষ্ঠ জাতি, সেহেতু পৃথিবী শাসন করার একমাত্র হকদার ইহুদীরা। সুতরাং পৃথিবীর সকল শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রসমূহকে ধ্বংস করে একজন মাত্র ইহুদী বাদশাহ সমগ্র দুনিয়ার শাসনকার্য পরিচালনা করবে। এ লক্ষ্যে তারা ইতোমধ্যে সুপার গভর্নমেন্ট হিসেবে জাতিসংঘ স্থাপন করেছে।"

বর্তমান সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের পরিচয়

যায়নবাদী ইসরাইল, তার বরকন্দাজ আমেরিকা, বৃটেন, ফ্রান্স, জার্মানি ও ভারত। বিগত প্রায় এক হাজার বছর যাবত ইহুদীগণ কর্তৃক রচিত বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক মতবাদ ও গোপন ষড়যন্ত্রমূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে এ সকল সাম্রাজ্যবাদী দেশসহ পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে ইহুদীদের তল্পীবাহকগণ রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে সক্ষম হয়। ফলে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের প্রত্যাশা মোতাবেক এ সকল দেশে সরকার গঠিত হয় না, এ সকল দেশ পরিচালিত হয় না। পূর্বে ক্রুসেড শুরু হয়েছিল পোপের আহ্বানে আর বর্তমানে ক্রুসেড পরিচালিত হয় যায়নবাদী ইহুদীদের চাহিদা মোতাবেক। বর্তমান রাশিয়া যতদিন পর্যন্ত ইহুদী কার্লমাক্স, লেনিন, ট্রটস্কি, ব্রেজনেভ-এর আদর্শে পরিচালিত হয়েছিল ততদিন রাশিয়াও সাম্রাজ্যবাদী ছিল। ইহুদীদের একমাত্র রাষ্ট্রটি একটি ধর্মীয় রাষ্ট্র। কিন্তু পৃথিবীর অন্য কোনো জাতি ধর্মরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে ইহুদীদের বরকন্দাজরা উক্ত রাষ্ট্রকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে ঝড়ের বেগে ধেয়ে আসে।

পোপ বনাম বুশ-জন মেজরের ভাষণ

বর্তমান সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ কি রাজনৈতিক বা মতাদর্শগত যুদ্ধ করছে নাকি ধর্মযুদ্ধ পরিচালনা করছে তার পরিচয় জানতে হলে আমাদেরকে পোপের মানস ও ভাষণের সাথে বুশ-মেজরের ভাষণ ও মানসকে মিলিয়ে দেখতে হবে। পোপের ভাষণ ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এক্ষণে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রসমূহের কর্ণধারদের ভাষণের কয়েকটি অংশ পাঠকদের জ্ঞাতার্থে প্রদান করা হলো—

১. প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী আরব জাতীয়তাবাদীরা মুসলিম তুরস্কের বিরুদ্ধে মিত্রশক্তিকে সহায়তা করেছিল। ইসলাম ও মুসলমানদের দুশমন এ সকল নামধারী মুসলমানদেরকে তাদের খ্রিস্টান বন্ধুরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল

www.pathagar.com

যে– মিত্রশক্তি যুদ্ধে জয়লাভ করলে আরব এলাকার মুসলমানদেরকে তুরস্কের অধীনতা থেকে স্বাধীনতা দেয়া হবে। কিন্তু যুদ্ধের পর দেখা গেল আরবদের সহায়তায় তুরস্ককে পরাজিত করে খ্রিস্টান দেশগুলো আরব অঞ্চলকে টুকরো টুকরো করে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছে এবং ইউরোপের ইহুদীদেরকে ফিলিস্তিনে এনে অবৈধ ইসরাইল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করেছে।

মক্কার শরীফ হোসেনের সহায়তায় খ্রিস্টান মিত্রশক্তি ৯-১২-১৯১৮ তারিখে বায়তুল মুকাদ্দাস দখল করে। ১-১০-১৯১৮ সালে শরীফ পুত্র আমীর ফয়সাল ও ফরাসী জেনারেল গুরবানী বিজয়ীর বেশে সিরিয়ার দামেস্কে প্রবেশ করে। এ সময় ফরাসী জেনারেল গুরবানী বায়তুল মোকাদ্দাস উদ্ধারকারী সুলতান সালাহউদ্দীন আইয়ুবীর কবরে পদাঘাত করে বললেন, "রে সালাউদ্দীন! আমরা এসে পড়েছি। আমরা সিরিয়া জয় করেছি।" (সূত্র : ত্রৈমাসিক সাময়িকী, ই.ফা.বা, ২৪ বর্ষ ২য় সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর-১৯৮৪)

২. 'সভ্যতার সংঘাত' থিওরীর রচয়িতা ও শীর্ষ মার্কিন বুদ্ধিজীবী ও নীতি-নির্ধারক স্যামুয়েল হ্যান্টিংটন ১৯৯৩ সালের 'ফরেন এফেয়ার্স' পত্রিকার জুন সংখ্যায় লিখেন—"সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর পশ্চিমা জগতের এক নতুন শত্রুর প্রয়োজন ছিল। কারণ যুদ্ধ কখনো থেমে থাকবে না।... নতুন শত্রু ইসলামী বিশ্বও হতে পারে, চীনও হতে পারে।

৩. যুগোস্লাভিয়ার খ্রিস্টান সার্বরা যখন স্বাধীনতাকামী নিরস্ত্র অসহায় বসনীয় মুসলমানদেরকে কচুকাটা করছিল তখন বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী জন মেজর তার পররাষ্ট্র ও কমনওয়েলথ দফতরের মন্ত্রী ডগলাস হগকে ২-৫-১৯৯৩ইং তারিখে একটি চিঠি লিখেছিলেন, চিঠির সারকথা ছিল—

   ক. ইউরোপের বুকে কোনো সম্ভাব্য ইসলামী রাষ্ট্র সহ্য করা হবে না। তাই বসনিয়া-হারজেগোভিনা খণ্ড-বিখণ্ড না হওয়া পর্যন্ত এবং ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে দেশটি ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত সে দেশের মুসলমানদের কোনো রকম সাহায্য প্রদান না করার নীতি ব্রিটেন অনুসরণ করে যাবে।

   খ. **ব্রিটেন জানে গ্রীস, রাশিয়া ও বুলগেরিয়া সার্বীয়দের অস্ত্র ও ট্রেনিং দিচ্ছে। জার্মানি, অস্ট্রিয়া, স্লোভেনিয়া এমনকি ভ্যাটিকানও সে অঞ্চলে ক্রোয়েশিয়া ও বসনিয়ার ক্রোট বাহিনীকে অনুরূপ সাহায্য দিচ্ছে। এ সত্ত্বেও বৃটেনকে নিশ্চিত করতে হবে, যাতে কোনো ইসলামী দেশ কিংবা গ্রুপ বসনিয়ার মুসলমানদের সাহায্য প্রদানে সফল না হয়।**

   গ. **ভবিষ্যত ইউরোপের মূল্যমান পদ্ধতি হবে এবং অবশ্যই হতে হবে খ্রিস্টান সভ্যতাভিত্তিক। এ অভিমত প্রতিটি ইউরোপীয় দেশের ও উত্তর আমেরিকার।** (সূত্র : ইতিহাস-অন্বেষা, ডিসেম্বর-২০০৭, পৃ-২৪-২৫)

৪. মধ্যপ্রাচ্য শান্তি প্রক্রিয়া নিয়ে মাহমুদ আব্বাস ও তৎকালীন ফিলিস্তিনী

www.pathagar.com

পররাষ্ট্রমন্ত্রী নাবিল শাদ এর সাথে আলোচনাকালে প্রেসিডেন্ট বুশ বলেন, "I am driven with a mission from God, God would tell me George, Go & fight those terrorist in Afganistan, and I did, And then God would tell me George, go & end the tyranny in lraq, and I did. (Source : The Independent, Britain, 7.10.2005)

মূলত বর্তমান সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহ বাহ্যিকভাবে নিজেদেরকে ধর্মনিরপেক্ষ দাবি করলেও তাদের মুখোশের নিচে লুকায়িত রয়েছে হিংস্র সাম্প্রদায়িকতা ও পরধর্ম, পরজাতি বিদ্বেষ। উপরোক্ত উদাহরণ এবং ভারতের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় সরকারের নীতি-কৌশলই এর সপক্ষে জ্বলন্ত প্রমাণ। পক্ষান্তরে মুসলমান নামধারী ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ও কম্যুনিস্টরা হলো নিজ ধর্ম, দেশ ও জাতির দুশমন এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সহযোগী গোলাম।

বর্তমান সাম্রাজ্যবাদীদের মাস্টার প্লান

বর্তমান সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ নিজেদের আধিপত্য চিরদিন ধরে রাখার জন্য প্রধানত ৪টি কৌশল অবলম্বন করে। এই চারটি কৌশলেও যদি কোনো রাষ্ট্রকে পদানত করা না যায় তবে তারা উক্ত দেশে সরাসরি সর্বাত্মক হামলা পরিচালনা করে দেশটি ধ্বংস করে এবং তাঁবেদার পুতুল সরকার কায়েম করে। তাদের অনুসৃত উক্ত ৪টি অপকৌশল হলো—

১. **মানসিক অনৈক্য সৃষ্টি :** টার্গেটকৃত অঞ্চল ও দেশের জনগণের মধ্যে মানসিক অনৈক্য ও বিভক্তি সৃষ্টি করা হয়। এই বিভেদ সৃষ্টির প্রধান প্রধান উপাদানসমূহ হলো :

(ক) **মতবাদভিত্তিক বিভক্তি :** গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ, ভূখণ্ডভিত্তিক জাতীয়তাবাদ, ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ, গোত্রীয় ও আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদসমূহ বিগত কয়েক শতকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের বুদ্ধিজীবীরা আবিষ্কার করেছে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি উক্ত মতবাদগুলোকে বিশ্বব্যাপী প্রচার-প্রসারে সহায়তা করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষকে আত্তকোন্দলে লিপ্ত করেছে।

(খ) **ধর্মভিত্তিক বিভক্তি :** প্রত্যেক দেশে বিভিন্ন ধর্মের মানুষের বসবাস। সাধারণত সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ধর্ম অনুযায়ী উক্ত দেশে সভ্যতা-সংস্কৃতি গড়ে ওঠে এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রাধান্য পায়। এমতাবস্থায় সাম্রাজ্যবাদী শক্তি উক্ত দেশের সংখ্যালঘু ধর্মীয় গোষ্ঠীকে সংখ্যাগুরুদের বিরুদ্ধে উস্কানি দেয়। সংখ্যাগুরু ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্ন ফেরকা সৃষ্টি করে, বিভিন্ন পীর-পুরোহিত সৃষ্টি করে সংখ্যাগুরুদেরকে মানসিকভাবে

www.pathagar.com

বিভক্ত করে দ্বন্দ্ব-সংঘাতে লিপ্ত করায় এবং জাতিকে শক্তিহীন ও বিপদগামী করে।

(গ) **সাহিত্যিক মতভেদ :** একটি জাতিকে স্থায়ীভাবে বিভক্তির জন্য সাহিত্যিক মতভেদ খুবই কার্যকরী। এক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদীরা সংশ্লিষ্ট দেশের অতীত ইতিহাস রচনা করে ভেজাল দিয়ে এবং মিথ্যা দিয়ে। তারা প্রতিটি দেশের কিছুসংখ্যক বুদ্ধিজীবীকে কিনে নেয়। উক্ত বুদ্ধিজীবীরা সাম্রাজ্যবাদীদের ফরমায়েশ মোতাবেক ইতিহাস লিখে। নাটক লিখে, সিনেমার স্ক্রীপ্ট লিখে, উপন্যাস লিখে। উক্ত সাহিত্যকর্মের কোনোটিতে একপক্ষের উপর অন্যপক্ষ আক্রমণাত্মক সংলাপ প্রয়োগ করে, ইতিহাসে যা ছিল না তা ঢুকিয়ে দিয়ে সাম্প্রদায়িক বিভেদকে প্রকট করে তোলা হয়। দুটি উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটি পরিষ্কার হবে।

১. ইয়েমেনের ইহুদী আবদুল্লাহ বিন সাবাহ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে দীর্ঘ কয়েক বছর কুরআন-হাদীসের উপর ব্যাপক জ্ঞান অর্জন করে নিজেকে ধর্মীয় বোদ্ধা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। তখন হযরত ওসমান (রাঃ) মদীনার খলিফা ছিলেন। আবদুল্লাহ তখন হযরত আলী (রাঃ) এর একনিষ্ঠ ভক্ত হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে। সরলপ্রাণ মুসলমানদেরকে সে এই মর্মে ওসমান (রাঃ) এর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলে যে, খেলাফতের সত্যিকারের হকদার হলো হযরত আলী (রাঃ), প্রথম তিন খলিফা হলো জবরদখলকারী। সুতরাং বর্তমান খলিফাকে অপসারণ করে হযরত আলী (রাঃ)কে খলিফা বানানো মুসলমানদের জন্য জরুরি। এই প্রচারণায় তার অনেক অনুসারী তৈরি হয়। সে ওসমান (রাঃ)-এর চিঠিকে বিকৃত করার মাধ্যমে তার অনুসারীদেরকে খেপিয়ে তোলে এবং হযরত ওসমান (রাঃ) সাবাহর অনুসারীদের হাতে নিহত হন। এরপর মুসলিম জনমত দুইভাগে বিভক্ত হয়। একভাগ হযরত আলী (রাঃ) এর দলে, অন্যভাগ ওসমান (রাঃ)-এর হত্যার বদলা নেয়ার শপথে আমীর মুয়াবিয়ার দলে। এভাবেই মুসলমানদের মধ্যে ভ্রাতৃঘাতি ভয়াবহ সংঘাত শুরু হয় এবং মুসলমানরা শিয়া-সুন্নী দুই দলে বিভক্ত হয়ে অনেক রক্তপাত ঘটায়—যা এখনও বিদ্যমান।

২. দীর্ঘ হাজার বছর ভারত উপমহাদেশ শাসন করেছিল তুর্কী, আফগান ও মোঘল বংশোদ্ভূত শাসন কর্তারা। তাঁরা ভারতে বহিরাগত হলেও তাঁরা নিজেদের জ্ঞান-যোগ্যতা ও সর্বস্ব দিয়ে বহুধা বিভক্ত ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করেন। তাদের আমলে সরকারি চাকরি, বাণিজ্যসহ সকল ক্ষেত্রে ভারতের সকল ধর্ম-বর্ণ-গোত্রের লোক স্বাধীনভাবে নিজ নিজ যোগ্যতা অনুযায়ী দেশ গঠনে ভূমিকা রেখে ভারতকে বিশ্বের সবচেয়ে শান্তিপূর্ণ ও

www.pathagar.com

সমৃদ্ধশালী আবাসভূমিতে পরিণত করেছিল। উক্ত সময়ের কোনো সাম্প্রদায়িক হানাহানির কথা জনগণের অজানা ছিল। তখন হানাহানি হতো রাজায়-রাজায়। নিরস্ত্র জনগণ নির্বিবাদে জীবনযাপন করত। ধর্মের নামে বা ধর্মের কারণে কেউ জুলুমের শিকার হতো না। কিন্তু ১৭৫৭ সালে মীরজাফর ও জগৎশেঠ গংদের সহায়তায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলা দখল করার পর তারা এদেশের জনগণকে একের বিরুদ্ধে অন্যকে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার ব্যবস্থা করে। এক পক্ষকে চাকরি-ব্যবসা-জমিদারী দিয়ে অন্য পক্ষের চাকরি-ব্যবসা-জমিদারী কেড়ে নিয়ে তারা স্থায়ী বিভেদের বীজ বপন করে। দেশি-বিদেশি ভাড়াটিয়া বুদ্ধিজীবীদের দিয়ে মিথ্যা ইতিহাস ও সাহিত্য রচনা করে ভারতবর্ষের জনমানসকে চিরদিনের জন্য বিষাক্ত করে যায়, যার ফলে অদ্যাবধি এ উপমহাদেশ হানাহানির দেশে পরিণত হয়।

সভ্যতার সংঘাত তত্ত্ব

The great game plan

সাগর মহাসাগর ও বিশ্বে স্বীয় আধিপত্য বজায় রাখতে বর্তমান সাম্রাজ্যবাদী শক্তি কয়েকটি মতবাদ অনুসরণ করে। উক্ত মতবাদসমূহের রচয়িতা হলেন, নিকোলাস স্পাইক্স্ম্যান, হার্বার্ট স্পেন্সার, হেনরি পাইরেনি ও স্যামুয়েল হান্টিংটন। উক্ত মতবাদের সারকথা হলো—

(ক) ইউরোয়েশিয়ান হার্টল্যান্ডে (উত্তরে রাশিয়া, দক্ষিণে ইরান, পূর্বে চীন, পশ্চিমে পূর্ব ইউরোপ ও উত্তর আফ্রিকা এলাকাকে ইউরোয়েশিয়ান হার্টল্যান্ড বলা হয়) অবস্থিত রাষ্ট্রসমূহের ঐক্য সমুদ্রে আধিপত্য বিস্তারকারী শক্তিসমূহের জন্য ব্যাপক হুমকি। এ জন্য এ এলাকার দেশগুলিকে ছিন্নভিন্ন করা, ভেঙে দেয়া, টুকরা করা বর্তমান সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহের স্থায়ী নীতি।

(খ) ইউরোয়েশিয়ার হার্টল্যান্ডে অবস্থিত দেশগুলোতে প্রায়ই ঐক্যের প্রবণতা দেখা দেয়। এই প্রবণতাকে প্রতিহত না করলে বিশ্ব আধিপত্য বজায় রাখা যাবে না। এ জন্যই প্রথম ও ২য় বিশ্বযুদ্ধের পর যুক্তরাষ্ট্র-বৃটেন জোট মধ্যপ্রাচ্য, মধ্যএশিয়া, পূর্ব ইউরোপ, ভারত ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অনেকগুলো নতুন রাষ্ট্রের সৃষ্টিতে কার্যকর ভূমিকা রেখেছে।

(গ) **পূর্ব ইউরোপকে রাশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করা, ভারত ও মধ্যপ্রাচ্যকে রাশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন রাখা বৃটেনের দীর্ঘস্থায়ী নীতি। দার্শনিক ম্যাকাইভার বৃটেনকে এই মর্মে সতর্ক করেন যে, অদূর বা সুদূর ভবিষ্যতে রাশিয়া-চীন-ইরান এবং ভারত যদি একটি একক অবস্থানে উপনীত হয় তবে সাগরের কর্তৃত্ব যুক্তরাষ্ট্র-বৃটেন ও জাপানের নিকট থেকে উক্ত শক্তি চতুষ্টয়ের নিকট চলে যাবে।**

www.pathagar.com

(ঘ) স্নায়ুযুদ্ধের অবসানের পর স্যামুয়েল হান্টিংটন সভ্যতার সংঘাত নামক যে তত্ত্ব হাজির করেছেন তা মূলত ইউরোয়েশিয়ান হার্টল্যান্ড ভিত্তিক সাম্রাজ্যবাদীদের দীর্ঘ দিনের ভাবনার ফসল। তিনি মূল ধারণাকে সভ্যতার সংঘাতের আবরণ পরিয়েছেন মাত্র। হান্টিংটন তত্ত্বের মূল কথা হলো—ইউরোয়েশিয়ান হার্টল্যান্ডে নয়টি ভিন্ন ভিন্ন সভ্যতা অবস্থান করেছে। এদের পরস্পরের মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি করে এদের নিয়ন্ত্রণ ও গ্রাস করার জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ন্যাশন এস্টেট স্থাপন করলে পশ্চিমা আধিপত্য অক্ষুণ্ন থাকবে। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী মার্কিন কর্নেল রাল্ফ পিটার ২০০৬ সালের 'U-S Armed Forces Journal'-এর জুন সংখ্যায় একটি মানচিত্র প্রকাশ করেন। উক্ত মানচিত্রের শিরোনাম ছিল 'বিস্তৃত মধ্যপ্রাচ্য প্লান'। উক্ত প্লানে যেসব দেশকে টুকরা করার এবং বড় করার লক্ষ্য ঘোষিত হয়েছে তা হলো—

১. সৌদি আরব
সৌদি আরবের বর্তমান ভূখণ্ডকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হবে। এর কিছু অংশ জর্দানের সাথে যোগ করে Greater Jordan, কিছু অংশ ইয়েমেনকে দেয়া হবে, কিছু অংশ কুয়েতকে দিয়ে অবশিষ্ট অংশে দুইটি দেশ গঠন করা হবে। একটি হলো মক্কা ও মদীনা নিয়ে। Islamic Sacred State অপরটির নাম হলো Soudi Homeland Independent Territory.

২. ইরানের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের প্রদেশ ও ইরাকের শিয়া অঞ্চল নিয়ে Arab Shia State, ইরাকের মধ্য পশ্চিমাঞ্চলে গঠিত হবে Sunni Iraq, ইরান-ইরাক-তুরস্ক ও সিরিয়ার কুর্দী অঞ্চল নিয়ে গঠন করা হবে Free Kurdistan. ইরানের উত্তরাঞ্চলের কিছু অংশ তুর্কমেনিস্থানকে দেয়া হবে।

৩. সিরিয়ার পশ্চিমাঞ্চল ও তুরস্কের দক্ষিণাঞ্চল যোগ করে গঠন করা হবে Greater Lebanan. তবে লেবাননের দক্ষিণাঞ্চলের বিরাট এলাকা ও সিরিয়ার বেকা উপত্যাকার মালিক হবে ইসরায়েল। ফিলিস্তিন-মিশরের সীমানা তুলে দিয়ে ফিলিস্তিনীদেরকে মিশরের দিকে ঠেলে দেয়া হবে।

৪. পাকিস্তান থেকে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ বিচ্ছিন্ন করে আফগানিস্তানের সামিল করা হবে। আজাদ কাশ্মীরকে আফগানিস্তানের সামিল করা হবে। আফগানিস্তানের পশ্চিমাঞ্চলের শিয়া অধ্যুষিত এলাকা ইরানের সাথে সামিল করা হবে। পাকিস্তান থেকে সিন্ধু প্রদেশকে বিচ্ছিন্ন করে ভারতের সামিল করা হবে এবং বালুচিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করে Free Baluchistan নামক দেশ প্রতিষ্ঠা করা হবে।

মার্কিন কর্নেলের আঁকা উপরোক্ত মানচিত্র যে কোনো কথার কথা নয়, তা যে

www.pathagar.com

কোনো চক্ষুষ্মান ব্যক্তিই অনুধাবন করতে পারবেন। কেননা ইতোমধ্যে পাকিস্তানকে প্লান অনুযায়ী অস্তিত্বহীনতার সংঘর্ষে নিমজ্জিত করেছে। পাকিস্তানের তালেবানদেরকে (টি.টি.পি) সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ সরকারের সাথে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে লিপ্ত করিয়েছে, বালুচ লিবারেশন আর্মীকে অস্ত্র-অর্থ-প্রশিক্ষণ ও স্বীকৃতি দিয়ে বিচ্ছিন্নতার দ্বারপ্রান্তে নিয়ে গেছে। সিন্ধুতে জিয়ে সিন্ধ আন্দোলনকে পরিচর্যা করা হচ্ছে।

ইরাক ইতোমধ্যে অঘোষিতভাবে তিন ভাগে বিভক্ত হয়েছে, সকল দেশের কুর্দীদেরকে অস্ত্র-অর্থ-প্রশিক্ষণ দিচ্ছে ইসরাইল ও যুক্তরাষ্ট্র, সিরিয়ায় গৃহযুদ্ধ শুরু করানো হয়েছে, ইয়েমেনও গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে, ইরানে গৃহযুদ্ধ লাগানোর সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় সরাসরি হামলার প্রস্তুতি পর্ব চলছে। ইরানকে দমন করা সম্ভব হলে পারস্য উপসাগর ও এর পার্শ্ববর্তী সকল দেশে সাম্রাজ্যবাদী দখল পরিপূর্ণতা লাভ করবে। তখন ইরানবিরোধী আরব দেশগুলোর সুখনিদ্রা টুটে যাবে এবং জি.সি.সি দেশগুলোতে ও মধ্যপ্রাচ্যের বাকি দেশগুলোতে রাল্‌ফ পিটার অংকিত মানচিত্র বাস্তবায়ন করা হবে। সৌদি আরবসহ অন্যান্য আরব দেশগুলো তখন বুঝতে পারবে ইহুদী-নাছারাদের সাথে বন্ধুত্বের পরিনাম কী। ভবিষ্যত ঐতিহাসিকরা লিখবে, ব্যক্তি ও পরিবারকেন্দ্রীক ক্ষমতা লিপ্সার বলি হয়েছে অজস্র সম্পদ ও সম্ভাবনার আরব দেশসমূহ। ইহুদী-নাছারাদের সাথে বন্ধুত্বের মাশুল দিতে গিয়ে আরবরাও শেষ হয়েছে পৃথিবীর অন্য দেশের মুসলমানদের আশা-ভরসার স্থলকেও সাগরের গভীরে তলিয়ে দিয়েছে।

৩. সাম্রাজ্যবাদী রচিত ডকট্রিনসমূহ

সাম্রাজ্যবাদ দেশসমূহ নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখতে ও বিস্তৃত করতে যে সকল স্থায়ী নীতি রচনা করেছে তা Doctrine নামে পরিচিত। বর্তমানে আমরা যেসব Doctrine-এর কথা শুনি বা জানি সেগুলির উৎস কিন্তু প্রাচীন গ্রীস এর বিভিন্ন নগর রাষ্ট্রসমূহ।

এ সকল প্রাচীন ডকট্রিনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে রচিত হয় বিভিন্ন ডকট্রিনসমূহ। নিজ সম্প্রদায়, বর্ণ বা দেশের সমৃদ্ধির জন্য অন্য সম্প্রদায় বা জাতিকে শোষণ করা, নির্যাতন করা, পদপিষ্ট করা এই নীতির মূল প্রতিপাদ্য। এই নীতিসমূহের কয়েকটি নিম্নে প্রদান করা হলো—

(ক) মনরো ডকট্রিন : মার্কিন প্রেসিডেন্ট মনরোকে এ নীতির প্রবক্তা বলা হয়। এর মূল বিষয় হলো– যে এলাকাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার স্বার্থসংশ্লিষ্ট বা প্রভাব বলয়ের জন্য প্রয়োজন মনে করবে সে এলাকায় অন্য কোনো বহিঃশক্তি অথবা স্বাধীনচেতা রাষ্ট্রের উপস্থিতি মেনে নেয়া হবে না এবং সেসব এলাকার কোনো সরকারকে মার্কিন স্বার্থের পরিপন্থী কোনো কাজ করতে দেয়া হবে না।

www.pathagar.com

প্রয়োজনে অভ্যুত্থান ঘটিয়ে বা হস্তক্ষেপ করে সরকার পরিবর্তন করা হবে অথবা দেশটি ধ্বংস করা হবে।

(উল্লেখ্য, তেল-গ্যাস প্রাপ্তির পর থেকে মধ্যপ্রাচ্য এলাকাকে যুক্তরাষ্ট্র নিজের স্বার্থসংশ্লিষ্ট এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এ জন্য এ এলাকায় শক্তিশালী ইরাককে ধ্বংস করা হয়েছে, পাকিস্তানকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে গেছে এবং ইরানকে ধ্বংস করার জন্য বিভিন্নমুখী কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।)

(খ) **এথেনীয় পদ্ধতি :** প্রাচীন এথেন্স এর শাসকরা মনে করত সৃষ্টিকর্তা তাদেরকে তাদের অনুসৃত শাসন ব্যবস্থা সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়ার দায়িত্ব প্রদান করেছেন। এই মহান দায়িত্ব পালনার্থে তারা অপরাপর দেশগুলোকে নিজেদের শাসন কায়েমের জন্য দখল করে নিত। আলেজান্ডারের বিশ্বজয় এরূপ মানসিকতার ফসল।

(গ) **স্পার্টান মডেল বা পোলোপোনেশিয়ান লীগ :** ড. আইভান এলান্ড তাঁর বিখ্যাত "দি এম্পায়ার হেজ নো ক্লথ : ইউ.এস ফরেন পলিসি এক্সপোস্‌ড" নামক গ্রন্থে লিখেছেন, প্রাচীন স্পার্টা অন্য দেশ দখল না করে সামরিক শক্তি দিয়ে উক্ত দেশের শাসকগোষ্ঠীকে মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ করে নিয়ন্ত্রণ করত। এসব দেশের বৈদেশিক নীতি ও মৌলিক আভ্যন্তরীণ নীতি স্পার্টার মর্জিমাফিক হতো। এই মৈত্রীকে বলা হতো পেলোপোনেশিয়ান লীগ।

(ঘ) **চানক্য নীতি বা নেহেরু-ইন্দিরা ডকট্রিন :** ডাকাত সর্দার শিবাজী ব্যতীত যে হিন্দুজাতির মধ্যে কোনো অনুসরণীয় বীর নাই সে জাতির সদস্য ছিল চানক্য বা কৌটিল্য তা আমার বিশ্বাস হয় না। প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার রানী হেলেনকে যেরূপ সীতা বানিয়ে হেলেনের অপহরণ ও উদ্ধারের যুদ্ধকে রাম-রাবনের যুদ্ধ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, ঠিক তদ্রূপ আলেকজান্ডারের ভারত অভিযানের সময় আগত আলেকজান্ডারের কোনো সভাসদকেই হয়তো ব্রাহ্মণ্যবাদীরা নিজেদের চানক্য বা কৌটিল্য হিসেবে আখ্যায়িত করে কাহিনী রচনা করেছে। ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায়, চানক্যের সময়কাল ও আলেকজান্ডারের ভারত অভিযানের সময়কাল প্রায় সমসাময়িক। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, উক্ত ধার করা চানক্যের ন্যায় নেহেরু-ইন্দিরা ডকট্রিনও পাশ্চাত্যের অনুকরণে রচিত। চানক্যের মতবাদ, মনরো ডকট্রিন, এথেনীয় পদ্ধতি ও স্পার্টান মডেলের সাথে নেহেরু-ইন্দিরা ডকট্রিন বা The India Doctrine-এর কোনো মৌলিক পার্থক্য নেই।

এ ডকট্রিনের মূল নীতিসমূহ হলো—

১. সার্ক দেশসমূহ, আফগানিস্তানের কিছু অংশ এবং বার্মাকে অন্তর্ভুক্ত করে অখণ্ড ভারত গঠন।

www.pathagar.com

২. সামরিক তৎপরতা চালানোর মাধ্যমে রাষ্ট্রের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
৩. টার্গেটকৃত দেশগুলোর সাথে অধীনতামূলক মিত্রতা চুক্তি করা।
৪. অন্যকে নিজের কাছে আশ্রয় ও নিরাপত্তা চাইতে বাধ্য করাই হচ্ছে মিত্রতা।
৫. ভিন্ন বর্ণ ও জাতির সর্বস্ব অপহরণ কোনো পাপ নয়।

Orientalism বা প্রাচ্যতত্ত্ব : অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ অস্ত্রের শক্তিতে এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ দখল করে নিজেদের স্বেচ্ছাচারী শাসন চাপিয়ে দেয়। শাসনের ব্যাপারে তাদের নীতি ছিল পোড়ামাটি নীতি ও লুণ্ঠন। সমগ্র ইউরোপের জনগণ যাতে এই নীতিতে আসক্ত হয়ে পড়ে সে লক্ষ্যে পাশ্চাত্যে বুদ্ধিজীবীরা অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগ থেকে প্রাচ্যতত্ত্ব নামক বিভিন্ন তত্ত্ব হাজির করে। এসব তত্ত্বের দ্বারা ইউরোপ-আমেরিকার জনগণের মানস গঠন করা হয় এবং উপনিবেশিক দেশগুলোতে সামরিক ও রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তৃত ও বজায় রাখার জন্য প্রাচ্যের মানুষের মন-আচরণ-দৃষ্টিভঙ্গী ও সাংস্কৃতিক স্বভাবকে নিজেদের ইচ্ছামতো রূপান্তরিত, বিকৃত ও পরিবর্তন করে প্রাচ্যের একশ্রেণীর লোকের মনোজগত ও বাইরের ইমেজ পাশ্চাত্যের রঙে রঙিন করা হয়। বিংশ শতাব্দী থেকে অদ্যাবধি পাশ্চাত্য নিরন্তর চেষ্টা করে যাচ্ছে যেন প্রাচ্যের প্রতিটি দেশে পাশ্চাত্যের দেশীয় সেবাদাসরা ক্ষমতাসীন হয়। এর অন্যথা হলে পাশ্চাত্য বিভিন্ন অজুহাতে উক্ত সরকারের পতন ঘটায় বা ঘটানোর চেষ্টা করে। প্রাচ্য তত্ত্ববিশারদ Edward W. Sayeed বলেন—

"পশ্চিমা জ্ঞানজগতে প্রাচ্যতত্ত্ব নামের ডিসকোর্সের পরিশোধিত বক্তব্য হলো- পৃথিবীতে পশ্চিমের মানুষ আছে, আর আছে প্রাচ্যবাসী। প্রথমোক্তরা আধিপত্য করবে আর সেই আধিপত্যের শিকার হতে হবে অবশ্যই প্রাচ্যবাসীদেরকে। যার মূল কথা হলো- প্রাচ্যবাসী পাশ্চাত্যবাসীকে নিজেদের ভূমি দখল করতে দেবে, নিজেদের আভ্যন্তরীণ বিষয়সমূহ কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে দেবে, তারা নিজেদের রক্ত ও সম্পদ তুলে দেবে কোনো না কোনো পশ্চিমা শক্তির হাতে। প্রাচ্যতত্ত্ব প্রাচ্যকে নিকৃষ্ট মনে করে এবং প্রাচ্যের মানুষদেরকে নিজস্ব শাসনে পরিচালিত হওয়ার অযোগ্য ঘোষণা করে। যেহেতু প্রাচ্য বিনষ্ট, অসভ্য, তাই প্রাচ্যজনকে কথা বলতে দেয়া যায় না। কারণ সে নিজেকেও ভাল করে চেনে না, তাকে যতটা চেনে পশ্চিমের লোকেরা। এ জন্যই প্রাচ্যের পক্ষে কথা বলে সাম্রাজ্যবাদী ইউরোপ ও আমেরিকা- প্রাচ্য পরিণত হয় নিকৃষ্ট-নির্বাক-নিষ্ক্রিয় উপনিবেশে।"

মুসলিম বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত সম্পর্কিত কিছু সাম্প্রতিক তথ্য

সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহের বর্ণবাদী বুদ্ধিজীবীদের রচিত Doctrine The great game plan, বিভিন্ন মতবাদসমূহ, Orientalism এবং Clash of Civilization তত্ত্বকে প্রাচ্যের উপর চাপিয়ে দেয় সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের

www.pathagar.com

সরকারসমূহ। স্যামুয়েল হান্টিংটনের 'সভ্যতার সংঘাত' থিওরী রচনার পূর্বে এবং সিনিয়র বুশের উক্ত তত্ত্ব ফেরী করার পূর্বে মুসলিম বিশ্বে কোনো জঙ্গী ছিল না। ছিল শুধু ভিটেমাটি হারা ফিলিস্তিনী প্রতিরোধ যোদ্ধা ও জবরদখলের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা আন্দোলনরত কাশ্মিরী মুজাহিদ। উক্ত কল্পিত সভ্যতার সংঘাত তত্ত্ব বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইল ৯/১১ ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে টুইন টাওয়ার বিধ্বস্ত করে মুসলিম দেশ দখলের অজুহাত সৃষ্টি করে। তারপর থেকে পৃথিবীর সকল মুসলিম দেশ জঙ্গীময় হয়ে যায়। শুরু হয় জঙ্গী ও সন্ত্রাসী দমনের নামে রক্তাক্ত আগ্রাসন ও হত্যাযজ্ঞের নির্মম-নিষ্ঠুর-অমানবিক কার্যক্রম। তখন থেকে সাম্রাজ্যবাদীরা নিজেরাই মুসলিম যুবকদেরকে জঙ্গী বানায় এবং উক্ত জঙ্গী দমনের অজুহাতে জঙ্গীর বাপ-দাদার ভিটেমাটি-সহায়-সম্পদ কেড়ে নেয়ার কার্যক্রম শুরু হয়। কয়েকটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি সুস্পষ্ট হবে।

১. **আফগানিস্তান :** রাশিয়ার দখল থেকে আফগানিস্তান মুক্ত করার লড়াইয়ে পশ্চিমা শক্তি আফগান মুজাহিদ বাহিনী গড়ে তোলে। রাশিয়া পরাজিত হওয়ার পর আফগানরা গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হলে পশ্চিমারাই তালেবানদের সংঘটিত করে আফগানিস্তানে ক্ষমতাসীন করে। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তির পর মধ্য এশিয়ার বিপুল পরিমাণ খনিজ সম্পদ লুণ্ঠনের জন্য পশ্চিমারা আফগানিস্তানের উপর দিয়ে পাইপলাইন স্থাপনের জন্য তালেবান সরকারের সাথে একাধিক বৈঠক করে। পশ্চিমারা চেয়েছিল আফগান মোল্লাদেরকে নামমাত্র ভাড়া দিয়ে পাইপ লাইন স্থাপন করবে। কিন্তু মোল্লারা বলল– আমাদের দেশের উপর দিয়ে আমরা পাইপ লাইন বসাব, আপনারা আমাদেরকে ন্যায্য হিস্যা প্রদান করবেন। মোল্লাদের এরূপ জবাবে অসন্তুষ্ট হয়ে তালেবান সরকার উৎখাতে ৯/১১-কে অজুহাত হিসেবে দাঁড় করিয়ে আফগানিস্তানে দখলদারিত্ব কায়েম করা হয়। স্বার্থে আঘাত লাগায় মুজাহিদরা হয়ে যায় জঙ্গী, তালেবানরা হয়ে যায় সন্ত্রাসী।

২. **স্যামুয়েল বাকের লিউ রকওয়েল ওয়েবে লিখেছেন—**

(ক) ১৯৬৩ সালে সি.আই.এ সাদ্দাম হোসেনের বাথ পার্টিকে সামরিক অভ্যুত্থানে সাহায্য করে। অভ্যুত্থানের পর সি.আই.এ'র তালিকা অনুসারে জেনারেল করিম কাসেমসহ জাতীয়তাবাদীদেরকে হত্যা করা হয়।

(খ) মার্কিনীরা তাদের সাম্রাজ্য নির্মাণে তেলসমৃদ্ধ অঞ্চলকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখতে চায়। এর ধারাবাহিকতায় ইরানের মোসাদ্দেক সরকারের পতন ঘটিয়ে রেজা শাহকে ক্ষমতাসীন করা হয়।

(গ) ইরাক দখল ও নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনা করা হয় ১৯৯৬ সালে। বর্তমান মার্কিন সরকারের পরামর্শদাতা রিচার্ড পার্ল, ডগলাস ফেইথ, ডেভিড ওরম্সসহ কয়েকজন "A Clean Break : A New Strategy for

www.pathagar.com

Securing the Realms" শিরোনামে জুলাই ১৯৯৬ সালে একটি প্লান পেশ করেন, যাতে ইরাক, সিরিয়া, লেবানন ও ইরানের সরকার পরিবর্তনের নীল-নকশা উপস্থাপন করা হয়।

(ঘ) উক্ত রিচার্ড পার্ল-এর গ্রুপ ২০০০ সালের সেপ্টেম্বরে "Rebuilding Americas De Defence Strategy Forces" নামক আর একটি নীল্ নক্শা প্রণয়ন করে, যা বাস্তবায়নের অজুহাত সৃষ্টির জন্য পার্ল হারবারের ন্যায় একটি সর্বনাশা অজুহাত প্রয়োজন বলে মন্তব্য করা হয়। টুইন টাওয়ার হামলা ছিল উক্ত অজুহাত, যা ইসরাইল কর্তৃক বাস্তবায়ন করা হয়।

৩. পাকিস্তানের পরমাণু বিজ্ঞানী ড. কাদির খান দ্য নিউজ–বিবিসিকে বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র ২০১৫ সালের মধ্যে পাকিস্তান ভাঙার পরিকল্পনা করেছে। প্রেসিডেন্ট মোশাররফ পাকিস্তান ভাঙ্গার মার্কিন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছেন।

৪. সাদ্দাম হোসেন ও বাগদাদের তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রদূত এপ্রিল গ্লাসপাই-এর মধ্যে দীর্ঘ বৈঠকের ৮ দিন পর সাদ্দাম কুয়েত দখল করেন। বিশ্বের বেশির ভাগ সংবাদ মাধ্যমের মতে, ইরাকের কুয়েত আক্রমণের পিছনে মার্কিন ইন্ধন ছিল। (সূত্র : আলমগীর মহিউদ্দীন, নয়া দিগন্ত, ১৪-০৬-০৮ইং)

৫. আমেরিকার উস্কানিতে ইরাক ১৯৮০ সালে ইরানে হামলা করে। এতে ১০ লাখ মুসলমান নিহত হয়। (দৈনিক সংগ্রাম, ২৭-০৬-০৮)

৬. বিখ্যাত আন্তর্জাতিক মিডিয়া ব্যক্তিত্ব সিমুর হার্শ ৭ জুলাই ২০০৮ সালের নিউইয়র্কা পত্রিকায় লিখেন—"ইরানকে অস্থিতিশীল করতে যুক্তরাষ্ট্র ৪০০ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ করেছে। ইরানের ধর্মীয় নেতৃত্বে ও রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি, আরবী ভাষী ইরানী ও বালুচদের সাথে পার্সী ভাষী ইরানীদের বিভেদ সৃষ্টি করে অস্থিতিশীল করা এ পরিকল্পনার অংশ।

মার্কিন কর্নেল রালফ পিটারের অংকিত Broader Middle East Plan ও উপরোক্ত তথ্যসমূহ থেকে দেখা যাচ্ছে, পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ নিজেদের অন্যায্য লুণ্ঠনবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য মুসলিম বিশ্বকে ধ্বংস ও দখল করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তাদের টার্গেটকৃত দেশের মধ্যে পাশ্চাত্যের পক্ষের ও বিপক্ষের উভয় শ্রেণীর মুসলিম দেশ অন্তর্ভুক্ত। তবে পার্থক্য এই যে, সাম্রাজ্যবাদীরা প্রথমে পাকিস্তানে, ইরানে, সিরিয়ায়, ইরাকে ও তুরস্কে তাদের আগ্রাসী হামলা পরিচালনা করবে এবং তৎপর পাশ্চাত্যের বন্ধুরাষ্ট্র বা বশংবদ মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের জানকবজ করবে। মুসলিম বিশ্বের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানরা কি এসব তথ্য অবগত নয়? যদি অবগত না থাকে তাহলে এমন অযোগ্য বেখবর রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানদের পদত্যাগ করে যোগ্য ব্যক্তিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করা দরকার। আর যদি জানা থাকে তাহলে তাদের উচিত আর কোনো মুসলিম দেশ সাম্রাজ্যবাদী হামলার শিকারে

www.pathagar.com

পরিণত হওয়ার পূর্বে সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়ে তোলা। আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে নিজেদের মতভেদ দূর করা ও নিজ নিজ জনগণকে সাম্রাজ্যবাদীদের আসন্ন হামলার ব্যাপারে সজাগ-সতর্ক-ঐক্যবদ্ধ ও সশস্ত্র করা। **মনে রাখতে হবে। সাম্রাজ্যবাদীরা কখনও কোনো স্বাধীন দেশের বন্ধু নয়। সাম্রাজ্যবাদের পুতুল সরকারগণ সাম্রাজ্যবাদীদের দৃষ্টিতে টয়লেট পেপারের চেয়ে বেশি মূল্যবান নয়। সিরিয়ার বিপদে যদি তুরস্ক সহযোগিতার পরিবর্তে সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষাবলম্বন করে, তবে তুরস্ককেও ধ্বংস হতে হবে। ইরানের বিপদে যদি সৌদি আরব, পাকিস্তান ও জিসিসি দেশসমূহ ইরানকে সাহায্যের পরিবর্তে সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষাবলম্বন করে তবে ইরানের পতনের সাথে তাদেরও পতন হবে। আমাদের পবিত্র ভূমি অভিশপ্ত ইহুদী-নাছারাদের পদতলে পিষ্ট হবে। এমতাবস্থায় একবিংশ শতাব্দীর জাগ্রত মুসলিম তরুণেরা প্রথমে তাদের দুর্ভোগের কারণ শাসকদের খুঁজে বের করে বিচারের সন্মুখীন করবে এবং সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে নির্মম-কঠিন প্রতিরোধ গড়ে তুলে সাম্রাজ্যবাদীদের পতন নিশ্চিত করবে। সবাইকে স্মরণ রাখা উচিত, আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির কল্যাণে মুসলিম তরুণ-যুবকগণ এখন অনেক বেশি সচেতন-সজাগ ও স্বাধীনতা প্রিয়। অযোগ্য-অথর্ব তাঁবেদার সরকারকে তারা জীবন্ত কবর দেবে।**

পতন-পরবর্তী মুসলমানদের উত্থানের কারণ

সৌদি আরব

ধ্বংসপ্রায় মুসলিম বিশ্বের উত্থানের রূপরেখা প্রণয়ন করেন প্রখ্যাত ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব শায়খ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহাব নজদী। তাঁর শিক্ষায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মুসলমানরা ঘুম থেকে জেগে উঠে এবং ১৭৪৫ খ্রিস্টাব্দে আরবের একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের শাসক মুহাম্মদ ইবনে সউদ শায়খ মুহাম্মদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। নির্ভেজাল ইসলাম চর্চা ও প্রতিষ্ঠাই ছিল ইবনে ওয়াহাব এর মূল লক্ষ্য। সউদ পরিবার এর পর থেকে সকল কুসংস্কার দূর করে ইসলাম প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে রাজত্ব বিস্তৃত করার কার্যক্রম পরিচালনা করেন। অনেক ঘাত-প্রতিঘাত, চড়াই-উতরাই পেরিয়ে এ বংশের মহান ব্যক্তি আবদুল আযীয ইবনে সউদ ১৯০১ সাল থেকে ১৯৩২ সালের মধ্যে বর্তমান ভূখণ্ডের মধ্যে সউদী আরব প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁকে আধুনিক সউদী রাজত্বের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। এ বংশ সউদী আরবে ইসলামী শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করায় সৌদি আরব এখনও বিশ্বের সবচেয়ে শান্তি ও ন্যায়বিচার সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে টিকে আছে। ১৯৭৫ সালে আততায়ীর গুলিতে এ বংশের মহান শাসক বাদশাহ ফয়সাল নিহত হওয়ার পর থেকে সৌদি আরব ক্রমান্বয়ে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বলয়ে প্রবেশ করে।

১৯৮৪ সালে এ দেশটি যুক্তরাষ্ট্র-ফ্রান্স ও ব্রাজিলের সাথে প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম

www.pathagar.com

সরবরাহ এবং সামরিক প্রশিক্ষণের জন্য চুক্তি করে। আভ্যন্তরীণভাবে দেশটি এখনও ইসলামের নিয়ম-কানুন পালনে সচেষ্ট থাকলেও আন্তর্জাতিকভাবে এরা ইসলামের দুশমন ইসরাইল ও সাম্রাজ্যবাদীদের সহযোগীতে পরিণত হয়েছে। এর থেকে বেরিয়ে আসতে না পারলে এ দেশটি মুসলমানদের জন্য যথাযথ কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হবে এবং নিজেদের জন্য সর্বনাশ ডেকে আনবে। এ রাজবংশের উত্থানের কারণ নির্ভেজাল ইসলাম প্রতিষ্ঠা আর পতনের কারণ হবে ইসলামের দুশমন ইহুদী-নাছারাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন।

পাকিস্তান

১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের জন্ম লাভ বিংশ শতাব্দীর বিস্ময়, রাজনৈতিক ইতিহাসের বিস্ময়। দীর্ঘ ১৫০ বছরের ইঙ্গ-হিন্দু শাসন-শোষণে নিষ্পেষিত মৃতপ্রায় মুসলমানরা ধর্মের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রবল শক্তিধর বৃটিশ কর্তৃপক্ষ ও বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ উগ্র সাম্প্রদায়িক হিন্দু শক্তির সাথে যুগপৎ মোকাবেলা করে অর্জন করে পাকিস্তান। মুষ্টিমেয় মুসলিম নেতৃবৃন্দ ও বুদ্ধিজীবী ঘুমন্ত ও মৃতপ্রায় জাতিকে মুসলিম জাতীয়তার মন্ত্রে দীক্ষিত করে ঐক্যবদ্ধ করে মাত্র ৪১ বছরের মধ্যে হিন্দুস্থানের বুক চিরে নিজেদের জন্য নিজেদের সার্বভৌম ভূখণ্ড লাভ করা সম্ভব হয়েছে শুধুমাত্র স্বীয় ধর্মকে অবলম্বন করায়। কিন্তু ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতার পর পর এ জাতির মহান নেতা কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ইন্তেকাল করায় পরবর্তী দুর্বল নেতৃত্ব জাতিকে সঠিকভাবে নেতৃত্ব দিতে ব্যর্থ হওয়ায় দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রে মাত্র ২৪ বছরে দেশটি ভেঙে যায়। এতদসত্ত্বেও বর্তমান পাকিস্তান ও বাংলাদেশ শত ষড়যন্ত্র মোকাবেলা করে বিশ্বে নিজেদের আসন ধরে রেখেছে। উভয় দেশের বতর্মান দূরবস্থার প্রধান কারণ হলো ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধ ও মূল্যবোধ থেকে দূরে সরে যাওয়া। আত্মজিজ্ঞাসা ও ভুল সংশোধন উভয় দেশের স্বাধীনতাকে সংরক্ষণ করবে।

ইরান

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে ইরান ক্রমান্বয়ে রাশিয়া ও বৃটেনের কলোনীতে পরিণত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৫১ সালে ড. মোসাদ্দেক সরকার ইরানের তেলশিল্প জাতীয়করণ করায় সাম্রাজ্যবাদীরা মোসাদ্দেক সরকারের উপর ক্ষিপ্ত হয়। সিআইএর অর্থে সামরিক অভ্যুত্থানে মোসাদ্দেক সরকারের পতন হয়, পলাতক শাহ দেশে ফিরে এসে রাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা চালু করেন এবং ইরানে পাশ্চাত্যের বেলেল্লাপনা, মদ, জুয়া, নেশা, অশ্লীল পুস্তক, অশ্লীল সিনেমা, পতিতালয় ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেন এবং ইসরাইলের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। এতদিন শাহের দেশবিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে ইরানের গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি সক্রিয়

www.pathagar.com

ছিল কিন্তু শাহ কর্তৃক ইসরাইলের সাথে সম্পর্ক স্থাপন ও ইসলামবিরোধী পদক্ষেপ গ্রহণ করায় ইরানের শক্তিশালী ধর্মীয় নেতারা তুমুল আন্দোলন গড়ে তোলেন। জনগণ আলেমদের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ১৯৭৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রের পুতুল রেজাশাহ পাহলবীকে দেশ ছাড়া করেন। তৎকালীন পৃথিবীর সকল বৃহৎ শক্তি, বৃহৎশক্তির দেশীয় এজেন্টগণ এবং রাজতান্ত্রিক মুসলিম দেশসমূহের সম্মিলিত বাধা উপেক্ষা করে ইরানের ইসলামী বিপ্লব বিজয়ী হয়েছে, টিকে রয়েছে এবং বর্তমানে বিশ্বমোড়লদেরকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়ার শক্তি অর্জন করেছে। ইরানী জনগণ যতদিন ইসলাম থেকে দূরে থেকেছিল ততদিন তারা অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর গোলামী করেছে।

তুরস্ক

১২৯০ খ্রিস্টাব্দ হতে ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তুরস্কে উছমানিয়া খেলাফত/রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইরাকসহ সমগ্র আরব উপদ্বীপ, মিসর, মরক্কো, গ্রীস, বুলগেরিয়া, আলবেনিয়া, সার্বিয়া, বসনিয়া, মন্টেনেগ্রো, হার্জেগোভিনা, হাঙ্গেরী, রুমানিয়া, আর্মেনিয়া এই সাম্রাজ্যের অধীন ছিল। ১ম বিশ্বযুদ্ধে পরাজয়ের পর এ সাম্রাজ্য ভেঙে যায় এবং বর্তমান তুরস্ক অবশিষ্ট থেকে যায়। আমার আলোচ্য বিষয় হলো তুর্কীদের উত্থান ও পতনের কারণসমূহ উল্লেখ করা। তা সংক্ষেপে নিম্নরূপ–

তুর্কীরা মধ্য এশিয়ার তাতার জাতির বংশধর ছিল। তারা ছিল যাযাবর ও প্রকৃতিপূজারী। নবম ও দশম শতাব্দীতে তুর্কীরা ইসলাম গ্রহণ করে। ১০৫৫ খ্রিস্টাব্দে সেলজুক তুর্কীরা বাগদাদ দখল করে এবং ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দে হালাকু খান কর্তৃক ক্ষমতাচ্যুত হয়। অপরদিকে ১২৯০ সালে ১ম ওছমান ওছমানিয়া তুর্কী সালতানাতের ভিত্তি স্থাপন করেন তুরস্কের ইশকি শহরকে কেন্দ্র করে। প্রত্যেক শাসক তুর্কী সাম্রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি করে ১৮২৮ পর্যন্ত অত্যন্ত প্রতাপের সাথে এশিয়া মাইনর, আরব ভূখণ্ড ও ইউরোপের বর্ণিত দেশসমূহ শাসন করেন এবং এর পর থেকে ১৯১৩ সাল নাগাদ ইউরোপীয় অংশসমূহে পর্যায়ক্রমে তুর্কী শাসন লোপ পায় এবং ১ম মহাযুদ্ধে পরাজয়ের পর বর্তমান আকার ধারণ করে। তুর্কী সেনাপতি কামাল পাশা ১৯২২ সালের ২৯ অক্টোবর তুর্কী সুলতানকে ক্ষমতাচ্যুত করে তুরস্কে প্রজাতন্ত্র স্থাপন করেন। কামাল পাশা প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ১৯২৪ সালের মার্চ মাসে কামাল পাশা খিলাফত ব্যবস্থা বিলুপ্ত করেন। অসংখ্য আলেম হত্যা করেন। ধর্মচর্চা নিষিদ্ধ করেন। আরবীতে নাম রাখা, আরবী পড়া, আরবীতে আজান দেয়া নিষিদ্ধ করেন। তুরস্ককে তথাকথিত সেক্যুলার (অর্থাৎ ইসলামবিরোধী) দেশে পরিণত করেন। মূলত ৬৩২ বছর পর্যন্ত প্রবল প্রতাপান্বিত তুর্কী সালতানাত কামাল পাশা ও তার অনুসারীদের দ্বারা ১৯২২ সাল থেকে সামরিক শাসনের দেশ, ইসলাম বিরোধীদের দেশ, জরুরি অবস্থা জারির দেশ ও

www.pathagar.com

ভিক্ষুকের দেশে পরিণত হয়। ইসলামপন্থী রজব তাইয়েব এরদোগানের ক্ষমতা গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত তুরস্ককে বলা হলো 'ইউরোপের রুগ্ন মানুষ'। কিন্তু মাত্র এক দশকের মধ্যে এরদোগান সরকার তুরস্ককে ইউরোপের সবচেয়ে শক্তিশালী দেশে পরিণত করেন। দুর্নীতিবাজ সেক্যুলারগণ যে তুরস্ককে ইউরোপের ভিক্ষুকে পরিণত করেছিল সে তুরস্ক এখন ইউরোপের সবচেয়ে ধনী ও শক্তিশালী দেশে পরিণত হয়েছে। এই সেক্যুলাররা তুরস্কে ২৫টি মার্কিন ঘাঁটি স্থাপনের সুযোগ দিয়ে তুরস্ককে গোলামে পরিণত করেছিল।

কামাল পাশার আসল পরিচয় : আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামসহ পৃথিবীর অনেক মুসলমান লেখক দীর্ঘদিন কামাল পাশাকে নিয়ে গর্ব করে সাহিত্য-কবিতা রচনা করেছেন। কিন্তু তার আসল রূপ যারা জানে তারা অবশ্যই ঘৃণায় তার প্রতি সহস্র অভিশাপ বর্ষণ করবেন।

মুখোশের অন্তরালে কামাল পাশা : কামাল পাশা ইহুদী কবলিত দূন্‌মা (প্রত্যাবর্তনকারী) সম্প্রদায়ের সদস্য ছিল। দূন্‌মাদের পরিচয় হলো– ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দে শারতে শিবী নামক স্নার্নাবাসী ইহুদী নিজেকে 'মসীহ মউদ' বা প্রতিশ্রুত মসিহ (ঈসা আ.) হিসেবে দাবি করে। বিপুল সংখ্যক ইহুদী তার উপর ঈমান আনে। শিবী সদলবলে সিরিয়া ও বায়তুল মুকাদ্দাস সফর করে ইস্তাম্বুলে উপস্থিত হলে তুর্কী খলিফা তাকে গ্রেফতার করেন। এমতাবস্থায় শিবী ও তার দল ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মুক্তি লাভ করে ও তুরস্কে স্থায়ীভাবে অবস্থান করে। তার অনুসারীরা ইতিহাসে দূন্‌মা হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। পরবর্তীতে এ সম্প্রদায়ের লোকেরা তুরস্কে Comittee of Union and Progress নামক দল গঠন করে। এ দলের সদস্যগণ অনেক তুর্কী যুবককে নিজ দলে অন্তর্ভুক্ত করে এবং সালতানাতের অনেক বড় পদ দখল করে। ১ম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে দানিয়ুব প্রদেশের গভর্নর মাদহাত পাশা এবং ড. নাজেম, ফওজী পাশা, ছগুম আফেন্দী প্রমুখ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিতে পরিণত হন। এসব ব্যক্তি তুর্কী সেনাবাহিনীতে একটি গোপন ইউনিট গড়ে তোলে এবং ১ম বিশ্বযুদ্ধের সময় উক্ত ইউনিট কামাল পাশার নেতৃত্বে তুর্কী সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ও তুর্কী খেলাফত ধ্বংস করে। কামাল পাশা ইহুদীদের গোপন আন্দোলন ফ্রী ম্যাসন এর সদস্য ছিল। ইহুদীদের নির্দেশে সে তুরস্ক থেকে ইসলামকে উচ্ছেদ করার কর্মসূচি গ্রহণ করে। (তথ্য সূত্রঃ জাতির উত্থান-পতন সূত্র, প্রবন্ধকার, পৃ. ৪২)

উপরোক্ত আলোচনায় দেখা গেল ইসলাম ধর্মের প্রকৃত অনুসরণ যাযাবরকে বাদশাহী প্রদান করে এবং ইসলাম থেকে দূরে সরে গেলে আমীর থেকে গোলামে পরিণত হয়ে সকল জাতির পদতলে পিষ্ট হতে হয়। ইসলামী জাতীয়তাবোধ পরাধীন থেকে স্বাধীন করে এবং ভৌগোলিক, গোত্রীয়, ভাষাভিত্তিক ও অন্যান্য জাতীয়তাবাদ এবং অন্যান্য ইজম মুসলমানদের পতন নিশ্চিত করে।

www.pathagar.com

বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের পতনের কারণসমূহ—

১. নিজ নিজ মাতৃভাষায় ইসলামকে না জানা এবং ইসলাম থেকে দূরে সরে যাওয়া।

২. খেলাফত থেকে রাজতন্ত্রে এবং গণতন্ত্রে প্রত্যাবর্তন।
এ বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত মতামত হলো— সত্যিকারের খেলাফত ব্যবস্থা সবচেয়ে উত্তম, যদি খেলাফত প্রতিষ্ঠা সম্ভব না হয় তবে ইসলামী মূল্যবোধের ধারক ও বাহক ন্যায়পরায়ণ রাজা বাদশাহর শাসন জনগণের জন্য উত্তম। গণতন্ত্র মুসলমানদের জন্য উত্তম হবে যদি প্রত্যেক ধর্মীয় জাতি পৃথক ভোটের মাধ্যমে নিজেদের নেতা নির্বাচিত করে এবং সৎ ও দূরদর্শী ব্যক্তি প্রধান নির্বাহী ও সংসদ সদস্য হয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায়, ইহুদী মস্তিষ্কপ্রসূত বর্তমান গণতন্ত্র, পৃথিবীর দেশে দেশে রাজনীতি ব্যবসায়ী দুর্বৃত্তদেরকে নেতা নির্বাচিত করে এবং দেশ জাতিকে ধ্বংস করে।

৩. যায়নবাদী ইহুদী চক্রান্ত সম্পর্কে অজ্ঞতা।

৪. ধর্ম ও রাজনীতির বিভাজন।

৫. ইসলামী নেতৃত্বের অযোগ্যতা।

৬. জ্ঞান-বিজ্ঞানে পশ্চাদপদতা।

৭. শিরক ও বিদআতে লিপ্ত হওয়া।

৮. ধর্ম ব্যবসা ও ফেরকাবাজি।

৯. ধর্মবিমুখ শাসক।

১০. তাতারী ফেতনা।

১১. ক্রুসেড।

১২. বিজাতীয় সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ও বিজাতীয় মতবাদ গ্রহণ।

মুসলিম বিশ্বের করণীয়

১. সাম্রাজ্যবাদের তাঁবেদার সরকার থেকে মুসলিম দেশগুলোকে রক্ষা করা।

২. মুসলিম বিশ্বে একক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা। প্রথম শর্ত পূরণ করা গেলে ২য় শর্ত পূরণ করা যাবে।

৩. সাম্রাজ্যবাদের সেনাঘাঁটি ও গোয়েন্দা ঘাঁটি থেকে নিজ নিজ দেশকে মুক্ত করা।

৪. সাম্রাজ্যবাদবিরোধী দেশগুলোর সাথে মুসলিম বিশ্বের ঐক্যপ্রতিষ্ঠা।

৫. জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে দ্রুত আত্মনির্ভরশীল হওয়া।

৬. সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহের ইহুদীবিরোধী ব্যক্তি ও সংগঠনকে সহায়তা প্রদান।

৭. সরকার ও জনগণের মধ্যে দূরত্ব নিরসন।

www.pathagar.com

৮. সার্বজনীন উচ্চশিক্ষা ও সামরিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা।

৯. শিক্ষা ব্যবস্থা ও সিলেবাসকে লক্ষ্য অনুযায়ী বিন্যস্ত করা।

১০. মুসলিম জাতীয়তাবোধ ও মূল্যবোধকে শক্তিশালী করা।

১১. শক্তিশালী ও.আই.সি বাহিনী গঠন, আঞ্চলিক ও ভাষাভিত্তিক লীগ বিলুপ্তকরণ।

১২. সর্বক্ষেত্রে সমকালীন শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করা।

১৩. যায়নবাদী ষড়যন্ত্র সম্পর্কে নিজ জাতিকে ও অন্যান্য জাতিকে অবহিত করা, সতর্ক করা ও প্রতিহত করা।

১৯ জানুয়ারি ২০১২

www.pathagar.com

মুসলিম বিশ্বে গণজাগরণ, সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত এবং করণীয়

সর্বশেষ প্রেরিত পুরুষ হযরত মুহাম্মদ (সা:) ও সর্বশেষ আসমানী কিতাব আল-কুরআন নাজিল হওয়ার মাধ্যমেই মূলত মানব ইতিহাসের আধুনিক যুগ শুরু হয়। ইতোপূর্বে রাষ্ট্র পরিচালনায় জনগণের সম্মতি গ্রহণ, নারী অধিকার, সার্বজনীন মানবাধিকারের ধারণা পৃথিবীতে আগত অন্য কোনো নবী-রাসুল, ধর্মনেতা বা দার্শনিক উপস্থাপন করতে সমর্থ হননি। রাসূল মুহাম্মদ (সা:) শুধু উপস্থাপনই করেননি, তিনি প্রতিটি বিষয় বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখিয়েছেন। ফলে ইসলামের আবির্ভাব, মুসলমানদের বিজয় অভিযান ও দেশ শাসনের সময়কালে পৃথিবীর প্রতিটি মহাদেশের জনগণ, ইসলামের সাম্য, মানবাধিকার, ন্যায় বিচার প্রত্যক্ষ করে নিজেদেরকে সমৃদ্ধ করেছে। স্পেনে মুসলমানদের সুদীর্ঘ ৭০০ বছরের শাসনকালে সমগ্র ইউরোপের জ্ঞানপিপাসু যুবকগণ স্পেনের মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণ করে নিজ দেশ জাতিকে আলোকিত করেছে। এই আলোকচ্ছটাই ইউরোপে নবজাগরণ এনেছিল।

কালক্রমে ইসলাম থেকে দূরে সরে যাওয়ায়, জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা বাদ দিয়ে ভোগ-বিলাসে লিপ্ত হওয়ায় মুসলমানরা পিছিয়ে যায় এবং ইউরোপীয়রা সে স্থান দখল করে। আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার বয়স ২০০-২৫০ বছরের বেশি নয়। এরই মধ্যে ভোগবিলাস আর চরিত্রহীনতা তাদেরকে পতনের দ্বারপ্রান্তে এনে দাঁড় করিয়েছে। অপরদিকে নবউত্থিত মুসলমানরা যাতে পুনরায় বিশ্বের চালকের আসন দখল করতে না পারে তার জন্য সমগ্র ইউরোপ ও তাদের ভাবশিষ্যরা মুসলিম নবজাগরণকে নস্যাত করতে সকল প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

মুসলিম বিশ্বের আধুনিক গণজাগরণের নায়কগণ

মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ আল কুরআন অবিকৃত থাকায় এ জাতির মধ্যে প্রতি শতাব্দীতেই এক বা একাধিক ধর্ম সংস্কারকের আবির্ভাব ঘটে। তন্মধ্যে কারো প্রভাব নিজ দেশে সীমাবদ্ধ থাকে আর কারো প্রভাব দেশ-কাল-সীমানা ছাড়িয়ে যায়। পতন-পরবর্তী মুসলিম বিশ্বের আধুনিক পথপ্রদর্শকগণ যারা মৃতপ্রায় মুসলিম জাতিকে পুনরায় ঘুরে দাঁড়ানোর শিক্ষা, সাহস, হিম্মত ও কৌশলের নির্দেশনা

www.pathagar.com

দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, জাজিরাতুল আরবের শায়খ মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহাব, ভারতবর্ষের শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী, মিসরের সাইয়েদ হাসানুল বান্না (শহীদ) ও ভারতের সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী। উক্ত ৪ জন মহান মুসলিম দার্শনিক মুসলমানদেরকে পুনরায় আল কুরআনের দিকে আহ্বান জানান এবং কুরআন-হাদীসের শিক্ষার আলোকে নবজাগরণের পথনির্দেশনা দান করেন। সঠিক ইসলামকে রাজনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠাই তাদের শিক্ষার মূলকথা। তাঁদের পরিচয় ও কার্যক্রমের সংক্ষিপ্তসার হলো—

১. ইমাম মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহাব

অষ্টাদশ শতকে তাঁর জন্ম জাজিরাতুল আরবে। তখন আরব ভূখণ্ড অনেকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল এবং উক্ত রাজ্যগুলো ওসমানিয়া খলীফাদের করদরাজ্য ছিল। শিরক বিদআতের ব্যাপক বিস্তারের কারণে মুসলমানরা ইসলাম থেকে দূরে সরে গিয়ে হীনাবস্থায় পতিত হয়েছিল। রাজাদের খেয়াল-খুশিমতো রচিত আইনে জনগণ শাসিত হতো। এহেন অবস্থায় ইমাম মুহাম্মদ মানুষকে এক আল্লাহর ইবাদতের দিকে ডাকেন, আল্লাহর আইনের শাসনের দিকে আহ্বান জানান এবং ইসলামকে বিজয়ী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার ডাক দেন। তাঁর এ আহ্বানে জনগণ ছাড়াও তৎকালীন আরবের দারিয়া রাজ্যের প্রিন্স মুহাম্মদ বিন সউদ সাড়া দেন। ১৭৬৫ সালে এই মহান প্রিন্স ইমাম মুহাম্মদ এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং ইসলামকে বিজয়ী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠার শপথ নেন। প্রিন্স মুহাম্মদ এর ওফাতের পর তাঁর সুযোগ্য পুত্র আবদুল আযীয ক্ষমতাসীন হন এবং পিতার নীতি অনুসরণ করেন। এরই ধারাবাহিকতায় বাদশাহ আবদুল আযিয বিন আবদুর রহমান (১৮৭৬-১৯৫৩) দীর্ঘ ৩০ বছর রক্তাক্ত সংগ্রাম পরিচালনা করে বর্তমান সৌদি আরব রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। অতঃপর তিনি সমগ্র সৌদি আরবে শরীয়া আইন চালু করেন এবং শিরক-বিদআত উচ্ছেদ করেন, যা এখনো অব্যাহত আছে। বাংলার হাজী শরীয়ত উল্লাহ ও মীর নিসার আলী তিতুমীর এই ধারার ফসল ছিলেন। এছাড়া বিশ্বের প্রতিটি মুসলিম দেশ এই ধারা থেকে অনুপ্রাণিত হয়েছে।

২. শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (১৭০৬-১৭৬৩)

দিল্লীতে জন্মগ্রহণকারী শাহ ওয়ালীউল্লাহর সময় ছিল মোগল শাসনের অন্তিম পর্ব। তিনি লক্ষ্য করেন যে, মুসলমানদের নৈতিক অধঃপতনই মুসলিম শাসনের দ্রুত পতনের কারণ। এর থেকে পরিত্রাণ পেতে শেরেকী বর্জন করে কোরআন হাদীস অনুযায়ী জীবনযাপন করতে হবে। তাঁর এই ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন উনবিংশ শতকের প্রারম্ভে সুসংগঠিত রূপলাভ করে। হিন্দু-শিখ ও ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী এর বিরোধীতা করায় এ আন্দোলন যুগপৎভাবে তাদের বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপ নেয়। এ পর্যায়ে মূল নেতৃত্বে ছিলেন মওলানা শাহ আবদুল আজিজ ও তাঁর

www.pathagar.com

শিষ্যরা যথাক্রমে সৈয়দ আহমদ বেরেলভী, মওলানা শাহ ইছমাইল ও মওলানা আবদুল হাই, সৈয়দ আহমদের নেতৃত্বে শিখদের সাথে অনেক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়। এক পর্যায়ে শিখদেরকে পরাজিত করে সৈয়দ আহমদ পেশওয়ার ও পাঞ্জাবে ইসলামী শাসন কায়েম করেন। ১৮৩১ সালের মে মাসে শিখদের অতর্কিত হামলায় বালাকোট নামক স্থানে সৈয়দ আহমদ বেরেলভীসহ অনেক নেতৃস্থানীয় মুজাহিদ শহীদ হন। এরপর এ আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন জামিন শাহ। তিনি সীতানাকে কেন্দ্র করে ৫০ বছর স্থায়ী একটি স্বাধীন এলাকা প্রতিষ্ঠা করেন। সৈয়দ আহমদের অনুসারীদের সাংগঠনিক তৎপরতা এবং দিল্লীর বাদশাহ বাহাদুর শাহ জাফরের নেতৃত্বেই ১৮৫৭ সালের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ সমগ্র ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। হিন্দু-শিখ ও গুর্খারা ব্রিটিশদের পক্ষ নেয়ায় সে যুদ্ধে মুসলমানদের শোচনীয় পরাজয় ঘটে। ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী লক্ষ লক্ষ আলেমকে ও মোগল রাজপুরুষদেরকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে এর প্রতিশোধ নেয়। ভারতবর্ষ চূড়ান্তভাবে মুসলমানদের হস্তচ্যুত হয়।

৩. সাইয়েদ হাসানুল বান্না (শহীদ) (১৯০৬-১৯৪৯)

তিনি ১৯০৬ সালে এক প্রখ্যাত আলেমের ঔরসে মিসরে জন্মগ্রহণ করে। মাত্র ১৪ বছর বয়সে তিনি 'জামাইয়্যাতুল হাসাফিয়াতিল খায়রিয়্যা' নামে একটি জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে এর সেক্রেটারী নির্বাচিত হন। তিনি ২১ বছর বয়সে কায়রোর দারুল উলুম থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রি লাভ করেন। এখানে তিনি শিক্ষক প্রশিক্ষণ, মনোবিদ্যা, দর্শন, তর্কশাস্ত্র, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব, গণিত ও ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে অধ্যয়ন করেন। এ সময় তিনি দারুল উলুম ও আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সমন্বয়ে একটি দাওয়াতী সংগঠন গড়ে তোলেন। পরবর্তীতে তিনি 'আল্ ফাত্হ' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা ও জামাইয়্যাতশ-শুব্বানিল মুসলিমীন নামে একটি যুবসংগঠন গড়ে তোলেন, মিসর তখন সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেনের অধীনস্থ তাবেদার সরকার দ্বারা শাসিত হতো।

১৯২৯ সালে তিনি 'জামাইয়্যাতু ইখওয়ানুল মুসলেমিন' নামক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। এ সংগঠনের মূল উদ্দেশ্য ঘোষিত হয় আল্লাহর জমীনে ইসলমাকে বিজয়ী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা। এ সংগঠন ১৯৩৬ সালে মজলুম ফিলিস্তিনী ভাইদের সাহায্যার্থে প্রত্যক্ষ লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়। ২য় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে তৎকালীন ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী প্রতিশ্রুতি দেয় যে, যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর তারা মিসর ছেড়ে চলে যাবে। কিন্তু বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর তারা মিসর ত্যাগ করতে অস্বীকার করায় ইখওয়ানুল মুসলেমিন-এর নেতৃত্বে মিসরবাসী প্রবল গণআন্দোলন শুরু করে। গণআন্দালন বন্ধ করতে তৎকালীন তাবেদার সরকার ইখওয়ানের অসংখ্য নেতাকর্মীদের বন্দী করে এবং শায়খ হাসানুল বান্নাকে গুপ্তঘাতকের দ্বারা শহীদ করে।

www.pathagar.com

সারাজীবন তিনি সমাজসেবা, সমাজ সংস্কার, ইসলামী দাওয়াত ও জিহাদে ব্যাপৃত ছিলেন। এজন্য তিনি বই আকারে কিছু লিখে যাননি তবে তাঁর বক্তৃতা, প্রবন্ধ ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উপর ভিত্তি করে রচিত হয় 'রিসালাহ্ আত তা'লীম' গ্রন্থ। এটিই ইখওয়ানুল মুসলেমীন বা Muslim Brotherhood-এর মূল চালিকাশক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। এই গ্রন্থের দু'টি অংশ। প্রথম অংশ হলো– 'আরকান-ই-বাইয়াত' আর ২য় অংশ হলো 'মুজাহিদ ভাইদের দায়িত্ব ও কর্তব্য'।

তাঁর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ মুসলমানদেরকে আধুনিক বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সক্ষম করেছে এবং সমগ্র আরব বিশ্ব, ইউরোপ ও অনারব মুসলিম বিশ্বে বিভিন্ন নামে এই সংগঠন গড়ে ওঠে পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে।

৪. সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী ১৯০৩-১৯৭৯

তিনি ইংরেজি ১৯০৩ সালের হিজরি রজব মাসে ভারতের আওরঙ্গবাদ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন প্রখ্যাত আইনজীবী সাইয়েদ আহমেদ হাসান মওদুদী। ১৯১৭ সালে তিনি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। পিতার অসুস্থতার কারণে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়েও তিনি বাড়িতে ফিরে আসেন এবং ১৯২০ সালে পিতার মৃত্যু পর্যন্ত পিতার পাশে অবস্থান করেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে বেছে নেন এবং অবসরে ইংরেজি, আরবী ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেন। তাছাড়া তিনি মশহুর আলেমদের নিকট কুরআন, হাদীস ও ফেকাহ্ শাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন।

১৯৩২ সালে দাক্ষিণাত্যের হায়দরাবাদ থেকে 'তরজুমানুল কোরআন' নামক একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। উক্ত পত্রিকার মাধ্যমে তিনি স্বীয় চিন্তাধারাকে দেশব্যাপী ছড়িয়ে দেন। ১৯৪১ সালে তিনি তাঁর গুণগ্রাহী পাঠকদের সমন্বয়ে জামায়াতে ইসলামী নামক রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সংগঠন গড়ে তোলেন। যে যুগে তিনি জন্মেছিলেন সে যুগে ভারতের মুসলমানরা ব্রিটিশ শাসকদের গোলামীর শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল। রাষ্ট্রশক্তি, শিক্ষাব্যবস্থা, সিলেবাস ছিল ইসলাম বিরোধীদের দিক নির্দেশনায় পরিকল্পিত। মুসলমানদের ঈমান-আকিদা বিরোধী সকল ফিতনায় তখন ভারত ও বিশ্বমুসলিম নিমজ্জিত ছিল। ভণ্ড নবী গোলাম আহমদ কাদিয়ানী তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজধারী মুসলমান নামধারী তুরস্কের কামাল পাশা, ভণ্ড আলেম, দরবারী আলেম, পীর পূজারী, কবর পূজারী, শিরক-বিদআতে নিমজ্জিত মুসলমান, সমাজতন্ত্রী, পাশ্চাত্য গণতন্ত্রী সাম্যবাদী, ডারউইনবাদীদের তখন জয়-জয়কার ছিল। তদুপরি ইসলাম যে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা, সকল মতবাদের উপর ইসলামকে বিজয়ী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা যে, মুসলমানদের দায়িত্ব ও কর্তব্য তাও আলেমরা ভুলে গিয়েছিল। সর্বোপরি ইসলামে রাজনীতি আছে কি নাই তাও জনগণ জানতো না।

www.pathagar.com

এহেন ঘনঘোর অন্ধকার যুগে তিনি আলোর মশাল হাতে একাকী এগিয়ে এলেন। নিজ জাতিকে পরিশুদ্ধ করার সাথে সাথে তিনি সকল বাতিল মতবাদের অন্তসারশূন্যতা ও ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব যুক্তিপূর্ণভাবে তুলে ধরেন। ইসলামের বিজয়ের রূপরেখা ও মানবতার মুক্তির দিকদির্দেশনা তিনি তুলে ধরেন। প্রতিটি বিষয়ে তিনি যুক্তিপূর্ণভাবে ও বিস্তারিতভাবে তুলে ধরে যুগ-জিজ্ঞাসার জবাব প্রদান করেন। তাঁর রচিত বইয়ের সংখ্যা ৬০টিরও বেশি। এছাড়াও তিনি অসংখ্য পুস্তিকা ও প্রবন্ধ রচনা করেন।

তাঁর ক্ষুরধার লেখনী পৃথিবীর প্রায় সব গুরুত্বপূর্ণ ভাষায় অনূদিত হয়ে বিশ্বব্যাপী চিন্তাশীল মানুষের মনোজগতে আলোড়ন সৃষ্টি করে। ফলে পৃথিবীর সব দেশে কোনো না কোনো নামে সংগঠন গড়ে ওঠে ইসলামের নবজাগরণে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছে ও রাখছে। পৃথিবীর অসংখ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর লেখা প্রবন্ধ ও বই পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তাঁর রচিত সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান হলো– পবিত্র কুরআনের তাফসীর 'তাফহীমুল কুরআন।' এই তাফসীরের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য সমূহ হলো—১. প্রাঞ্জল, বোধগম্য ও সাবলীল ভাষা। ২. শানে নুযুল বা কুরআনের আয়াতটি বা সুরাটি নাজিলের প্রেক্ষাপট, ঘটনাস্থলের চিত্র, বর্ণনা, ইতিহাস এবং উক্ত স্থানের বা জনপদের বর্তমান অবস্থান ও অবস্থা। ৩. একই বিষয়ে অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের বর্ণনা, অন্যান্য তাফসীরকারকদের, বিজ্ঞ ব্যক্তিদের মতামত ও বিরুদ্ধ পক্ষের মতামত ও তা খণ্ডন। সকলের মতামত উল্লেখ করার পর নিজের সুচিন্তিত অভিমত উল্লেখ করা।

তাঁর আর একটি উল্লেখযোগ্য অবদান হলো ইসলামকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে মানব জাতির নিকট উপস্থাপন করা। তিনি নিরবচ্ছিন্ন অধ্যবসায়ের মাধ্যমে কোরআন ও হাদীসের বরাত দিয়ে এক সামগ্রিক পরিকল্পনা তৈরি করেন, যার মধ্যে আকায়েদ, এবাদত, নৈতিক ব্যবস্থা, আইন ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা এবং যুদ্ধ ও শান্তির বিষয়ে সুস্পষ্ট ইসলামসম্মত দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি দৃঢ়তার সাথে প্রমাণ করেছেন– কেবলমাত্র ইসলামের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণের মাধ্যমেই সমগ্র মানবজাতির মুক্তি অর্জন সম্ভব। এভাবেই তিনি বিশ্বমানবতার মুক্তির দিশারী হয়েছেন এবং ইসলামী নবজাগরণের ভূমিকা রেখেছেন।

আধুনিক বিশ্বে মুসলমানদের যে গণজাগরণ শুরু হয়েছে তার জন্য উক্ত চার মহান ব্যক্তির জীবন ও কর্ম, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছে এবং আগামীতেও তা অব্যাহত থাকবে। তাঁদের আগমনের পূর্বে ইসলাম শত শত বছর মাদ্রাসা, খানকাহ ও মসজিদের চার দেয়ালে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। মুসলমানেরা ইসলামী শিক্ষা থেকে দূরে সরে গিয়ে শিরক-বিদআতে লিপ্ত হয়ে বিজাতীয় শক্তির গোলামে পরিণত হয়েছিল। উক্ত চার মহান ব্যক্তি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা

www.pathagar.com

করেছিলেন—'ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা এবং মানব রচিত সকল মতবাদ ও স্বেচ্ছাচারী শাসনকে উৎখাত করে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা করার জন্যই ইসলামের আগমন এবং মুসলমানদের কর্তব্য হলো তা বাস্তবায়নে সর্বোচ্চ ত্যাগ ও কুরবানী পেশ করা এবং অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া।

বর্তমান সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ ও তাদের দোসর তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ও মুশরেকী শক্তি, নাস্তিক-কমিউনিস্টরা মুসলমানদের এই সঠিক পথে ফিরে আসা ও পুনর্জাগরণকে বাধা দিতে সর্বশক্তি নিয়োগ করবে এটাই স্বাভাবিক। কেননা রাজনৈতিক ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হলে সকল মানবরচিত মতবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিলুপ্তি ঘটবে এবং সমগ্র দুনিয়ার শাসন ক্ষমতা মুসলমানদের করতলগত হবে। ইসলাম আবার বিজয়ী শক্তি হিসেবে বিশ্বমঞ্চে নেতৃত্ব দেবে। উক্ত বাতিল শক্তিসমূহ কিন্তু চার দেয়ালে সীমাবদ্ধ ইসলামকে ও এর অনুসারীদেরকে শত্রু মনে করেন না বরং রাজনৈতিক ইসলামকে বাধা দেয়ার হাতিয়ার মনে করে। আন্তর্জাতিকভাবে সাম্রাজ্যবাদের তাবেদার কিন্তু স্বদেশে শরীয়া আইন প্রচলনকারী সরকার ও রাজা-বাদশাহদেরকে তারা সহ্য করে। কেননা এরা ইসলামী গণজাগরণ নস্যাত করতে চায় নিজেদের গদি রক্ষার বিনিময়ে।

ইসলামী গণজাগরণ ও রাজনৈতিক ইসলাম প্রতিষ্ঠায় বাধাসমূহ

১. সমকালীন শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনকারী ইসলামী নেতৃত্বের অভাব

আপনি যে যুগে বা যে সময়ে ইসলামের আদর্শকে বিজয়ী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করবেন আপনাকে সে সময়ের সমকালীন শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে হবে। তবেই জনগণ আপনার কথা শুনবে ও আপনার আহ্বানে সাড়া দিতে এগিয়ে আসবে।

২. মুসলমানদের মানসিক বিভাজনজনিত অনৈক্য

ইহুদী থেকে মুসলমান হওয়া অনুপ্রবেশকারী ইহুদী আবদুল্লাহ বিন সাবাহ সর্বপ্রথম মুসলমানদের ঐক্যে ফাটল ধরিয়ে মুসলমানদেরকে শিয়া-সুন্নী ও খারেজী সম্প্রদায়ের নামে তিন ভাগ করে। আব্বাসীয় খলিফাদের আমলে বাগদাদ বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার কেন্দ্র হয়ে উঠে এবং সেখানে গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিস, এরিস্টটল ও প্লেটোর রচনাসমূহ অনুবাদের ফলে গ্রীক দর্শন মুসলমানদের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করে এবং উগ্রপন্থী মতবাদ ও হাদীস অস্বীকারকারী মুতাজিলা মতবাদের জন্ম হয়ে আর একটি বিভাজনের যুগ শুরু হয়।

কয়েকশ বছর যাবত মুসলমানদের বিরুদ্ধে সমগ্র খ্রিস্টান বিশ্ব ক্রুসেড (ধর্মযুদ্ধ) পরিচালনা করতে গিয়ে ইউরোপ মুসলমানদের সংস্পর্শে আসে এবং ইউরোপে নবজাগরণের সূত্রপাত ঘটে। এই নবজাগরণের ধারাবাহিকতায়

www.pathagar.com

ইউরোপীয় চিন্তাবিদগণ অনেক নতুন নতুন মতবাদের জন্ম দেয়। ইউরোপীয়দের উত্থান ও মুসলমানদের পতন সূচিত হয়। এ পর্যায়ে ইউরোপীয়রা একশ্রেণীর মুসলিম যুবকদেরকে তাদের উদ্ভাবিত মতবাদ যথা—পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র, সাম্যবাদ, ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদ, সেক্যুলারিজম ও গণতন্ত্রের মতবাদে দীক্ষিত করে। এমতাবস্থায় মুসলমানরা এ সকল মতবাদের ভিত্তিতে বহুধা বিভক্ত হয়ে পড়ে। ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিকভাবে মুসলমানদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার মতবাদ অনুপ্রবেশ করে। যার ফলে শিরক-বিদআত-পীরপূজা, কবর পূজা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে মুসলিম মানস ইসলাম থেকে দূরে সরে যায়। এভাবে বহুধা বিভক্ত মুসলমান সমাজ পতনের চূড়ান্ত পর্বে উপনীত হয়।

বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিক থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত রাজনৈতিকভাবে তিন শ্রেণীর মুসলমান দৃশ্যমান হয়।

ক. সমাজতন্ত্রের পক্ষের মুসলমান।

খ. পুঁজিবাদের পক্ষের মুসলমান।

গ. ইসলামের পক্ষের মুসলমান।

১৯৯০ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর সমাজতন্ত্রীরা রুশ-চীন হালুয়া-রুটি থেকে বঞ্চিত হয়ে তাদের চির প্রতিদ্বন্দ্বী পুঁজিবাদের ছায়াতলে আশ্রয় নেয়। এর থেকে বুঝা গেল যে, সমাজতন্ত্র মানুষকে চরিত্রহীন করে গড়ে তোলে, ফলে সমাজতন্ত্রীরা বৈষয়িক লোভে যে কোনো দলে ভিড়তে পারে। বর্তমানে সমাজতন্ত্রের কমরেডরা পুঁজিবাদের লাঠিয়াল হিসেবে ইসলামের পক্ষের মুসলমানদের উপর হামলা করছে। এরা সত্যিকারের সর্বহারা, বস্তুগত লোভে এরা নিজেদের চরিত্র হারিয়ে সর্বহারায় পরিণত হয়ে নিজেদের গায়ে লিখে রেখেছে 'আমাকে ব্যবহার করুন'।

এমতাবস্থায় বিশ্বের মুসলমানেরা বর্তমানে সুস্পষ্ট দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। একপক্ষ সাম্রাজ্যবাদের পক্ষেও নিজেদের ধর্মের বিরুদ্ধে আর অন্যপক্ষ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ও নিজেদের ধর্মের পক্ষে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি উক্ত দুই বিভাজকের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত সৃষ্টি করে বর্তমানে মুসলিম বিশ্বকে টুকরো করে তাবেদার সরকার প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এই দ্বন্দ্বে যারা জয়ী হবে তারাই আগামী দিনে মুসলিম বিশ্বের নেতৃত্ব দখল করবে। সাম্রাজ্যবাদের পক্ষের মুসলমানরা আভ্যন্তরীণভাবে তিন ভাগে বিভক্ত। যথা—

ক. পাশ্চাত্যপন্থী (Pro western) : এ শ্রেণীর লোক বস্তুগত লোভে এবং ধর্মীয় অনুশাসনের ভয়ে পাশ্চাত্য নীতির সমর্থক, তবে স্বীয় জাতীয় স্বকীয়তার অনুভূতি তাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকে।

খ. পাশ্চাত্যবাদী (Westernized) : এ শ্রেণীর লোক মনে-মননে পাশ্চাত্য চিন্তাধারা ও কাজকর্মকে প্রাচ্যের মূল্যবোধ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করে এবং

www.pathagar.com

সাম্রাজ্যবাদের পক্ষের সকল কার্যক্রমে যুক্ত হয়ে সন্তোষ লাভ করে।

গ. **সাম্রাজ্যবাদের ক্রীড়নক :** এ শ্রেণীর লোক সাম্রাজ্যবাদের ভাড়াটিয়া হিসেবে নিজের অস্তিত্ব বিসর্জন দেয়। ফলে যখন যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি থেকে সুবিধা পায় তখন সে সাম্রাজ্যবাদের ক্রীড়নক হিসেবে ভূমিকা পালন করে।

৩. রাজতন্ত্রপন্থী ও খানকাপন্থী ইসলামী ধারা

আরব বিশ্বের রাজা-বাদশাহদের সহায়তাপুষ্ট সালাফীরা এবং ভারত উপমহাদেশের ও আফগানিস্তানের খানকাপন্থী, মাদ্রাসাপন্থী ইসলামী ধারা নিজেদের সুযোগ-সুবিধা ও নেতৃত্ব হারানোর ভয়ে গণতন্ত্রপন্থী ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠাকারীদেরকে নিজেদের কায়েমী স্বার্থের বিরোধী মনে করে। ফলে তারা নিজেদের জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সাম্রাজ্যবাদের নীরব সহযোগীতে পরিণত হয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠায় বাধার সৃষ্টি করছে।

৪. সাম্রাজ্যবাদ সৃষ্ট ইসলামী ধারা

Red flag oppose Red flag অর্থাৎ কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার পদ্ধতি অবলম্বন করে বিভিন্ন কারণে ক্ষুব্ধ মুসলিম যুবকদেরকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি অস্ত্র-অর্থ-প্রশিক্ষণ দিয়ে স্বজাতির বিরুদ্ধে কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে যুদ্ধে লিপ্ত করেছে। আফগানিস্তানে, ভারতে, ইসরাইলে এরূপ উগ্রপন্থী মুসলিম যুবকদের বহু রিক্রুটিং সেন্টার ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, জার্মানি, ব্রিটেন ও ভারত আফগানিস্তানে এরূপ প্রশিক্ষণ ক্যাম্প পরিচালনা করে। সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের টার্গেটকৃত দেশে এসব যুবকদেরকে ব্যবহার করে হামলা পরিচালনা করে দেশে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করে। এক পর্যায়ে সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ দমনের অজুহাতে সাম্রাজ্যবাদীরা উক্ত দেশের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয় ও কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য হাসিল করে। আমার নিকট এরূপ ঘটনার অনেক তথ্য আছে। তন্মধ্যে পাঠকদের জ্ঞাতার্থে কয়েকটি উল্লেখ করা হলো—

ক. ২০০৪ সালের মাঝামাঝি বালুচিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী জাম ইউসুফ বলেন, ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' বালুচিস্তানের বিভিন্ন স্থানে ৩০-৪০টি জঙ্গী ঘাঁটি পরিচালনা করছে। ভারত প্রত্যেক Terroristকে প্রতিমাসে ১০ হাজার টাকা বেতন প্রদান করে। ২৯-১২-২০০৫ সালে প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশাররফ বালুচিস্তানে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টিতে প্রতিবেশী দেশের হাত রয়েছে বলে অভিযোগ করেন। সূত্র : Muhrmmad Tahir, Tribes & Rebells, The Players in the Balochistan Insurgency (The James town foundation, April, 3, 2008)

www.pathagar.com

খ. পাকিস্তানী, তিব্বতী, বাংলাদেশী ভিন্নমতাবলম্বীদের ন্যায় ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' তামিল গেরিলাদের অতি গোপনীয় চক্রথা সামরিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ প্রদান করে। (সূত্র : টি. সাবারত্নম পিরাপাহারান, ভলিউম-১, চাপ্টার-২৮)

গ. জামায়াতুল মুজাহেদীন বাংলাদেশ (জেএমবি)-এর কেন্দ্রীয় নেতা আবদুর রহমান ও বাংলাভাই এর গ্রেফতারের পর প্রকাশ হয়ে পড়ে যে, ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা জেএমবিকে অস্ত্র, প্রশিক্ষণ ও নিরাপদে সীমান্ত পারাপারের ব্যবস্থা করে।
(সূত্র : Holiday, July-21, 07/PROBE, June-15-21,06)

ঘ. সিআইএ পাকিস্তানী গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআইকে পরিচালনা করে। আইএসআই আল-কায়েদাকে সহায়তা করে প্রভুর নির্দেশে। সত্যিকার অর্থে আল-কায়েদা C.IA-র brain Child.
(সূত্র : Michel Chossudovsky, Author, Global Research)

৫. ধর্ম ব্যবসায়ী ইসলামী ধারা : যারা ইসলামের পূর্ণাঙ্গ রূপ জনগণের নিকট থেকে আড়াল করে এবং ধর্মকে অর্থ উপার্জনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে, তারা প্রকৃত ইসলামের বিরোধীতা করে কেননা প্রকৃত ইসলামে ধর্ম ব্যবসার কোনো সুযোগ নেই। ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ জনগোষ্ঠী এদের ফাঁদে ধরা দেয় এবং কবর পূজা, মাজার পূজা, পীরপূজাসহ অন্যান্য শিরক-বিদআতী কাজে লিপ্ত হয়ে তথাকথিত ধর্ম ব্যবসায়ীদেরকে অর্থ প্রদান করে। এরা সবসময় নিজেদের রক্ষাকবচ হিসেবে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি, তাদের তাবেদার সরকার ও সেক্যুলারদের পক্ষে অবস্থান নেয়।

৬. ইসলামের সঠিক শিক্ষা সম্পর্কে অজ্ঞ মুসলমানগণ

মুসলিম বিশ্বের গণজারগণ ও রাজনৈতিক ইসলাম প্রতিষ্ঠায় সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তসমূহ

ছাত্রজীবনে আমরা বাংলাদেশ ও বিশ্বের ডায়রিতে পড়েছি ইউরোপের রুগ্ন মানুষটির নাম হলো– তুরস্ক। কিন্তু রাজনৈতিক ইসলামের ধারক-বাহকরা তুরস্কের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর মাত্র ২৩ বছরে তুরস্ক এখন ইউরোপের সবচেয়ে সবল মানুষে পরিণত হয়েছে। এ জন্যই সাম্রাজ্যবাদী শক্তি মুসলিম দেশে রাজনৈতিক ইসলাম প্রতিষ্ঠায় সর্বশক্তি দিয়ে বাধা প্রদান করে। ইতোপূর্বেও সাম্রাজ্যবাদের লালিত তুর্কী সেক্যুলার সেনাবাহিনী রাজনৈতিক ইসলামের ক্ষমতারোহণকে একাধিকার ব্যর্থ করে দিয়েছে। আগামীতেও তারা তুরস্কে ইসলামপন্থী সরকারকে উৎখাত করতে বদ্ধ পরিকর। সাম্রাজ্যবাদীরা মুসলিম

www.pathagar.com

নামধারী সেক্যুলারদেরকে দিয়ে এসব অপকর্ম সংঘটিত করে। ০২-০৮-২০১৩ইং তারিখের দৈনিক নয়া দিগন্ত পত্রিকা উল্লেখ করেছে, ৪ জুলাই ২০১৩ তারিখে মুরসীর পতনে উল্লাসিত হয়ে ইহুদী সাংবাদিক রাই ডাওসন বলেন, This is the best 4th july in my life. This movement could spread, I hope, it spreads to Turkey next.

আমার ধারণা ইরানের শক্তিশালী নেতা মাহমুদ আহমদিনেজাদের যুগের অবসান হওয়ায় সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সিরিয়ায় গৃহযুদ্ধ শুরু করেছে এবং মিসরে একই অবস্থা সৃষ্টি করেছে। অতঃপর সিরীয় যুদ্ধ আরব বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে। এতে তুরস্ক, ইরান ও তিউনিসিয়ার ইসলামপন্থীদেরকে ক্ষমতাচ্যুত করা হবে এবং আরব বিশ্বকে টুকরা-টুকরা করার অপকর্ম সম্পন্ন করা হবে।

Muslim Brotherhood বা ইখওয়ানুল মুসলেমীন রাজনৈতিক ইসলামের প্রধান ধারা। সকল আরব দেশে, তুরস্কে ও ইন্দোনেশিয়ায় বিভিন্ন নামে এ সংগঠন তৎপর রয়েছে। বর্তমানে তিউনিসিয়া, মরক্কো, তুরস্কে ও গাজায় ব্রাদারহুড ঘরানার দলগুলি ক্ষমতাসীন হয়েছে। মিসরে একই ঘরানার সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়েছে। বাকিদেরকে ক্ষমতাচ্যুত করার প্রক্রিয়া চলছে।

মুসলিম বিশ্বে সত্যিকারের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হোক তা সাম্রাজ্যবাদীরা চায় না, কেননা গণসমর্থিত ইসলামী সরকার সাম্রাজ্যবাদীদেরকে প্রতিরোধ করে। এ জন্য তারা রাজতান্ত্রিক আরব শাসকদের দ্বারা সালাফীদের ও নিজেদের ব্রেন চাইল্ড আল-কায়েদাকে দিয়ে রাজনৈতিক ইসলাম প্রতিষ্ঠাকে অসম্ভব করে তুলছে। সাম্রাজ্যবাদীরা ইসলামপন্থীদের প্রাধান্যযুক্ত ইসলামী সেক্যুলরিস্টদের শাসনও চায় না, কেননা এতে সেক্যুলারিস্টদেরকে নিজেদের অপকর্মে ব্যবহার করা বাধাগ্রস্ত হতে পারে। এজন্যই তিউনিশিয়াতে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী দল আল নাহাদা ও সেক্যুলারিস্ট লিবারেল ডেমোক্রেটদের সরকারকে অস্থিতিশীল করছে সালাফী ও আল কায়েদাদের ব্যবহার করে। মরক্কোতে ব্রাদারহুড ও রাজতন্ত্রীপন্থীদের কোয়ালিশন সরকারকে ব্যর্থ করার চেষ্টা করছে রাজতন্ত্রীদের কোয়ালিশন থেকে পদত্যাগ করিয়ে। ইসরাইলী আক্রমণ দ্বারা গাজার ইসলামী সরকার উৎখাতের ১ম প্রচেষ্টা সফল হয়নি পরবর্তীতেও তারা সেক্যুলারিস্ট ফাতাহ দলের সাথে যোগশাজস করে গাজায় ইসলামী সরকারের পতন ঘটাতে চাইবে।

মুসলিম নেতৃত্বের করণীয়

১. জনগণকে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ রূপ সম্পর্কে অবহিত করা।

২. আরব বিশ্বে ব্রাদারহুড ও সালাফীদের মধ্যে সুদৃঢ় ঐক্য প্রতিষ্ঠা।

৩. শিয়া-সুন্নী মতভেদ বা অন্যান্য মতভেদ যেন সংঘর্ষের রূপ না নেয় তার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া।

www.pathagar.com

৪. মুসলিম নামধারী সেক্যুলারিস্টদের সাথে সম্পর্ক ও ভাববিনিময় বৃদ্ধি করা, যাতে তারা ইসলামপন্থীদের ক্ষমতারোহণে ভয় না পায়।

৫. মুসলিম স্কলারদের নিয়ে আন্তর্জাতিক থিংক-ট্যাঙ্ক গঠন, যাতে তারা মুসলমানদের আভ্যন্তরীণ বিবাদ মীমাংসা করতে পারে এবং জাতিকে যুগোপযোগী দিক নির্দেশনা দিতে পারে।

৬. রাজতন্ত্রের অন্ধ বিরোধীতা না করে রাজা ও রাজপরিবারকে পরিশুদ্ধ করার কর্মসূচি গ্রহণ। কেননা সত্যিকারের মুসলিম রাজার শাসন তথাকথিত পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক শাসন থেকে উত্তম। শত শত বছর যাবত স্পেন থেকে ভারতবর্ষ পর্যন্ত যেসব ইসলামী মূল্যবোধসম্পন্ন রাজা দেশ শাসন করেছেন তাদের রাজ্যশাসন, প্রজাপালন ও ন্যায়বিচারের ইতিহাস চিন্তা করলে দেখা যায় তারা পৃথিবীতে উত্তম শাসন ব্যবস্থা উপহার দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। এ জন্য আমাদেরকে মুজাদ্দেদে আলফেসানীর জীবন ও কর্ম থেকে শিক্ষা নিতে হবে। ইসলামী খেলাফত অবশ্যই রাজতন্ত্র থেকে অধিক উত্তম শাসন ব্যবস্থা কিন্তু বেশির ভাগ জনগণের নৈতিক মান উন্নত করা না গেলে খেলাফত ব্যবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হবে না। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ করছি তা হলো—হযরত ওসমান (রা:) হত্যার সাথে জড়িত একদল মিসরীয় মুসলিম যুবক খলিফা হযরত আলীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "হযরত মুহাম্মদ (সা:), হযরত আবু বকর (রা:) ও হযরত ওমর (রা:)-এর সময় মুসলমানে-মুসলমানে লড়াই-ঝগড়া হয়নি কিন্তু হযরত ওসমান (রা:) এবং আপনি যদি ভাল লোক হয়ে থাকেন তবে মুসলমানদের মধ্যে রক্তপাত কেন হচ্ছে?" উত্তরে হযরত আলী (রা:) বলেন, "প্রথম তিন মহাপুরুষের শাসনকালে জনগণ ছিল আমি আলীর মতো লোকেরা কিন্তু বর্তমানে জনগণ হলো তোমাদের মতো লোকেরা, তাই এত অশান্তি ও রক্তপাত হচ্ছে।"

৭. যায়নবাদী ইহুদীদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, কর্মসূচি, কর্মপদ্ধতি এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ষড়যন্ত্র সম্পর্কে নিজ জাতিকে ও মানবজাতিকে অবহিত করা।

৮. সাম্রাজ্যবাদ সৃষ্ট উগ্রবাদী দল ও ধর্মীয় ফেরকাসমূহকে চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নেয়া ও নিজ জাতিকে অবহিত করা।

বর্তমান সময়টি ইসলামের বিজয় যুগের সূচনাপর্ব। সাম্রাজ্যবাদীরা বিনাযুদ্ধে পৃথিবীর কর্তৃত্ব ছেড়ে দেবে না। সুতরাং বর্তমান যুদ্ধ বিগ্রহ-সংঘর্ষ-প্রাণহানি অপ্রত্যাশিত বিষয় নয়।

২৯ আগস্ট ২০১৩ খ্রি.

www.pathagar.com

পাকিস্তানের বর্তমান সংকট : কারণ ও সম্ভাব্য প্রতিকার

পাকিস্তানের বর্তমান সংকটের উৎপত্তি মেমোগেট কেলেংকারী থেকে। মেমোগেট কেলেংকারী হলো "পাকিস্তানী বংশোদ্ভুদ মার্কিন ব্যবসায়ী মনসুর ইজাজ এই মর্মে তথ্য প্রকাশ করেন যে, যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত তৎকালীন পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূত হুসাইন হাক্কানী পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আসিফ আলী জারদারীর নির্দেশে একটি চিঠির খসড়া প্রস্তুত করে মনসুর ইজাজের মাধ্যমে সাবেক মার্কিন শীর্ষ সামরিক কর্মকর্তা মাইক মুলেনের হাতে প্রদান করেন। (মাইক মুলেনও উক্ত চিঠির সত্যতা স্বীকার করেন তবে চিঠিটি স্বাক্ষরবিহীন ছিল বলে তিনি জানান) মার্কিন বিশেষ বাহিনী কর্তৃক উসামা বিন লাদেনকে হত্যা করার পর সেনাবাহিনী সরকারের উপর ক্ষুব্ধ হলে জারদারী পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও আই.এস.আই-এর ক্ষমতা খর্ব করে জারদারীর সরকারকে রক্ষা করার জন্য মার্কিন হস্তক্ষেপ কামনা করে এই চিঠি দেওয়া হয় বলে মনসুর ইজাজ তথ্য প্রকাশ করেন।" ইহাই বিখ্যাত মেমোগেট কেলেংকারী হিসেবে খ্যাতি পেয়েছে।

আসিফ আলী জারদারী ও পারভেজ মোশাররফ যে মার্কিন পাপেট তা সর্বজন বিদিত। দেশবাসীর নিকট জনপ্রিয়তা হারানোর কারণে মোশাররফকে সরিয়ে জারদারীকে পাকিস্তানে ক্ষমতাসীন করা হয়েছিল। কিন্তু পাকিস্তানের মার্কিনবিরোধী জনগণ, শক্তিশালী বিচার বিভাগ ও সেনাবাহিনীর কারণে জারদারীর দ্বারা প্রভুদের এজেন্ডা বাস্তবায়ন সম্ভব হয়ে উঠেনি। তদুপরি জারদারী প্রভুর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ইরান-পাকিস্তান গ্যাস পাইপ লাইন চুক্তি করে প্রভুদের খরচের খাতায় নিজের নাম লিখান। জারদারীকে বিপদে ফেলতেই মাইক মুলেন মনসুর ইজাজের ফাঁস করা তথ্যের পক্ষে সম্মতি প্রদান করেন। অথচ এসব পাপেটকে ক্ষমতায় বসানো, ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখার জন্য কত প্রকার চিঠি চালাচালি, গোপন পরামর্শ ও চুক্তি হয়েছে তার কোনো ইয়ত্তা নেই। সকল গোপন ষড়যন্ত্র ফাঁস না করে শুধু জারদারীকে ফাঁসানোর জন্য তথ্য ফাঁস করার বিষয়টি অবশ্যই রহস্যজনক।

পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকে যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের রাজনীতিতে নাক গলিয়েছে। বারবার পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক শাসন উৎখাত করে সামরিক শাসন ও পুতুল শাসককে পাকিস্তানে প্রতিষ্ঠা করেছে। এক পুতুলকে দিয়ে মনোবাসনা পূরণ না হলে অপর পুতুলকে ক্ষমতায় বসিয়েছে। এতদসত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান পাকিস্ত

www.pathagar.com

ান নীতি শক্ত চ্যালেঞ্জের মুখোমুখী হয়েছে। পাকিস্তানী জনগণের সচেতনতা, শক্তিশালী দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনী ও বিচার বিভাগ, চীন-পাকিস্তান-ইরান ঘনিষ্ঠতা যুক্তরাষ্ট্রকে স্বীয় এজেন্ডা বাস্তবায়নে বারবার বাধা দিচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান পাকিস্তান নীতিই পাকিস্তানকে অস্তিত্ব সংকটে নিমজ্জিত করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের মধ্য এশিয়া, দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া নীতি বাস্তবায়নে পাকিস্তান একটি বড় বাধা স্বরূপ। এখানে পাকিস্তানের চাওয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যাশা সাংঘর্ষিক। এতদ্‌সংক্রান্ত কিছু তথ্য নিম্নে প্রদান করা হলো

ইরান-পাকিস্তান গ্যাস পাইপ লাইন স্থাপন

শান্তির পাইপ লাইন নামে খ্যাত ইরান-পাকিস্তান-ইন্ডিয়া (IPI) পাইপ লাইনের ব্যাপারে ভারত ২০০৮ সালে সম্মত হলেও মার্কিন চাপে কখনও কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। অথচ (IPI) বাস্তবায়িত হলে দক্ষিণ-পশ্চিম, দক্ষিণ, মধ্য এবং পূর্ব এশিয়ার মধ্যে একটি জ্বালানি সংহতি ও সমৃদ্ধি গড়ে উঠতে পারে যদি এতে চীন ও মধ্য এশিয়া যোগ দেয়।

জ্বালানি স্বল্পতার দেশ পাকিস্তান এতে নিজেও উপকৃত হবে এবং এশিয়ার জ্বালানি করিডোরের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হয়ে দীর্ঘ মেয়াদে পরনির্ভরশীলতা কাটিয়ে উঠতে পারবে। পরবর্তী পর্যায়ে IPI বাস্তবায়িত হলে মার্কিন অর্থ সাহায্য ছাড়াই পাকিস্তান স্বনির্ভর হবে এবং পাক-ভারত বৈরীতা অনেকাংশে কমে যাবে। অপরদিকে যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটোর আফগানিস্তান-পাকিস্তান অভিযানের প্রধান কারণ ছিল মধ্য এশিয়া ও আফগানিস্তানের অনুত্তোলিত বিপুল গ্যাস ও খনিজ সম্পদ পাকিস্তানের উপর দিয়ে নিয়ে যাওয়া। এমতাবস্থায় ইরান-পাকিস্তান-ভারত/পাকিস্তান-চীন-মধ্য এশিয়া পাইপ লাইন মার্কিন ও ন্যাটোর স্বার্থের পক্ষে চরম ক্ষতিকর হয়ে পাশ্চাত্যের অর্থনৈতিক পতন ত্বরান্বিত করবে এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও মধ্য এশিয়াকে সমৃদ্ধ করবে, এসব দেশে পাশ্চাত্যের খবরদারি বন্ধ হয়ে যাবে।

দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া পলিসি

পাশ্চাত্যের দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মূল পলিসি হলো এশিয়ার উদীয়মান বিশ্বশক্তি চীনকে দমন করা। বিশাল জনগোষ্ঠীর চীনকে দমাতে প্রয়োজন বিশাল জনগোষ্ঠীর দেশ ভারতকে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অপ্রতিদ্বন্দ্বীরূপে প্রতিষ্ঠা করা, ভারতকে মোড়ল বানাতে হলে ভারতের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানের নিকট থেকে পরমাণু অস্ত্র কেড়ে নিতে হবে, পাকিস্তানের অর্থনীতি ধ্বংস করতে হবে এবং পাকিস্তানকে জাতিগতভাবে কমপক্ষে তিন টুকরা করতে হবে। এসব কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পাশ্চাত্য শক্তি প্রথমে পাকিস্তানের দেশপ্রেমিক গণতান্ত্রিক শক্তি নওয়াজ শরীফকে অপসারণ করে তদস্থলে ভারত-মার্কিন বলয়ের

www.pathagar.com

সহযোগী ও পাপেট পারভেজ মোশাররফকে ক্ষমতাসীন করে, ন্যাটো পারভেজ মোশাররফের সহযোগিতায় আফগানিস্তানের তালেবান সরকারকে উৎখাত করে আফগানিস্তান দখল করে। আফগানিস্তানে অবস্থান করে পাকিস্তানের বৃহত্তর যোদ্ধা জনগোষ্ঠী পশতুনদের ভিতর থেকে দালাল সংগ্রহ করে তেহেরিক-ই-তালেবান প্রতিষ্ঠা করে। পরবর্তীতে ইসরাইলী গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদ-এর ব্রেইন চাইল্ড আল-কায়েদাকে টিটিপির সহযোগী করে পাক-আফগান সীমান্তের উভয় পাশের পশতুনদেরকে দলে ভিড়িয়ে পাকিস্তানের অভ্যন্তরে অনবরত রক্তাক্ত হামলা পরিচালনা করে পাকিস্তানকে ধর্মীয় সামাজিক-জাতিগত ও গোত্রীয়ভাবে অস্থিতিশীল করে ব্যর্থ রাষ্ট্রের পর্যায়ে নিয়ে যায়।

অস্বাভাবিক সরকার পরিবর্তনের মাধ্যমে বেশি সুবিধা আদায়

পাশ্চাত্যের সেবাদাস পারভেজ মোশাররফের গ্রহণযোগ্যতা চরমভাবে বিতর্কিত হলে বেনজীর ভুট্টোকে হত্যার ব্যবস্থা করে সহানুভূতির ভোটে আরেক দুর্বল পুতুল আসিফ আলী জারদারীকে পাকিস্তানে প্রতিষ্ঠিত করে। যুক্তরাষ্ট্রের টার্গেট ছিল জারদারীকে দিয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে দুর্বল করা হবে, আই.এস.আই-এর সক্ষমতা সর্বনিম্ন পর্যায়ে নিয়ে যাবে এবং দুর্বল পাকিস্তানের নিকট থেকে পরমাণু অস্ত্রসমূহ কেড়ে নেয়া হবে। কিন্তু আই.এস.আই মার্কিন-জারদারী ষড়যন্ত্র আগেভাগে উদ্‌ঘাটন করায় যুক্তরাষ্ট্র উদ্দেশ্য হাসিলে ব্যর্থ হয়। ইতিমধ্যে অর্থনৈতিক দুরবস্থা থেকে উদ্ধারে জারদারী ইরান-পাকিস্তান গ্যাস পাইপ লাইন চুক্তি স্বাক্ষর করায় যুক্তরাষ্ট্র জারদারীকে সরিয়ে ইমরান খান অথবা পারভেজ মোশাররফকে পাকিস্তানের ক্ষমতায় বসানোর জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মহল দেখতে পাচ্ছে, উক্ত গ্যাস পাইপ লাইন চুক্তির পর পরই পাকিস্তানের উপজাতি অঞ্চলে ড্রোন হামলা বৃদ্ধি করে উপজাতিদের সাথে পাকিস্তান সরকারের যুদ্ধাবস্থা তৈরি করা হয়, বিনা অনুমতিতে পাকিস্তানের অভ্যন্তর থেকে ওসামা বিন লাদেনকে ধরে নিয়ে হত্যা করে সেনাবাহিনীর সক্ষমতা ও দায়িত্বজ্ঞানহীনতার ব্যাপারে জনগণকে ক্ষুব্ধ করা হয়। সর্বশেষ মেমোগেট কেলেংকারী ফাঁস করে দিয়ে জারদারীর ক্ষমতায় টিকে থাকাকে অসম্ভব করে তোলা হয়। এরপরই শুরু হয় পাকিস্তানে নতুন পাপেট সরকার প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম। উক্ত কার্যক্রম হলো—১. ইমরান খানের নামসর্বস্ব তেহেরিক-ই-ইনসাফ দলের লাইম লাইটে আসা, ২. পিপিপি থেকে মার্কিনপন্থী নেতাদের ইমরান খানের দলে যোগ দেয়া, ৩. ভারতপন্থী মুত্তাহিদা কওমি মুভমেন্টের ইমরান খানের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়ানো, ৪. পারভেজ মোশাররফের পাকিস্তান প্রত্যাবর্তনের ঘোষণা এবং পিপিপি থেকে ইমরান খানের দলে যোগ দেয়া মার্কিনপন্থী মাহমুদ শাহ কোরেশীর পারভেজ মোশাররফের সাথে জোট গঠনের আশাবাদ ব্যক্ত করা। যুক্তরাষ্ট্রের

www.pathagar.com

পাকিস্তান নীতি ও পুতুল সরকারের কার্যক্রম সম্পর্কে ৩০ জুন ২০১১ সালে নিউজ লাইনকে দেয়া সাবেক আই.এস.আই প্রধান লে. জেনারেল (অব.) হামিদ গুলের সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে সংক্ষেপে যা জানা যায় তা হলো—

১. পাকিস্তানের কৌশলগত সম্পদরাজির উপর প্রতিটি হামলায় যুক্তরাষ্ট্র জড়িত।
২. সাবেক প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশাররফই যুক্তরাষ্ট্রকে পাকিস্তানে ঘাঁটি গেড়ে বসার সুযোগ করে দিয়েছেন। পাকিস্তানকে অনৈসলামিকরণ, পরমাণু অস্ত্রমুক্তকরণ ও চীনের সাথে সম্পর্কছেদের পর্যায়ে নিয়ে গেছে মোশাররফ।
৩. পাকিস্তানের নৌ-ঘাঁটি মেহরান হামলায় জড়িত ছিল মার্কিন-ভারতীয় মদদপুষ্ট সন্ত্রাসী গ্রুপ।
৪. পাশ্চাত্য কর্তৃক পরিচালিত সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অর্থ হচ্ছে পাকিস্তানকে অস্থিতিশীল করা এবং পাকিস্তানের অর্থনীতি ধ্বংস করে ভারতকে আঞ্চলিক মোড়ল বানানো।
৫. ৯/১১ হামলা হলো বিশ্বব্যাপী নির্দোষ মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করার মার্কিন এজেন্ডা বাস্তবায়নের ষড়যন্ত্র।
৬. যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত হোসাইন হাক্কানি এবং ইসলামাবাদের আরও কয়েকজন শীর্ষ ব্যক্তি সরাসরি সি.আই.এর স্বার্থ দেখাশুনা করছে।
৭. পাকিস্তান পিপলস পার্টি (পিপিপি) সবসময় পাকিস্তানী সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা আই.এস.আইকে দুর্বল করে অন্যদের স্বার্থে ব্যবহার করতে চায়। (সূত্র : দৈনিক নয়া দিগন্ত ১২/০৭/২০১১, সাক্ষাৎকার অনুবাদ : হাসান শরীফ)।

সমূহ ধ্বংস থেকে রক্ষা পেতে পাকিস্তানীদের করণীয়

১. সাবেক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফের নেতৃত্বে একটি শক্তিশালী দেশপ্রেমিক জোট গঠন করা। এ জোটে পি.পি.পির সাম্রাজ্যবাদবিরোধী অংশ এবং দেশপ্রেমিক ইসলামপন্থী দলসমূহ থাকা চাই।
২. সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখল না করে সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তরে কার্যকর সহায়তা প্রদান।
৩. ইচ্ছাকৃতভাবে জারদারীকে হেনস্তা করার চেষ্টা না করা। কেননা জারদারীর ভুলত্রুটি থাকলেও তিনি ইরানের সাথে গ্যাস পাইপ লাইন চুক্তি করে পাকিস্তানের উপকার করেছেন এবং সাম্রাজ্যবাদীদের চক্ষুশূলে পরিণত হয়েছেন। সুতরাং সাম্রাজ্যবাদীদের চাওয়া ও দেশপ্রেমিকদের চাওয়া যেন এক না হয়।
৪। চীন, ইরান ও মুসলিম বিশ্বের সাথে সম্পর্ক আরও দৃঢ় করা এবং সম্ভাব্য ন্যাটো-ইরান যুদ্ধে ইরানের পাশে থাকা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সম্ভাব্য ন্যাটো-ইরান যুদ্ধে পাকিস্তান যদি দৃঢ়ভাবে ইরানের পাশে অবস্থান নেয়, জি.সি.সি

www.pathagar.com

যদি নিরপেক্ষ থাকে তবে চীন ও রাশিয়া ইরানের পক্ষে অবস্থান নেবে। এমতাবস্থায় ন্যাটোর জন্য এটি হবে সর্বশেষ খেলা।

৫. পাকিস্তান ও আফগান তালিবানদের মধ্য সৃষ্ট সন্দেহ-অবিশ্বাস দূর করার ব্যবস্থা নেয়া। এর মাধ্যমে তালেবানরা ন্যাটো ও ভারত থেকে দূরে সরে যাবে।

৬. সাম্রাজ্যবাদ সৃষ্ট তেহেরিক-ই-তালিবানের সাথে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা অন্যথায় শ্রীলংকার মাহিন্দ্র রাজাপাকসের থেরাপি প্রয়োগ করা।

৭. 'বালুচ'দের সাথে সৃষ্ট সমস্যা আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা।

৮. সাম্রাজ্যবাদের চিহ্নিত দেশীয় এজেন্টদের ব্যাপারে কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া।

ফেব্রুয়ারি ২০১২

www.pathagar.com

উপমহাদেশে স্থায়ী শান্তি ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় মানচিত্রের পুনর্বিন্যাস অপরিহার্য

ফরাসী বিপ্লবের পূর্বে ইউরোপে ইহুদীদের নাগরিক অধিকার ছিল না। ইহুদীদের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত ফরাসী বিপ্লবের ঢেউ ইউরোপের অন্যান্য প্রতিষ্ঠিত দেশের সরকার ও প্রশাসন ব্যবস্থায় ইহুদী ষড়যন্ত্রকারীরা জেঁকে বসে। যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বে লন্ডনই ছিল ইহুদী ষড়যন্ত্রের কেন্দ্রভূমি। ইহুদীদের ষড়যন্ত্রে পরিচালিত হয়ে ব্রিটিশ জাতি বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্য কায়েম করে সমগ্র বিশ্বে লুণ্ঠন করে অবশেষে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাধ্যমে ঠুঁটো জগন্নাথে পরিণত হয়। ব্রিটিশ জাতি সর্বস্ব হারালেও নেপথ্যে থাকা ইহুদীরা ব্রিটিশদের লুট করা সম্পদরাজি নিজেদের গোলায় তুলে নেয়। একই অবস্থা এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের। বৃটেনের পতনের পর ইহুদী ষড়যন্ত্রের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয় নিউইয়র্ক। ইহুদী পরিচালনায় যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে বিশ্বব্যাপী লুটতরাজ, দেশ দখল অব্যাহত রাখে। একই নিয়মে ইহুদীরা মার্কিন জাতির লুট করা সম্পদ নিজেদের গোলায় তুলে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রকে দেউলিয়াত্বের দিকে ঠেলে দিয়েছে। ইহুদীদের পরবর্তী গন্তব্য সম্ভবত ভারত, চীন অথবা অন্য কোনো উদীয়মান জাতির রাজধানীকে সন্ত্রস্ত করা হবে।

তৎকালীন বিশ্বের সবচেয়ে সম্পদশালী ও শান্তিময় দেশ ভারতবর্ষকে সশান্ত করার লক্ষ্যে মোগল আমলে ইহুদীরা মাদ্রাজে এবং কোলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে তাদের ষড়যন্ত্রের গোপন ঘাঁটি 'ফ্রী ম্যাসন লজ' স্থাপন করেছিল। ইহুদী ষড়যন্ত্রের গোপন দলিল 'Protocol of the elders of the Zion' বইতে ফরাসী বিপ্লবে তাদের ভূমিকার কথা এবং মাদ্রাজ ও পোর্ট উইলিয়ামে 'ফ্রী ম্যাসন লজ' স্থাপনের কথা উল্লেখ রয়েছে। এ দুটি গোপন ঘাঁটির মাধ্যমে ইহুদীরা এ দেশের কিছুসংখ্যক চরিত্রহীন, ক্ষমতালোভী, নারী লোলুপ ব্যক্তিকে সংগ্রহ করে উদীয়মান ব্রিটিশ বণিকদের মাধ্যমে প্রথমে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার স্বাধীনতা হরণ করে এবং পরবর্তীতে সমগ্র ভারত উপমহাদেশের স্বাধীনতা হরণ করে।

দখলীকৃত ভূখণ্ডকে দীর্ঘদিন যাবত শাসন-শোষণের লক্ষ্যে Procol-এ বর্ণিত Divide & Rule নীতিকেই অনুসরণ করেছে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশবণিক ও রাজশক্তি। এ জন্য দেখা যায় পৃথিবীর যে দেশে ব্রিটিশ শাসন কায়েম হয়েছে সে

www.pathagar.com

দেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ব্যবস্থায় বিভেদের বিষবৃক্ষ রোপণ করা হয়েছে। সময়ের সাথে সাথে উক্ত বিষবৃক্ষের ফুল, ফল, চারা সমগ্র দেশ ও জাতিকে চরম অশান্তিতে নিমজ্জিত করেছে। মুসলিম শাসনামলে ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান, উপজাতি নির্বিশেষে সবাই নিজ নিজ ক্ষেত্রে অবদান রেখে উপমহাদেশকে বিশ্বের সবচেয়ে সমৃদ্ধশালী ও শান্তিময় দেশে পরিণত করেছিল। তখন সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ, রাজা জমিদারের লোমহর্ষক অত্যাচার নিপীড়ন, সাম্প্রদায়িক হানাহানি, শাসক মহলের শোষণ, অত্যাচার-নিপীড়নের সাথে উপমহাদেশবাসী অপরিচিত ছিল। ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ব্রিটিশ শাসন কায়েম হওয়ার পরে ব্রিটিশ রোপিত বিষবৃক্ষের প্রতিক্রিয়ায় সমগ্র উপমহাদেশ ১৭৫৭ থেকে অদ্যাবধি জ্বলছে। অথচ ১৯৪৭ সালের পর থেকে উপমহাদেশে অশান্তি থাকার কথা ছিল না। ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী উপমহাদেশ ত্যাগ করার সময় তাদের ভাবশিষ্য নেহেরু-প্যাটেল-বিড়লা-ইস্পাহানির সাথে ষড়যন্ত্র করে একটি অযৌক্তিক, অন্যায্য দেশ বিভাগ কার্যকর করায় উপমহাদেশ এখনও জ্বলছে। এর থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে ব্রিটিশ রোপিত বিষবৃক্ষসমূহ চিহ্নিত করে উপড়ে ফেলতে হবে এবং ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করা ১৯৪৭-এর মানচিত্রকে ন্যায্য ও যৌক্তিকভাবে পুনর্বিন্যাস করতে হবে। ১৯৪৭ এর পর অন্যায়ভাবে দখল করা ভূখণ্ড ও জাতিসমূহকে স্বাধীনতা প্রদান করতে হবে।

পাঠকবৃন্দের মনে প্রশ্ন দেখা দিতে পারে আমি ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে নেহেরু-প্যাটেল গংয়ের নাম করলাম অথচ জিন্নাহ গং-এর নাম নিলাম না। তদুপরি বিড়লা-ইস্পাহানীর ন্যায় স্বনামধন্য ব্যবসায়ীদেরকেও কেন ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে উল্লেখ করলাম? এর সংক্ষিপ্ত উত্তর এই যে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী নেহেরু পরিবারকে তাদের সার্থক উত্তরসূরি হিসেবে উপমহাদেশে প্রতিষ্ঠা করে গেছে আর প্যাটেল ছিলেন দখলদার ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর সার্থক উত্তরসূরি। বিড়লা ও ইস্পাহানী ছিলেন ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষাকারী পদলেহী ব্যবসায়ী-শিল্পপতি। উভয়ের অন্য পরিচয় ছিল বিড়লা নিয়ন্ত্রণ করতেন ভারতীয় কংগ্রেস আর ইস্পাহানী নিয়ন্ত্রণ করতেন মুসলিম লীগকে। অন্যায্য দেশ বিভাগে জিন্নাহকে রাজী করাতে ইস্পাহানীর ব্যক্তিগত লাভ-ক্ষতি ছিল মুখ্য। নেহেরু-প্যাটেল সম্পর্কে ঐতিহাসিক তথ্য অন্যত্র আলোচনা করা হবে। নিম্নে বিড়লা-ইস্পাহানীর ভূমিকা সম্পর্কিত তথ্য উল্লেখ করা হলো।

১৯৪৭ সালে বর্তমান ভারতের জাতির পিতা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ভারত বিভাগ কোনোভাবেই মেনে নিতে চাননি। অপরদিকে পাকিস্তানের জাতির পিতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ সমগ্র পাঞ্জাব, সমগ্র বাংলা ও আসাম ব্যতিত দেশ বিভাগ মেনে নিতে দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করেন। এমতাবস্থায় পর্দার অন্তরালে ঘটে যাওয়া ঘটনাই উভয়কে সিদ্ধান্ত পাল্টাতে বাধ্য করে। উক্ত ঘটনাটি ছিল

www.pathagar.com

এই—"দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিড়লা ও ইস্পাহানী যৌথভাবে ব্রিটিশ সরকারকে খাদ্য-শস্য সরবরাহের ঠিকাদারী পান। উভয়ের খাদ্য সংগ্রহের ফলে বাংলায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, যাতে কমপক্ষে ৫০ লাখ লোক মারা যায়। উক্ত ব্যবসা থেকে প্রাপ্ত লভ্যাংশের কয়েক কোটি টাকা ইস্পাহানী বেনামীতে বিড়লার মালিকানাধীন ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকে জমা রাখেন। ডা. বিধান চন্দ্রের অনুরোধে বিড়লা এই টাকা বাজেয়াপ্ত করার হুমকি দিলে ইস্পাহানি মি. জিন্নাহকে চাপ প্রয়োগ করে খণ্ডিত বাংলা ও পাঞ্জাব নিয়ে গঠিত পাকিস্তান প্রস্তাব মেনে নিতে বাধ্য করেন। একইভাবে ডা. বিধান চন্দ্র রায় বিড়লাকে দিয়ে মি. গান্ধীকে চাপ প্রয়োগ করে ভারত বিভাগ মেনে নিতে বাধ্য করেন। (তথ্য সূত্র : দৈনিক আজকাল, ২৪/০৮/১৯৯৫, লেখক ও প্রত্যক্ষদর্শী- ড. পূর্ণেন্দু ঝা) উক্ত সময়ে সমগ্র বাংলা ও পাঞ্জাবকে পাকিস্তানভুক্ত করার জন্য সমগ্র ভারতে চলমান রক্তক্ষয়ী দাঙ্গায় লাখ লাখ লোক আহত নিহত হচ্ছিল। ইস্পাহানী-বিড়লার ব্যবসায়ীক স্বার্থে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ অন্যায্য দেশ বিভাগ মেনে নিয়ে উপমহাদেশকে দীর্ঘস্থায়ী অশান্তির আবর্তে নিক্ষেপ করে।

উপমহাদেশে অশান্তির কারণ

উপমহাদেশে অশান্তির প্রথম কারণ ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর Divide & Rule Policy সৃষ্ট ভারতীয় জনমানসের বহুধা বিভক্তি, দ্বিতীয় কারণ অন্যায্য ও অযৌক্তিক দেশ বিভক্তি, তৃতীয় কারণ ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর মানসপুত্র পণ্ডিত নেহেরুর India Doctrine এবং চতুর্থ কারণ হলো ভারতীয় শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক অপর দেশ-জাতি দখলের অন্তহীন অপকর্ম। এতদসংক্রান্ত প্রামাণ্য তথ্যাদি নিম্নরূপ—

(ক) Divide & Rule Policy- মুসলিম শাসকদের নিকট থেকে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী ভারতবর্ষের ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছিল বিধায় মুসলমানদেরকে প্রতিপক্ষ বানানো হলো এবং ব্রিটিশদের পদলেহী অপরাপর অমুসলিমদেরকে ব্রিটিশরা স্বপক্ষে টেনে নিল। তারা প্রথমে মুসলমানদের হাত থেকে রাষ্ট্রক্ষমতা কেড়ে নেয়। তৎপর সেনাবাহিনী ও সরকারি চাকরি থেকে মুসলমানদেরকে বিতাড়িত করে তাদের আজ্ঞাবহ অমুসলিমদেরকে দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করে, তৎপর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও সূর্যাস্ত আইনের মাধ্যমে মুসলমান জমিদারদের জমি কেড়ে নিয়ে নিম্নশ্রেণীর নিষ্ঠুর অমুসলিমদেরকে জমিদার বানায়। রাষ্ট্রভাষা ফারসী বাতিল করে মুসলমানদেরকে মুর্খ ও চাষীতে পরিণত করে। বিভিন্নমুখী করারোপ করে ও নীলচাষে দাদন নিতে বাধ্য করে জনগণকে শারীরিকভাবে নির্যাতন করে। এরপর শুরু হয় ভারতবাসীর ইতিহাস ও ধর্ম বিকৃত করার কাজ, নতুন নতুন ধর্মমত প্রবর্তন করে জনগণের মধ্যে ধর্মীয় হানাহানির পথ উন্মুক্ত করা

www.pathagar.com

হয়। বিভিন্ন ধর্মের কিছু সংখ্যক নীতিহীন ধর্মনেতাকে বৈষয়িক সুবিধা দিয়ে নতুন নতুন ধর্মীয় দল-উপদল, ফের্কা সৃষ্টি করে প্রত্যেক ধর্মের জনগণকে বহুধাবিভক্ত করা হয়। সাম্প্রদায়িক দূরত্ব সৃষ্টির ইতিহাস, তালপত্র, পুঁথি, ধর্মগ্রন্থ, মুদ্রা, শিলালিপি তৈরি করে বিভাজনকে অনতিক্রমনীয় করে তোলা হয়। ভারতীয় জনগণকে মানসিকভাবে বিভক্ত করার জন্য কিছু নতুন মতবাদ চালু করা হয়। তন্মধ্যে প্রধান দুটি মতবাদ হল– আর্য-অনার্য তত্ত্ব এবং হিদেন বা হিন্দু নামকরণ।

১. আর্য-অনার্য তত্ত্ব : ব্রিটিশ শাসনের সূচনালগ্ন থেকে যে সকল অমুসলিম ব্যক্তিবর্গ তাদেরকে সার্বিক সহযোগিতা দিয়েছে তারা অচিরেই কুলীন শ্রেণীর মর্যাদা পায়। আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হওয়া এসব ভদ্রলোক শ্রেণীর অনেকে পূর্ব থেকে ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভূত ছিলেন, অনেককে ব্রাহ্মণ শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয় অথবা নিদেন পক্ষে কায়স্থ শ্রেণীতে উত্তীর্ণ করা হয়। প্রথম পর্ব সমাধা হওয়ার পর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ক্রীড়নক জার্মান বুদ্ধিজীবী ম্যাক্স মুলার অশ্রুতপূর্ব আর্য-অনার্য তত্ত্ব নিয়ে হাজির হন। এ মতবাদ দ্বারা ভারতবর্ষের জনগণকে সুস্পষ্ট ২ ভাগে ভাগ করা হয়। ইংরেজের পদলেহী সহযোগীরা হয়ে গেল আর্য বা প্রাচীন বিজয়ী শ্রেণী আর অন্যরা হয়ে গেল বিজিত বা অনার্য শ্রেণী। প্রাচীন ভারতের সকল সভ্যতার মালিক-মোখতার বানানো হলো আর্যদেরকে আর সকল অনিষ্টের কারণ বানানো হলো অবশিষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারতবাসীকে। অথচ ১৮৬০ সালের পূর্ব পর্যন্ত পৃথিবীবাসী আর্য জাতি সম্পর্কে জানতো না। নব-আবিষ্কৃত আর্য জাতি (Aryan) তত্ত্বের মাধ্যমে ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণগণ জানতে পারে যে, তারা ইউরোপের জার্মান ও ব্রিটিশ জাতির সমগোত্রীয়। ক্রমে ক্রমে আর্যতত্ত্ব এ দেশের ব্রাহ্মণদের বিশ্বাসের অংশে পরিণত হয় এবং তারা মনে করতে থাকে যে, তারা অর্থাৎ ব্রাহ্মণরা ইউরোপীয় বংশোদ্ভুদ। ইউরোপের স্বার্থ রক্ষার্থে নীচু জাতের native অনার্যদের ঘৃণা করা, শাসন-শোষণ-জুলুম-নিপীড়ন করা তাদের মৌরসী অধিকার। ইতোমধ্যে এদেশবাসীকে খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত করার প্রচেষ্টায় ব্রিটিশ বুদ্ধিজীবীরা নতুন নতুন হিন্দু ধর্ম গ্রন্থ রচনা করে তাতে খ্রিস্টানদের ত্রিতত্ত্ববাদের অনুপ্রবেশ ঘটায়। এতদসংক্রান্ত প্রামাণ্য তথ্যাদি সংক্ষেপে নিম্নরূপ–

১. পৃথিবীতে আর্য জাতি নামে কোনো কালে কোনো জাতি বা মানববংশের অস্তিত্ব ছিল—এর সমর্থনে কোনো সাক্ষ্য নাই। প্রমাণ নাই। তবুও বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পৌছাতে না পৌছাতেই এই আর্য জাতিই হয়ে ওঠে মানব ইতিহাসে সবচেয়ে বাস্তব। সবচেয়ে শক্তিশালী মানব বংশ। আর্য জাতির কথা পৃথিবী জানতে পারে ১৮৬০ সালের পর। (সূত্র : আর্য জাতির অস্তিত্বই ছিল না—পরমেশ চৌধুরী, পৃ : ১৭১)

২. ষড়যন্ত্রের বড় কারিগর ম্যাক্সমূলার ইন্দো-ইউরোপীয় শব্দের ব্যবহারে 'আর্য'

www.pathagar.com

শব্দটির জন্ম দিয়েছেন। শব্দটি জার্মান হওয়ায় ম্যাক্স মুলার ষড়যন্ত্রকারী পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট কয়েকটি শব্দ পাঠিয়েছিলেন বেছে নেয়ার জন্য। তাঁর সৃষ্টি করা ও পাঠানো শব্দসমূহ ছিল এরিয়ান, ইন্দো-জার্মান, ইন্দো-ইউরোপীয়ান, জাফেটিক, সাংস্কৃতিক, ম্যাডিটারেনিয়ান প্রভৃতি। এই শব্দগুলো থেকে জার্মানি, ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স গ্রহণ করল 'এরিয়ান' শব্দটি। (সূত্র : ঐ, পৃ-১৯৪)

৩. ১৮৮৬ সালের ১০ এপ্রিল লন্ডনের রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটিতে একটা ষড়যন্ত্রের জন্ম হয়েছিল। সে ষড়যন্ত্রটা ছিল 'আর্যদের ভারত আক্রমণ তত্ত্ব'। এ কাল্পনিক তত্ত্বটিকে প্রতিষ্ঠিত করা হলো। (সূত্র : ঐ পৃ. ৭৭)

৪. ব্রিটিশরা ভারতের ইতিহাস বিকৃতি ঘটিয়েছিলেন তাঁদের নিজেদের স্বার্থে। ভারতবাসীদের বোকা বানিয়ে তাদের ওপর ইচ্ছে মতো জবর-দখল-ভোগ করার জন্য। (সূত্র : ঐ পৃ. ১২২)

৫. ইতিহাস গবেষণার ক্ষেত্রে এই আর্য নামক ধারণাটি অনেক বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে।... আর্য ধারণাটি ব্রিটিশ শাসনাধীন শিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত ভারতীয়দের হীনমন্যতা দূরীকরণে কিছুটা সাহায্য করেছিল সন্দেহ নেই। উচ্চবর্ণের ভারতীয় এবং তাদের মালিক ইংরেজরা যে আসলে একই গাছের ফল, এ রকম একটা বিশ্বাস এ দেশে সহজে দানা বেঁধেছিল। সেই হিসাবে আর্য শব্দটি আজও জনপ্রিয়। (সূত্র : নরেন্দ্রনাথ ভট্টচার্য : ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস, পৃ. ৫৬-৫৭, কলকাতা)

মূলত বর্ণাঢ্য ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সভ্যতার স্রষ্টা ভারতীয় মুসলমানদের গৌরবকে ম্লান করার জন্য ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী আর্য তত্ত্বসহ আরও অনেক মিথ্যা ইতিহাস রচনা করে তাদের দালালদেরকে ভূতপূর্ব মুসলমান ও বৌদ্ধ শাসকগোষ্ঠীর প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে গড়ার প্রচেষ্টায় লিপ্ত ছিল। এসব কাল্পনিক মতবাদ, পরিকল্পিত ধর্মগ্রন্থ ও বিকৃত ইতিহাস ভারতীয় জনগণকে বহুধা বিভক্ত করেছে এবং ভারতের হিন্দু-মুসলমানের মাঝে, শিখ-হিন্দুর মধ্যে, বর্ণহিন্দু ও হরিজনের মধ্যে টাইম বোমা স্থাপনের কাজ করেছে। ইংরেজ রচিত ইতিহাসই হিন্দুদেরকে বলেছে, বাবরী মসজিদের স্থলে রামের জন্ম হয়েছে এবং দক্ষিণেশ্বরের মন্দির এক সময় মসজিদ ছিল। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৯২ সালে বাবরী মসজিদ ধ্বংস হয়। দ্বিতীয় বিস্ফোরণ কবে ঘটে তা ইতিহাসই বলে দেবে।

২. হিদেন বা হিন্দু নামকরণ তত্ত্ব : আরব ও ইরানের জনগণ সিন্ধু নদের পাড়ের বা সিন্ধু নদের পূর্ব পাড়ের অধিবাসীদেরকে সিন্ধু বা সিন্ধী হিসাবে নামকরণ করেন। এই নামকরণটি ধর্মীয় বা জাতিগত নয়—ইহা আঞ্চলিক বা ভূখণ্ডগত নাম। এ অঞ্চলের যেসব অধিবাসীর সাথে ইরানীরা মিশেছিল তাদের আচার ব্যবহার ও

www.pathagar.com

কার্যকলাপের বৈশিষ্ট্যের দরুন ফার্সী অভিধানসমূহ ও Samsad English-Bengal; dictionery-তে হিন্দু শব্দের যে অর্থ লেখা রয়েছে তা রীতিমতো কদর্যপূর্ণ ও অবমাননাকর। ইংরেজ ও ভারতীয় পণ্ডিতগণ হিন্দু শব্দের এরূপ কদর্য অর্থ সম্পর্কে জানতেন। এতদসত্ত্বেও সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ রাজশক্তির পরামর্শে এদেশীয় ব্রাহ্মণগণ বিশেষ উদ্দেশে এই শব্দটিকে নিজেদের পরিচিত হিসেবে নির্বাচন করেন। এর ফলে ভারতবর্ষের মুসলিম, শিখ, খ্রিস্টান ও পারসিক ব্যতিত অপরাপর সকল জাতিগোষ্ঠীকে হিন্দু হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানরা সংখ্যালঘুতে পরিণত হয় এবং সংখ্যালঘু ব্রাহ্মণরা (যারা মাত্র ৯%) সংখ্যাগুরু হিন্দু জাতির পরিচালকের আসন দখল করে। এই তত্ত্বের দ্বারাই ব্রাহ্মণবাদী শাসকগোষ্ঠী ১৯৪৭ সালের দেশ ভাগের সময় ভারতের অধিকাংশ এলাকা কুক্ষিগত করে। অথচ যাদের কপালে হিন্দুত্বের সীল মেরে ব্রাহ্মণরা ভারতের বৃহৎ অংশ দখল করে নিয়েছে তাদের অধিকাংশকে মন্দিরে প্রবেশের অধিকারও দেওয়া হয় না। নিজেদের বৈষয়িক ও সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে ব্রাহ্মণরা কিরূপ কলঙ্কজনক শব্দকে নিজেদের পরিচিতি হিসেবে সাব্যস্ত করেছে, এবং গলার মালার ন্যায় ঝুলিয়েছে। পাঠকদের জ্ঞাতার্থে তা উল্লেখ রা হলো—

১. যে হিন্দু নামে পরিচয় দেওয়া এখন আমাদের নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে তার কোনো সার্থকতা নেই। কারণ ঐ শব্দের অর্থ যারা সিন্ধু নদের পাড়ে বাস করতো।... মুসলমান শাসনামল থেকে আমরা ঐ শব্দ নিজেদের উপর প্রয়োগ করতে শুরু করেছি।... সুতরাং আমি হিন্দু শব্দ ব্যবহার না করে 'বৈদিক' শব্দ ব্যবহার করব। অবশ্য 'বৈদান্তিক' শব্দ ব্যবহার আরও যুক্তিসংগত। (সূত্র : বিবেকানন্দ রচনা সমগ্র পৃ. ৭০০, ১৯৮৮)

২. হিন্দু বা হিদেন এর সহজ বাংলা অর্থ হচ্ছে অধার্মিক, নিম্নস্তরের ধর্মাবলম্বী জাতিভুক্ত ব্যক্তি, অখ্রিস্টান, অসভ্য বা বর্বর ব্যক্তি, রুক্ষ, নিষ্ঠুর, ম্লেছ প্রভৃতি। (সূত্র : Samsad English-Bangali Dictorery, Fifth edition, 1976, p. 504)

৩. হিন্দু শব্দের অর্থ—অবিশ্বাসী, দাস ও কৃতদাস। (সূত্র : ফার্সী অভিধান হাফত কুলযুম, ৩য় খণ্ড, পৃ-৯৮)

৪. হিন্দু শব্দের অর্থ—চোর, চৌকিদার, দাস ও ক্রীতদাস। এখানে আরও উল্লেখ আছে ভারতের বাসিন্দাদের হিন্দি বলা হয় হিন্দু নয়। (সূত্র : ফার্সী অভিধান বাহরে আযম, ২য় খণ্ড, পৃ-৪৯৭)

৫. হিন্দু শব্দের অর্থ—চোর, ডাকাত, ছিনতাইকারী ও গোলাম। (সূত্র : ফার্সী অভিধান—লোগাতে কিশওয়ারী, পৃ. ৮২১-২২)

৬. শ্রীরামপুরের পাদ্রী উইলয়াম কেরী ভারতে আসার পূর্বেই তাঁর স্বদেশ বিলেতে এই 'হিদেন' নামটি ভারতীয়দের জন্য নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল। ভারতের

www.pathagar.com

হিদেনদের কোন কায়দায় খ্রিস্টান করা হবে সে ষড়যন্ত্রের কারখানা তৈরি হয়ে যাওয়ার অনেকদিন পর তিনি পৌঁছেছিলেন ভারতে। কেরী ভারতে না এসেও হিদেনদের মধ্যে খ্রিস্টের বাণী প্রচারের জন্য উতলা হয়ে উঠেছিলেন এবং কোটারিং শহরে The Particular Baptist Society for Propagating the Gospel amongst the Heathen নামে সমিতি গঠন করেছেন। (সূত্র : বাংলার সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ, অধ্যাপক ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়, ১৯৭৭, পৃ. ১৪)

ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর পদলেহী ও সহযোগী বুদ্ধিজীবী এবং নব্য ধনিক শ্রেণী হিদেন ও হিন্দু শব্দের ভয়ানক কদর্য অর্থ জেনে বুঝেও শুধুমাত্র ভারতের বিশাল জনগোষ্ঠীর উপর আধিপত্য ও শোষণ বজায় রাখার জন্য ব্রিটিশদের সাথে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। এ ষড়যন্ত্রের স্বরূপ ছিল নিম্নরূপ—অর্থাৎ ভারতের স্বাধীনচেতা ও মর্যাদা সচেতন জাতি মুসলিম, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ ও পারসিকরা ব্যতিত অপরাপর সকল জাতি-গোষ্ঠী, উপজাতি নির্বিশেষে সকলেই হিদেন বা হিন্দু। আর মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মণ শ্রেণী (তখন ছিল মাত্র ৭%) ও ব্রিটিশের অনুগ্রহপ্রাপ্ত কায়স্থ শ্রেণী উক্ত হিদেনদের নেতা। এরূপ ধারণা প্রতিষ্ঠিত করার পর সাধারণ নির্বাচন ও দেশ ভাগের সময় ব্রাহ্মণরা হয়ে গেল সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের নেতা ও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি এবং দেশভাগের সময় মুসলমানদেরকে বিশাল ভারতের সামান্য অংশ দিয়ে বিশাল অংশটি হিদেন বা হিন্দুদের নামে ব্রাহ্মণদের কব্জায় চলে যায়। অথচ ভারতের বিশাল জনগোষ্ঠী, যাদের কপালে হিন্দু সীল মেরে ব্রাহ্মণরা নিজেদেরকে ভারতের মালিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে তাদের সাথে সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় কোনো প্রকার মিল নেই এই ব্রাহ্মণদের।

প্রাগৈতিহাসিক যুগ এবং ঐতিহাসিক যুগ থেকে ভারতে বহু জাতি ও বহু দেশ ছিল। প্রত্যেক জাতি গোষ্ঠীর ছিল আলাদা দেশ, আলাদা ভাষা, পৃথক পৃথক দেবতা ও দেবী, পূজা পদ্ধতি স্বতন্ত্র, সামাজিক ও পারিবারিক বিধিনিষেধ স্বতন্ত্র, বিবাহ পদ্ধতি ও মৃতের সৎকারও ছিল ভিন্ন। দীর্ঘ মুগল শাসনের শেষ দিকে মুসলমানরাই ছিল ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতি। শিখ, পার্সী, ইহুদী, বৌদ্ধ, রাজপুত, অহমী, টিপরা, মিজো, নাগা, সাঁওতাল, কুকী, লুসাই, মণিপুরী, জৈন, মার্মা, চাকমা, উড়িয়া, মারাঠা, তামিল, বিহারী, ঝাড়খণ্ডীসহ শত শত জাতি ছিল সংখ্যালঘু। ব্রাহ্মণরা ছিল আরও সংখ্যালঘু। এমতাবস্থায় ব্রিটিশ রাজশক্তি ও সুচতুর ব্রাহ্মণরা মুসলমানদেরকে সংখ্যালঘু করার জন্য ভারতের অপরাপর জাতিগোষ্ঠীর ললাটে হিন্দু সীল লাগিয়ে দেয় এবং ১৯৪৭ সালে ভারতের বিশাল অংশ হিন্দুদের নামে গ্রহণ করে। কিন্তু যাদের নামে বিশাল ভূখণ্ড গ্রহণ করা হয়েছে তারা কিন্তু এখনও ব্রাহ্মণবাদী শাসকদের দ্বারা অবহেলিত, লাঞ্ছিত-নিপীড়িত, শোষিত ও বঞ্চিত। ব্রাহ্মণদের পুকুরের পানি ব্যবহার বা মন্দিরে

www.pathagar.com

প্রবেশের অধিকারও নেই এসব তথাকথিত হিন্দুদের। ভারতের দিকে দিকে যেসব স্বাধীনতার লড়াই চলছে তা মূলত ব্রাহ্মণবাদী আধিপত্য ও শোষণ বঞ্চনার ফসল।

খ. অন্যায্য ও অযৌক্তিক ভারত বিভাগ

সাধারণভাবে একটি ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, মুসলিম লীগ এবং এর সভাপতি জিন্নাহ সাহেবের দাবির কারণেই ভারত দুই ভাগে বিভক্ত হয়েছে। কিন্তু এই ধারণাটি আংশিক সত্য হলেও পুরোপুরি সত্য নয়। ইতিহাস বোদ্ধারা জানেন যে, ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার সময়কালে দেশ বিভাগের কোনো চিন্তা মুসলমানদের ছিল না। ১৯০৫ সালে শাসনতান্ত্রিক সুবিধার্থে ঢাকাকে পূর্ব বাংলার রাজধানী করায় প্রথমে বাংলার হিন্দু জনগোষ্ঠী এবং পরবর্তীতে সর্বভারতীয় হিন্দুরা বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে রক্তাক্ত বিরোধিতা শুরু করায় সর্বভারতীয় হিন্দু-মুসলিম মানস সুস্পষ্ট দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। অথচ উক্ত বঙ্গভঙ্গের ফলে হিন্দুদের ক্ষতির কোনো কারণ ছিল না। কেবলমাত্র পূর্ব বাংলার পশ্চাদপদ মুসলমানদের লাভ হবে এই ভেবে হিন্দুদের অন্তর বিস্ফোরিত হয়।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের অধীনে '৩৬ সালের নির্বাচনে ভারতের ৬টি প্রদেশে কংগ্রেস ক্ষমতাসীন হলে সর্বভারতীয় মুসলমানরা চরম নির্যাতনের শিকার হয়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, কংগ্রেসের বা হিন্দুদের শাসনে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। এ সিদ্ধান্ত থেকেই ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাব (যা পরবর্তীতে পাকিস্তান প্রস্তাব হিসেবে পরিচিতি পায়) গৃহীত হয়। তখন থেকেই শুরু হয় ভারত বিভাগের বিভিন্ন ফর্মুলা বা Plan প্রণয়ন। উক্ত Planগুলো ছিল নিম্নরূপ :

জিন্নাহ প্ল্যান

১. লাহোর প্রস্তাবে ব্রিটিশ ভারতকে তিন ভাগে ভাগ করার প্রস্তাব গৃহীত হয়। (উল্লেখ্য, তখন ব্রিটিশ ভারতের আওতা বহির্ভূত আরও ২৮৩টি আধা স্বাধীন রাজ্য রাজা কর্তৃক শাসিত হতো) উক্ত তিনটি ভাগ হলো যথাক্রমে– ক. সিন্ধু প্রদেশ, পাঞ্জাব প্রদেশ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং বেলুচিস্তান নিয়ে একটি মুসলিম দেশ, (খ) ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বঙ্গ প্রদেশ ও আসাম প্রদেশ নিয়ে অপর একটি মুসলিম দেশ, (গ) ব্রিটিশ ভারতের বাকি অংশ নিয়ে গঠিত হবে হিন্দুস্তান।

ভারতীয় কংগ্রেস মুসলিম লীগের লাহোর প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করে। তারা প্রথমে পাঞ্জাবকে দুই ভাগ করার প্রস্তাব করে। আসামকে প্রস্তাবিত মুসলিম দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করার দাবি তোলে এবং সর্বশেষ বঙ্গদেশকে দুই ভাগ করার জোর দাবি জানায়।

www.pathagar.com

ক্যাবিনেট মিশন প্লান

২. ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬ সালে ভারতের তৎকালীন ভাইসরয় ভারতকে স্বাধীনতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ৩ সদস্যের কাবিনেট মিশন ভারতে আসে। ১৬ মে ১৯৪৬ সালে ক্যাবিনেট মিশন মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবি নাকচ করে এবং ভারতের প্রদেশগুলোকে ৩টি গ্রুপে ভাগ করে ফেডারেল সরকারের অধীনে স্বাধীনতা প্রদানের ঘোষণা দেয়। এতে উল্লেখ ছিল– দেশরক্ষা, বৈদেশিক সম্পদ ও যাতায়াত ফেডারেল সরকারের অধীনে থাকবে; বাকি ক্ষমতা থাকবে প্রাদেশিক সরকারের হাতে। সারা ভারতের ব্রিটিশ শাসিত প্রদেশগুলোকে ৩টি গ্রুপে ভাগ করে প্রত্যেক গ্রুপকে স্বাধীনতার ১০ বছর পর প্রদেশগুলোর সংসদ সদস্যদের নিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠদের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে প্রয়োজনে সে গ্রুপ কেন্দ্রীয় ফেডারেশন থেকে পৃথক হওয়ার স্বাধীনতা থাকবে বলে উল্লেখ করা হয়। উক্ত ৩টি গ্রুপের গঠন নিম্নরূপ– A গ্রুপ–মাদ্রাজ প্রদেশ, বোম্বে প্রদেশ, সংযুক্ত প্রদেশ, বিহার প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ ও উড়িষ্যা প্রদেশ। B গ্রুপ– পাঞ্জাব প্রদেশ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও সিন্ধু প্রদেশ। C গ্রুপ– বাংলা প্রদেশ ও আসাম প্রদেশ।

গান্ধী ও নেহেরু কেবিনেট মিশনের এই প্লান গ্রহণ করে এবং জানায় যে, ১০ বছর পরে কোনো গ্রুপের কেন্দ্রীয় ফেডারেশন ত্যাগ করার ক্ষমতা ভারতীয় কনস্টিটিউট এসেম্বলীর সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে বাতিল করে দিতে পারবে। মুসলিম লীগ ও জিন্নাহ কেবিনেট মিশন প্ল্যান গ্রহণ করে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে ফেডারেশন ত্যাগ করার ক্ষমতাকে স্বাগত জানায়। মুসলিম লীগ আরও জানায়, কেবিনেট মিশনের প্রস্তাব বাতিল করার কোনো অধিকার থাকবে না কনস্টিটিউট এসেম্বলির। উভয় পক্ষ স্ব-স্ব দাবিতে অটল থাকায় লন্ডনে উভয় পক্ষকে ডেকে পাঠানো হয়। ব্রিটিশ সরকার কেবিনেট মিশন প্ল্যান সমর্থন করে ভাইসরয়কে প্ল্যান কার্যকর করার নির্দেশ দিয়ে ভারতে পাঠায়।

ভাইসরয় এবং মুসলিম লীগ প্রতিনিধি দল ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। কংগ্রেস নেতারা লন্ডনে অবস্থান করে বৃটেনের কিছু প্রভাবশালী নেতৃবৃন্দের সাথে গোপন শলা-পরামর্শ করে ব্রিটিশ সরকারের সাথে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে তৎকালীন ভাইসরয়ের পরিবর্তে নেহেরুর বন্ধু লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভারতের ভাইসরয় নিযুক্ত হন। **মাউন্টন্যাটেন ভারত এলে লেডী মাউন্টব্যাটেনের সাথে নেহেরুর এবং মাউন্টব্যাটেনের সাথে নেহেরু কন্যা ১৯ বছরের তরুণী ইন্দিরা গান্ধীর গভীর সখ্যতা স্থাপিত হয় এবং ভারতবর্ষ অন্যায় ও অযৌক্তিক বিভক্তির শিকার হয়। উভয় পক্ষের সাথে আলাপ শেষে মাউন্টব্যাটেন ভারত বিভাগের নিজস্ব একটি প্ল্যান প্রস্তুত করে ব্রিটিশ সরকারের অনুমোদন নেন এবং গোপনে নেহেরুকে প্ল্যানটি দেখান। নেহেরু উক্ত প্ল্যান মেনে না নেওয়ায়**

www.pathagar.com

মাউন্টব্যাটেন নেহেরুর আবদার অনুযায়ী প্ল্যানটি সংশোধন করে বাংলা ও পাঞ্জাব বিভক্ত করেন এবং কোলকাতা বন্দরকে পশ্চিম বাংলার অন্তর্ভুক্ত করেন। ১৩ জুন ১৯৪৭ সালে প্ল্যানটি ঘোষণা করেন। উল্লেখ্য, দুই পক্ষের মধ্যে সালিশ করতে এসে একপক্ষের সাথে গোপন পরামর্শ করা ও একপেশে আবদার রক্ষা করে মাউন্টব্যাটেন মূলত নীতি বিবর্জিত কাজ করে ভারতবাসীকে অদ্যাবধি অশান্তিতে নিমজ্জিত রেখেছেন।

৩. ঘোষিত মাউন্টব্যাটেন প্লান

ক. পাঞ্জাবের লাহোর ডিভিশনের : গুজরানওয়ালা, গুরুদাসপুর, লাহোর, শেখপুরা ও শিয়ালকোট, খ. রাওয়ালপিণ্ডি ডিভিশনের : কটক, গুজরাট, ঝিলাম, মিয়ানওয়ালী, রাওয়ালপিন্ডি ও শাহাপুর। গ. মুলতান ডিভিশনের : ডেরাগাজী খান, জং, লয়ালপুর, মন্টগোমারী, মুলতান ও মুজাফফরগড় পাকিস্তানকে দেয়া হয়। ঘ. বেঙ্গলে চট্টগ্রাম ডিভিশনের : চট্টগ্রাম, নোয়াখালী ও ত্রিপুরা জেলা, ঙ. ঢাকা ডিভিশনের : বাখরগঞ্জ, ঢাকা, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ জেলা, চ. প্রেসিডেন্সী ডিভিশনের : যশোর, মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া জেলা, ছ. রাজশাহী ডিভিশনের : বগুড়া, দিনাজপুর, মালদহ, পাবনা, রাজশাহী ও রংপুর জেলা পাকিস্তানকে দেওয়া হয়।

শেষ পর্যন্ত মাউন্টব্যাটেন নিজের ঘোষিত প্ল্যানও কার্যকর করেননি তার ব্যক্তিগত বন্ধু-বান্ধবীর আবদারের কারণে। গুরুদাসপুর, কটক, ত্রিপুরা, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, মালদহ শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানকে দেওয়া হয়নি। গণভোটের মাধ্যমে সিলেট পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হলেও করিমগঞ্জকে কেটে ভারতকে দেয়া হয় এবং দিনাজপুর জেলাকে খণ্ডিত করা হয়। মাউন্টব্যাটেনের এই প্রস্তাব অন্যায্য হওয়া সত্ত্বেও মুসলিম লীগের তা না মেনে উপায় ছিল না। কেননা ইতোমধ্যে ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করে যে, যদি মাউন্টব্যাটেনের প্রস্তাব গ্রহণ করা না হয় তবে ব্রিটিশ সরকার ভারতের সর্বময় শাসন ক্ষমতা দিল্লিতে তৈরি কনস্টিটুয়েন্ট এসেম্বলীর হাতে ছেড়ে দিয়ে আগস্টের মধ্যেই ভারত ছেড়ে চলে যাবে। তদুপরি কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর ব্যক্তিগত ডাক্তার তাঁকে এই মর্মে সতর্ক করেছিলেন যে, "যক্ষা রোগের কারণে আগামী ছয় মাসের মধ্যে আপনার মৃত্যু হতে পারে।" এমতাবস্থায় মি. জিন্নাহ কংগ্রেস-ব্রিটিশ ষড়যন্ত্রের ভয়াবহতা লক্ষ্য করে নিজের জীবদ্দশায় মুসলমানদের জন্য একটি নিরাপদ আবাসভূমি পেতে এই অন্যায় দেশ বিভাগ মেনে নেন।

৪. কম্যুনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়ার প্ল্যান

কংগ্রেস ভারত বিভাগে সম্মতি দেওয়ার ঢের আগে ১৯৪০-৪১ সালে C.P.I বোম্বাই থেকে প্রকাশিত তাদের People war কাগজে ভারত বিভাগ যে হওয়া উচিত সে

www.pathagar.com

সম্পর্কে তাদের অভিমত প্রকাশ করেন। উক্ত পত্রিকায় ভারত বিভাগের একটি ম্যাপ প্রকাশ করা হয়। ম্যাপে ভারত বিভাগের ফলে ভারতের যে অংশ নিয়ে পাকিস্তান গঠিত হয়েছে তার চেয়ে বেশি অঞ্চল নিয়ে পাকিস্তান দেখানো হয়েছিল। ম্যাপ দুটি (ভারত ও পাকিস্তান) দেশ পত্রিকার ঐ সংখ্যায় ১২৮ ও ১৩১ পৃষ্ঠায় ছাপা হয়েছিল। শুধু তাই নয় ভারতীয় জনসংঘের স্রষ্টা শ্যামাপ্রসাদ বাবু বহু স্থানে ভারত বিভাগের স্বপক্ষে বক্তৃতা দিয়েছেন। (সূত্র : সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকার কংগ্রেস শতবর্ষ সংখ্যা ১৮৮৫-১৯৮৫), অতুল্য ঘোষ, পৃ. ১২৫ ও ১৩০)

৫. সার্বভৌম বঙ্গদেশ প্ল্যান

বঙ্গ প্রদেশ (পূর্ব বাংলা ও পশ্চিমবাংলা) ও আসাম প্রদেশ একত্রিত করে একটি সার্বভৌম দেশ গঠনের প্রস্তাব প্রথম গ্রহণ করা হয় ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবে। পরবর্তীতে ১৯৪৬ সালের ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যানেও এই ধারণার স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ১৯৪৬-৪৭ সালে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, শরৎচন্দ্র বসু, কিরন শংকর, ফজলুল হক, সৈয়দ আবুল হাশিম প্রমুখ নেতৃবৃন্দ সার্বভৌম বাংলার নতুন প্ল্যান গ্রহণ করেন। এ প্রস্তাবে পূর্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ ও আসামসহ বিহার প্রদেশের দুমকা, কাটিহার, সিংভূম, মানভূম এবং সমগ্র ত্রিপুরা প্রদেশের বাংলাভাষী অঞ্চল নিয়ে সার্বভৌম বঙ্গদেশ গঠনের পরিকল্পনা করা হয়। কিন্তু কংগ্রেস নেতা নেহেরু-মাউন্টব্যাটেন ষড়যন্ত্র এবং এ সি চ্যাটার্জি, শ্রামাপ্রাসাদ মুখার্জী ও গান্ধীর অসহযোগিতায় এ প্ল্যান কার্যকর করা যায়নি। এতদসংক্রান্ত প্রামাণ্য তথ্য নিম্নরূপ :

ক. মি. জিন্নাহর পরামর্শে শহীদ সোহরাওয়ার্দী অবিভক্ত বাংলা প্রতিষ্ঠার জন্য হিন্দু নেতা শরৎচন্দ্র বসু ও কিরন শংকর রায়ের সাথে কয়েক দফা আলোচনায় মিলিত হন। হঠাৎ আলোচনা বন্ধ হয়ে যায়। 'আমি মুজিব বলছি' বইতে 'কৃত্তিবাস ওঝা' লিখেছেন, 'শরৎ বসু ভারত ডোমিনিয়নের অন্তর্ভুক্তি ছাড়া মুক্ত বাংলায় রাজী হননি। সিরাজুদ্দীন হোসেন তাঁর 'ইতিহাস কথা কও' গ্রন্থে লিখেছেন গান্ধীর বিরোধিতার কারণেই যুক্ত বাংলার প্রস্তাব নস্যাৎ হয়। (সূত্র : জাতির উত্থান পতন সূত্র, পৃ. ১৫১, প্রবন্ধকার)

খ. কায়েদে আজমের আশীর্বাদপুষ্ট বসু-সোহরাওয়ার্দীর সার্বভৌম বাংলার পরিকল্পনাকে গান্ধী এই বলে নস্যাৎ করে দেন যে, "এই পরিকল্পনা কংগ্রেসের নিকট গ্রহণযোগ্য হতে হলে সার্বভৌম বাংলার সংস্কৃতি হিসেবে হিন্দু উপনিষদের আদর্শকে গ্রহণ করতে হবে। গান্ধীর এই অন্যায় প্রস্তাবে বিক্ষুব্ধ হয়ে শরৎ বসু এক পত্রে তাকে লেখেন, "যে কংগ্রেস একদা মহান জাতীয় প্রতিষ্ঠান ছিল, তা দ্রুত একটি হিন্দু

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে চলেছে দেখে আমি মর্মাহত। (In Retrospection, Abul Hashim, page-161)

গ. তদানীন্তন কংগ্রেস নেতা কুমিল্লার আশরাফ উদ্দীন চৌধুরীর পত্রের জবাবে নেহেরু লিখেন, "অখণ্ড ভারতের নীতিকে আমরা জলাঞ্জলী দিয়েছি একথা সত্য নয়। তবে আমরা কোনো কিছু চাপিয়ে দিতে চাই না। ভারত বিভাগ মেনে নেব আমরা এই শর্তে যে, বাংলা ও পাঞ্জাবকে বিভক্ত করতে হবে। কারণ একমাত্র এ পথেই অখণ্ড ভারত পুনরায় ফিরে পাওয়া সম্ভব হবে। (সূত্র : রাজবিরোধী আশরাফ উদ্দীন চৌধুরী, জসীম উদ্দীন চৌধুরী)

উপরোক্ত তথ্য-উপাত্তের মাধ্যমে এটি সুস্পষ্ট যে, ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের উপরোক্ত ৫টি প্ল্যানের কোনোটি কার্যকর হতে পারেনি কেবলমাত্র সংখ্যালঘু বর্ণ হিন্দু নেতৃবৃন্দ ও সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকারের গোপন ষড়যন্ত্রের কারণে। এমতাবস্থায় ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ লাঞ্ছিত নিপীড়িত অধিকার বঞ্চিত জাতি গোষ্ঠীর উচিত হবে ঐক্যবদ্ধভাবে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পদলেহী বর্ণ হিন্দুদেরকে ক্ষমতা থেকে টেনে নামানো এবং জনগণের শান্তির স্বার্থে উপরোক্ত প্ল্যানসমূহের মধ্যে যেটি সবচেয়ে ন্যায়সঙ্গত ও বাস্তব সে প্ল্যান বাস্তবায়নের জন্য উপমহাদেশের মানচিত্র পুনর্বিন্যাস করা।

গ. দেশীয় রাজ্য দখল

ব্রিটিশ ভারতের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন অঞ্চলের বাইরে আরও ৭শ' স্বাধীন রাজ্য ছিল ভারতবর্ষে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ছলে-বলে-কলে-কৌশলে এ সকল রাজ্যের অনেকগুলোকে দখলে নিতে সক্ষম হয়েছিল। এরপরেও ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী ১৯৪৭ সালে ভারত ত্যাগের প্রাক্কালে ভারত উপমহাদেশে ২৮৩টি রাজ্য ছিল যাদেরকে বলা হতো করদ বা মিত্র রাজ্য। এ সকল রাজ্যের হিন্দু-মুসলিম রাজা ও নবাবগণ স্বয়ং নিজ নিজ আইন অনুসারে রাজ্য শাসন করতেন। ইংরেজ সরকারকে এই রাজ্যগুলো কর দিত। ইংরেজ সরকার ভারতবর্ষ ত্যাগ করার আগে দেশীয় রাজাদের ডেকে বলেছিলেন যে, "তারা প্রত্যক্ষভাবে ব্রিটিশ সরকারের অধীন, ভারত সরকারের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই। ইংরেজ ভারত ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে তারা স্বাধীন।" (সূত্র : সাপ্তাহিক দেশ, কংগ্রেস শতবর্ষ সংখ্যা (১৮৮৫-১৯৯৫) লেখক—শ্রী অতুল্য ঘোষ, পৃ. ১৩০)

শ্রী ঘোষ আরও লিখেছেন, "ইংরেজ যাবার সময় ভারতবর্ষ শুধু দু'ভাগ করে গেল তা নয়—২৮৫ ভাগ করে গেল। যথা :

দেশীয় রাজ্য	২৮১টি
হিন্দুস্থান	১টি

www.pathagar.com

পাকিস্তান	১টি
পর্তুগীজ শাসনকৃত	১টি
ফরাসী শাসনাধীন	১টি

সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকারের ভাবশিষ্য ও দোসর হিন্দুস্থান সরকার বিভিন্ন কৌশলে উক্ত ২৮৩টি স্বাধীন রাজ্যকে জবরদখল করে নেয়। এ প্রসঙ্গে অতুল্য ঘোষ লিখেছেন, "এসব ইতিহাস লুকিয়ে রাখার কোনো কারণ নেই। আমরা ২৮৩টি রাজ্যকে ভারতের মধ্যে ঢুকিয়ে নিতে পেরেছি। নিঃসন্দেহে এটা আমাদের রাজনৈতিক বিজয়। পাকিস্তানের জিন্নাহ সমান সমান অংশ দাবি করেও যা পেয়েছিলেন, আমরা কিন্তু ভারতের মানচিত্রে তারচেয়েও বেশি এবং বিরাট অংশ বাড়িয়ে ফেলেছি। এটাকে কেউ যদি আগ্রাসন, অত্যাচার অথবা আন্তর্জাতিক নীতিভঙ্গ বলেন তাতে আমাদের কী এসে যায়? এর মাধ্যমে স্বাধীন ভারতের আয়তন লক্ষাধিক মাইল বেড়েছে।... কংগ্রেসের পক্ষে সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেলের অত্যন্ত ধৈর্য, সাহসিকতা ও কুশলতার জন্য দেশীয় রাজ্যগুলো একে একে ভারতভুক্ত হয়। (দেশ, ঐ, পৃ. ১৩০)

অতুল্য ঘোষের উপরোক্ত তথ্যে আমরা জানতে পারি যে, ১৯৪৭ সালের পর থেকে অত্যাচার, আগ্রাসন, আন্তর্জাতিক নীতিভঙ্গ, সাহসিকতা ও কুশলতার মাধ্যমে হিন্দুস্থানের শাসকগোষ্ঠী উপমহাদেশের ২৮৩টি স্বাধীন রাজ্য জবরদখল করে নেয়। উক্ত জবরদখলকৃত ভূখণ্ডের স্বাধীনচেতা নাগরিকদের আন্দোলন, সংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং অন্যায্য ভারত বিভাগই উপমহাদেশে অশান্তির মূল কারণ। অশান্তির আর একটি মূল কারণ নেহেরু ডকট্রিন বা দি ইন্ডিয়া ডকট্রিন। এ ডকট্রিনের মূলকথা হলো—আফগানিস্তান, পাকিস্তান, নেপাল, ভুটান, সিকিম, বাংলাদেশ ও বার্মাকে ভারতভুক্ত করার অন্তহীন আগ্রাসী কর্মকাণ্ড। ভারতের এই আগ্রাসী মনোভাব ও কার্যকলাপে বিগত ৬৩ বছর যাবত তার প্রতিবেশী দেশগুলো বারবার অশান্তিতে নিমজ্জিত হচ্ছে।

উক্ত ২৮৩টি রাজ্য দখলে হিন্দুস্থানের শাসকগোষ্ঠী একটি ন্যক্কারজনক ও অপমানকর কৌশল গ্রহণ করে। উক্ত কৌশলটি ছিল—পাকিস্তান ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট থেকে সার্বভৌম দেশে পরিণত হলেও ভারত সরকার ১৯৭১ সালের ১৫ আগস্টের পূর্ব পর্যন্ত ব্রিটিশ সম্রাটের প্রতিনিধি হিসেবে ভারত শাসন করে। এর মূল কারণ ছিল ইংরেজ সরকারের ভারত ত্যাগের পর ইংরেজ সরকারের স্থানীয় প্রতিনিধি হিসেবে ভারতের ২৮৩টি স্বাধীন রাজ্য দখলের বৈধ কর্তৃপক্ষ হওয়া। উক্ত সময়ের মধ্যে ভারত সরকার উক্ত ২৮৩টি রাজ্য জবরদখল করে নেয় এবং প্রতিবেশী দেশে আগ্রাসনের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। দখলকৃত রাজ্যগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—কাশ্মীর, হায়দরাবাদ, ভূপাল, ইন্দোর, ময়ূরভঞ্জ, বরোদা, ছোট উদয়পুর, গোয়ালিয়র, ত্রিবাঙ্কুর, মহীশুর, কপুরতলা, পাতিয়ালা, ভরতপুর,

www.pathagar.com

জয়পুর, যোধপুর, বিকানীর, সিকিম, কুচবিহার, মণিপুর, ত্রিপুরা, কাশী, আলোয়ার, দেওয়াস, অরুণাচল, মেঘালয়, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, জলপাইগুড়ি ইত্যাদি। নাগাল্যান্ডকে ভারতীয় রাজ্যে পরিণত করা হয় ১৯৬৩ সালে, আসাম, ত্রিপুরা, মেঘালয়, মণিপুরকে ১৯৭২ সালে, মিজোরাম ও অরুনাচলকে ১৯৮৭ সালে। (সূত্র : অতুল্য ঘোষ, সাপ্তাহিক দেশ, কংগ্রেস শতবর্ষ সংখ্যা (১৮৮৫-১৯৮৫) পৃ. ১৩০ এবং M.B.I. Munshi, The India Doctrin, 2nd edition page-328)

উপরোক্ত তথ্যাদির সমর্থনে আরও প্রামাণ্য তথ্য নিম্নে প্রদান করা হলো—

১. ১৫ আগস্ট আমরা কেন স্বাধীনতা দিবস পালন করব? সেদিন আমাদের গভর্নর জেনারেল কে ছিলেন? নিশ্চয়ই মাউন্টব্যাটেন। দেশ ভাগের পর দু'দেশের গভর্নর জেনারেল থাকতে চেয়েছিলেন মাউন্টব্যাটেন। কিন্তু জিন্নাহ সে প্রস্তাবে রাজী হননি। প্রশ্ন হচ্ছে স্বাধীন ভারতের গভর্নর জেনারেল ব্রিটিশ শাসক প্রতিনিধি হলেন কি করে? আর হলে স্বাধীনতা লাভই বা কিভাবে হয়? (সূত্র : সম্পাদকীয়, দৈনিক বর্তমান, লেখক জয়ন্ত ঘোষাল, ১২/০৮/১৯৯৫)

২. মাউন্টব্যাটনের পর ভারতীয় গভর্নর জেনারেল হলেন চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারী। কিন্তু ১৯৪৯ সালের ২১ জুন তিনি শপথবাক্য পাঠ করলেন কার নাম স্মরণ করে? কার প্রতি আনুগত্য, কার প্রতি দায়িত্ব প্রকাশ করলেন তিনি? ভারতবর্ষের আম-জনতার উদ্দেশে নয়, তিনি সম্রাট ষষ্ঠ জর্জ ও তার বংশধরদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে শপথ নিলেন। শপথ নিতে গিয়ে তিনি বললেন, "আমি চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারী যথাবিহিত প্রতিজ্ঞা করছি যে, আমি সম্রাট ষষ্ঠ জর্জ, তার বংশধর এবং উত্তরাধিকারীদের প্রতি আইনানুসারে বিশ্বস্ত ও অনুগত থাকব এবং আমি শপথ নিচ্ছি যে, আমি গভর্নর জেনারেলের পদে অধিষ্ঠিত থেকে সম্রাট ষষ্ঠ জর্জ, তার বংশধর ও উত্তরাধিকারীদের সুচারু ও যথাযথভাবে সেবা করব।

   আমাদের গভর্নর জেনারেল রাজার নামে শপথ নেন, আমরা সংবিধানে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের মর্যাদা পাই আর লন্ডনে আমরা কমনওয়েলথ করতে যাই সার্বভৌমত্বের প্রমাণ দিতে। ধ্যাষ্ঠামীর একটা সীমা আছে। (সূত্র : ঐ)

৩. রজনীপাম দত্ত তাঁর বিখ্যাত বই India Todayর মধ্যে বলেছেন যে, ভারতের জনগণের কোনো সার্বভৌম ক্ষমতা নেই এবং Independence বলায় তিনি একটি প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিয়েছেন। পেঙ্গুইনের বই মারফত জানা যায়, আমাদের পাশের দেশ বার্মা স্বাধীন, কিন্তু আমরা পরাধীন। (অমিতাভ মৈত্র, বর্তমান দিনকাল, জুলাই ১৯৮২ পৃ. ২৬)

www.pathagar.com

৪. ভারতের রাষ্ট্রপতি, রাজ্যপাল ও লেফটেনেন্ট গভর্নরদের সরকারি বাসভবন ও গাড়িগুলোতে এতদিন ইংল্যান্ডের রাজার দেওয়া যেসব পতাকা শোভা পেত ১৯৭১ সালের ১৫ আগস্ট থেকে তার পরিবর্তে দেখা যাবে ভারতের জাতীয় পতাকা। (সূত্র : আনন্দবাজার পত্রিকা, ২০/০৭/১৯৭১ সংখ্যা)

ঘ. অন্যায্য দেশ বিভাগ ও দেশীয় রাজ্য দখলের কুফল

অন্যায্য দেশ বিভাগ বিশেষ করে পাঞ্জাব ও বাংলাকে বিভক্ত করার ফলে এর পক্ষ-বিপক্ষের দাঙ্গায় ১৯৪৬-৪৭ সালে ভারতে যে হিন্দু-মুসলিম-শিখ দাঙ্গা হয় তাতে কমপক্ষে ১০ লাখ লোক নিহত হয়। আহত ও উদ্বাস্তু হয় কয়েক কোটি মানব সন্তান। অথচ দেশ বিভাগের জিন্নাহ প্ল্যান অথবা ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান বাস্তবায়ন করা হলে উক্ত হত্যাযজ্ঞ বা জনদুর্ভোগের ঘটনা ঘটতো খুবই কম। ভারতীয় হিন্দু নেতাদের আগ্রাসী মনোভাবের কারণেই ১৯৪৬ থেকে অদ্যাবধি কোটি কোটি ভারতবাসী আহত নিহত ও পঙ্গু হচ্ছে। সর্বোপরি উক্ত হিন্দু নেতৃবৃন্দ ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের গোপন আঁতাতের ফলে উপমহাদেশের জনগণ তাদের ১৯০ বছরের দুঃখ-দুর্দশা, হত্যাকাণ্ড, অপমান, লাঞ্ছনার জন্য দায়ী ব্রিটিশ দুর্বৃত্তদের প্রতি মনোযোগ দিতে সক্ষম হয়নি। কংগ্রেস-ব্রিটিশ চক্রান্ত ও আঁতাতের ফলে ভারতের জনগণ ভাইয়ে-ভাইয়ে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে। কমন শত্রু ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী ও তাদের পদলেহী গোলামরা নিরাপদে পার পেয়ে যায়। এই অন্যায্য দেশ বিভাগ ভারতবাসীর জন্য আরও যেসব সমস্যার সৃষ্টি করেছে তা প্রধানত নিম্নরূপ :

১. জনদুর্ভোগ ও অর্থনৈতিক দুর্দশা সৃষ্টি

অন্যায্য দেশ বিভাগের ফলে আসাম ও উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলোকে কোলকাতা বন্দরের পশ্চাদভূমি করা হয়েছে। অথচ প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিকভাবে আসাম ও উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলো চট্টগ্রাম বন্দরের পশ্চাদভূমি তখনও ছিল এখনও আছে। জিন্নাহ প্ল্যান বা ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান বাস্তবায়ন করা হলে আসামসহ উত্তর-পূর্ব ভারতের জনগণকে বন্দরে মালামাল পরিবহন ও পানিসম্পদ ব্যবহার নিয়ে ভোগান্তি পোহাতে হতো না। অন্যদিকে সমগ্র পাঞ্জাব, বোম্বে বা মাদ্রাজ বন্দরের পশ্চাদভূমি নয়। অখণ্ড পাঞ্জাব সব সময় করাচী বন্দরের পশ্চাদভূমি ছিল। তদুপরি সমগ্র পাঞ্জাব ব্রিটিশ আমলেই একই ইরিগেশন সিস্টেমের অন্তর্ভুক্ত ছিল। অন্যায্য পাঞ্জাব বিভাগের ফলে পানি ব্যবস্থাপনায়, যোগাযোগ ব্যবস্থায় ও ইরিগেশন সিস্টেমে পাঞ্জাববাসী সীমাহীন দুর্ভোগের শিকার হয়েছে। এ দুর্ভোগের কারণেই পাঞ্জাবে বারবার বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠে। অন্যায্য দেশ বিভাগ না হলে পূর্ব পাঞ্জাববাসী, আসাম ও উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যসমূহের অধিবাসীরা নিজেদের উৎপাদিত পণ্য করাচী ও চট্টগ্রামের মাধ্যমে রফতানি করে

www.pathagar.com

অর্থনৈতিকভাবে অধিকতর সমৃদ্ধশালী হতো। কংগ্রেস ও ব্রিটিশ চক্রান্তকারীদের অন্যায্য দেশ বিভাগ ভারতের বিশাল জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য ও দুর্ভোগের কারণ হয়েছে। বর্তমানে চক্রান্তকারীদের ভুলের মাশুল দিতে রাজী হয়েছে বাংলাদেশ সরকার। কিন্তু চুক্তি কার্যকর করতে গেলে দেখা যাবে বাংলাদেশের জনগণ এই অন্যায্য চুক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে। এই বিদ্রোহের দাবানল সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতে ছড়িয়ে যাবে।

২. বাংলাভাষী জনগণের বহুধা বিভক্তি

সাম্রাজ্যবাদী বৃটেন পৃথিবীর যেসব দেশ থেকে বিদায় নিয়েছে সেসব দেশে স্থায়ী অশান্তির টাইমবোমা পেতে তবে বিদায় নিয়েছে। তাদের মূল উদ্দেশে হলো জনগণ যাতে নিজেদের মধ্যে হানাহানি-মারামারি করে এক সময় বলে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ রাজশক্তি ভালো ছিল। এর ফলে অদূর ভবিষ্যতে হয়তো তারা আবার তাদের হারানো সাম্রাজ্যে ফিরে আসতে পারবে। মধ্যপ্রাচ্যের দিকে তাকিয়ে দেখুন। তুরস্কের শাসনাধীন মধ্যপ্রাচ্যকে তারা এই ওয়াদা দিয়েছিল যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে আরবরা যদি বৃটেনকে তুরস্কের বিরুদ্ধে সহায়তা করে তবে তাদেরকে তুরস্ক থেকে স্বাধীনতা এনে দেবে। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর শক্তিহীন হয়ে মধ্যপ্রাচ্য ত্যাগ করার সময় মধ্যপ্রাচ্যকে অনেক ভাগে ভাগ করে যায় এবং মধ্যপ্রাচ্যের আরবদেরকে কয়েক টুকরা করে, শক্তিশালী কুর্দী জাতিকে ভাগ করে তুরস্ক, সিরিয়া, ইরাক ও ইরানের অংশ করে দেয়। ইরাক থেকে একটি অংশ কেটে নিয়ে কুয়েত রাষ্ট্র সৃষ্টি করে এবং ফিলিস্তিনে মধ্যপ্রাচ্যের বিষফোঁড়া ইসরাইল রাষ্ট্র স্থাপন করে। তখন থেকে অদ্যাবধি সংশ্লিষ্ট দেশসমূহ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের অন্যায্য দেশ বিভাগের মাশুল গুনছে।

একইভাবে ১৭৫৭ সালে ব্রিটিশ বেনিয়ারা এ দেশ দখল করার সময় বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা নিয়ে একটি দেশ ছিল। এ দেশের হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান শান্তিপূর্ণভাবে নিজেদের দেশ শাসন করতো। এখানে ছিল না কোনোরূপ সাম্প্রদায়িক হানাহানি, দুর্দশা বা দুর্ভিক্ষ। ব্রিটিশ শাসকরাই এ দেশে সাম্প্রদায়িকতা, হানাহানি, দুর্ভিক্ষ ও জনদুর্ভোগের জন্য দায়ী।

১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের সময় তাদের উচিত ছিল বাংলা-বিহার-উড়িষ্যাকে নিয়েই একটি দেশ গঠন করে ভারত ত্যাগ করা। অথচ তারা তা না করে শক্তিশালী বাঙালি জাতিকে কুর্দীদের ন্যায় বিভিন্ন রাজ্য ও দেশের মধ্যে ভাগ করে দেয়। এর মাধ্যমে তারা উত্তর ভারতের বর্ণহিন্দুদের স্বার্থ রক্ষা করেছে। বাঙালিদের করেছে সর্বনাশ। একইভাবে তারা তাদের ভারত সাম্রাজ্য গঠন ও বিকাশের কেন্দ্রভূমি কোলকাতা থেকে রাজধানী প্রত্যাহার করে দিল্লিতে নিয়ে গিয়ে উত্তর ভারতের বর্ণ হিন্দুদেরকে উপমহাদেশের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠা

www.pathagar.com

করে। অথচ শক্তিশালী বাঙালি জাতি নিয়ে যদি একটি মাত্র স্বাধীন সার্বভৌম দেশ থাকতো তবে সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারত হতো শক্তিশালী, সমৃদ্ধ ও শান্তির আবাসভূমি। হিন্দী মাড়োয়ারীদের বুটের তলায় সংস্কৃতিবান বাঙালিদেরকে পিষ্ট হতে হতো না। সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতজুড়ে বিদ্রোহের দাবানল ছড়িয়ে পড়তো না। দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যবাহী রাজধানী কোলকাতা ভিক্ষুকের শহর বা জার্মান নোবেল বিজয়ী গুন্টার গ্রাসের ভাষায় 'ঈশ্বরের বিষ্ঠা' হতো না।

৩. দেশীয় রাজ্যসমূহ দখলের কুফল

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্টের পর পরই ভারত সেনা পাঠিয়ে জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাশ্মীর রাজ্যের দুই-তৃতীয়াংশ দখল করে নেয়। ১৯৪৮ সালে মি. জিন্নাহর মৃত্যুর পর পরই সেনাবাহিনী ও সাম্প্রদায়িক গুণ্ডা পাঠিয়ে হায়দরাবাদ দখল করে নেয়। এরপর ভারত একে একে ২৮৩টি দেশীয় রাজ্য দখল করে বর্তমানে প্রতিবেশী স্বাধীন দেশ দখলের পথে পা বাড়িয়েছে। অথচ ১৯৪৭ থেকে অদ্যাবধি শুধুমাত্র কাশ্মীরের দখলদারিত্ব বজায় রাখার জন্য ভারতকে যে পরিমাণ অর্থ ক্ষয় ও লোকক্ষয় স্বীকার করতে হয়েছে তা যদি না করতে হতো তবে ভারত এতদিনে বিশ্ব শক্তিতে পরিণত হতো, ভারতের সিংহভাগ জনগণকে দারিদ্র্য, অপুষ্টি ও মানবেতর জীবন যাপন করতে হতো না। উক্ত ২৮৩টি রাজ্যের মধ্যে যে সকল রাজ্য আয়তনে বড়, জাতিগতভাবে সম্পূর্ণ আলাদা ও খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ সে সকল রাজ্যে দীর্ঘদিন যাবত চলছে সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রাম।

বুশ-ব্লেয়ার যেরূপ সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সীমাহীন নৃশংসতায় আফগানিস্তান ও ইরাক দখল করে ও দখলদারিত্ব বজায় রাখতে গিয়ে নিজেরা ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে, নিজ দেশের জনগণকে ও বিশ্বকে সীমাহীন অর্থনৈতিক দুর্দশায় নিপতিত করেছে ঠিক তদ্রূপ ভারতের বর্ণবাদী-আগ্রাসী শাসকগোষ্ঠী ভিন্ন দেশ ও রাজ্য জবরদখল করে সমগ্র ভারতব্যাপী যে বিদ্রোহের দাবানল প্রজ্জ্বলিত করেছে তাতে করে ভারতও খুব শিগগিরই সোভিয়েত ইউনিয়নের পরিণতি বরণ করবে অথবা আরও শোচনীয় পরিস্থিতির শিকার হবে। এই অন্যায় দখলদারিত্ব বজায় রাখতে গিয়ে ভারত খুব শিগগিরগই নৃশংস গৃহযুদ্ধের শিকার হয়ে অস্তিত্বহীনতায় নিমজ্জিত হবে।

শান্তিময় উপমহাদেশ প্রতিষ্ঠায় করণীয়

দীর্ঘ ৭০০ বছরের মুসলমান শাসনামলে ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মতো কোনো ঘটনা ঘটেনি। রাজায়-রাজায় যুদ্ধ হয়েছে, সরকার-বিদ্রোহী লড়াই হয়েছে কিন্তু ধর্ম বা সম্প্রদায়ের কারণে কোনো দাঙ্গা-হাঙ্গামা, শোষণ-অবিচার সংঘটিত হয়নি। মুসলিম শাসকদের ছত্রছায়ায় ভারতের সকল ধর্মের, সকল জাতির লোকজন নিজ

www.pathagar.com

নিজ যোগ্যতা অনুযায়ী দেশ শাসনে ও দেশ গড়ায় অবদান রেখে ভারতকে বিশ্বের সবচেয়ে ঐশ্বর্যশালী দেশে পরিণত করেছিল। পক্ষান্তরে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী বিশ্বের সেরা সম্পদশালী ভারতের সোনাদানা, মণি-মানিক্য, হীরা-জহরতসহ সকল আস্থাবর সম্পত্তি নিজ দেশে নিয়ে গেছে এবং ভারতের বিশাল ভূখণ্ডের কোটি কোটি মানুষের শ্রম ও ফসল নিজ দেশে নিয়ে গিয়ে ভারতকে পৃথিবীর সবচেয়ে গরিব দেশে পরিণত করেছে।

শুধু তাই নয়, তারা দীর্ঘদিন অবস্থান করে ভারতে শাসন-শোষণ অব্যাহত রাখার জন্য যে Divide & Rule পলিসি অনুসরণ করেছিল তা ছিল অত্যন্ত মারাত্মক ও ব্যাপক বিস্তৃত। তারা ধর্মে-ধর্মে বিরোধ সৃষ্টি করেছে, একই ধর্মের মধ্যে বিভিন্ন উপদল সৃষ্টি করেছে, জাতিতে জাতিতে বিরোধ সৃষ্টি করেছে, জাতির মধ্যে বিভিন্ন উপদল ও উপদলীয় কোন্দল সৃষ্টি করেছে। বর্ণে বর্ণে, গোত্রে গোত্রে বিরোধ সৃষ্টি করেছে এবং বিভিন্ন দল-উপদল সৃষ্টি করেছে। তারা ভূখণ্ডগত ও মতবাদগত দ্বন্দ্ব-সংঘাত সৃষ্টি করে অশান্তিকে দীর্ঘায়িত করার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। বিভিন্ন কাল্পনিক ইতিহাস, পরিকল্পিত ধর্মমত, পুঁথি, তালপত্র, মুদ্রা, শিলালিপি, স্থাপত্যকর্ম, প্রাচীন নগর, ধর্মগ্রন্থ সৃষ্টি করে ভারতবাসীকে দীর্ঘস্থায়ী হানাহানিতে লিপ্ত করার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে এদেশ ত্যাগ করেছে।

ইতোপূর্বে উল্লেখিত উইলিয়াম কেরীর হিদেন বা হিন্দু তত্ত্ব, আর্যতত্ত্ব, আর্য-অনার্য তত্ত্ব, আর্যদের ভারত আক্রমণ তত্ত্ব, বাবরী মসজিদ ও রাম জন্মভূমির ইতিহাস, দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের স্থলে মসজিদ থাকার ইতিহাস, শিখ-মুসলমান বিরোধের কাল্পনিক ইতিহাস, জাতি-উপজাতি বিরোধের মিথ্যা ইতিহাস, হিন্দু-মুসলিম বিরোধের পরিকল্পিত ইতিহাস, গল্প, উপন্যাস, চিত্রকলা, স্থাপত্য সৃষ্টি করে প্রতিটি ধর্ম, জাতি, গোত্রের মধ্যে এক একটি টাইম বোমা স্থাপন করে গেছে। বর্তমানে প্রচলিত হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের বেদ-আয়ুর্বেদ, মুসলিম ধর্মাবলম্বীদেরকে বিভ্রান্ত করে কাদিয়ানী ও বাহাই মতবাদ ব্রিটিশ শাসক ও বুদ্ধিজীবীদের পরিকল্পিত সৃষ্টি। অন্যদিকে অজন্তা-ইলোরা নামক প্রাচীন কীর্তি সৃষ্টিও ব্রিটিশ মস্তিষ্কপ্রসূত। এসবের ফিরিস্তি দীর্ঘ বিধায় মূল আলোচনায় ফিরে আসছি। এমতাবস্থায় আমাদের করণীয় নিম্নরূপ—

১. দীর্ঘ আড়াইশ' বছরে ব্রিটিশ রোপিত বিষবৃক্ষসমূহ ফুলে ফলে বিকশিত হয়ে ভারতবাসীকে গ্রাস করে ফেলেছে। এমতাবস্থায় উপমহাদেশের চিন্তাশীল ও আত্মমর্যাদাবান গবেষকদের এগিয়ে এসে ব্রিটিশ রোপিত বিষবৃক্ষসমূহ চিহ্নিত করে উপড়ে ফেলার ব্যবস্থা করতে হবে এবং তদস্থলে সঠিক ইতিহাসকে পুনর্বহাল করতে হবে। এটি করা সম্ভব হলে সাম্প্রদায়িক হানাহানির উৎসমূল নিশ্চিহ্ন হবে।

২. জবরদখলকৃত দেশীয় রাজ্যসমূহকে স্বাধীনতা প্রদান করতে হবে।

www.pathagar.com

৩. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, শরৎচন্দ্র বসু, কিরন শংকর রায়, ফজলুল হক, সৈয়দ আবুল হাশিম প্রমুখ নেতৃবৃন্দ কর্তৃক প্রণীত 'সার্বভৌম বঙ্গদেশ' পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে। এ বঙ্গদেশ পরিচালিত হবে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের 'বেঙ্গল-প্যাক্টে'র নীতিকে সমুন্নত রেখে।
৪. প্রাকৃতিক, ভৌগোলিক ও জাতিগত স্বার্থ সমুন্নত রেখে ভারতের বর্তমান মানচিত্রকে পুনর্বিন্যাস করতে হবে।
৫. খ্রিস্টান পাদ্রী উইলিয়াম ক্যারির হিন্দেন তত্ত্ব বা হিন্দুতত্ত্বের মুখোশ উন্মোচন করে ভারতের স্বতন্ত্র জাতিসমূহের ললাট থেকে এই তত্ত্বের সীল অপসারণ করতে হবে।
৬. জার্মান পণ্ডিত ম্যাক্সমুলারের কল্পিত 'আর্যদের ভারত আক্রমণ তত্ত্ব', আর্য তত্ত্ব ও আর্য-অনার্য তত্ত্ব থেকে ভারতের স্বতন্ত্র জাতিসমূহকে বেরিয়ে আসতে হবে।
৭. ভারতীয় শাসকগোষ্ঠীকে আগ্রাসী মনোভাব বর্জন করতে হবে।

আমি ভারত উপমহাদেশের একজন স্বাধীন ও সচেতন নাগরিক। উপমহাদেশের শান্তি-অশান্তির সাথে আমার অস্তিত্ব জড়িত। এ জন্য অত্র প্রবন্ধ রচনা করেছি। আমার এ প্রবন্ধ স্বাধীনতার সপক্ষের ও আধিপত্যবাদ ও জবরদখলের বিরুদ্ধে। শান্তির সপক্ষে-অশান্তির বিপক্ষে, ন্যায়ের পক্ষে—অন্যায়ের বিরুদ্ধে, মজলুমের পক্ষে—জালিমের বিপক্ষে। আধিপত্যবাদী ও জবরদখলকারীরা এ প্রবন্ধের প্রতি বিরূপ মনোভাব দেখাতে পারেন। তবে আমার ধারণা তারাও এর থেকে শিক্ষা নিতে পারেন। যারা এ প্রবন্ধের দ্বারা বিরক্ত হবেন তাদের জ্ঞাতার্থে নিকট অতীতের একটি ঐতিহাসিক ঘটনা উল্লেখ করছি।

বর্তমান রাশিয়া প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাধ্যমে অপর দেশ দখল করে সোভিয়েত ইউনিয়ন সেজেছিল। কোটি কোটি মানুষের অধিকার হরণ করে, কোটি কোটি মানুষকে হত্যা করে, অসংখ্য জাতি গোষ্ঠী ও দেশের স্বাধীনতা হরণ করে, ভূমি ও সম্পদ জবরদখল করে কিছুদিন বিশ্বশক্তিও হয়েছিল। কিন্তু ১৯৯০ সাল নাগাদ দেখা গেল যে, এত জবরদখল, অপরের সম্পদ লুণ্ঠনের পরও দখলদারিত্ব বজায় রাখতে গিয়ে রাশিয়া ভিতর থেকে দেউলিয়া হয়ে গেছে। বুদ্ধিমান ও দূরদর্শী রুশ প্রেসিডেন্ট মিখাইল গর্বাচেভ সভা করে আনুষ্ঠানিকভাবে জবরদখলকৃত ভূমি ছেড়ে দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নকে পুনরায় রাশিয়ায় পরিণত করেন। এতে করে রাশিয়া বর্তমানে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী ও সুখী দেশে পরিণত হয়েছে। জবরদখল থেকে মুক্তি লাভ করা জাতিসমূহও আগের চেয়ে অনেক বেশি সুখী ও সমৃদ্ধশালী হয়েছে। ভারতের বর্তমান শাসক গোষ্ঠীও যদি ১৯৪৬ সালের ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যানের A গ্রুপ-এর প্রদেশসমূহ অর্থাৎ মাদ্রাজ প্রদেশ, বোম্বে প্রদেশ, সংযুক্ত প্রদেশ, বিহার প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ ও উড়িষ্যা প্রদেশ

www.pathagar.com

নিয়ে নিজেদের দেশ গঠন করে এবং অপরাপর জবরদখলকৃত রাজ্যসমূহকে স্বাধীনতা প্রদান করে তবে ভারতও রাশিয়ার ন্যায় শক্তিশালী, সম্পদশালী ও শান্তিময় দেশে পরিণত হবে। সাথে সাথে উপমহাদেশের অসংখ্য জাতি-গোষ্ঠী স্বাধীনতা, সমৃদ্ধি ও শান্তিময় জীবনের অধিকারী হবে। উপমহাদেশের কোটি কোটি জনতার শান্তির জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে ভারতের বর্তমান শাসকগোষ্ঠীর সুমতি হবে কি? না-কি লোভে পাপ—পাপে মৃত্যুর পথে এগিয়ে যাবে?

তথ্যসূত্র :

১. এ এক অন্য ইতিহাস, গোলাম আহমদ মোর্তজা।
২. ইতিহাস সঠিক কথাই বলে, এ কে এম রফিকউল্লাহ চৌধুরী
৩. জাতির উত্থান-পতন সূত্র, এস এম নজরুল ইসলাম
৪. সমকালীন সংলাপ, ঐ

ডিসেম্বর ২০১১

www.pathagar.com

এশিয়াকেই বিশ্বের নেতৃত্ব প্রদানে এগিয়ে আসতে হবে

স্মরণাতীতকাল থেকে এশিয়া পৃথিবীকে নেতৃত্ব দিয়েছে। পৃথিবীর সকল প্রাচীন সভ্যতা, সকল ধর্মের জন্মস্থান ও বিকাশের স্থান এশিয়া। এ জন্যই সকল ধর্মের মৌলিক প্রেরণা রয়েছে এশিয়ায়, অন্য কোনো মহাদেশে নয়। অন্যান্য মহাদেশ এশীয় ধর্মের অনুসারী। কিন্তু ধর্মের আবির্ভাব ও বিকাশ এশিয়ায় হওয়ায় ধর্ম, মানবতা, মানবিক সভ্যতার তীর্থস্থান এশিয়া। অন্যান্য মহাদেশে এশীয় ধর্ম পৌছতে দীর্ঘ সময় লেগেছে, উক্ত দীর্ঘ সময়ে বেশিরভাগ ধর্মই বিকৃত হয়ে অন্যান্য মহাদেশে পৌছেছে। ফলে খাঁটি ধর্ম, মানবসভ্যতা, মানবিকতা সভ্যতা-ভব্যতার মৌলিক স্বাদ অপরাপর মহাদেশবাসীরা আস্বাদন করতে পারেনি। এ কারণেই মৌলিক মানবিক গুণাবলীসমূহ অপরাপর মহাদেশে খুব কমই দৃষ্টিগোচর হয়।

স্পেন ও ইউরোপের আরো কিছু কিছু অঞ্চলে মুসলমান শাসনের ফলে ইউরোপ জেগে ওঠে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানে একসময় মুসলমানদেরকে ছাড়িয়ে যায়। একপর্যায়ে ইউরোপীয়রা পৃথিবীর দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং ছলে-বলে-কৌশলে এশীয়দের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে এবং এশিয়ার দেশে দেশে অর্থ ও ক্ষমতালোভী একশ্রেণীর মানুষের সহযোগিতায় কালক্রমে এশিয়া ও অপরাপর মহাদেশে নিজেরা একাধিপত্য কায়েম করে। উন্নত প্রযুক্তির অধিকারী হয়ে তারা মানবিক সভ্যতার স্থলে যান্ত্রিক ও অমানবিক সভ্যতা প্রতিষ্ঠা করে। লুণ্ঠন ও নৃশংসতাই ইউরোপীয় সভ্যতার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়। সততা, ন্যায়পরায়ণতা, শালীনতা, সভ্যতা-ভব্যতার কবর রচিত হয়। তাদের দস্যুতা ও অমানবিকতা বিশ্বের প্রতিটি নিভৃত কোনের জনগোষ্ঠীকে বর্তমানে সীমাহীন দুর্ভোগে পতিত করেছে। এ দুর্ভোগ থেকে বাঁচতে হলে বিশ্বের নেতৃত্বে আসীন হতে হবে এশীয়দেরকে। তবেই বিশ্বে শান্তি ফিরে আসবে।

বর্তমানে বিশ্ব নেতৃত্বের পালাবদলের সময় এসেছে। অগ্রসর চিন্তার ক্ষেত্রে এশিয়াও ক্রমান্বয়ে ইউরোপের সমকক্ষতা অর্জন করেছে। এশিয়ার সচেতন নাগরিকগণ বর্তমানে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছে যে, এশিয়ার সকল অশান্তির মূলে রয়েছে যায়নবাদী ইসরাইল ও তার বরকন্দাজ ইউরোপ এবং আমেরিকা। যায়নবাদীদের বিশ্বশাসনের আকাঙ্ক্ষা এবং ইউরোপ-আমেরিকার লুণ্ঠনবৃত্তিই মূলত

www.pathagar.com

সমগ্র পৃথিবীর অশান্তির জন্য দায়ী। যায়নবাদীদের ষড়যন্ত্রের নীলনকশা Protocol of the Elders of the Zion-এর অনুসরণে রচিত মনরো ডকট্রিন, আইসেন হাওয়ার ডকট্রিন, হিটলারের মাইন ক্যাম্প পৃথিবীকে ২টি বিশ্বযুদ্ধ এবং অসংখ্য যুদ্ধে লিপ্ত করেছে। ১৯৪৭ সালে বৃটিশরা ভারতবর্ষ থেকে বিদায় নেয়ার সময় এদেশে কিছু ভাবশিষ্য রেখে যায় যারা রচনা ও চর্চা করছে নেহেরু ডকট্রিন, গুজরাল ডকট্রিন তথা দি ইন্ডিয়া ডকট্রিন। উক্ত Protocol ও ডকট্রিনের মূল কথা হলো অপরাপর জাতিকে হত্যা-লুণ্ঠনের মাধ্যমে নিজ জাতির সমৃদ্ধি ও আধিপত্য বিস্তার করা।

সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্য, পৃথিবীকে শান্তির আবাসভূমি হিসেবে পরিণত করার জন্য উপরোক্ত Protocol ও ডকট্রিনের অনুসারীদের নিকট থেকে বিশ্বের নেতৃত্ব কেড়ে নিতে হবে এবং মানবীয় সভ্যতার পাদপীঠ এশিয়াকে বিশ্ব নেতৃত্বের আসনে আসীন করতে হবে।

এশিয়া বর্তমানে বিশ্ব নেতৃত্বের আসনে আসীন হওয়ার যোগ্যতা ও ক্ষমতা অর্জন করেছে তবে উক্ত যোগ্যতা ও সামর্থ্য সমন্বিত রূপলাভ করেনি। ক্ষমতা ও সামর্থ্যের সমন্বয় করার জন্য প্রয়োজন একটি থিংকট্যাংক যা নিউক্লিয়াসের ন্যায় ভূমিকা রাখবে এবং লক্ষ্য পানে এগিয়ে যাবে। এশিয়ার সমর্থ্য ও করণীয় সম্পর্কে এশিয়ার দুইজন অর্থনীতিবিদের বক্তব্য নিম্নরূপ–

আগস্ট '০৯ সালে মালয়েশিয়ার পেনাংয়ে অনুষ্ঠিত "Conference on the effects of the Global economic crisis on Asia" শীর্ষক সম্মেলনে চীনের ব্যাংকিং রেগুলেটরি কমিশনের প্রধান উপদেষ্টা দাতুক সেরি আঙ্গুসের ও ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ওয়াই-ভি-রেড্ডি বলেন, "বিশ্বের মোট মজুদ মুদ্রার ৬৭%, মোট জনসংখ্যার ৫৫% এবং বিশ্ব জিএনপি (GNP)'র উল্লেখযোগ্য অংশ এশিয়ার হওয়া সত্ত্বেও বিশ্বের প্রভাবশালী ২টি ঋণসংস্থা ও সংবাদ সংস্থার মালিক পশ্চিমারা। এশিয়া যদি নেতৃত্ব দিতে চায় তবে এশীয় ঐক্য অপরিহার্য এবং এশিয়ায় একটি থিংকট্যাংক, ঋণসংস্থা ও সংবাদ সংস্থা প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন।" সূত্র : স্টার, মালয়েশিয়া, ২৪.০৮.২০০৯)।

উপরোক্ত দুইজন অর্থনীতিবিদের প্রস্তাবিত এশীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে হলে আমাদেরকে প্রথমে চিহ্নিত করতে হবে এশিয়ার ঐক্যের বাধাসমূহ কি কি? এশিয়ার বর্তমান যুদ্ধ-বিগ্রহ, রক্তপাত, উদ্বাস্তু সমস্যা, অমানবিক কার্যকলাপ কি এশীয়দের স্বার্থে হচ্ছে– নাকি আমেরিকা, ইসরাইল ও ইউরোপের স্বার্থে হচ্ছে? এশিয়ার ভূখণ্ডে বসবাস করে ইউরোপীয়দের স্বার্থে কাজ করছে কোন গোষ্ঠী ও কোন দেশ? এর সহজ-সরল উত্তর হলো এশিয়ার তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ গোষ্ঠীসমূহ শুধুমাত্র অর্থ ও ক্ষমতার লোভে নিজ দেশ ও জাতির সুখ-সমৃদ্ধি ইউরোপীয়দের হাতে তুলে দিচ্ছে। এশিয়ার একটি মাত্র দেশ ভারত নিজের

www.pathagar.com

আগ্রাসী মনোবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য ইউরোপীয়দের সাথে গাঁটছড়া বেঁধেছে ও ইউরোপীয় অস্ত্রে এশিয়ায় রক্তপাত ঘটাচ্ছে এবং ভয়াবহ যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। এশিয়ার অপরাপর দেশসমূহ শুধুমাত্র আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্র সংগ্রহ করছে এবং যুদ্ধ করতে বাধ্য হচ্ছে। ভারতের এরূপ অর্বাচীন কার্যকলাপ অব্যাহত থাকলে সমগ্র এশিয়ায় যুদ্ধের দাবানল ছড়িয়ে পড়বে, যাতে ভারত নিজেও পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

পাঠকবৃন্দ! যদি এমন হতো যে, ভারত তার আগ্রাসী পরিকল্পনা থেকে সরে এলো এবং ইউরোপ-আমেরিকা-ইসরাইলের সাথে যুক্ত হয়ে এশিয়ায় ক্ষতি করার মনোবৃত্তি পরিত্যাগ করলো। এমতবাস্থায় পরবর্তী কয়েক মাসের মধ্যেই আমেরিকা-ইউরোপ ও তাদের রোপিত বিষবৃক্ষ ইসরাইল এশিয়া থেকে পাততাড়ি গুটাতে বাধ্য হবে। বিশ্ববাসী ইতিমধ্যে লক্ষ্য করেছে যে, অর্থনীতি ও জনসংখ্যা স্বল্পতায় আমেরিকা-ইউরোপ পতণোন্মুখ। ইরাক-আফগানিস্তানে ইউরোপ-আমেরিকার অস্ত্রের কার্যকারিতা পরখ হয়ে গেছে। হামাস-হিজবুল্লাহর সাথে ইসরাইলি সক্ষমতার পরীক্ষা হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় পতণোন্মুখ আমেরিকা-ইউরোপের পতন ঠেকাতে দরিদ্র কিন্তু উদীয়মান ভারত নিজের পতন ডেকে আনছে কেন? ভারত যদি যুদ্ধ প্রস্তুতির বদলে নিজ দেশের জনগণের জীবনমান উন্নত করার প্রচেষ্টায় নিজেকে নিয়োজিত করে তবে ভারতের সাধারণ জনগণ চরম দারিদ্র্যসীমা থেকে মুক্ত হয়ে উন্নত ও সমৃদ্ধ জীবনযাপনে সক্ষম হতো, ভারতের সকল রক্তপাত ও গৃহযুদ্ধ বন্ধ হতো এবং ভারতের প্রতিবেশীরা শান্তিতে ঘুমাতে পারতো। আমেরিকা ও ভারতের বর্তমান অর্থনৈতিক ও সামাজিক হালচাল সংক্ষেপে নিম্নরূপ–

মার্চ ২০০৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত রিপোর্টে দেখা যায়, যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় রিজার্ভ ফান্ডে দেনার পরিমাণ ১১ ট্রিলিয়ন ডলার। তন্মধ্যে বিদেশীরা পাবে ৩.৩ ট্রিলিয়ন ডলার। উক্ত দেনার পরিমাণ নিম্নরূপ–

১. জাপান– ৬৮৬.৭ বিলিয়ন ডলার
২. চীন– ৭৭৬.৯ বিলিয়ন ডলার
৩. ক্যারিবীয় দেশসমূহ– ২১৩.৬ বিলিয়ন ডলার
৪. ভারত, ফ্রান্স, মেক্সিকো, কোরিয়া, সিঙ্গাপুর, তুরস্ক– ২০৪ বিলিয়ন ডলার
৫. মিসর, ইসরাইল, ইতালি, নেদারল্যান্ড, থাইল্যান্ড– ১২৪.৩ বিলিয়ন ডলার
৬. আলজেরিয়া, বাহরাইন, ইকুয়েডর, গ্যাবন, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, ইরাক, কুয়েত, লিবিয়া, নাইজেরিয়া, ওমান, কাতার, সৌদি আরব, আরব আমিরাত, ভেনিজুয়েলা– ১৯২ বিলিয়ন ডলার
৭. বেলজিয়াম, কানাডা, চিলি, কলম্বিয়া, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন, সুইডেন– ৮৯.৫ বিলিয়ন ডলার

www.pathagar.com

৮. ব্রাজিল– ১২৬.৬ বিলিয়ন ডলার
৯. লুক্সেমবার্গ– ১০৬.১ বিলিয়ন ডলার
১০. জার্মানি– ৫৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার
১১. বৃটেন– ১২৮.২ বিলিয়ন ডলার
১২. আয়ারল্যান্ড– ৫৪.৭ বিলিয়ন ডলার
১৩. তাইওয়ান– ৭৪.৮ বিলিয়ন ডলার
১৪. হংকং– ৭৮.৯ বিলিয়ন ডলার
১৫. সুইজারল্যান্ড– ৬৭.৭ বিলিয়ন ডলার
১৬. রাশিয়া– ১৩৮.৪ বিলিয়ন ডলার
১৭. অন্যান্য দেশ– ১৫৬.৭ বিলিয়ন ডলার।

উল্লেখ্য, অক্টোবর ২০০৯ পর্যন্ত চীনের নিকট যুক্তরাষ্ট্রের দেনার পরিমাণ হয়েছে ৮৪০ বিলিয়ন ডলার (আল-জাজিরা : ২০.১০.০৯)। এছাড়া অন্যান্য দেশ থেকে আরো ঋণ সংগ্রহ করেছে এবং হাজার হাজার কোটি টাকার বন্ড বিক্রয় করছে যুক্তরাষ্ট্র।

ভারতের দারিদ্র্য

দিল্লি সরকার পশ্চিমের কয়েকটি রাজ্যের সমৃদ্ধির জন্য বাকি রাজ্যগুলোকে শোষণ করছে। বিহার, উড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গ, কাশ্মীর রাজ্যের জনগণের মাথাপিছু আয় অপেক্ষা মহারাষ্ট্র, গুজরাট, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক ও কেরালা রাজ্যের জনগণের মাথাপিছু আয় ৫ থেকে ১০ গুণ বেশি। উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলোর স্থানীয় জনগণের আয় দারিদ্র্যসীমার নিচে। ২০০৫ সালের হিসাব অনুযায়ী ভারতের ৮৫.৭% লোকের দৈনিক আয় ২.৫ ডলারের নিচে এবং ৪১.৬ ভাগ লোকের আয় দারিদ্র্যসীমার নিচে অর্থাৎ ১.২৫ ডলার। বিশিষ্ট সাংবাদিক সিরাজুর রহমান ৮/৯/০৯ সালে দৈনিক নয়াদিগন্তে লিখেছেন, ভারতের মোট জনসংখ্যার ৭৬% চরম দরিদ্র। ঋণের দায়ে ও অনাহারে বিগত ১০ বছরে ভারতের ২ লাখ কৃষক আত্মহত্যা করেছে। বর্তমানে প্রতি আধঘণ্টায় একজন কৃষক আত্মহত্যা করে।

উপরোক্ত তথ্য-উপাত্তের মাধ্যমে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, পরের ধনে পোদ্দারি করা আড়তদার আমেরিকা যদি লুটপাট করার সুযোগ না পায় তবে অচিরেই নব্বইয়ের দশকের সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাগ্যবরণ করবে। আর ভারত হচ্ছে সর্বাঙ্গে ক্যান্সার আক্রান্ত সুন্দর মুখমণ্ডলের মানুষের ন্যায় যার উপরের অংশই শুধু সুন্দর।

মানবজাতির সুখ-সমৃদ্ধি ও উন্নতির জন্য যান্ত্রিক ও পাশবিক সভ্যতার ধারক-বাহক পাশ্চাত্যের নিকট থেকে মানবিক সভ্যতার অধিকারী প্রাচ্যকে বিশ্ব নেতৃত্বে

www.pathagar.com

আসীন হতে হবে। এ জন্য প্রাচ্যের বুদ্ধিজীবী ও জনগণকে এগিয়ে আসতে হবে। প্রাচ্যের স্বাধীনতাকামী বুদ্ধিজীবী ও রাষ্ট্রনায়করা যদি এ লক্ষ্যে সুচিন্তিত পদক্ষেপে অগ্রসর হয়ে জনগণকে সচেতন করে তবে জনগণ পাশ্চাত্যের আজ্ঞাবহ- অর্থ ও ক্ষমতালোভী সেবাদাসদেরকে ক্ষমতার মসনদ থেকে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করবে এবং পাশ্চাত্যের স্বার্থে প্রাচ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী দেশ ও গোষ্ঠীকে সমুচিত শিক্ষা দেবে। এরূপ আকাঙ্ক্ষা এ মুহূর্তে অসম্ভব মনে হলেও বাস্তবে অপশক্তির পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। নইলে পৃথিবীতে মানবজাতি এতদিন টিকে থাকতে সক্ষম হতো না।

১ নভেম্বর ২০০৯

www.pathagar.com

বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক, কলামিষ্ট, সমাজতত্ত্ববিদ, জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক রাজনীতি বিশ্লেষক ও গবেষক জনাব এস.এম. নজরুল ইসলাম চট্টগ্রাম জেলার মীরসরাই থানাধীন ডোমখালী গ্রামে ১৯৬০ সালের ৩রা মার্চ জন্মগ্রহন করেন। তিনি ১৯৮৯ইং সনে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৯০ সন থেকে ২০০১ সন পর্যন্ত তিনি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রভাষক (বাংলা) হিসাবে কর্মরত ছিলেন। এরপর তিনি শিক্ষকতা ত্যাগ করে ব্যবসা, গবেষণা ও ইতিহাস অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হন। ইতিমধ্যে তিনি জাতীয়, আন্তর্জাতিক , ধর্মীয় এবং ইতিহাস বিষয়ে শতাধিক গবেষনাধর্মী প্রবন্ধ এবং ১০টি সেমিনার পেপার রচনা করেন। ইতিমধ্যে তার দুটি বই যথাক্রমে 'সমকালীন সংলাপ' ও 'জাতির উত্থান-পতন সূত্র' প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান বই "সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতির সদরে-অন্দরে" বাংলায় প্রকাশিত হওয়ার পূর্বেই ইংরেজী ও আরবী ভাষায় অনুদিত হয়েছে।

তাঁর প্রকাশিতব্য বইগুলি হচ্ছে-

১। আমাদের উত্থান-পতন কারন ও প্রতিকার।
(Cause & Remedies of our Rise & fall)

২। খাল কেটে কুমির আনার পরিনাম।
(Consequence to invite evil)

৩। ইহুদী চক্রান্তের ঘুর্ণিপাকে বাংলাদেশ ও বিশ্ব।
(Jews conspiracy in Bangladesh & World)

৪। আমাদের আত্মপরিচয় ও টিকে থাকার লড়াই।
(Our self Introduction & Strugle of existance)

তাঁর প্রবন্ধসমুহ একাধিক জাতীয় দৈনিক ও তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত গবেষণাধর্মী "মাসিক ইতিহাস-অন্বেষা" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। নিজেকে, নিজ জাতিকে, সমাজকে, ধর্মকে ও বহির্বিশ্বকে জানার জন্য তাঁর প্রবন্ধসমুহ তথ্য সমৃদ্ধ ও যুক্তিগ্রাহ্য। সহজ, সরল, সাবলীল ভঙ্গিতে এবং নির্ভীকচিত্তে তিনি প্রবন্ধ রচনা করেন। অতীত ইতিহাসের সাথে বর্তমানের সমন্বয়ের মাধ্যমে সুন্দর আগামী নির্মাণ ও জাতিকে যথাযথ দিক নির্দেশনা প্রদান তাঁর জীবনের লক্ষ্য। আমি তাঁর সুন্দর ভবিষ্যত কামনা করি।

প্রফেসর মোসলেম উদ্দীন সিকদার
উপদেষ্টা
মাসিক ইতিহাস-অন্বেষা